



১৮শ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৭২ { ১ম সংখ্যা



শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

সম্পাদক—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজ
কার্যালয়—শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

অষ্টাদশ বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাক্ষ ৪৮০ বিষ্ণু হইতে ৪৮০ মাধব,
বঙ্গাব্দ ১৩৭২ ফাল্গুন হইতে ১৩৭৩ মাঘ,
খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৬ মার্চ হইতে ১৯৬৭ ফেব্রুয়ারী]

প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক

পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমন্তকপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

প্রকাশক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘারপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

বার্ষিক ভিক্ষা—৫.০০ টাকা মাত্র

ଶ୍ରୀଗୌଡ଼ୀୟ ବେଦାନ୍ତ ସାମାନ୍ତର ଯୁଥପତ୍ର

ଶ୍ରୀଗୌଡ଼ୀୟ-ପାତ୍ରିକାର

ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ନିୟାମକ

ପରମହଂସସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିଗ୍ରାଞ୍ଜନ କେଶବ ମହାରାଜ

—(*)—

ପ୍ରଚାର-ସମ୍ପାଦକ

ତ୍ରିଦିଗ୍‌ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହାରାଜ

—(*)—

ସହକାରୀ ସମ୍ପାଦକ-ସଞ୍ଜୟ

ତ୍ରିଦିଗ୍‌ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ

ତ୍ରିଦିଗ୍‌ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ହରିଜନ ମହାରାଜ

ତ୍ରିଦିଗ୍‌ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଧବଚୈତନ୍ୟ ଭକ୍ତିତିଳକ, ବ୍ୟାକରଣତୀର୍ଥ

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବ୍ୟାକରଣତୀର୍ଥ

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଧୁସୂଦନ ବିଦ୍ୟାନିଧି, ବି. ଏ. .

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରସିକରଞ୍ଜନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବି. ଏ.

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବି. ଏ.

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନବିହାରୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବି. ଇ.

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣକୃପା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଭକ୍ତସେବକ

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜିତକୃଷ୍ଣ ଦାସାଧିକାରୀ, ଭକ୍ତିଭୂଷଣ

ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାପତି ଦାସାଧିକାରୀ, ଭକ୍ତସୁହଦ

—(*)—

କାର୍ଯ୍ୟାଧ୍ୟକ୍ଷ

ତ୍ରିଦିଗ୍‌ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ମହାରାଜ

ତ୍ରିଦିଗ୍‌ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ବାମନ ମହାରାଜ-କର୍ତ୍ତୃକ ନବଦ୍ୱୀପସ୍ଥ

ଶ୍ରୀଗୌଡ଼ୀୟ-ପାତ୍ରିକା ପ୍ରେସ ହରିତେ ମୁଦ୍ରିତ ।

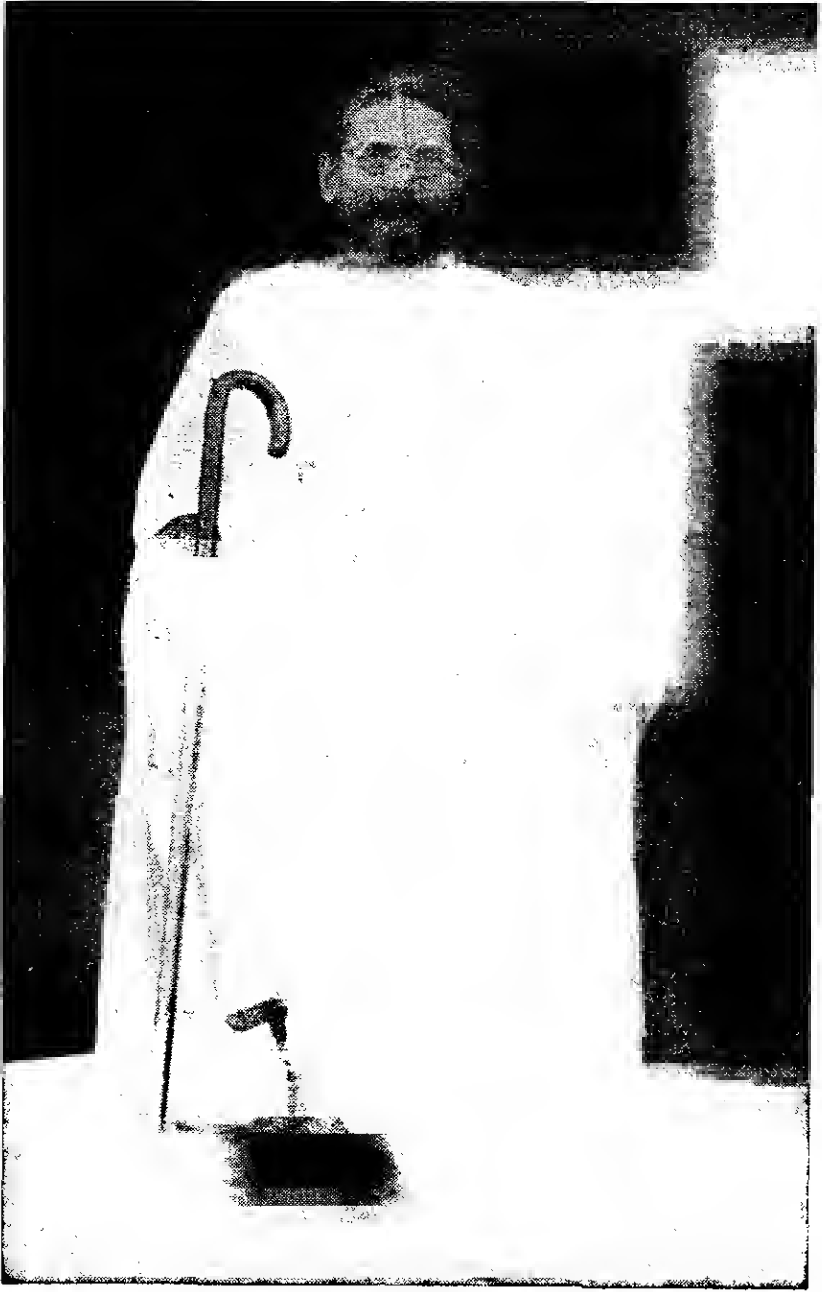
প্রবন্ধ সূচী

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রিক
১। অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব	১।৩৪
২। অঃকুট মহোৎসব—শ্রী শ্রী [নবদ্বীপ, চুঁচুড়া ও মথুরা মঠে]	১০।৩২৬
৩। অপ্রাকৃত-বাণী [কবিতা]	৬।২৩০
৪। অমল পত্র [কবিতা]	১২।৪৬৫
৫। অমূল্য কণ্ঠের কয়েকটি ধ্বনি [চুঁচুড়া মঠে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ- বিরহে গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-নিগ্ৰহ শ্রীমদ্ কেশব গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতার চুষ্ক] ৬।২৩৫	
৬। আচার্য্যদেবের বক্তৃতা—শ্রীল [নবদ্বীপে বাসপূজা-বাসরে]	২।৬২
৭। আচার্য্যদেবের ভাষণ—শ্রীশ্রীল [কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে] ১২।৪৬৯	
৮। আচার্য্যদেবের মথুরাধামে শুভবিজয় ও শ্রীব্রজমণ্ডল- পরিক্রমা—শ্রীশ্রীল ১০।৩২৯	
৯। আছে অধিকার [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৮।২৮৪
১০। আনন্দপাদায় শ্রীল আচার্য্যদেব	১২।৪৭২
১১। আবাহন [কবিতা]	৯।৩৫১
১২। আর কেন? [কবিতা]	৩।১১২
১৩। ইহলোক [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	২।৪৫
১৪। উৎসব সমাচার [শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব; চুঁচুড়া ও পিছলদা মঠে স্নানযাত্রা উৎসব]	৪।১৫৪
১৫। একজাতি [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৭।২৪৫
১৬। একাদশী-মাহাত্ম্য—শ্রীশ্রী [পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড হইতে অনূদিত] [উৎপন্ন ২।৫৭, মোক্ষদা ৩।১০৯, সফল ৪।১৪৩, পুত্রদা ৫।৭৭, ষট্‌তীলা ৬।২১৬, জয় ৭।২৫৮, বিজয়া ১০।৩৮৩, আমলকী ১১।৪২১]	
১৭। কবোঁয়ার পানি	১০।৩৮০
১৮। কর্তব্য [কবিতা]	১০।৩৭৩
১৯। কর্ম ও ভক্তি	১।২৯
২০। কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব	১২।৪৬৮
২১। কীর্তনে বিজ্ঞান [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১।৫
২২। কৃষ্ণাবির্ভাবে ব্যাক্তিস্বৰ্ণিত [কবিতা]	৭।২৫২
২৩। কেদার-বদ্বী-দর্শনান্তে প্রত্যাবর্তন [তীর্থ-পরিক্রমার বিবরণ]	৭।২৭৩
২৪। স্থল ও সাধু [কবিতা]	৯।৩৫৩
২৫। গুরুপদে বিজ্ঞপ্তি—শ্রী [কবিতা]	৬।২২০
২৬। গোপীনাথ পট্টনায়ক কথা [কবিতা]	১০।৩৯২, ১১।৪১০
২৭। গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-উৎসব—শ্রীল	১০।৩৯৭

২৮।	গৌর-ভজন—শ্রী [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৪।১২৭
২৯।	গৌরসুন্দরের গুণিচামাজ্জ নলীলা—শ্রী [কবিতা]	৭।২৬৫, ৯।৩৪৩
৩০।	গৌড়ীয় প্রজ্ঞান	৪।১৮৬, ৬।২২৫
৩১।	গৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর ছাত্রবৃন্দের সাফল্য—শ্রী	৭।২৮০
৩২।	গৌড়ীয়-সরস্বতী	২।৬৩
৩৩।	গৌড়ীয়-স্মৃতি—শ্রী [কবিতা]	১।১২
৩৪।	গৌড়ীয়ের অষ্টাদশ বর্ষ	১।৩৬
৩৫।	চাতুর্মাস্ত-ব্রত-সমাপ্তি	১০।৩২৮
৩৬।	জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও বার্ষিক মহোৎসব—শ্রী শ্রী	৫।১৯৭
৩৭।	জন্মাষ্টমী [কবিতা]	৮।৩০৮
৩৮।	জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব—শ্রী শ্রী	৮।৩১৩
৩৯।	জীবমঙ্গল [কবিতা]	৪।১৩৪
৪০।	জৈবধর্মের ফলশ্রুতি [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৪।১৪৬
৪১।	ঝুলনযাত্রা-মহোৎসব [নবদ্বীপ, মথুরা ও চুঁচুড়া মঠে]	৭ ২৭৬
	[শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে]	৮।৩০৯
	[শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব ও চারিদিবস- ব্যাপী ধর্মসভার বিবরণ সহ]	৭।২৭৭, ৮ ৩০৯
৪২।	টাকা দিয়ে মোড়া	৬।২২১
৪৩।	ঠাকুর তোমায় চাই [কবিতা]	২ ৫১
৪৪।	ঠাকুরের স্মৃতি-সমিতি [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১২।৪৪৬
৪৫।	তীর্থযাত্রা [কবিতা]	১২।৪৫১
৪৬।	তুফান [কবিতা]	৮।৩০৭
৪৭।	ত্রিগুণাতীত দাস বাবাজী মহারাজের নির্য্যাপ—শ্রীমৎ	৩।১১৫
৪৮।	দামোদর ব্রতে ভাগবত পাঠ [কাশীনগরে]	১০।৩২৮
৪৯।	দীনারে অর্ঘ্য [পূজ্যপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের শ্রীচরণে] [কবিতা]	১১।৪১৪
৫০।	দীনের কাতর প্রার্থনা [কবিতা]	৩.৯৭
৫১।	দীনের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি—[শ্রী শ্রীল গুরুমহারাজের পাদপদ্মে]	২।৬৩
৫২।	দুই চোর [নাটিকা]	৩।১০৪, ৪।১৪০
৫৩।	নবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমায় আব্হান—শ্রী শ্রী	১২।৪১৩
৫৪।	নবদ্বীপ-ধাম-মহাত্ম্যম্ (প্রমাণ খণ্ডঃ)—শ্রী শ্রী [সানুবাদং শ্রীলভক্তিবিনোদ-ঠাকুরেণ সংগৃহীত সকলিতঞ্চ] ১।১, ২।৪১, ৩।৮১.৪।১২১	
৫৫।	নবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী	৩.১১৮
৫৬।	নববর্ষে শরণাগতি [কবিতা]	৩।১৮
৫৭।	পরমেশ্বর-স্তোত্রম্—শ্রী শ্রী [সানুবাদং শ্রীদেবগণ-কৃতং]	
		১০।৩৬১, ১১।৪০১
৫৮।	পরলোক [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৩ ২১

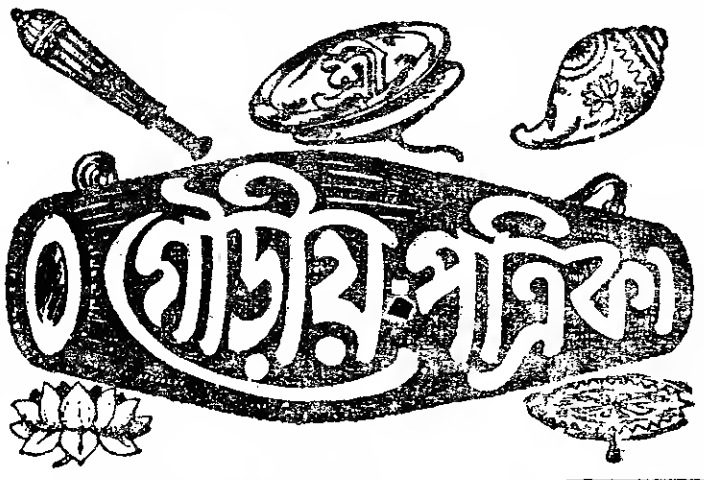
৫২।	পরলোকে শ্রীমদ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ	২।৭৯
৬০।	পাণ্ডিত্য	১।২৫
৬১।	শ্রুত বন্ধু বা আত্মীয় কে?	১।১৮
৬২।	প্রচার-প্রসঙ্গ [দক্ষিণ বঙ্গে, দমদম দেশবন্ধু নগর কলোনীতে ও উত্তর- বঙ্গে রায়গঞ্জ, শিলিগুড়ি ৩।১১৯], [২৪ পরগণার শ্যামবস্ত্রচক, কাকদ্বীপ; মেদিনীপুরে খেজুরী থানা; দাজ্জিলিং, জলপাইগুড়] ৪. ৫৭ [কুচবিহার ৩।২৪০] [হুমকা জিলায়, দিউড়ি, আসাম ৭।২৭৮] [সাঁওতাল পরগণার চণ্ডালমারা, মহেশপুর] ৮।৩১৯ [বহরমপুর] ১০।৪০০	
৬৩।	প্রতিবাদ [“শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সমীক্ষা” পুস্তকের] ৭।১৯৩, ৭।২৬৮, ৯।৩৪৬, ১০।৩৮৬, ১১।৪২৫	
৬৪।	প্রশ্নোত্তর [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখনী হইতে] [বৈষ্ণব তত্ত্ব ১।৮, বিষ্ণুদৈবত ২।৪৯, গৃহস্থবৈষ্ণব ৩।৯৩, পরমহংস- স্বরূপ ৪।১৩২, প্রচার ও প্রচারক ৫।১৬৮, বিজ্ঞান ৬।২০৮, দর্শন ৭।২৪৭, ঐতিহ্য ৮।২৮৯, ৯।৩৩০, শ্রুতি ও হায়া-প্রস্থান ১০।৩৬৭, স্মৃতি-প্রস্থান ১১।৪০৭, প্রবরণ-প্রস্থান ১২।৪৪৮	
৬৫।	বাণী সংরক্ষণ যন্ত্র	৯।৩৬০
৬৬।	নিচর আদালত [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১১।৪০৬
৬৭।	নিরঙ্ক-বার্তা [শ্রীচরিত্রদাস দাসাধিকারীর]	৮।৩১৮
৬৮।	বিশেষ নিবেদন	১০।৪০০
৬৯।	বেশ্যপ্রয় [শ্রীগোরাচাঁদ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী] ৪।১৫৫ [শ্রীবলরাম ব্রজবাসী, শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রজবাসী, শ্রীনিহ্যানন্দ ব্রহ্মচারী] ৮।৩১৭	
৭০।	বৈষ্ণব সাম্মলন—শ্রীশ্রী	১১।৪৩৯
৭১।	ব্যাসপূজা ও আস্থান—শ্রীশ্রী	১১।৪৪০
৭২।	ব্যাসপূজা মহোৎসব—শ্রীশ্রী	২।৭৬
৭৩।	ব্রহ্মগুণ পরিক্রমায় আস্থান—শ্রী	৫।২০০
৭৪।	ব্রহ্ম—খণ্ডবস্ত্র	১১।৪৮৪
৭৫।	ভাক্তপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের স্বধাম প্রয়াণ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ১২।৪৬৬	
৭৬।	ভক্তিবোধান্ত ভিক্ষু মহারাজের মহাপ্রয়াণ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ১০।৩৯৪	
৭৭।	ভক্ত্যর্থ্য [ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যাবধ্য ১০৮ শ্রীশ্রীমদ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের গুণ আবির্ভাব-বাসরে] ২।৬২	
৭৮।	ভগবদ্ভূতি-বর্ণনম্—শ্রীশ্রী [মানুবাদঃ শ্রীব্রহ্ম-কথিতং]	৯।৩২১
৭৯।	ভ্রম-সংশোধন	৮।১৬
৮০।	মঙ্গল-জন্মতিথি—শ্রী [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	১০।৩৬৫

৮১।	মহাপ্রসাদ—শ্রী	১১।৪৩৬
৮২।	মানবানাং কর্তব্য-নির্ণয়ঃ [শুকদেবেন]	৫।.৬১, ৬ ২০১
৮৩।	মানবানাম্ বর্ণধর্মো নির্ণয়ঃ [শ্রীশুকদেবেন]	৭।২৪১
৮৪।	মানবানাম্ সদাচার-নির্ণয়ঃ— [যুধিষ্ঠির-মহারাজস্য প্রশ্নে শ্রীনারদ-ঋষিণা]	৮।২৮১
৮৫।	মাঘানফরের মুক্তি	৫। ৮১
৮৬।	মুং করোতি বাচালং [কবিতা]	৮।২৯৩
৮৭।	রথযাত্রায় আস্থান [বিজ্ঞাপন]	৪।১৫২
৮৮।	রথযাত্রায় শ্রীপুরীধাম দর্শন [পত্রিক্রমা বিবরণ]	৭ ২৭৪
৮৯।	রাজর্ষি কৃষ্ণাঙ্গদ	৮ ২২৬, ৯ ৩৩৭, ১২।৪৫৩
৯০।	রাধাষ্টমী—শ্রীশ্রী	৮। ৩১৬
৯১।	শক্তি-সঞ্চার [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৫।১৬৬
৯২।	শ্রবণ	২।২২
৯৩।	শ্রীধাম-মায়াপুর [কবিতা]	১১ ৪৩৩
৯৪।	শ্রেষ্ঠ পথ [কবিতা]	৬।২১১
৯৫।	স্ট্রেটমেন্ট [ভারত সরকারের ১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেডিষ্টারী সংক্রান্ত আইনগতে প্রকাশিত]	১।৪০
৯৬।	সুগণ শ্রীচৈতন্য-চরণসরোজে অধমার আকিঞ্চন [কবিতা]	৯।৩৫১
৯৭।	সচ্চদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব—শ্রীল	৫।১২৬
৯৮।	সন্দর্ভ-সার [শ্রীভক্তিসন্দর্ভ]—(১৩) ১।.২, (১৪) ২।৫২, (১৫) ৩।৯৯, (১৬) ৪।১৩৬ (১৭) ৫।১৭৩, (১৮) ৬।২১৩, (১৯) ৭।২৫৫, (২০) ১০।৩৭৪, (২১) ১১।৪১৪	
৯৯।	সপ্ততাল উদ্ধার [কবিতা]	৫।১৭১
১০০।	সমাজের বোঝা	৭।২৬১, ৮।৩০২
১০১।	সাত্ত্বত শ্রাদ্ধ [শ্রীরাধাকৃষ্ণ দাসাধিকারীর পত্নীর] [আঁধারমাণিক গ্রামে শ্রীহিরণ্যগোবর্দ্ধন দাসাধিকারীর] [চুঁচুড়ার শ্রীপবিত্রকুমার দত্ত-মহাশয়ের] [ধাদিকার শ্রীরসিকরঞ্জন দাস ব্রহ্মচারীর পিতৃদেবের] [পূর্বচকের শ্রীপাদে গিরিধারী দাসাধিকারীর পত্নীর]	৩।১১৮ ৪।১৫৭ ৫।১৯৮ ৬ ২৪০ ৭।২৭৫
১০২।	সেবাপর নাম [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৯.৩২৭
১০৩।	স্মার্তের কাণ্ড [শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর]	৬।২০৬
১০৪।	স্বাধীনতা [কবিতা]	৯।৩৩৬
১০৫।	সংখ্যা দ্বারা দার্শনিক-শিক্ষা	৪।১৪৮
১০৬।	সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব	৯।৩৫৫
১০৭।	সংসভগবৎ-স্তোত্র-দ্বাদশকম্—শ্রীশ্রী [সানুবাদং শ্রীপ্রজাপতি-কৃতং]	১২।৪৪১



শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ামক পরিব্রাজক
পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহ-রূপিণে ।
শ্রীশ্রীমদুক্তি-প্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে ॥
শ্রীসরস্বত্যভীষিতং সর্বদা স্মৃষ্টু-পালিনে ।
শ্রীসরস্বত্যভিনায় পতিতোধার-কারিণে ॥
শ্রীশ্রীগোড়ীয়-বেদান্ত-সমিতেঃ স্থাপকায় চ ।
শ্রীশ্রীমায়াপুর-ধামঃ সেবা-সমৃদ্ধি-কারিণে ॥
বজ্রাদপি কঠোরায় চাপসিদ্ধান্ত-নাশিনে ।
সত্যস্বার্থে নির্ভীকায় কুসঙ্গ-পরিহারিণে ॥
অতিমর্ত্য-চরিত্রায় স্বাশ্রিতানাঞ্চ পালিনে ।
জীব-দুঃখে সদাৰ্থায় শ্রীনাম-প্রেম-দায়িনে ॥

ধর্মঃ স্বভূতিতঃ পুংসাং বিধবৃন্দেন-কথা হ যঃ	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়স্যাত্মা স্তুত্বসীদতি ॥</p>	নোং পাদমেরেযদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥
সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম্ব । অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ॥	অস্ত ধর্ম স্তুত্বরূপে পালে যেই জন । হরি-কথার বক্তি নৈলে পণ্ড সেই জন ॥	

১৮শ বর্ষ } সঙ্কর্ষণ, ৭ বিষ্ণু, ৪৮০ গৌরাক
 { সোমবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৭২ ; ইং ১৪।৩।১৯৬৬ } ১ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ]

প্রমাণখণ্ডঃ

চতুর্থোহধ্যায়ঃ

যত্কৃতং ধামমাহাত্ম্যং শিবেন গিরিজাং প্রতি ।

উদ্ধামায়-মহাতন্ত্রে শৃণু তদ্ভক্তিপূর্বকম্ ॥৮॥

উদ্ধামায়-মহাতন্ত্রে মহাদেব পার্শ্বতীর নিকট যে ধাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, তাহা ভক্তিপূর্বক শ্রবণ কর ॥৮॥

শ্রদ্ধা গৌরকথাঃ দেবী বিষ্ণুমায়া সনাতনী ।

পপ্রচ্ছ শঙ্করং দেবং ভক্ত্যা পরময়া মুদা ॥১॥

বিষ্ণুমায়া-স্বরূপী সনাতনী দেবী গৌরকথা শ্রবণ করত পরমভক্তি ও প্রীতি-সহকারে মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১॥

গৌরমস্তাদিকং নাথ শ্রুতং তবোদ্ধিবক্তৃতঃ ।

নবদ্বীপস্থ মাহাত্ম্যমিদানীং বদ তত্ত্বতঃ ॥২॥

হে দেব, আপনার উর্দ্ধমুখ হইতে গৌরমস্ত্রাদি শ্রবণ করিয়াছি, সম্প্রতি নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য যথার্থভাবে বর্ণন করুন ॥২॥

নবদ্বীপকথা পুণ্য সর্বপাপবিনাশিনী ।

ন কদাচিৎ পুরা নাথ কৃপয়া কথিতা হুয়া ॥৩॥

হে নাথ, নবদ্বীপ-ধামের কথা অতীব পুণ্য এবং সর্বপাপবিনাশিনী ; আপনি কৃপাপূর্বক এ পর্য্যন্ত তাহা বলেন নাই ॥৩॥

শ্রীমহাদেব উবাচ—

শ্রীহরেঃ পরমা শক্তিঃ স্বরূপাখ্যা বরাননে ।

যস্ত্যাশ্ছায়াস্বরূপা ত্বং মহামায়া গুণাত্মিকা ॥৪॥

তৎপ্রভাবাস্ত্রিধা সন্নিঃ-হ্লাদিনী-সন্ধিনী প্রিয়ে ।

সন্ধিনী ধামনামাদেহঁরেঃ সাক্ষাৎপ্রকাশিনী ॥৫॥

শ্রীমহাদেব বলিয়াছিলেন,—অয়ি স্নুমুখি, শ্রীহরির পরমা শক্তি স্বরূপশক্তি নামে কথিত হইয়াছে । তুমি তাহারই ছায়াস্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি । সেই স্বরূপশক্তির সন্নিঃ (জ্ঞান), হ্লাদিনী ও সন্ধিনী (সত্তাবিস্তারিণী) এই ত্রিবিধ প্রভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে । ঐ সন্ধিনীশক্তিই সাক্ষাৎভাবে শ্রীহরির ধাম-নামাদির প্রকাশ করিয়াছেন ॥৪-৫॥

ভগবান্ সচ্চিদানন্দশ্চেদয়ামাস সন্ধিনীম্ ।

সা সন্ধিনী নবদ্বীপমকরোদক্ষিণগোচরম্ ॥৬॥

সচ্চিদানন্দময় ভগবানের প্রেরণায় সন্ধিনী-শক্তি শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে লোকের নয়নগোচর করিয়াছেন ॥৬॥

ফলং পুষ্পাং যথা দেবি শক্তের্ধাম তথা শুভে ।

অতো নিত্যং নবদ্বীপং প্রকটং হি বিত্ববুধাঃ ॥৭॥

অয়ি দেবি, পুষ্প হইতে ফলের প্রকাশের ত্যায় শক্তি হইতে ধামের প্রকাশ হইয়া থাকে, এইজন্ত পণ্ডিতগণ নবদ্বীপকে নিত্য প্রকটিত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥৭॥

অপ্রাকৃতং নবদ্বীপং চিন্ময়ং চিদ্বিশেষণম্ ।

জড়াতীতং পরং ধাম ব্রহ্মপুরং সনাতনম্ ॥৮॥

বদন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাদ্ভরং সর্বমুন্দরম্ ।

নবসংখ্যাস্তথা দ্বীপাঃ বর্ত্তন্তে পদ্মপুষ্পবৎ ॥৯॥

শ্রুতিসকল এই নবদ্বীপধামকে অপ্রাকৃত, চিন্ময়, চিদ্বিশেষণযুক্ত, জড় জগতের অতীত, পরমসনাতন ব্রহ্মপুর, মনোরম দহর-সংজ্ঞক পদ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং নয়টি দ্বীপও পদ্মপুষ্পের ত্রায়ই শোভা পাইতেছে ॥৮০॥

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নবখণ্ড-স্বরূপকম্ ।

যত্র বৈ রাজতে নিত্যং শ্রীগৌরসুন্দরো হরিঃ ॥১০॥

অয়ি দেবি, যেখানে সাক্ষাৎ হরি শ্রীগৌরসুন্দর নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন, সেই নবদ্বীপের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর ॥১০॥

অন্তর্দ্বীপস্তথা দেবি সীমন্তদ্বীপসংজ্ঞকঃ ।

গোদ্রুমদ্বীপসংজ্ঞোহন্যো মধ্যদ্বীপস্তথাপরঃ ॥১১॥

গঙ্গাপূর্ব্বতটে রম্যো দেবি দ্বীপ-চতুষ্টয়ম্ ।

কোলদ্বীপ-ঋতুদ্বীপো জহ্নুদ্বীপঃ সুরেশ্বরী ।

মোদক্রমস্তথাক্রুদ্রঃ পশ্চিমে তটে ॥১২॥

গঙ্গার রমণীয় পূর্ব্বতীরে অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদক্রমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ নামে চারিটি দ্বীপ এবং পশ্চিমতীরে কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদক্রমদ্বীপ এবং ক্রুদ্রদ্বীপ নামে পাঁচটি দ্বীপ বর্ত্তমান আছে ॥১১-১২॥

গঙ্গা চ যমুনা চৈব গোদাবরী সরস্বতী ।

নর্ম্মদা সিন্ধুঃ কাবেরী তাম্রপর্ণী পয়স্বিনী ॥১৩॥

কৃতমালা তথা ভীমা গোমতী চ দৃষদ্বতী ।

সর্ব্বাঃ পুণ্যজলা নতঃ বর্ত্তন্তেহত্র যথাযথম্ ।

নবদ্বীপো মহাদেবি তাভিঃ সর্ব্বৈঃ পরিবারিতঃ ॥১৪॥

এখানে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী, তাম্রপর্ণী, পয়স্বিনী, কৃতমালা, ভীমা, গোমতী, দৃষদ্বতী-প্রভৃতি সমস্ত পুণ্যসলিলা নদী যথাযথভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, নবদ্বীপ-ধাম ঐ সমস্ত তীর্থদ্বারা সর্ব্বদা পরিবৃত ॥১৩-১৪॥

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী হুবন্তিকা ।

দ্বারাবতী কুরুক্ষেত্রং পুষ্করো নৈমিষং বনম্ ।

বর্ত্তন্তেহত্র নবদ্বীপে নিত্যে ধ্যানি মহেশ্বরী ॥১৫॥

অগ্নি মহেশ্বরী, এই নিত্যধাম নবদ্বীপে অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কান্ধী,
অবন্তী, দ্বারাবতী, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, নৈমিষারণ্য বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥১৫॥

ভাগীরথ্যালকানন্দা মন্দাকিনী তথাপরা ।

ভোগবতীতি গঙ্গায়া অস্তি ধারাচতুষ্টয়ম্ ।

নবদ্বীপস্ত পরিধিশ্চত্বারি যোজনানি চ ॥১৬॥

এখানে ভাগীরথী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী এবং ভোগবতী নামে গঙ্গার
চারিটি ধারাই বর্ত্তমান, এই নবদ্বীপক্ষেত্রের পরিধি চারি যোজন পরিমিত ॥১৬॥

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি রসয়াং দিবি বা প্রিয়ে ।

তানি সর্বাণি তিষ্ঠন্তি নবদ্বীপে সুরেশ্বরী ॥১৭॥

অগ্নি প্রিয়ে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালে যে-সমস্ত তীর্থ আছে, নবদ্বীপে
তাহাদের সকলেই বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥১৭॥

নাহং বসামি কৈলাসে ন ত্বং বসসি মদগৃহে ।

ন দেবা দিবি তিষ্ঠন্তি ঋষয়ো ন বনে বনে ॥১৮॥

সর্ব্বে বয়ং নবদ্বীপে তিষ্ঠামঃ প্রেমলালসাঃ ।

গৌর-গৌরেতি গায়ন্তঃ সঙ্কীর্ত্তনপরা ভুবি ॥১৯॥

বস্তুতঃ আমি কৈলাসে বর্ত্তমান নহি, তুমিও কৈলাসে আমার গৃহে
বর্ত্তমান নহ, দেবতাগণও স্বর্গে বর্ত্তমান নহেন, ঋষিগণও বনে বনে অবস্থান
করেন না, কিন্তু আমরা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম-লাভের আশায় গৌরনাম
সঙ্কীর্ত্তন করত পৃথিবীতে নবদ্বীপ-ধামে বাস করিতেছি ॥১৮-১৯॥

যে নরাঃ কৃতিনো দেবি নবদ্বীপে বসন্তি তে ।

জীবনে মরণে তেষাং পতিরেকো মহাপ্রভুঃ ॥২০॥

যে-সকল বুদ্ধিমান লোক নবদ্বীপে বাস করেন, একমাত্র মহাপ্রভুই
জীবনে মরণে সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের প্রতিপালক রহিয়াছেন ॥২০॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং গৌরং কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ।

যে ভজন্তি নবদ্বীপে তে মে প্রিয়তমাঃ কিল ॥২১॥

কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞক পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দরকে নবদ্বীপে যাহারা ভজনা
করেন, তাঁহারা আমার প্রিয়তম বলিয়া জানিবে ॥২১॥

পদ্মাকারং নবদ্বীপং অন্তর্দ্বীপঞ্চ কর্ণিকাম্ ।

সীমান্তাদিস্থলাংস্তত্র দলানষ্ট-স্বরূপকান্ ॥২২॥

এই নবদ্বীপক্ষেত্র পদ্মাকারে অবস্থিত, অন্তর্দ্বীপ (শ্রীমায়াপুর ক্ষেত্র) সেই পদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ এবং সীমস্তাদি অষ্টদ্বীপ উহার অষ্টদলস্বরূপ ॥২২॥

কর্ণিকা-মধ্যভাগে তু পীঠং রত্নময়ং পরম্ ।

পঞ্চ-তত্ত্বাষিতং তত্র গৌরং পুরটমুন্দরম্ ।

যে ধ্যায়ন্তি জনাঃ শশ্বন্তে তু সর্বোত্তমোত্তমাঃ ॥২৩॥

সেই কর্ণিকার মধ্যভাগে রত্নময় উত্তম পীঠ বর্তমান, যাহারা উক্ত পীঠস্থিত কনককান্তি পঞ্চতত্ত্বযুক্ত শ্রীগৌরমুন্দরকে নিরন্তর ধ্যান করেন, তাহাদিগকে সকল শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥২৩॥

যত্র তত্র নবদ্বীপে স সন্ন্যাস্থথবা গৃহী ।

হা গৌরেতি বদন্তিত্যং সর্বানন্দান্ সমশ্ৰুতে ॥২৪॥

সন্ন্যাসী বা গৃহী যে কোন ব্যক্তি নবদ্বীপের যে-কোন স্থানে নিরন্তর “হা গৌর”, “হা গৌর” এইরূপ কীর্তন করিলে নিখিল আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥২৪॥

কীর্তনে বিজ্ঞান

ভগবান্ কি এবং কিরূপেই বা তাহাকে পাওয়া যায়, তাহা জানিবার জন্ত স্বভাবতঃ মনুষ্য-হৃদয় সমুৎসুক। শাস্ত্রকারগণ ধ্যান, ধারণা, নাম-সংকীর্তনাদি ভিন্ন ভিন্ন পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। কোন্ পন্থা মনুষ্য-হৃদয়ের সহজ-বোধগম্য, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক। ভগবান্ অসীম। অসীমের পূর্ণ ধারণা করা সসীম মনুষ্যের সীমাবদ্ধ চিন্তাশক্তির দ্বারা সম্ভব নহে। উক্ত চিন্তাশক্তি দ্বারা অনন্তের চিন্তা করিতে গিয়া আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই, তাহা দেখা যাউক।

দেখা যায়, কোনও বিষয় চিন্তা করিতে হইলে মনের একাগ্রতা বিশেষ আবশ্যক; কারণ, মন সর্বদা বিক্ষিপ্ত। এক বস্তুর চিন্তায় মনকে অধিকক্ষণ স্থির রাখা সাধারণতঃ অসম্ভব। নির্জনে আত্মিক করিতে বসিলাম, কিন্তু কোথায় আত্মিক! সাংসারিক যাবতীয় বিষয় ক্ষণে ক্ষণে মনে উদ্ভিত হইয়া ক্ষণে লয় হইতে লাগিল। অলী যেমন পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু-আশে ধাবিত হয়, মনও তদ্রূপ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতে লাগিল, কিছুতেই বশে আনিতে পারিলাম না! আমার আত্মিক হইল না। বিক্ষিপ্ত মন

বশে না আসিলে—একাগ্র না হইলে চিন্তিত বিষয় কিরূপে ধারণাযোগ্য হইতে পারে? বিক্ষিপ্ত মন সংযত করিয়া চিন্তিত বিষয়ে একাগ্রভাবে নিয়োজিত করিলে চিন্তিত বিষয় বোধগম্য হওয়া সম্ভবপর। পাঠাভ্যাসরত বালক পাঠাভ্যাসকালীন যদি ক্রীড়া-কৌতুকাদি চিন্তা করিতে থাকে, তবে কি তাহার পাঠাভ্যাস হয়?

ভগবদ্-বিষয়ক বিরাট ব্যাপার চিন্তা করিতে হইলে কিরূপ একাগ্রচিত্ত হওয়া প্রয়োজন, তাহা অনুমেয়। শব্দময় সংকীর্ণনাদির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার পূর্বে চিন্তাময়, জ্ঞানময় যোগের বিষয় আলোচনা করা যাউক। যোগ বা চিন্তাবৃত্তি-নিরোধ-দ্বারা মনঃসংযোগ করিয়া ভগবানকে চিন্তা করিবার প্রথা আছে। মন কেনই বা সদা বিক্ষিপ্ত ও যোগাভ্যাসদ্বারা মনস্থির কিরূপ সম্ভবপর, তাহার বিজ্ঞানসম্মত কি কারণ থাকিতে পারে, তাহা অগ্রে দেখা যাউক; পরে নামসংকীর্ণনাদি দ্বারা মনস্থির অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য কি-না, সে বিচারভার ভক্ত-পাঠকবর্গের উপর হস্ত করা যাইবে। অন্ধকার যেমন আলোকের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধিকর, কৃষ্ণবস্ত্র যেমন শ্বেতবস্ত্রের উৎকর্ষসাধক, নিকৃষ্ট যেমন উৎকৃষ্ট বস্ত্রের ধারণোদ্দীপক, শব্দময় নামসংকীর্ণনের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে যোগ বা প্রাণায়াম কি, তাহা অগ্রে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।

জাগতিক সমস্ত সৃষ্ট বস্তু অণু-পরমাণু দ্বারা গঠিত। এই অণু-পরমাণু সর্বদা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। এই কারণে স্বল্পপরমাণুগঠিত জগৎ বহু-পরমাণুগঠিত সূর্য্যদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহারই চতুর্দিকে ভ্রাম্যমাণ আছে। আমাদের এই অণু-পরমাণুগঠিত দেহও পৃথিবী দ্বারা সদা আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে সংলগ্ন আছে। তাহাকেই দেহের গুরুত্ব কহে। স্বল্পপরমাণুগঠিত ক্ষীণকায় ব্যক্তি অধিক পরমাণুগঠিত স্থলকায় ব্যক্তি অপেক্ষা লঘু, কারণ স্থলকায় ব্যক্তির অধিক পরমাণু পৃথিবী-কর্তৃক অধিক আকৃষ্ট হইতেছে, বিজ্ঞানবিৎ-মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ একটা আনুমানিক সরলরেখার উপর অবস্থিত। যদিও একটা দণ্ড ঠিক মধ্যস্থলে, উপরিভাগ হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত, আনুমানিক সরল-রেখাবিশিষ্ট একটা ছিদ্র করা যায় ও সেই দণ্ডটী পৃথিবীর উপর একরূপভাবে রাখা যায় যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষক রেখা দণ্ডের মধ্যবর্তী আনুমানিক ছিদ্রপথের ভিতর পড়ে, তবে উক্ত দণ্ডটী পৃথিবীর উপর দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয়। দণ্ডের বক্রতা ঘটিলে উক্ত দণ্ড আর যথাস্থানে থাকিতে পারে না।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ দণ্ডের একবিন্দু হইতে বিন্দুস্তরে গমন বিধায় দণ্ডের চঞ্চলতা-হেতু পতন অবশ্যস্তাবী। বাজীকরণ এই প্রক্রিয়ায় নিজদেহ শূন্যস্থিত তারের উপর ঠিক রাখিয়া তত্পরি চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সমর্থ হয়। আমাদের দেহে যে মেরুদণ্ড আছে তাহা শরীরের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিতি-হেতু উক্ত মেরুদণ্ড সরলভাবে রাখিলে উৎসর্গদ্বার হইতে মস্তক পর্যন্ত মেরুদণ্ডের মধ্যবর্ত্তি স্থানের ছিদ্রপথে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষক রেখা পতিত হয়। যোগাভ্যাস-প্রক্রিয়ায় মেরুদণ্ড এইরূপ সরল রাখিবার প্রথা আছে।

এখন অণু কি, তাহা দেখা যাউক। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, একটা অণু একটা ধন ও আটটি ঋণ তড়িৎদ্বারা গঠিত। প্রত্যেক অণুতে আটটি ঋণ ও একটি ধন তড়িৎকণ প্রকৃতি-পুরুষের স্থায় বাস করে। দেখা গিয়াছে যে, একটা সজাতীয় তড়িৎ পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ ও একটি বিজাতীয় তড়িৎ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই বিজাতীয় তড়িৎ উভয়ের আকর্ষণের ফলে পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যে দানায় বা অণুতে পরিণত হয়, তাহাতে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ শক্তি থাকিয়া যায়। ইহা হইতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তির উদ্ভব। কিন্তু প্রত্যেক সজাতীয় তড়িৎকণ যখন অণু হইতে বিভক্ত হইয়া আলাহিদা অবস্থায় থাকে, তখন তাহার প্রত্যেকে, একটা অণুর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা, বস্তুগুণ অধিক।

মনে করুন, আপনি একখণ্ড প্রস্তর লইয়া আর একখণ্ড প্রস্তরে আঘাত করিতে লাগিলেন। আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া মিলাইয়া যাইতে লাগিল। এরূপ করিতে করিতে সমস্ত প্রস্তর নিঃশেষ হইয়া গেল। আপনি কি বুঝিলেন? বুঝিলেন,—ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, সংঘর্ষে উত্তেজিত প্রস্তরের প্রত্যেক অণুর ভিন্ন জাতীয় এবং তড়িৎকণ সুপ্তাবস্থা হইতে বিভক্ত হইয়া পুনরায় শূন্যে নিভ নিভ স্বভাবদ্বারা সংযুক্ত হইয়া অণুরূপ ধারণ করিয়া শূন্যে বিলীন হইতেছে। ঐ সমস্ত বিক্ষিপ্ত অণু যদি পুনঃসংযুক্ত হয়, তবে যে প্রস্তর সংঘর্ষদ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই পুনর্গঠিত হইবে। অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম ত্রীণাম এসকল প্রাকৃত-বিজ্ঞান-বিচার হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থিত — ইহা উপলব্ধির বিষয় হইলেই জীব কৃতকৃত্য হয়।

আত্মন, সুধী পাঠক-পাঠিকাবর্গ! যিনি ঋষ্যকীর্তন-সুরধুনীর অমলধারা প্রপঞ্চে প্রকটিত করাইয়া গৌরকীর্তন-রসহীন মরুজগৎকে অনুক্ষণ সুশীতল কারিতে সদাই ব্যস্ত, যিনি স্বয়ং অধোক্ষজের সেবা-অনুষ্ঠান করিয়া সৌভাগ্যবান্ জীববৃন্দকে অধোক্ষজ-সেবারস পান করাইবার মূল উৎসস্বরূপ, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমলে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া আমরাও অনুক্ষণ গৌর-বিহিত কীর্তন গান করিয়া জন্ম ও জীবন সার্থক করি।

—জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(বৈষ্ণব-তত্ত্ব)

১। শুদ্ধভক্তের স্বভাব কি ?

“সরলতা, দৃঢ়তা ও একান্ততাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় তিনি কখনও ভক্তি-বিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না ; শুদ্ধ ভক্তগণ সর্বদা নিরপেক্ষ।”

—‘ভক্তির প্রতি অপরাধ’, সঃ তোঃ ৮।১০

২। বৈষ্ণব-চরিত্র কিরূপ ? বৈষ্ণব-পদবী পাইবার যোগ্য কে ?

“বৈষ্ণব-চরিত্র নিষ্পাপ ; তাহার কোন অংশ গোপন করিবার যোগ্য নয়। সরলতাই বৈষ্ণবের জীবন। স্বীয় চরিত্র, সর্বত্র প্রকাশ-পূর্বক শিক্ষা দাও। চরিত্র শুদ্ধ না হইলে বৈষ্ণব পদবী পাইবার কেহ যোগ্য হন না। —‘সাধুশিক্ষা’, সঃ তোঃ ৫।১০

৩। চিন্ময় প্রকৃতি-দেহে কৃষ্ণভজনকারী মহাজন কি বৈধাচার পরিত্যাগ করেন ?

“আত্মায় কৃষ্ণ-যোষিদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া সারগ্রাহী মহোদয়গণ কৃষ্ণভজন করেন, তথাপি সর্বদাই বাহুদেহে শারীর কর্মফল ধীরভাবে নির্বাহ করিয়া থাকেন। আহার, বিহার, ব্যায়াম, শিল্প-কার্য্য, বায়ুসেবা, নিদ্রা, যানারোহণ, শরীর-রক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশ-ভ্রমণ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাঁহাদের চরিত্রে যথাযোগ্য সময়ে লক্ষিত হয়।” —কৃষ্ণঃ সং ১০।১২

৪। মনুষ্য-জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় থাকিয়াও সারগ্রাহী বৈষ্ণব কি হরিভজন হইতে চ্যুত হন ?

“সারগ্রাহী বৈষ্ণব পুরুষদিগের মধ্যে ধীরভাবে অবস্থিতি ও কার্য্য করেন। কখনও স্ত্রী-জাতির আশ্রয় পুরুষরূপে যোষিদ্ভগ্নের নিকট পূজনীয় হন। সমাজে অবস্থিত হইয়া কখনও সামাজিক কার্য্য-সমুদয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বালক-বালিকাগণকে অর্থ-বিদ্যা শিক্ষা দিয়া কখনও প্রধান-শিক্ষক মধ্যে পরিগণিত হন।” —কৃঃ সং ১০।১৩

৫। অবিদ্বৎ সন্ন্যাসধর্ম্ম কৃষ্ণের প্রীতিকর হয় না কেন ? অত্যাভিলাষিতা-শূন্য জ্ঞান-কর্ম্মাভাবরণ-রহিত ও আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনকারীর প্রতি প্রীতির কিরূপ রূপা হয় ?

“সন্ন্যাস-ধর্ম্মও আশ্রমোচিত কর্ম্ম-বিশেষ ; তাহাতে মোক্ষ

স্পৃহা-রূপা ফল-কামনা থাকায় কৃষ্ণের প্রীতিকর হয় না। সন্ন্যাসীরাও কর্মানুরূপ ফল পাইয়া থাকেন এবং নিতান্ত নিষ্কাম হইলেও আত্মারামতারূপ ক্ষুদ্র ফল পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহারাও অত্যাভিলাষিতা-শূন্য হইয়া জ্ঞান-কর্মাতির স্বতন্ত্র চেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক আনুকূল্য-ভাবের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণের অহুশীলন করেন। কৃষ্ণ সেই সকল লোকের কর্ম, কর্মবাসনা ও অবিद्या সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছেন।”

—ব্রঃ সং ৫।২৪

৬। বর্ণাশ্রমস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ঐকান্তিক বিষ্ণুভক্ত কি কর্মকাণ্ডীয় বিধি-নিষেধ স্বীকার করেন?

“বর্ণাশ্রমস্থিত সকল ব্যক্তির মধ্যে বিষ্ণুভক্তি সমাযুক্ত ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবপূজা ও অপর বিবিধ রাজস-তামস, হেদ-পুরাণে কথিত সকল প্রকার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম-সমূহ সর্ববৃত্তোভাবে ত্যাগ করিয়াছেন; অথবা পক্ষান্তরে, একান্ত ভক্তগণের যদিও শূদ্রের ও সঙ্কর অন্ত্যজগণের হ্রায় আচার-ব্যবহার, তথাপি তাঁহারা সংসার-বন্ধনজনিত সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।”

—সঃ সাঃ দী, বঙ্গানুবাদ

৭। যে কোন কুলে উদ্ভূত শুদ্ধবৈষ্ণবের পারমাথিক-ব্রাহ্মণত্ব লভ্য হয় কি?

“যে বর্ণই হউন, শুদ্ধবৈষ্ণব হইলে তিনি পারমাথিক ব্রাহ্মণতা লাভ করেন।”

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৮। যে কোন কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবের বেদাধ্যাপনায় অধিকার আছে কি?

“যাঁহার অনন্তভক্তি উদিত হইয়াছে, তিনি তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদের অধ্যাপক হইবার অধিকারী।”

—জৈঃ ধঃ ৬ষ্ঠ অঃ

৯। কৃষ্ণ রূপা ব্যতীত কেবল জ্ঞানে মুক্তি হয় কি? শুদ্ধভক্তের কি মুক্তির জন্ত প্রার্থনা করিতে হয়?

“কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করিয়াও কেহ মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন না; এইজন্তই জ্ঞানমার্গিগণ কৃষ্ণভক্তির আভাসকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তির অধিকারিগণ মুক্তি প্রার্থনা করেন না; কিন্তু মুক্তি অতিশয় দীনভাবে তাঁহাদের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হয়।”

—শ্রীমঃ শিঃ ৮ম প

১০। পার্থিব রাজৈশ্বর্য ও স্বর্গ-সুখাদি বৈষ্ণবের প্রার্থনীয় কি ?

“The kingdom of the world, the beauties of the local heavens and the sovereignty over the material world are never the subjects of *Vaishnava* prayer.”

—*The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Its Theology.*

১১। অকিঞ্চন আত্মরত ব্যক্তি কি ভাবে হরিভজন করেন ? তাঁহার কোনরূপ বিষয়মদ থাকে কি ?

“অকিঞ্চন আত্মরত কৃষ্ণরতিসার ।

জানি ভুক্তি-মুক্তি-আশা করে পরিহার ॥

সংসারে জীবনযাত্রা অনায়াসে করি’ ।

নিত্যদেহে নিত্য সেবে আত্মপ্রদ হরি ॥

বর্ণ-মদ, বল-মদ, রূপ-মদ যত ।

বিসর্জন দিয়া ভক্তি-পথে হন রত ॥”

—‘অভিধেয়-বিজ্ঞান-লক্ষণ-উপলব্ধি’ ১, কঃ কঃ

১২। সর্বোত্তম সাধক কাহার ?

“সাধন-ভক্তি যতপ্রকার আছে, তন্মধ্যে একমাত্র নামাশ্রয়েই সর্বদিক্টি হয়—এইরূপ যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারাই সর্বোত্তম সাধক ।”

—‘প্রবোধিনী কথা’, হঃ চিঃ

১৩। শুদ্ধবৈষ্ণবের বাদানুবাদ বা প্রেমরহস্য-কলহ কি মায়িক-বুদ্ধির অধিগম্য ?

“শুদ্ধবৈষ্ণব যাহা বলেন, তাহা সকলই সত্য ; তাহাতে পক্ষ-প্রতিপক্ষই নাই ; তাঁহাদের বাক্য-কলহে রহস্য আছে। যাঁহাদের বুদ্ধি মায়িকী, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবতার অভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের প্রেমরহস্য-কলহ বুদ্ধিতে না পারিয়া পক্ষ-বিপক্ষ-গত দোষের আরোপ করেন ।” —ব্রঃ সং ৫।৩৭

১৪। শুদ্ধবৈষ্ণব কি কখনও নিজের স্বাতন্ত্র্য-সংরক্ষণে যত্নবিশিষ্ট ? তিনি কিরূপে শুদ্ধদাম্প লাভ করিয়াছেন ?

“শ্রীবৈষ্ণবের সর্বদা এইটী স্মরণ করা কর্তব্য যে, তিনি শ্রীগোপীবল্লভ-দাসানুদাস, পরতন্ত্র স্বাধীন নহেন। স্বাধীনতা তাঁহাতে সম্ভবপর নহে, যেহেতু তাঁহার তদীয়ত্বরূপ স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম বিজ্রয়ের দ্বারা তিনি কৃষ্ণদাম্প লাভ করিয়াছেন ।” —‘শ্রীবৈষ্ণবের বর্ণাশ্রম’, সঃ তোঃ ১১।১০

১৫। কৃষ্ণদাস্ত-মধুপান-মত্ত শুদ্ধভক্ত কি ত্রিতাপ-ক্লেশ অনুভব করেন ?

“শুদ্ধভক্তজন কৃষ্ণ-কৈঙ্কর্য্য-আসবে ।

নিজ-নিজ ভজনেতে মগ্ন সুখার্ণবে ॥

না জানে অভাব-পীড়া সংসার-যাতনা ।

সিদ্ধকাম শুদ্ধদেহ বৈসে সর্ব্বজনা ॥” —নঃ ভাঃ তঃ ১-২

১৬। বৈষ্ণব-ঠাকুরের চরিত্র কিরূপ ?

“বৈষ্ণব ঠাকুর,

অপ্রাকৃত সদা,

নির্দোষ, আনন্দময় ।

কৃষ্ণনামে প্রীত,

জড় উদাসীন,

জীবিতে দয়াদ্র হয় ॥

অভিমান হীন,

ভজনে প্রবীণ,

বিষয়েতে অনাসক্ত ।

অন্তরে বাহিরে

নিরুপট সদা,

নিত্যলীলা-অনুরক্ত ॥”

—লালসাময়ী, প্রার্থনা কঃ কঃ

১৭। কাঁহার আবেদনে কৃষ্ণ দয়া করেন ?

“বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময় ।

এ হেন পামর-প্রতি হ'বেন সদয় ॥

—দৈশ্চময়ী প্রার্থনা, কঃ কঃ

১৮। শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট কিরূপ প্রার্থনা হওয়া উচিত ?

“কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শক্তি আছে ।

আমি ত' কাঙ্গাল, ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি, ধাই তব পাছে পাছে ॥

*

*

*

*

অমানী মানদ হইলে কীৰ্ত্তনে, অধিকার দিবে তুমি ।

তোমার চরণে নিরুপটে আমি কাঁদিয়া লুটিব ভূমি ॥”

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীগৌড়ীয়-স্তুতি

সারাটি বরষ, তোমারে সেবিয়া, কত যে আনন্দ পেয়েছি ।
বলিয়া বা আমি, জানাব তা কা'রে, তাইত বসিয়া ভাবিছি ॥
প্রথম যে দিন, মোরে কৃপা করি', আমার নিকটে আসিলে ।
তোমারে তখন, চিনিতে নারিনু, তাই অনাদর পাইলে ॥
কিন্তু ক্রমে ক্রমে, সে ভ্রম আমার, কোথায় গেল যে চলিয়া ।
কিরূপ আনন্দে, দিন মম যায়, জানাব তাহা কি কহিয়া ॥
প্রতি প্রবন্ধেতে, কত উপদেশ, আমারে তুমি যে অর্পিল ।
বহুজন-সঙ্গে, ফিরিয়া যা কভু, জীবনে নাহিক পাইলা ॥
আউল বাউল, কর্তাভজা আদি, কুসঙ্গে পড়িয়া বৃথা ।
বহুদিন আমি, কাটায়ে দিয়াছি, আর না যাইবতুলিয়া ॥
এখন বুঝেছি, আমি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ সে পরম আরাধ্য ।
অথ দেবসেবা, বৃথা কালক্ষয়, জীবের যা' করে আবদ্ধ ॥
ধর্ম-ধর্ম করি, ফিরিছে অনেকে, জড়িতে আবদ্ধ হইয়া ।
অক্ষজ-জ্ঞানেতে, পালিত তাহার, চিজ্জ্ঞান নাহি লভিয়া ॥
অধোক্ষজ-জ্ঞান, জীবনে কখন শুনি নাই কারো কাছেতে ।
তুমি দয়া করি', মোরে দেখাইলে, অক্ষজ বিমূঢ় যাহাতে ॥
অবরোহবাদ—সাধন-উপায়, অধিরোহ—সর্বনাশ যে ॥
শুদ্ধভক্ত ছাড়া, যারে মোরা দেখি, পড়িছে বিষম ফাঁসে সে ॥
কত তত্ত্বকথা, শুনাতে আমারে, ভুলিব নাহিক জীবনে ।
এ পাঞ্চভৌতিক, দেহ যতদিন, ভজিব তোমার চরণে ।
নূতন বরষে, মনের হরষে, পূজিব তোমায় সাদরে ।
তব গুণরাশি আনন্দেতে ভাসি, কহিব যতনে সবারে ॥
দন্তে তৃণ ধরি, সবারে কহিব, সেব' 'শ্রীগৌড়ীয়' যতনে ।
মানব-জনম, করিতে সার্থক, ইচ্ছা থাকে যদি জীবনে ।
পরম যতনে, নিত্য পাঠ কর, ভকতি-ধন যে লভিবে ।
অনায়াসে তুমি, এ ভব তরিবে, বৃন্দাবনে শেষে যাইবে ॥
তুমি কৃষ্ণদাস, পাবে নিত্য-সেবা, চৌরাশী ভ্রমিতে হবে না ।
চিরশান্তি সেথা, লভিবে যে তুমি, কোন দুঃখ আর র'বে না ॥
'শ্রীপত্রিকা' যাঁদের, জীবন-দর্শন, তাঁরাই আমার বন্ধু ।
তাঁদের চরণে, লইয়া শরণ, তরিব এ ভবসিন্ধু ॥

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, (ভক্তি-ভ্রমণ)

(গ্রাহক নং ৪৩৩৫)

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-১৩)

ত্বংপাদুকে অবিরতং পরি যে চরন্তি

ধ্যায়ন্ত্যভদ্রনশনে শুচয়ো গুণন্তি ।

বিন্দন্তি তে কমলনাভ ভবাপবর্গ-

মাশাসতে যদি ত আশিষ দীশ চাত্তে ॥ (ভাঃ ১০।৭২।৪)

হে পদনাভ, হে পুরুষোত্তম, যে-সকল শুদ্ধাত্মা জীব অবিद्या-নাশক তোমার পাদুকাদ্বয় নিরন্তর সেবা ও ধ্যান এবং কীর্তন করেন, তাঁহারাই সংসার হইতে মোক্ষ লাভ করেন। যদি কিছু কামনা করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই উহা লাভ করিতে সমর্থ, অন্যান্ত লোক রাজচক্রবর্তী হইলেও তাহা লাভে সমর্থ হন না।

যথা সমস্তলোকানাং জীবনং সলিলং স্মৃতম্ ।

তথা সমস্তসিদ্ধীনাং জীবনং ভক্তিরিষ্যতে ॥

জল যেমন সমস্ত লোকের জীবন বলিয়া বিখ্যাত, তদ্রূপ ভক্তিই সমস্ত সিদ্ধির প্রাণ-স্বরূপ।

যো যজ্ঞপুরুষো যজ্ঞে যোগে যঃ পরমঃ পূমান্ ।

তস্মিন্শ্রুষ্টে যদপ্রাপ্যং কিং তদন্তি জনাৰ্দ্দনে ॥ (শ্রীবিষ্ণুপুরাণ)

যজ্ঞে যিনি ‘যজ্ঞেশ্বর’ বিষ্ণু এবং যোগে যিনি ‘পরমাত্মা’ বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই জনাৰ্দ্দন সন্তুষ্ট হইলে আর কি অপ্রাপ্য আছে অর্থাৎ কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না।

তজ্জন্তুই শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৯।২৬) উক্তি—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং

নৈষার্থদো যৎ পুনরর্থিতা বতঃ ।

স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-

মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥

প্রার্থিত হইয়া শ্রীভগবান্ মানবগণের প্রার্থিত দ্রব্য সত্যসত্যই প্রদান করেন, কিন্তু কেবলমাত্র তাহা প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হন না। যেহেতু কামের উপভোগ দ্বারা উপশমিত না হইয়া কাম পুনরায় বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। ভোগ ক্ষয় হইলে সকাম উপাসকগণ পুনরায় প্রার্থনা করিয়া থাকেন, এইজন্য পরম কারুণিক পরমেশ্বর, যাঁহার পাদপদ্মের মাধুর্য না জানা হেতু

তাহা লাভ করিতে ততটা ইচ্ছা বা আগ্রহবিশিষ্ট হন না, ভজনরত তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সমস্ত ইচ্ছা-পরিপূরক নিজ-পাদপদ্ম প্রদান করেন। দৃষ্টান্ত—যেমন মাতা যুক্তিকা-চৰ্কণরত বালকের মুখ হইতে যুক্তিকা নিকাসিত করিয়া মুখে মিষ্টদ্রব্য প্রদান করেন, তদ্রূপ “অকাম বা সৰ্বকাম হইয়া তীব্র ভক্তি-যোগের সহিত পরম পুরুষ শ্রীহরির আরাধনা করিবে”—এই বাক্যে ভক্তির তীব্রত্বের কথা উক্ত হইয়াছে।

এইজন্ত গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

যদুর্লভং যদপ্রাপ্যং মনসো যন্ন গোচরম্।

তদপ্যপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদাতি মধুসূদনঃ ॥

যাহা দুর্লভ, যাহা অপ্রাপ্য, মনেরও যাহা অগোচর, মধুসূদনকে ধ্যান করিয়া কেহ এরূপ বস্তু প্রার্থনা করিলে তিনি উহা প্রদান করিতে পারেন। ব্যতিরেকভাবে কর্মের অনাদর জানাইতেছেন—

শ্রীশ্রুতের প্রতি শৌনক—

কর্মণ্যাম্মিন্নাশ্বাসে ধুমধূম্রায়নাং ভবান্।

অপায়য়তি গোবিন্দ-পাদপদ্মাসবং মধু ॥ (ভাঃ ১।১৮।১২)

অনীধ্বর ফলজনক এই যজ্ঞাহুষ্ঠানরূপ কর্মকাণ্ডের ধূমরাশিতে আমাদের দেহ ধূম্রবর্ণ অর্থাৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। আপনি কৃপাপূরক আমাদিগকে শ্রীগোবিন্দ-পাদপদ্ম-স্বকরন্দসুধা পান করাইতেছেন।

বিঘ্ন বাহুল্যহেতু কৃষিকার্য্যে যেমন ফলপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকে না, তদ্রূপ কর্মের ফলপ্রাপ্তি-বিষয়ে সংশয় বর্তমান বলিয়া উহা নির্ভরতার অযোগ্য। কিন্তু ভক্তির সাধন ও ফল উভয়ত্রই এই নিশ্চয়তা থাকায় নির্ভরযোগ্য।

ব্রহ্মবৈবর্তে শ্রীশিবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি--

যদি মাং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি প্রাপ্তুমস্ত্যেব নাতথা।

কলৌ কলুষচিত্তানাং বৃথাযুঃ প্রভৃতীনি চ।

ভবন্তি বর্ণাশ্রমিণাং ন তু মচ্ছরণার্থিণাম্ ॥

আমাকেই যাহারা পাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়, ইহার অন্তথা হয় না। কলিকালে কলুষিতচিত্ত বর্ণাশ্রমিগণেরই আয়ুঃ প্রভৃতি জীবন-ধারণই বৃথা, কিন্তু আমার শরণার্থী জনগণের জীবন-ধারণ নিরর্থক হয় না।

ত্যাগ্য স্বধর্ম্যং চরণাম্বুজং হরে-

ভজনপকোহথ পতেততো যদি ।

যত্র ক বাভদ্রমভূদমুখ্য কিং

কো বার্থ আশ্বেহভজতাং স্বধর্ম্যতঃ ॥ (১৫।১৭)

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্য পরিত্যাগ করিয়া যদি কেহ শ্রীহরি-পাদপদ্ম ভজন করিতে অপক (অসিদ্ধ) অবস্থায় পতিত হন, ভজন ত্যাগ বা মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলেও তাহাতে কিছু অমঙ্গল হয় না, কিন্তু ভগবদ্ভজনহীন ব্যক্তির বর্ণাশ্রম ধর্ম্য-যাজনে বিশেষ ফল লাভ হয় না ।

একত্র শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি—(ভাঃ ৭।৯।৯)

বিপ্রাদৃষিষড়্-গুণযুতাদরবিন্দনাম্ভ-

পাদারবিন্দবিমুখাং স্বপচং বরিষ্ঠম্ ।

মন্ত্রে তদর্পিত-মনোবচনেহিতার্থ-

প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে বিমুখ দ্বাদশ-গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও ভগবানে অর্পিত মন, বাক্য, প্রাণ ও চেষ্টাদি, এরূপ চণ্ডালকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি ; যেহেতু ভক্ত-চণ্ডাল নিজ-কুল পবিত্র করেন, কিন্তু গর্ভবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ নিজেকে পবিত্র করিতেও অসমর্থ ।

শাম, দম, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, বৈরাগ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সন্তোষ, সত্য, ঈশ্বর-বিশ্বাস এই দ্বাদশ গুণ ব্রাহ্মণের ।

কুলাচারবিহীনোহপি দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ

প্রশস্ত সর্বলোকানাং ন অষ্টাদশবিদ্যকঃ ।

ভক্তিহীনো বিজঃ শান্তঃ সজ্জাতিধার্মিকস্তথা ॥ (স্কান্দে)

জিতেন্দ্রিয় এবং ভগবানে দৃঢ়া ভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি সংকুল ও সদাচার-শূত্র হইলেও সর্বলোক-শ্রেষ্ঠ । কিন্তু অষ্টাদশ বিদ্যাবিশিষ্ট, শান্ত, সংকুলোৎপন্ন ধার্মিক হইলেও ভগবদ্ভক্তিহীন বিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ নহেন ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদি বেতরঃ ।

বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্বোত্তমোত্তমঃ ॥ (কাশীখণ্ড)

বিষ্ণুভক্তিবিনীনা যে চণ্ডালাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।

চাণ্ডালা অপি তে শ্রেষ্ঠা হরিভক্তিপরায়ণাঃ ॥ (নারদীয়ে)

ভাগবতে (২।৪।১৮)—

কিরাত-হুণাক্ষ-পুলিন্দ-পুঙ্কশা

আভীর-শুম্ভা যবনাঃ খশাদয়ঃ ।

যেহন্তে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ

শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্যবে নমঃ ॥

ব্রাহ্মণ হউক, ক্ষত্রিয় হউক, বৈশ্য বা শূদ্র হউক অথবা তদিতর অন্ত্যজ হউক না কেন, বিষ্ণুভক্তি-সংযুক্ত হইলে তাঁহাকেই সর্বোত্তমোত্তম জানিতে হইবে ।

যাহারা বিষ্ণুভক্তিহীন তাহারাই চণ্ডাল, আর যাহারা হরিভক্তিপরায়ণ, তাহারাই চণ্ডালকুলোৎপন্ন হইলেও সর্বশ্রেষ্ঠ ।

হে মহারাজ, বিষ্ণুভক্ত শ্বপচকুলোৎপন্ন হইলেও দ্বিজ অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ । আর দ্বিজাতি হইয়া বিষ্ণুভক্তিহীন হইলে সে শ্বপচ অপেক্ষাও হীন ।

কিরাত, হুণ, অক্ষ, পুলিন্দ, পুঙ্কশ, আভীর, কঙ্ক, যবন, খশ প্রভৃতি যাহারা জাতিগত পাপে দূষিত এবং অপর যে-সকল ব্যক্তি কৰ্ম্মতঃ পাপাচারিক্রমে দুষ্ট হয়, তাহারাও যে শুদ্ধভক্তের চরণাশ্রয়মাত্রেই ঐ জাতিগত ও কৰ্ম্মগত পাপ হইতে শুদ্ধিলাভ করেন, সেই স্বাভাবিক প্রভাবশালী শ্রীহরিকে নমস্কার ।

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্যন্তুধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্ ।

ধিক্কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে তুধোক্ষজে ।

(ভাঃ ১০।২৩।৪০)

কৰ্ম্মী যান্ত্রিক বিশ্রাণ ভক্তিহীনতার জন্য আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—
যাহারা অধোক্ষজ শ্রীহরিতে বিমুখ, তাহাদের শৌক্য, সাবিত্র ও দৈন্য এই ত্রিবিধ জন্মে, ব্রতে, বহুদর্শিতায়, কুলে ও ক্রিয়াদক্ষতায় ধিক্ অর্থাৎ ভক্তি না থাকিলে এই ত্রিবিধ জন্মও নিরর্থক ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীততেও উক্ত হইয়াছে —

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।

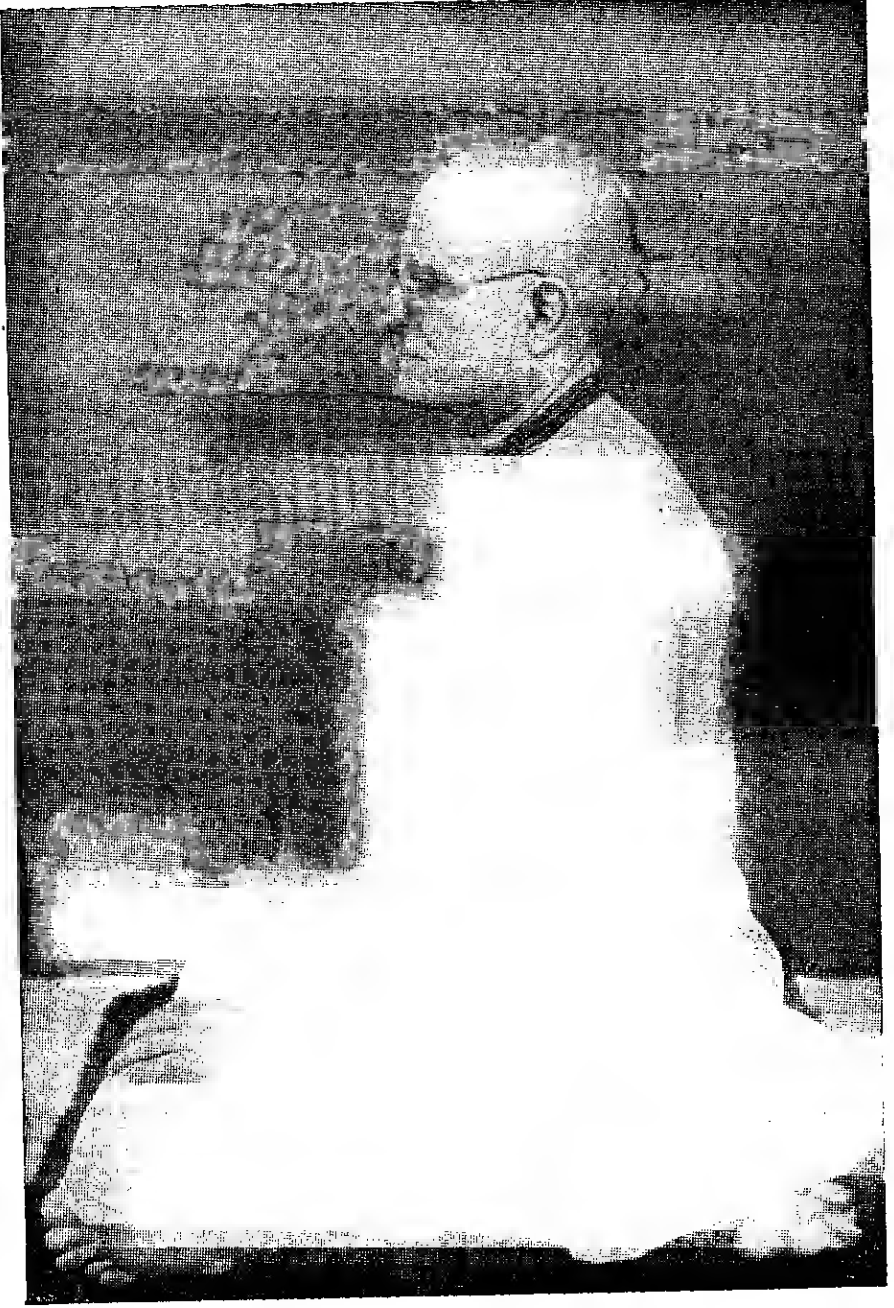
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥

অথ চিন্তং সমাধাতুং ন শক্লোষি ময়ি স্থিরম্ ।

অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছান্তুং ধনঞ্জয় ॥

অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহসি মৎকৰ্ম্মপরমো ভব ।

মদর্থমপি কৰ্ম্মাণি কুর্স্বন্ সিদ্ধিমবাপ্শুসি ॥



জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে ।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীতিনামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবী-দয়িতায় কৃপাক্ষয়ে ।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীকৃপানুগভক্তিদ ।
শ্রীগৌরকৃষ্ণাশক্তিবিগ্রহায় নমোহস্ত তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে ।
কৃপানুগবিরূপাপসিদ্ধান্তধাত্তহারিণে ॥

অথৈতদপাশকৌহসি কর্তুং মদযোগযাশ্রিতঃ ।

সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যত্নবান্ ॥ (গী: ১২।৮-১১)

ভক্তিপ্রধান ধর্মই অনুষ্ঠেয় হওয়ায় অহরহঃ একাগ্রচিত্তে ভক্তবৎসল ভগবানের প্রবণ কীর্তনাদিই কর্তব্য । ভগবানে সমর্পিত কর্মেরও অনাদর-পূর্বক কেবল ভক্তিই বিহিত । কেবল্যভক্তির অনুষ্ঠানে অসমর্থ্যবস্থাতে ভগবানে কর্মার্পণ বিহিত হইয়াছে । যথা—হে ধনঞ্জয়, আমার নিত্যস্বরূপে মনকে স্থির করিয়া আমার স্মরণ কর, তোমার বিবেকবতী বুদ্ধিকে আমাতে নিযুক্ত কর এবং ভগবত্ত্বেই অবস্থিত হও । তাহা হইলে সেই সাধনভক্তির সর্বোচ্চফল নিরুপাধিক প্রেম লাভ করিবে । যদি সহজ অনুরাগ দ্বারা আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে মৎকর্মপর হও । তাহাতেও সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে । যদি মৎকর্মচরণেও অশক্তি হও, তবে সংযত-চিত্তে সর্বকর্মফল ত্যাগপূর্বক বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান কর ।

এস্থলে পদ্মপুরাণোক্ত কাক্তিক-মাহাত্ম্য-বিষয়ক ইতিহাসটী আলোচ্য—

বিষ্ণুদাস নামক শুদ্ধ অর্চনকারী কোন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন । এক সময় চোলরাজ ঐ ব্রাহ্মণের সহিত স্পর্ধা করিয়া কাহার অগ্রে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় তদ্বিষয়ে উৎসুক হইয়া বহু যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণেরই ভগবৎ প্রাপ্তি দর্শন করিলেন, নিজে ভগবানকে লাভ করিতে পারেন নাই । তখন সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া মৃদুগলের নিকট বলিয়াছিলেন—আমি স্পর্ধা-সহকারে যজ্ঞদির অনুষ্ঠান করিলাম, সেজন্য কোন ফল লাভ হইল না । আর বিষ্ণুদাস সাক্ষ্য লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিতেছে । অতএব যজ্ঞ বা দানে ভগবান প্রসন্ন হইনা, কেবল ভক্তিই তাঁহার সন্তোষ বিধানের সমর্থ । তৎপরে রাজা হোমকুণ্ডের সম্মুখস্থ হইয়া—“ভগবান বিষ্ণু আমার কায়-মনোবাক্যে অচলা ভক্তি দান করুন” এই বলিয়া হোম-কুণ্ডে দেহত্যাগ করিয়া ভগবানকে পরবর্ত্তিকালে লাভ করিয়াছিলেন ।

এই প্রকার যোগেরও অনাদর করা হইয়াছে—

যুজ্ঞানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ ।

অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে নরুখিতম্ ॥ (ভা: ১০।৫।৬০)

হে রাজন্, অভক্ত যোগিগণ প্রাণায়ামাদি দ্বারা মন সংযোগের চেষ্টা করিলেও বাসনাক্রয়্যভাবে তাহাদের চিত্ত পুনরায় বিষয়াভিমুখে ধাবিত হইতে দেখা যায় ।

যমাদিভির্যোগপথেঃ কামলোভহতো মুহঃ ।

মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাঙ্কান্না ন শাম্যতি ॥ (ভাঃ ১।৬।৩৬)

পুনঃ পুনঃ কাম-লোভাদির বশীভূতচিত্ত মুকুন্দ-সেবাধারা যে-প্রকার সাক্ষাদভাবে শাস্ত হয়, যমাদি যোগপথে সেরূপ শমতাপ্রাপ্তি হয় না ।

এক্ষণে জ্ঞানেরও অনাদর করা হইতেছে—

পানেন তে দেব কথাসুধায়াঃ

প্রবুদ্ধভক্ত্যা বিশদাশয়া যে ।

বৈরাগ্যসারং প্রতিলভ্য বোধং

যথাঙ্গসার্থীযুরকুর্ধধিক্যম্ ॥ (ভাঃ ৩।৫।৪৬)

হে দেব, তোমার কথারূপ সুধাপান ও প্রবুদ্ধ ভক্তিধারা যাহাদের অন্তঃকরণ নিৰ্ম্মল হয়, তাঁহারা বৈরাগ্যের সার জ্ঞানকে লাভ করিয়া যেরূপ অনায়াসে বৈকুণ্ঠে গমন করেন, তদ্রূপ ধীর জ্ঞানীসকল আত্মসমাধি-বলে দুষ্কারী প্রকৃতিকে জয় করিয়া ব্রহ্মে লীন হইতে গিয়া বিপুল পরিত্রাণের আবাহন করেন মাত্র ; কিন্তু তোমার সেবাপর ভক্তগণের তাদৃশ পরিশ্রম হয় না ।

পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু ভোদ্যেয়ক্ৰীতলভ্যেষু সदैব সংস্থ ।

ভক্ত্যৈকলভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্তৌ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ ॥

সর্বদাই যখন পত্র, পুষ্প, ফল, জল, বিনামূল্যে লভ্য উপকরণরাজি বিত্তমান এবং পুরাণপুরুষ ভগবানও যখন ভক্তিলভ্যরূপেই বর্তমান, তখন মানবগণ এই সকল উপকরণের দ্বারা ভগবানের সেবা না করিয়া কি জন্ত মুক্তিলাভে চেষ্টা করিয়া থাকে ?

—ত্রিদণ্ডিস্বামী ক্রীমন্তুভিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

প্রকৃত বন্ধু বা আত্মীয় কে ?

মানুষ কখনও একাকী থাকিতে পারে না । পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া থাকিতে ভালবাসে । তাই দুই ব্যক্তির পরস্পর আন্তরিক মিলনের নাম বন্ধুত্ব । বন্ধুতা সম-স্বভাব বা সম-মতাবলম্বী ব্যক্তির সহিতই হইয়া থাকে । বন্ধুতা মানবের স্বভাবগত ধর্ম । মানব সম-স্বভাব ব্যক্তির সঙ্গে লাভে ইচ্ছুক এবং যাহার সহিত মনের বিশেষ ঐক্য আছে, তাহার সহিতই সে বন্ধুত্বস্থত্রে আবদ্ধ হয় ।

প্রকৃত বন্ধু যেকোনো মহোপকারক, কপট বন্ধু তদ্রূপ মহানিষ্ঠের মূল। কপট বন্ধু লোকের সুসময়ে ছায়ার ছায় সঙ্গ সঙ্গ থাকিয়া আনুগত্য ও প্রীতি প্রকাশ করে এবং সুযোগ পাইলেই নিজকার্য সাধন করিয়া লয়। কপট বন্ধুর এইরূপ অসদ্ব্যবহারে যে কতলোকের সর্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বলা যায় না। কপট বন্ধুকে অনেকে প্রকৃত বন্ধু মনে করিয়া তাহাদের উপদেশানুসারে নরকের পথে অগ্রসর হয়।

যিনি আমাদের কল্যাণ কামনা করেন, যিনি আমাদের বিপদে নিজেকে বিপদগ্রস্ত মনে করেন, যিনি আমাদের মঙ্গলের জন্ত সর্বপ্রকার স্বার্থত্যাগে অকুণ্ঠিত, তজ্জন্ত আপনাকে বিপদে ফেলিতেও প্রস্তুত, নীতিশাস্ত্র-কারগণ তাঁহাকেই প্রকৃত বন্ধু বলিয়া থাকেন। তাঁহারা আরও বলেন,—মাতাপিতা অপেক্ষা প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কারণ মাতাপিতার নিকট আমরা যেকোনো উপকার প্রাপ্ত হই, জগতে এরূপ কাহারও নিকট পাই না। নীতিশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে—

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্র-বিপ্লবে ।।

রাজদ্বারে শ্মশানে চ যতির্ভক্তি স বান্ধবঃ ॥

কিন্তু এই সকল উপকার জাগতিক ব্যাপারে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হইলেও পারলৌকিক বিষয়—ভগবৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে গৌণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদের নিত্য-প্রভু, আমরা তাঁহার নিত্যদাস, তাঁহার চরণ-সেবাই আমাদের কর্তব্য। তাঁহাকে ভুলিয়াই আমরা এজগতে—মহামায়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। মৃত্যুর পরও আমাদের আত্মার বিনাশ হইবে না, কর্মফলে নানাযোনিতে ভ্রমণ করিতে থাকিব। যাহা প্রকৃত আমি, তাহা পার্শ্বভৌতিক দেহ নহে; তাহাই আত্মা এবং সেই জীবাত্মার স্বরূপই কৃষ্ণের নিত্যদাস।

আমাদের সম্মুখে অনন্ত কাল বর্তমান, ইহার তুলনায় মানব-জীবন অতি অল্পকালস্থায়ী। হরিভজনে না করিলে অনন্তকাল ধরিয়া চৌরাসীলক্ষ জন্মে দুঃখময় সংসার-সাগরে আমাদিগকে হাবুডুবু খাইতে হইবে। তাই যিনি হরিভজনে সহায় হন, সহপদদেশদ্বারা আমার জড়াসক্তি কাটাইয়া দিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করেন, তিনিই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। যাহারা তথাকথিত উপদেশদ্বারা আমাদের বহির্নিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে, তাহারা কখনই যথার্থ বন্ধু-পদবাচ্য নহে। এমন কি, পিতা, মাতা, গুরু, দেবতা প্রভৃতি কেহই আমাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন, যদি তাঁহারা আমাদিগকে শ্রীহরির পাদপদ্মে ভক্তি-বিধানের উপদেশ না দিয়া হরিভজনে বাধা দেন।

গুরুর্ন স স্মাৎ স্বজনো ন স স্মাৎ

পিতা ন স স্মাজ্জননী ন সা স্মাৎ ।

দৈবং ন তৎ স্মাৎ ন পতিশ্চ স স্মাৎ

ন মোচয়েদ্ যঃ স্বমুপেত-মৃত্যুং । (ভাঃ ৫।৫।১৮)

কু-শিক্ষামাত্রকেই বর্জন করিতে হইবে । যিনি আসন্ন-মৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে না পারেন, তিনি গুরু, স্বজন, পিতা, জননী, দেবতা বা পতি-পদবাচ্য হইতে পারেন না অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুরূপ ভীষণ সংসার-সাগরে পতিত জীবকে ভক্তিমার্গের উপদেশদ্বারা তাহাদের উদ্ধারের চিন্তা না করিয়া কেবল লৌকিক সম্বন্ধে গুরু বা স্বজন এবং পিতামাতা, দেবতা বা পতিরূপে পরিচয় প্রদান করা বৃথা । লৌকিক বা ব্যবহারিক গুরু ভক্তি-পথাশ্রয়ী শিষ্যের পক্ষে সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

বামনাবতার স্বয়ং বলিরাজের নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বলিরাজকে দান-ধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন । কিন্তু বলিরাজ গুরুদেবকে উপেক্ষা করিয়া ভগবানকে সর্বস্ব দানপূর্ব্বক তাহার চিরভৃত্যে পরিণত হইলেন । শ্রীরামচন্দ্রের অনুরোধে বিভীষণ স্বজন রাবণাদিকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, শ্রীপ্রহ্লাদ পিতা হিরণ্যকশিপুকে ভগবদ্বিদ্বেষী বলিয়া ত্যাগ করেন । খট্টাকরাজা ইন্দ্রাদি দেবভাগবকে পরিত্যাগ করেন । গোচারণ কালে শ্রীকৃষ্ণ যখন বয়স্ক-বালকগণের দ্বারা যজ্ঞক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগণের নিকট অন্ন প্রার্থনা করেন, তখন গোপজাতি বলিয়া যাজ্ঞিকগণ তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন ; কিন্তু ব্রাহ্মণ-পত্নীগণ ভূত-ভাবন ভগবানকে অন্নপ্রদান করিবার জন্ত স্ব স্ব পতিগণকে উপেক্ষা করিয়া স্বয়ং অন্নাদি-হস্তে সেই গোচারণস্থলে উপস্থিত হন ।

অতএব ঐহ্যার উদ্ধার করিবার ক্ষমতা নাই তাহার গুরু হওয়া উচিত নহে এবং তজ্জন্ত বৃত্তি গ্রহণ করাও অবিধেয় । তাদৃশ ব্যক্তির পুত্র উৎপাদন করাও কর্তব্য নহে, যে পুত্রকে কেবল ভোগেই নিযুক্ত রাখিয়া সন্তুষ্ট এবং পুত্রকে ভারী পরিণামের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে ও ধর্ম্মোপদেশ-প্রদানে বিরত ; সেই দেবতার পূজা গ্রহণ করা উচিত নহে এবং সেই পতিরও কেবল কামচরিতার্থের জন্ত স্ত্রী গ্রহণ করা উচিত নহে, যিনি তাহাদিগকে পরমার্থ পথ প্রদর্শন করিতে সক্ষম নহেন । অতএব ব্যবহারেই শত্রু-মিত্রের

পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি পরমার্থ-বিষয়ে সাহায্য করেন, তিনিই যথার্থ বন্ধু এবং সেইরূপ বন্ধুরই সঙ্গ একমাত্র কাম্য।

“ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ।

ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্ ॥”

এস্থলেও যাহাকে ‘বন্ধু’ বলা হইল, তাহা অর্থকরী বিদ্যা নহে। কারণ জড়বিদ্যা দ্বারা জীবের জড়াসক্তিই প্রবল হয় এবং পরমবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ হইতে জীব দূরে চলিয়া যায়। তাই মহাজন গাহিয়াছেন—

জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভঞ্জে বাধা।

মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা ॥

* * * *

“নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে, বিদ্যা-কূলে কি করিবে তার।

অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, নিতাইপদ পাশরিয়ে, অসত্যেরে সত্য করি মানি ॥”

“সাঁ বিদ্যা তন্নতির্যয়া”। অতএব শ্রীকৃষ্ণের সেবা-মতিই প্রকৃত পরাবিদ্যা—উহাই অবিদ্যা-বিনাশকারিণী। এই পরাবিদ্যার জীবনই—শ্রীকৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তন। অতএব শুদ্ধ কৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনকারীই প্রকৃত বিদ্বান্ এবং নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবত। সুতরাং নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তই প্রকৃত বন্ধু। তাঁহার সঙ্গ লাভ হইলেই জীবের চরম কল্যাণ সাধিত হয়। ভগবানে ভক্তিবিশদানই জীবের একমাত্র কৃত্য। এইরূপ উপকার শুদ্ধভক্তের নিকটই লভ্য; ভক্ত সর্বদা নিজে ভজন করিয়া জীবকে হরিভক্তেরই উপদেশ দান করেন। এইপ্রকার হরিভক্ত বন্ধু অতি দুর্লভ। যিনি এইরূপ বন্ধু লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে অতি ভাগ্যবান্ জানিতে হইবে। তাহার তাপিত প্রাণ জুড়াইতে, শোকে সাস্তুনা দিতে, দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত করিতে, বিপদকালে হৃদয়ে ধৈর্য্য ও সাহস প্রদান করিতে এমন বন্ধু আর কেহই নাই।

বন্ধুর নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিলে আনন্দ হয়, কিন্তু একরূপ বন্ধুর অভাবে জীবন বিড়ম্বনা-বিশেষ। কারণ এইরূপ ভক্ত-বন্ধু ব্যতীত আমাদের নিত্য পরমবন্ধু হরিকে লাভ করা যায় না। সেই জগন্নাথ শ্রীহরি ভক্তেরই অধীন, তাই শাস্ত্রে তাহার দীনবন্ধু, জগবন্ধু, ভক্তবৎসল প্রভৃতি অনেক নাম শুনা যায়। ভক্তের ডাকে তিনি কখনও না আসিয়া থাকিতে পারেন না। তাই ঐকান্তিক ভক্তকে দর্শন দিয়া ভগবান তাঁহার ভক্তবৎসল নামের মাহাত্ম্য জগতে জানাইয়াছেন।

যেদিন আমাদিগকে এই ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, সে-দিন পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেহই আমাদের সঙ্গে যাইবে না এবং কেহই আমাদিগকে এখানে রাখিতে পারিবে না ; প্রাণের বন্ধু, ধন-জনাদি সমুদয় ফেলিয়া একাকী যাইতে হইবে। সে-সময়ে দুস্তর ভব-সাগর-পারের কেহই সাহায্য করিবে না। একমাত্র শ্রীহরিনামই আমাদিগকে এহেন বিপদে রক্ষা করিতে সমর্থ। তাই বলি, যদি ভব-সমুদ্রের পারে যাউবার যদি কাহারও বাসনা থাকে, তবে অসময়ে বন্ধু শ্রীহরিব পাদপদ্মে একান্তভাবে শরণ লইতে হইবে ; তিনি অনায়াসে এই দুস্তর ভব-পারাবার পার করিয়া তাঁহার চরণে অবশ্যই আশ্রয় দিবেন। আমাদিগকে আর জন্ম-মৃত্যুর নাগরদোলায় ভ্রমণ করিতে হইবে না - নিত্যকাল ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া চিরশান্তি লাভ করিব।

যিনি ভগবানের চরণকমল আশ্রয় করেন, তাঁহার নিকট এই দুস্তর ভবার্ণব গোপ্পদ তুল্য প্রতীয়মান হয়। হায়! এমন দিন কবে হইবে, যেদিন আমরা এই অসার সংসারে নিজে ভোক্তা সাজিয়া ‘আমি-আমার’ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া সময় থাকিতে সেই প্রাণবন্ধুর অভয় শ্রীচরণকমলে ধন-জনাদি যথাসর্ব্ব্ব অর্পণ করত তাঁহার চরণে একান্তভাবে আশ্রয় লইব।

—ত্রিদিগ্ভিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

শ্রবণ

আদি-পুরুষ শ্রীভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মার হৃদয়ে নিজতত্ত্ব স্মৃতি করেন। ব্রহ্মা হইতে শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস, বৈয়াসকি প্রভৃতি আগ্নায়-পারম্পর্য্যে সেই নিরন্তকুহক সত্যতত্ত্ব শ্রবণ-প্রভাবে অবগত হইয়াছেন। তন্নিমিত্তই অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্রকে ‘শ্রুতি’ আখ্যা অর্পণ করা হইয়াছে। যাহা মনোজ বিচারদ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তাহা শ্রুত বা শ্রুতি নহে। আর্ষ্যগণ শ্রুতিরই সেবক, তাঁহারা অবরোহমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক গুরু-পরম্পরাক্রমে মন্ত্রযোগে শ্রবণ করিয়া কৈতব-রহিত নিত্যসত্য অবগত হইবার অধিকারী হন। যেহেতু “মননাং ত্রায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।”

যাহারা এই আগ্নায়-পারম্পর্য্যে বিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক মন্ত্র-মর্য্যাদা লঙ্ঘন

করিতেছেন, তাঁহারা নিজ মনকে অসংযত করিয়া যথেষ্ট বিচার-মার্গে পরিভ্রমণ করিয়া আরোহ-মার্গের পথিক হইতেছেন, ইহা সনাতন-ধর্মাশ্রয়ী আৰ্য্য-সম্মত প্রণালী নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কয়েক শতাব্দী ধরিয়া এই অপকৃষ্ট প্রণালীর অত্যধিক আদর হইয়াছে। তন্নিমিত্ত আমরা শ্রুতি-শাস্ত্রের অমার্য্যাদা করিতে শিখিয়াছি; যথার্থ শ্রবণকারীর নিকট শ্রবণ না করিয়া শ্রোত-পথ উল্লঙ্ঘন করিতেছি। মধ্য মধ্য শ্রুতিবিরোধী এক একজনের অভ্যুদয় হইতেছে, আর আমরা দুর্ভাগা জীব তাহাদের অনুগমনে অপৌরুষেয় শ্রুতি উল্লঙ্ঘন করিয়া গণ-গড্ডলিকাগত মত শ্রবণ করিয়া উন্মার্গগামী হইতেছি। কিন্তু শ্রবণ বিনা আমাদের অনুগতি নাই।

শ্রবণই যদি করিতাম, তবে বেদ উল্লঙ্ঘনকারী আশুিক্য-ধর্ম্মশূন্য মনস্বীর উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক উন্মার্গগামী হওয়া আমাদের কর্তব্য নহে। আশ্রয়-পারম্পর্য্যক্রমে যাহারা যথার্থ সত্যতত্ত্ব শ্রবণের অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারাই কীর্ত্তনকারী গুরু — “আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।” যাহাদের উক্ত পারম্পর্য্য ব্যাহত হইয়াছে, যাহারা স্বকল্পিত মত প্রচারে ব্যস্ত, তাহাদের নিকট বা তাহাদের অনুগণ্যের নিকট শ্রবণ করিলে কি লাভ হইবে? ইতর জন-কল্পিত মত কখনও সত্য হইতে পারে না, তাহা কপটতাপূর্ণ মনো-বিকার মাত্র। ইহাকে বহুমানন করিলে আমাদের কি মঙ্গল হইবে? অবিমিশ্র সত্যই আমাদের একমাত্র কাম্যবস্তু। তাহার পরিবর্তে কুহকাশ্রিত ও সন্ধি-চিন্তা হইয়া আমাদের কোনই লাভ নাই। সুতরাং বেদানুগ মহাপুরুষগণই আমাদের আদর্শ, তাঁহাদের অনুবর্তন করিলেই সনাতন ধর্ম্ম সুষ্পষ্টরূপে পালিত হইবে, অত্যাচার অনার্য্য আচার-বিচারের বহুমানন করিয়া নরকগামী হইতে হইবে।

যখন হিরণ্যকশিপু বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় অস্বীকার করিয়া ‘সোহংবাদ’ প্রচার করিতে উদ্যত, তখন তাঁহারই গৃহে শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ভগবদ্বিষ্মেকরূপ অসুর-ভাবমুক্ত হইয়া দৈবভাব, ভগবদ্ব্যনুভূতি লাভ করিয়া চতুর্দশ ভুবনবন্দ্য হইয়াছেন। অনার্য্যতাবের মধ্যে থাকিয়াও তিনি যথার্থ সনাতন আৰ্য্যচার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, শ্রোতমার্গ অবজ্ঞা করিতে নাই, শ্রুতি-পারম্পর্য্যই জীবের মঙ্গল-নিদান! তাই তিনি পিতা-কর্তৃক ‘উত্তম অধীত কি?’—জিজ্ঞাসিত হইলে নবধা ভক্তি-লক্ষণের আদিতে শ্রবণের উল্লেখ করেন। শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন, স্মরণ, প্রভৃতি অত্যাচার-অ-

গুলির বিকাশ হয় না। তাই তিনি বলিলেন—বিষ্ণুর বিষয়েই শ্রবণ করিতে হইবে, তদিতর বিষয়ের শ্রবণ শ্রুতির উদ্দিষ্ট নহে। তিনি ষণ্ডামর্কের নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহা ষণ্ডার্থ ক্রত বিষয় নহে বলিয়াই তিনি জানেন, উহাদিগকে তিনি গুরুত্বে বরণ করেন নাই। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ উক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন যে,—উহারা বিপ্রাধম, উহাদের গুরুত্ব নাই; শ্রীনারদের নিকট আমি (প্রহ্লাদ) কেবলা ভক্তিই শ্রবণ করিয়াছি, স্মতরাং তাহাই বলিব মনে করিয়া শ্রবণাদি বিষয় বিবৃত করিয়াছেন।

পরম পূজনীয় শ্রীল জীব গোস্বামি-প্রভু ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় বলিয়াছেন—‘শ্রবণ’ বলিতে নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময় শব্দের কণ্ঠস্পর্শ বুঝায়। ভক্তি-নব-লক্ষণাশ্রিত। ভক্তির অত্যাশ্রয় অঙ্গগুলি উহাদের অন্তর্গত। নামাদি-শ্রবণ ভক্ত্যঙ্গের এই ক্রম। প্রথমে অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্ত শ্রীনামের শ্রবণ করিতে হইবে। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে রূপ-শ্রবণ-দ্বারা উহার উদয়-যোগ্যতা লাভ হয়। রূপ সম্যক্ উদ্ভিত হইলে গুণসমূহের স্ফুর্তি লাভ হয়। গুণ স্ফূরণ হইলে পরিকর-বৈশিষ্ট্যদ্বারা তাহাদের বিশিষ্টতা সিদ্ধ হয়। তৎপরে সেই নাম-রূপ-গুণাদি সম্যক্ স্ফুর্তিপ্রাপ্ত হইবার পর স্তম্ভভাবে লীলাস্ফুর্তি হয়, তৎপূর্বে নহে। এস্থলে চিত্তশুদ্ধির পূর্বে লীলা-শ্রবণের অধিকার হয় না—ইহাই স্মৃতি হইল। এই উদ্দেশ্যেই সাধন ক্রম লিখিত হইয়াছে। কীর্তন-স্মরণের পক্ষেও এই ক্রম অবলম্বনীয়। শ্রবণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণই পরম শ্রেষ্ঠ। তাহার মধ্যে ভগবৎসেবা-লোলুপ ঐকান্তিক ভক্ত-ভাগবতের শ্রীমুখেই শ্রীকৃষ্ণ-নাম-শ্রবণাদি পরম ভাগ্যেই ঘটয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, তাহারই কথা একমাত্র শ্রবণীয়া।

কলিকালে যে কীর্তনাখ্যা ভক্তিই সর্বপ্রধান, তাহার মূলে শ্রবণই পরিলক্ষিত হয়। সাধুর নিকট ক্রত-বিষয়ই কীর্তনের যোগ্য। স্তম্ভ শ্রবণ না হইলে কীর্তন কিরূপে সম্ভবপর? স্মতরাং আদি ভক্ত্যঙ্গ যে শ্রবণ, সর্বাত্মে তাহারই জন্ত আমরাদিগকে চেষ্টাশ্রিত হইতে হইবে। নিক্ষিঞ্চন সাধু-গুরু-পদাশ্রয়ে সর্বতোভাবে শ্রবণ কর্তব্য। যাহারা স্বকপোল-কল্পিত মতবাদ প্রচার করেন বা এইরূপ ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করেন, তাহাদের নিকট শ্রবণ করিলে আমরা বিপথগামী হইব। তাই বৈষ্ণব-মহাজন আদেশ করিয়াছেন—

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।

একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্ত-চরণে ॥

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ ।

তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥

যাহাদের বিষয়-ভোগ-স্পৃহাই প্রবল, যাহাদের বৈষ্ণব-বিদ্বেষই বৃদ্ধি, তাহাদের মুখে ভাগবত উচ্চারিত হন না, ভাগবতের নামে তাহাদের বিষয়-কথারই আলোচনা হইয়া যায়। যাহারা নিজেরা বৈষ্ণব-অভিমাণে অপর সকলকে হয় প্রতিপন্ন করেন, তাহাদিগকে অবৈষ্ণব জানিতে হইবে, কারণ—

“আমি ত বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হ'ব আমি।

প্রতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী ॥”

“দুষ্ট মন ! তুমি কিসের বৈষ্ণব।

প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জনের ঘরে, তব হরিনাম কেবল কৈতব ॥”

হায়, হায় ! কবে আমি হরিদাসগণের পাদদ্রাণবাহী—এই অভিমান করিতে সমর্থ হইব ? গুরুবৈষ্ণবগণের কৃপা হইলেই শ্রীনামের স্তূৰ্ণ শ্রবণ সম্ভব, তাই গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট সকাঙ্ক্ষ প্রার্থনা—তাহারা মাদৃশ জীবাধমকে কৃপাপূৰ্ব্বক শ্রবণ-যোগ্যতা প্রদান করুন, তবেই আমার জীবন ধন হইবে।

—ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত উদ্ধমন্তী মহারাজ

পাণ্ডিত্য

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় দেবানন্দ পণ্ডিত নামে একজন খ্যাতনামা ভাগবত-পাঠক ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে তিনি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া-ছিলেন ; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব একদিন দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহাভিমুখে যাইতে যাইতে তাঁহার পাঠ শুনিয়া ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন—

“ভাগবতে মহা-অধ্যাপক লোকে ঘোষে।

মর্শ্ব-অর্থ না জানে ডক্টিহীন-দোষে ॥

এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার ?

গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার ॥

ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।

সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার ॥”

শাস্ত্র বলিয়াছেন—“ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহং ন বুধ্যা ন চ টীকয়া”—ভক্তিদ্বারাষ্ট ভাগবতের মর্শ্ব গ্রহণ করা যায়, ভড়বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্যদ্বারা বুঝা যায় না। অতএব সংস্কৃত বলিতে পারিলেই ভাগবত বুঝা যায়, একথা নির্দোষ বালকের প্রলাপ মাত্র।

বৈষ্ণবের অপর নাম—ভাগবত, বৈষ্ণবের জীবনই ভাগবত। যাহার অনুভূতি নাই, যে মায়ার দাস, তাহার কি সাধ্য যে, ভাগবত বুঝিয়া লইবে? বিশ্রবা ঋষি ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু তাহার পুত্র রাবণ অশ্রু হইয়া মনে করিয়াছিল, আমি ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অর্দ্ধাঙ্গিনী শ্রীসীতাদেবীকে হরণ করিলাম। কিন্তু—

ঈশ্বর-প্রেমসী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।

প্রাকৃত ইন্দ্রিয় তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি ॥

স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।

সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ ॥

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।

বেদ-পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর ॥ (টীঃ চঃ মঃ ৯ম পঃ)

শুদ্ধভক্তের নিকট গীতা বা ভাগবত জড়বস্তু নহে—অর্থকরী বিদ্যালাত্তের নিকট পঠ্যপুস্তকও নহে অথবা অক্ষজবাদীর জড়দর্শন বা কাব্যগ্রন্থ নহে। কিন্তু কাল কলি, আজকাল তাহাই হইয়া পড়িয়াছে। যে মনে করে যে, সংস্কৃত অক্ষর চিনিবেই বা পাণিনির সূত্র কণ্ঠস্থ থাকিলেই বা অমরকোষ মুখস্থ করিলেই বা সংস্কৃতে কয়েকটা কথা কপ্‌চাইতে পারিলেই গীতা-ভাগবত বুঝিয়া লইতে পারিব, সে অত্যন্ত অপরাধী জীব। মহাজন বলেন—

ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর-বুদ্ধি যার।

সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ, ভক্তিসার ॥

বৈষ্ণব কখনও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার সেবক নহেন—“কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী, ছাড়িয়াছে যারে সেই ত বৈষ্ণব।” ভক্তির উদয়ে ভগবানে প্রীতি, ভগবদ-অনুভূতি, ইতরবিষয়ে বিরক্তি লাভ হয়। যাহার ইতর-বিষয়ে বিরক্তি হয় নাই, অথচ নিজকে ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেছে, তাহাকে কপট জানিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যদেব রঙ্গক্ষেত্র ভ্রমণকালে একজন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে শ্রীগীতাপাঠ করিতে দেখিতে পান। ঐ ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ ভাষায় গীতা পাঠ করিতেছিলেন; তাহার অশুদ্ধ পাঠ শুনিয়া নিকটবর্ত্তী লোকসকল নানারূপ বিদ্রূপ করিতেছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের অপূর্ব্ণভাব দেখিয়া মনে হইত, তিনি কতই না আনন্দ অনুভব করিতেছেন! শ্রীমন্ন্যহাপ্রভু তাহার এই অপূর্ব্ণ ভাব লক্ষ্য করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনাকে দেখিতেছি, আপনি অক্ষরমাত্রও চিনেন না, তবে আপনার হৃদয়ে এত আনন্দ কি প্রকারে?” ব্রাহ্মণ বলিলেন—

“বিপ্র কহে—‘মূর্খ আমি শব্দার্থ না জানি ।
 শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি ॥
 যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাণ্ড কৃষ্ণ-দরশন ।
 এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন ॥’
 প্রভু কহে—‘গীতাপাঠে তোমারই অধিকার ।
 তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থসার ॥”

অতএব ভুল সংস্কৃতে কথা বলিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারিলেই অপ্রাকৃত গীতা, পঞ্চরাত্র, ভাগবতের বিচার হৃদয়ঙ্গম সম্ভবপর নহে। সংস্কৃত ‘পণ্ডা’ শব্দের উত্তর জাতার্থে ‘ইত’ করিয়া ‘পণ্ডিত’ শব্দ নিষ্পন্ন। ‘পণ্ডা’-শব্দের অর্থ—বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। যাঁহার বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তিনিই পণ্ডিত। সংস্কৃতে ‘বেদ’ এই ক্রিয়ার অর্থ—‘জান’। ‘হে জীব! ব্রহ্মবস্তুরূপে জান’—ইহাই বেদের আদেশ। ব্রহ্মবস্তুরূপে জানিবার জন্ত যাঁহার উজ্জ্বলা বুদ্ধি হইয়াছে, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। নতুবা যিনি জড় অভিনিবিষ্ট, তাহাকে পণ্ডিত বলা যাইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপ অনুস্মার ও বিসর্গ-জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতের স্থান অতিনিম্নে দিয়াছেন। দেবানন্দ পণ্ডিত সংস্কৃত জ্ঞানে পারদর্শী হইয়া ভাগবত পাঠ করিতেন বলিয়াই শ্রীগৌরসুন্দর তাহাকে বলিলেন—

“বুঝিলাম, তুমি যে পড়াও ভাগবত ।
 কোনজন্মে না জান গ্রন্থের অভিমত ॥
 পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায় ।
 তবে বহির্দেশ গিয়া সে সন্তোষ পায় ॥
 প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি ।
 তত সুখ না পাইলা, কহিলাম আমি ॥”

শ্রীমন্মহাপ্রভু সংস্কৃতে পারদর্শী পণ্ডিতের অহঙ্কারকে অনাদর করিলেন। সেইজন্ত সংস্কৃতে কথা কহিতে শিখিলেই নিজের বা সমাজের কোন হিতই করা হয় না। এইরূপ পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার যিনি করেন, তাহাকে ভারবাহী গর্দভের সহিত তুলনা করা হইয়াছে—

“পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারেখারে ।
 কৃষ্ণ-মহামহোৎসব বঞ্চিল তাহারে ॥
 শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে ।
 গর্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি’ মরে ॥”

শ্রীগৌরসুন্দর যে-সময়ে নবদ্বীপে প্রকটিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে নবদ্বীপ শাস্ত্রচর্চা ও পাণ্ডিত্য-কোলাহলে মুখরিত ছিল। কত বড় বড়

নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ সেই সময়ে আবিভূত হইয়াছিলেন। নিজে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার স্বরচিত শিক্ষাষ্টকেও জানাইয়াছেন—হে ভগবন্, আমি ধন, জন বা পাণ্ডিত্য কিছুই চাহি না ; জন্মে জন্মে যেন তোমার পাদপদ্মে ভক্তি থাকে।

এখন জিজ্ঞাস্য,—তবে কি মূর্থ হওয়াই শাস্ত্রের অভিমত ? না—তাহাও নহে। ভগবদ্ভক্তিবিশীন মূর্থতা ও পাণ্ডিত্য উভয়ই ত্যাজ্য, ভক্তিয়ুক্ত ব্যক্তিই পণ্ডিত। বাংলা শব্দে অহুসার-বিসর্গ লাগাইয়া পণ্ডিত সাজিলে নুবুদ্ভিগণ তাহার বহমানন করিতে পারেন না—

ভগবদ্ভক্তিবিশীনশ্চ জাতি-শাস্ত্র-জপস্তপঃ।
অপ্রাণশ্চৈব দেহশ্চ মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্ ॥

ভগবদ্ভক্তিবিশীনের ব্রাহ্মণাদি উচ্চজন্ম, বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন, জপ-তপ সকলই মৃতদেহে অলঙ্কারের মত লোকরঞ্জনের হেতু মাত্র।

যে ব্যক্তি মাৎস্যর্য ও ঈর্ষার বশবর্ত্তী হইয়া ‘কাহাকেও পরাস্ত করিব বা নানা কোশলে আমি সভা জয় করিব’ এই দুর্ভিসন্ধির পোষণ করিয়া পাণ্ডিত্য জাহির করিতে প্রয়াস পায়, সে বৈষ্ণব নহে। ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের মৎসরতা নাই। বৈষ্ণব কপটতাপূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করেন না। বৈষ্ণবের জয়-পরাজয় বুদ্ধি নাই। তাঁহারা প্রাণাশ্বেও নিজেরা বাস্তব সত্যকথা আচরণপূর্ব্বক জগদ্বাসীকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। জীবোদ্ধারের নিমিত্ত তাঁহাদের ঐকান্তিকী চেষ্টার তুলনা হয় না।

বৈষ্ণব—অপ্রাকৃত পাণ্ডিত্যে ভূষিত ; তবে তিনি যে তাঁহার স্বভাব সুলভ দৈন্ত প্রকাশ করেন, ইহাও তাঁহার বৈশিষ্ট্য ও মহিমা। তিনি জগতের নিকট তাঁহার ইষ্টদেবের নাম প্রচারেই উৎকণ্ঠিত। জীবনে তাঁহার সেবা-চেষ্টাই একমাত্র কাম্য। মূর্থ পণ্ডিতাভিমानी নাস্তিক সমাজ তাই তাঁহাদের তত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ—

“বিষয়-মদাস্ক সব কিছুই না জানে।
জাতি-বিদ্वा-ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে।
ধন নহে, জন নহে, না চাহে পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভূত্যা ॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শক্তি ?

আছে সেকল সিদ্ধি দেখয়ে দুর্গতি ॥ (চৈঃ ভাঃ ৯ম অঃ)

—শ্রীরাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণতীর্থ

কৰ্ম ও ভক্তি

‘কৰ্ম’-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—কাৰ্য্য, অৰ্থাৎ যাহা করা যায়। কিন্তু দৰ্শনের পরিভাষায় ইহার একটী বিশেষ অর্থ আছে। আমরা ভগবৎসেবাকল্পে যে-সকল চেষ্টা করি, সেগুলি ইহার অন্তর্গত নয়; সেগুলির নাম—ভক্ত্যঙ্গ। ‘কৰ্ম’ বলিতে যে-সকল কাৰ্য্য লোকে ইহজন্মে বা পরজন্মে অথবা স্বর্গে নিজস্ব-ভোগের আশায় কিংবা এই দেহকে ‘আমি’ বুদ্ধি করিয়া ইহার সম্পর্কে যে সব ব্যক্তিকে আপন জ্ঞান করে, যথা—জাতি, কুটুম্ব, গ্রামবাসী, দেশবাসী, পৃথিবীবাসী, তাহাদের সুখের জন্য যে কাৰ্য্য করা হয়, সেই গুলিকে বুঝায়। আর ভগবানের সেবা উদ্দেশ্য করিয়া যাহা কিছু করা যায়, তাহা ভক্তি। ‘ভজ্’-ধাতুর অর্থ সেবা করা। একই কাৰ্য্য ক্ষেত্রবিণেষে কৰ্ম হইতে পারে, অতিক্ষেত্রে ভক্তি হইতে পারে; বুদ্ধি-বিচারে তাহার কৰ্মত্ব অথবা ভক্ত্যঙ্গত্ব। শাস্ত্রোক্ত কৰ্ম-সকল যখন পুণ্য-লাভার্থে বা স্বর্গ-কামনার বশে কৃত হয়, তখন সেগুলিই কৰ্ম।

আমরা কৰ্মফল ভোগ করিতে বাধ্য। কৰ্ম আমাদের বন্ধন-দশা বৃদ্ধি করিয়া আমাদের সংসারে নিষ্ক্ষেপ করে। কৰ্মে সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও অন্তর্স্থিত আছে। সংসারে এমন কোন সুখ নাই যাহার পশ্চাতে দুঃখ লুক্কায়িত থাকে না। সংসারে সুখভোগে শান্তি নাই। ভোগের দ্বারা কাম বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইতে থাকে, আর কামনার অতৃপ্তিতে দুঃখ আছেই। নিরবচ্ছিন্ন সুখ সংসারে কখনই হইতে পারে না। স্বর্গসুখেও কামনার অন্ত নাই, ইন্দ্র-চন্দ্রকেও পাপকৰ্মে লিপ্ত হইতে দেখা যায়। আর পুণ্য সমাপ্ত হইলে স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া আবার সংসার-দশা বরণ করিতে হয়।

ভক্তিই আমাদের নিত্যবৃত্তি। ভগবান্ নিত্য চিৎখন-বিগ্রহ, জীবের স্বরূপও চিৎ। এস্থলে ভগবানেও জীবে নিত্য অভেদ। এজগতে জীব অচিৎ সম্পর্শে স্থাবর-জঙ্গম-দেহ লইয়া সংসার করিতেছে। চিৎকণ জীব নিত্যকাল হরিসেবা-রত। বাস্তব জ্ঞানের সন্ধান লইয়া যখন শ্রদ্ধাসহকারে সাধু পদাশ্রয় করিয়া সাধন করিতে থাকি, তখনই আমাদের অনর্থ নিবৃত্তি ঘটে। তখনই আমরা নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাবক্রমে ভগবৎপ্রেমের অধিকারী হইতে পারি। ইহাই জীবের পরম প্রয়োজন, পরম-পুরুষার্থ। ভক্ত ধৰ্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই ত্রিবর্গাত্মক কৰ্ম এবং মোক্ষাভিসন্ধানরূপ অপবর্গ—এই চারি পুরুষার্থকে নরক-সদৃশ জ্ঞান করিয়া একমাত্র অহৈতুকী ভক্তিই যাজন করেন।

অনেকের ধারণা,—কর্ম করিতে করিতে তাহারই ফলরূপে ভক্তি আসিবে, কেননা কর্মিগণও হরিপূজাদি করিয়া থাকেন। ভাগবত-সিদ্ধান্ত তাহা নহে; কারণ কর্ম করিতে করিতে কেবল কামনা-বাসনাই বদ্ধিত হইয়া থাকে। সুতরাং কর্মের ফল কিরূপে ভক্তি হইতে পারে? তবে কর্মে যে ভক্তির মত কিছু অনুষ্ঠান দেখা যায়, উহা কর্ম্মাঙ্গ, ভক্তি নহে। কর্মে উদ্দিষ্ট বস্তু ভগবান্ আমাদের নিত্যসেব্য, সুতরাং সকল প্রকার ভোগবাস্তু পরিহারপূর্ব্বক ভগবানেরই সেবা কর্তব্য—এই বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া কর্মিগণ কখনও ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের চাই—নিজের ভোগ। সেই ভোগসাধনের জন্ত অনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় কিছু ভক্তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ইহা ভক্তের অহৈতুকী ভক্তির সহিত কখনই সমতুল্য নয়। ইহা কর্ম্মাঙ্গ—ইহা দ্বারা ভক্তিলাভ সুদূর-পরাহত।

কর্ম্মীর ভক্তিকে মিশ্রাভক্তি বলা যায় কিনা, একথাও কেহ কেহ প্রশ্ন করেন। তাহার উত্তরে বলা যায়, উহা মিশ্রা ভক্তিও নহে—উহা বিদ্বা-ভক্তি। যেক্রপ বিদ্বা একাদশী ত্যাজ্যা, তদ্রূপ বিদ্বা ভক্তিও হেয়া; উহা ভক্তিই নহে, নিজের ভোগের উপায়ভূত অনুষ্ঠান বিশেষ। যেখানে ভগবদ্ভক্তির জন্ত কেহ যত্নপর, ভগবানকে নিত্যসেব্যজ্ঞানে তাঁহার সেবাতেই মনোনিবেশ করা হয়; অথচ অনাদিকাল হইতে বদ্ধাবস্থায় যে-সংসারের সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে সেই কামনা সম্পূর্ণ নষ্ট হয় নাই, এমন অবস্থায় যে ভক্তি, তাহাই মিশ্রা ভক্তি। উহা ভক্তি, তবে কিছু কর্ম্মভাব উহাতে মিশ্রিত। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে ঐ কর্ম্মভাবটুকু শ্রীভগবৎকৃপায় কাটিয়া গিয়া শুদ্ধভক্তি লাভ হইবে।

ক্রব মহারাজের কথা হইতে আমরা জানিতে পারি, যদিও তিনি রাজ্য-লাভের জন্ত ভগবানের আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তিনি পদ্মপলাশ-লোচন শ্রীহরি আছেন—এই বিশ্বাসে ভক্তি-পথশ্রয় করিয়াছিলেন। কর্ম্মাঙ্গের অগ্রতম অনুষ্ঠানরূপে তিনি অনিত্যভক্তির আবাহন করেন নাই। ভগবানের জন্ত তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তবে রাজ্যলাভরূপ দুর্কাসনা তাঁহার চিত্তকে বিশেষরূপে আবদ্ধ করিয়াছিল। অবশু ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে দেবর্ষি নারদের সঙ্গের দ্বারা তাঁহার দুর্কাসনা বিদূরিত করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধভক্তি প্রদান করেন। কর্ম্মীর এরূপ সৌভাগ্য কদাচিৎ লাভ হয়, হইলেও তাহা কর্ম্মের ফল নহে। প্রহ্লাদ মহারাজের ভক্তি আদৌ মিশ্রা ছিল না। মাতৃগর্ভে থাকাকালেই তিনি দেবর্ষির সঙ্গ ও উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। কোনও ইতর কামনা-বাসনাই তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিতে পারে নাই। সাধুসঙ্গের এইরূপ অপার মহিমা। সাধুসঙ্গ ব্যতীত আমাদের শুদ্ধভক্তি-লাভের আর উপায়ান্তর নাই এবং ভক্তির দ্বারাই সেরূপ সাধুসঙ্গ লাভ সম্ভব।

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক

শ্রীশ্রী একাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, চতুর্বিংশ অধ্যায়]

শ্রীশিব বলিলেন,— হে বৎস নারদ ! এক সময়ে আমি বৈকুণ্ঠে শ্রীনারায়ণের নিকট গমন করি । সেখানে আমি তাঁহাকে ঐ একাদশী-ব্রতের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম । সেই মাহাত্ম্য শ্রবণ এবং যথাযথ ব্রত আচরণ করিয়া সমস্ত মুনিগণ এ জগতে নানা ভোগস্বখ লাভান্তে স্ব-স্ব-ধামে গমন করিয়াছিলেন । শ্রীনারদ বলিলেন,—হে মহাদেব ! এই সর্বশ্রেষ্ঠ একাদশীর স্বরূপ কি এবং ব্রতেরই বা ফল কিরূপ, তাহা আমাকে বলুন ।

বিশ্বেশ্বর বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণ ! এই একাদশী মহাপুণ্যফল প্রদান-কারিণী, বিশেষতঃ উহা শ্রবণাদি-নক্ষত্রযোগেই মুনিশ্রেষ্ঠগণের করণীয় । তন্মধ্যে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী—ইহারা সমস্ত পাপ হরণ করিয়া থাকেন । অতএব ফলাকাঙ্ক্ষীগণেরও এই সকল ব্রত অবশ্য করণীয় । শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী-দিনে যদি পুনর্বসু নক্ষত্রযুক্ত হয়, তবে দ্বাদশী ‘জয়া’-মহাদ্বাদশী নামে বিখ্যাত হন ; এই জয়া মহাদ্বাদশী সমস্ত তিথির মধ্যে শ্রেষ্ঠ । ঐ তিথিতে উপবাস করিয়া মানব পাপ হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে কোনও সংশয় নাই । যে শুক্ল-দ্বাদশী-তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহাকে ‘বিজয়া’-মহাদ্বাদশী নামে অভিহিত করা হয় । ঐ শ্রেষ্ঠ তিথিতে দান, হোম ও উপবাসকারীর সহস্রগুণ ফল হইয়া থাকে । যে শুক্লদ্বাদশীতে রোহিণী-নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহাকে সর্বপাপহারিণী ‘জয়ন্তী’ মহাদ্বাদশী বলা হয় । ঐ দিনে শ্রীগোবিন্দ মানব-কর্তৃক উপবাসাদি দ্বারা অর্চিত হইলে তাহার সপ্তজন্মকৃত স্বপ্ন বা বলতর পাপ নিশ্চিতই প্রক্ষালন করিয়া থাকেন । শুক্লদ্বাদশী-তিথিতে যদি পুষ্যা-নক্ষত্রের যোগ হয়, তবে উহা মহাপুণ্যালিনী ‘পাপনাশিনী’-মহাদ্বাদশী নামে বিখ্যাত হন । এক বৎসরকাল ব্যাপিয়া নিত্য তিলপ্রস্থ দানে যে ফল হয়, ঐ মহাদ্বাদশীতে একদিন উপবাসেই সেই ফল লাভ হইয়া থাকে এবং ব্রতচরণকারীর প্রতি জগৎপতি সর্বেশ্বর হরি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে নিজ-স্বরূপ দর্শন করাইয়া থাকেন । সুতরাং এই ব্রতের অনন্ত ফল শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ।

সগরপুত্র অসমঞ্জসকুণ্ডস্থ (ইক্ষাকু পুত্র পুরঞ্জয়), নহষ ও গাধিরাজের ঐ পাপনাশিনী মহাদ্বাদশীতে উপবাস দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে

সর্বসম্পদ দান করিয়াছিলেন। একমাত্র পুষ্যা-নক্ষত্রযুক্ত এই মহাদ্বাদশীতে উপবাস করিয়া মানব সপ্তজন্মকৃত বাচিক, মানসিক ও কায়িক অশেষ পাপরাশি হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ঐ মহাদ্বাদশী-ব্রত পালন করিয়া মানব সহস্র-একাদশী-ব্রতের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই ব্রতদিনে স্নান, দান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, দেবার্চন প্রভৃতি যাহা কিছু করে, তাহারই অক্ষয় ফল লাভ হয়। অতএব ফলাকাঙ্ক্ষিণের যত্নের সহিত এই পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী-ব্রত পালন করা কর্তব্য।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির মহারাজ পঞ্চম অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনপূর্বক অবতৃপ্ত-স্নানান্তে যতুবংশ-তিলক শ্রীকৃষ্ণকে একাদশী-ব্রত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন—যে কৃষ্ণ! একাদশী-ব্রতে উপবাস, নক্ত ও একভুক্ত-ভেদে কি পুণ্য এবং কি ফল, সে-সমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! হেমন্তকাল উপস্থিত হইলে শোভন গৌণচান্দ্র অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় যে একাদশী, তাহাতে উপবাস করিবে। দশমীদিনে একভুক্ত বা নক্তব্রত আচরণ, শুদ্ধচিত্ত ও দৃঢ়ব্রত হওয়া সমস্ত দশমী-দিনের নিয়মরূপেই জানিবে।

দিবসের অষ্টমভাগে সূর্য্যতেজ মন্দীভূত হইয়া আসিলেই যে ভোজন, তাহাই নক্তব্রত, রাত্রিতে ভোজনকে নক্তব্রত বলা যায় না। আকাশে নক্ষত্র-দর্শনই গৃহস্থশ্রমীর নক্ত নাশে কথিত হয়। সূতরাং উক্ত নক্তব্রতে দিনের অষ্টমভাগেই ভোজন কর্তব্য, রাত্রিতে ভোজন নিষেধ জানিতে হইবে। হে যুধিষ্ঠির! তৎপরে প্রভাত সময়ে একাদশী-ব্রতধারী স্নানান্তে ব্রতোক্ত নিয়ম গ্রহণপূর্বক মধ্যাহ্নেও দেহশুদ্ধির জন্ত স্নান করিবে। ঐ স্নান—কূপ-জলে অধম, বাপীজলে মধ্যম ও তড়াগে উত্তম এবং নদীতে তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ জানিবে। আর যে জলের মধ্যে স্নানের জন্ত অবস্থানকালে জলস্থ প্রাণিগণ পীড়াপ্রাপ্ত হয় বা মরিয়া যায়, সেরূপ জলস্নানে পাপ ও পুণ্য সমান হয়, অর্থাৎ স্নানজন্ত যেমন পুণ্যোদয়, আবার প্রাণিবধ জন্ত পাপে পুণ্য নষ্ট করে। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! তদপেক্ষা গৃহে স্নানই উত্তম—গৃহস্নানে জল বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া যায়; সূতরাং গৃহেই স্নান করা কর্তব্য। ঐ দিন ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগপূর্বক একচিন্ত ও দৃঢ়ব্রত হইবে এবং অন্ত্যজ ব্যক্তি, ছুরাচার, পাষণ্ডী, মিথ্যাবাদরত, ব্রাহ্মণনিন্দক, অগম্যাগমনরত, পরদ্রব্যাপহারী ও পরস্রীগামী প্রভৃতি লোকের সহিত আলাপ করিবে না। শ্রীকেশবের



শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

পূজাপূর্বক নৈবেদ্য প্রস্তুত ও ভক্তিয়ুক্তচিত্তে ভগবন্মন্দিরে দীপদান কর্তব্য।

হে পার্থ যুধিষ্ঠির ! ঐ একাদশীর দিনে নিদ্রা ও মৈথুন বর্জনপূর্বক ধর্ম-শাস্ত্র পাঠাদি দ্বারা সমস্ত দিন যাপন করিবে এবং রাত্রিতে জাগরণ করিয়া প্রভাতে ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম ও দক্ষিণা দানপূর্বক বিঘ্নাদিশূন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। উক্ত বিধি-অনুসারে যেমন কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী-ব্রত করিবে, তদ্রূপ শূক্লপক্ষীয় একাদশীও করিবে হইবে, উভয়পক্ষীয় একাদশীর মধ্যে কোনও বিভেদ জ্ঞান করিবে না।

একাদশী-ব্রতের ফল অতুলনীয়

হে যুধিষ্ঠির ! এই প্রকারে যে ব্যক্তি একাদশী-ব্রতচরণ করে, তাহার যে পুণ্যলাভ হয়, তাহাও শ্রবণ কর। মানব সমুদ্রস্নান করিয়া বা বিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা একাদশী-ব্রতের ষোড়শ ভাগের একভাগের তুল্যও নহে। চারিলক্ষ সংক্রান্তিতে দান করিয়া যে ফল হয়, তাহা অপেক্ষা একাদশী-ব্রতের ষোলগুণ ফল হয়। প্রভাসক্ষেত্রে বা চন্দ্র-স্বর্ষ্যগ্রহণ-সম্মানে যে পুণ্য হয়, একাদশীর উপবাসেও নিশ্চয়ই উপবাসকারীর সেই ফল হইয়া থাকে। কেদারে জলপান করিলে যেমন আর পুনর্জন্ম হয় না, সেইরূপ একাদশী-ব্রতও গর্ভবাস ক্ষয় করেন অর্থাৎ ঐ ব্রতকারীরও পুনর্জন্ম হয় না।

হে যুধিষ্ঠির ! পৃথিবীতে অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পাদনে যে ফল হয়, একাদশীর উপবাসে তাহার শতগুণ ফল হইয়া থাকে। দ্বিজোত্তম তপস্বিগণ গৃহে ভোজন করিলে যে ফল হয় একাদশীর উপবাসেও সেই ফল হইয়া থাকে। বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণকে গো-সহস্রদানে যে ফল হয়, একাদশী-ব্রতকারীর তদপেক্ষা শতগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। যাঁহাদের দেহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই তিন দেবতা বাস করেন অর্থাৎ যাঁহারা দেবতুল্য, একাদশী-ব্রতকারীর দেহেও উক্ত দেবতাব্রয়ের অবস্থানহেতু ব্রতকারীও দেবতুল্য জানিবে। যে সকল মানব ভক্তির সহিত রুক্মিণী-পতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিপ্রদ এই একাদশী-ব্রত পালন করেন, তাঁহারাই এজগতে প্রকৃত পুণ্যবান্। একাদশী-ব্রতের পুণ্যের পরিমাণ অসীম। দেবতাগণেবও দুর্লভ যে পুণ্য, সে-সমস্তই এই ব্রতকারী লাভ করিয়া থাকেন।

একাদশী-ব্রতজ্ঞ যে পুণ্য হয়, নক্তভোজন করিলে তাহার অর্ধেক পুণ্য হয়। আর একভুক্ত (মধ্যাহ্নে একবার ভোজন) দ্বারা মানবের নক্তব্রতের অর্ধেক ফল লাভ হইয়া থাকে। যতদিন পর্যন্ত মানব শ্রীবিষ্ণুর পরমপ্রিয় এই একাদশী-ব্রত না করে, ততদিন পর্যন্তই তীর্থসকল, দান ও অগ্নিব্রত-নিয়মাদি স্ব-স্ব-মাহাত্ম্য কীর্তন করে। হে যুধিষ্ঠির, অতএব তুমি এই ব্রতচরণ কর। আর তুমি যে ঈশ্বার পুণ্যের পরিমাণ জানিতে চাহিয়াছ, তাহা আমি নিজেই অবগত নহি। হে পার্থ ! তোমার নিকট এই গোপ্য ব্রতকথা বর্ণন করিলাম। সহস্র যজ্ঞ করিয়াও একাদশীর সমান ফললাভ হয় না। (ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

অধোক্ষজ ও অপ্ৰাকৃত-তত্ত্ব

প্ৰকৃত তত্ত্ববস্তুর বা পৰমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার পাইতে হইলে আমাদের এই জড়চক্ষুর সাহায্যে তাহা সম্ভবপর নহে। কেবলমাত্র প্ৰাতিভাসিক সত্য বা Apparent Truthই আমাদের এই জড় দৰ্শনেन्द्रিয়ের সাহায্যে অনুভাব্য। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান এবং অগ্নাত্ত বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত যে-সকল সত্য আমরা বৰ্ত্তমান সময়ে অবগত হইতেছি, সে-সকল আমাদের ইন্দ্রিয়-নিৰপেক্ষ ব্যাপার নহে। যে-সকল জীবগু আমাদেৱ সাধারণ দৃষ্টিশক্তিকে মিথ্যায় পৰ্য্যবসিত কৰিতেছে, তাহারা অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰের নিকট ধরা পাড়িতেছে। যে অতিক্ৰীণ বৈদ্যাতিক কম্পন ও প্ৰবাহ আমাদের সাধারণ অনুভব-শক্তিকে পৰাভূত কৰিতেছে, যন্ত্ৰ-বিশেষের সাহায্যে আমরা তাহাৱই অস্তিত্ব প্ৰমাণ কৰিতেছি। এমন কি, বৃক্ষ-পত্ৰাদির সুখ-দুঃখবোধ আছে, মানুষের সুখে তাহারা প্ৰফুল্লিত হয় এবং দুঃখে সহানুভূতি জ্ঞাপন কৰে, এ সকল ব্যাপারও আমরা বৈজ্ঞানিক যন্ত্ৰাদির সহায়তায় অবগত হইতেছি। এই সকল ব্যাপারই এই পৰিদৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন দিক্ এবং এই কাৰণেই ইহা আমাদের প্ৰাকৃত দৰ্শনের অধিকাৰভুক্ত।

‘প্ৰাকৃত’ শব্দের নিরুক্ত—প্ৰকৃতি হইতে জাত। Natural ও Phenomenal শব্দেও জড়েन्द्रিয়গ্ৰাহ্য বাহ্যজগতে বিভিন্নভাবে প্ৰকাশিত সত্তাকেই লক্ষ্য কৰে। কিন্তু তত্ত্ববস্তুর জড়ের ছায় কোন একটী নির্দিষ্ট আকার নাই, তজ্জন্ত তাহা চক্ষুৱাদি ইন্দ্রিয়ের অধিগম্য নহে। তাহা উপলব্ধির জন্ত প্ৰাকৃত ইন্দ্রিয় কোনরূপ সহায়তা কৰিতে পারে না, অপ্ৰাকৃত বা অতীন্দ্রিয়ের সাহায্যেই তাহা সম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া চক্ষুস্থান্ অপেক্ষা অন্ধের তত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎকারের ক্ষমতা অধিক, তাহা নহে। জ্ঞান-চক্ষু দ্বাৱাই ইহাৱ দৰ্শন সম্ভবপর এবং সকল অন্ধের এই জ্ঞান-চক্ষু না-ও থাকিতে পারে। এই জ্ঞান-চক্ষুৱ উন্মীলনের জন্ত শ্রবণ এবং স্পৃশ-বিষয়ে বিচাৱণ আবশ্যক। প্ৰপত্তিহীন চেষ্টা দ্বাৱা অক্ষজ এবং প্ৰপত্তিযুক্ত হইলে অধোক্ষজ জ্ঞান লব্ধ হয়। অক্ষজ জ্ঞান বা Emperic knowledge প্ৰাকৃত ইন্দ্রিয়-সাহায্য লাভ কৰিয়া উহাই জনসাধারণের মধ্যে প্ৰচাৱিত হইয়া থাকে। আমরা ঐ সকল পুস্তকাদি পাঠে তত্ত্ব জ্ঞান আহৰণ কৰিয়া গৰ্ভী অনুভব কৰি। অক্ষজ জ্ঞান যদিও প্ৰাকৃত দৰ্শনোথ জ্ঞানকেই লক্ষ্য কৰে, তথাপি আমাদিগকে সাধারণতঃ গ্ৰন্থাদি পাঠ কৰিয়াই জ্ঞান লাভ কৰিতে হয়, যেহেতু শব্দ বা Authority জ্ঞান-লাভের অগ্ৰতম উপায়।

অপৰপক্ষে অধোক্ষজ জ্ঞান বা Transcendental Knowledge আমাদিগকে বাহির হইতে লাভ কৰিতে হয় না। ইহা আনাদের আত্মাৱ মধ্যেই অন্তৰ্নিহিত রহিয়াছে। এই জ্ঞান সম্পূৰ্ণ ইন্দ্রিয়-নিৰপেক্ষ বা অতীন্দ্রিয়। সুতৰাং অক্ষজ ও অধোক্ষজ-জ্ঞানের মধ্যে আকাশ-পাতাল পাৰ্থক্য বিদ্যমান। অক্ষজজ্ঞানে আজ যাহা লাভ হইতেছে, কালই তাহা অসম্পূৰ্ণ বলিয়া পৰিত্যক্ত হইতেছে এবং অগ্ন প্ৰকাৱ জ্ঞান তাহাৱ স্থানাধিকাৱ কৰিতেছে। কিন্তু অধোক্ষজ জ্ঞান স্থান-কালাদিৱ অতীত এবং

কোনরূপ পরিবর্তনেরও অবকাশ রাখে না। অক্ষজ্ঞান জড়জগতের অনাত্ম-বিষয়ের অনাত্ম-বিচারোক্ত জ্ঞান। জড়জগৎ নিত্য পরিবর্তনশীল, অতএব অক্ষজ্ঞানের নিত্য স্থায়িত্ব নাই; পরিবর্তনই তাহার প্রধান লক্ষণ। পক্ষান্তরে অধোক্ষজ জ্ঞান—আত্মসম্বন্ধীয় অতীন্দ্রিয় নিত্যজ্ঞান।

অধোক্ষজ জ্ঞানের আর একটি বৈশিষ্ট্য—ইহা একান্তরূপে আত্মায়-পরম্পরাগত বা গুরুমুখী। আত্মবস্তুকে চাক্ষুষ দেখা যায় না, তাহার দ্রাণ লওয়া যায় না, তাহাকে স্পর্শ করা যায় না; এককথায় আত্মা সর্বপ্রকার জড়েন্দ্রিয়ের অতীত। আত্ম-সম্বন্ধীয় জ্ঞান জড়েন্দ্রিয়-লভ্য নহে। জড়ীয় জ্ঞান যাহারা লাভ করিয়াছেন, তাহারাই সেই জ্ঞান অত্মকে দান করিতে পারেন; তদ্রূপ আত্মজ্ঞানীই তদ্বিব্যক জ্ঞান অত্মকে দান করিতে সমর্থ। জড়জ্ঞানীর অত্মকে অধোক্ষজ জ্ঞান দানের ক্ষমতা বা অধিকার নাই—তাঁহারা নিজেরাই এই পরমার্থ জ্ঞানের কাঙাল।

প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞান পর্য্যন্ত মনোধর্মের রাজ্য, আর অধোক্ষজ জ্ঞান হইতে আত্মধর্ম আরম্ভ। অধোক্ষজ বস্তু—অর্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর—এই পঞ্চতত্ত্বে প্রকাশিত। সেবকের সেবাবৃত্তির ক্রম-বিকাশানুসারে অধোক্ষজ বস্তু আত্মপ্রকাশ করেন। নির্বিশেষ ব্রহ্মের বহু রূপ স্বীকৃত হইলেই পঞ্চোপাসনা ও মায়াবাদের আবাহন করা হয়। অধোক্ষজ তত্ত্ব এইরূপ সর্বনাশা বুদ্ধি হইতে জীবকুলকে নিরস্ত করেন। মহাজনগণ, অধোক্ষজই অপ্ৰাকৃত হইলেও, অধোক্ষজ অপেক্ষা অপ্ৰাকৃতিরই ঔৎকর্ষ বা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর জানাইয়াছেন—

“অধোক্ষজ বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে অপ্ৰাকৃত শ্রীরাধাগোবিন্দ-তত্ত্বের অধিকতর চমৎকারিতা অনর্থমুক্ত অত্যধিক সেবানিরত-হৃদয়ে উপলব্ধির বিষয় হয়। সেই উপলব্ধি অপ্ৰাকৃত বিচিত্রতাময়ী ও অপ্ৰাকৃত রসময়ী। * * ‘অধোক্ষজ’-শব্দে অপরিমিত শক্তিবিশিষ্ট ঐশ্বর্য্য্যাব আছে, কিন্তু ‘অপ্ৰাকৃত’-শব্দে স্ব-মাধুর্য্য্য্যাব-প্রচুর। * * ‘অধোক্ষজ’ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষের অন্তর্গত নহেন; অধোক্ষজ—অপ্ৰাকৃতির অন্তর্ভুক্ত। সেই অপ্ৰাকৃতে চিৎপ্রত্যক্ষ, চিৎপরোক্ষ, চিদপরোক্ষ ও চিন্ময়-অধোক্ষজতত্ত্ব ব্যক্ত।”

এই পরম চিৎজ্ঞান লাভ করিতে হইলে আত্মোপলব্ধ শ্রীগুরুর চরণে একান্ত শরণাগতি ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তিনিই এই অপার্থিব জ্ঞানদানের একমাত্র অধিকারী। অতএব বুদ্ধিমান জনগণ নম্বর জড়জ্ঞানের বহমানন না করিয়া ও তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া পরমধন আত্মজ্ঞান-লাভেই সর্বদা নিরলস ও যত্নবান হইয়া থাকেন।

—শ্রীবন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী, বি.ই.

গৌড়ীয়ার অষ্টাদশ বর্ষ

আমরা অষ্টাদশ-বর্ষে উপনীত হইয়াছি। ‘বর্ষ’ বলিতে কালের একটি অঙ্কে বুঝায়। কিন্তু ‘কাল’ বলিতে মায়িক কালকে লক্ষ্য করিলে অনেক-প্রকার কালের কথা আমরা জানিতে পারি। একই কালকে (সময়) বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার নানা প্রকার সংজ্ঞা নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ—এই তিনটি কালই প্রধান। এই তিনটি কালের মধ্যে বর্তমান কাল সর্বপ্রধান। বর্তমান কালকে বাদ দিলে কোন কালেরই অবস্থিতি স্বীকৃত হয় না। কোন দার্শনিক বর্তমানকে মিথ্যাজ্ঞান করিয়া উহাকে বিশ্ব-মিথ্যায় পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা এই প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মিথ্যাজ্ঞানই অজ্ঞান, কুজ্ঞান বা ভ্রম-জ্ঞান।

বর্তমান ভারতীয় জ্ঞান-বিচারক্ষেত্রে কোন মানব অষ্টাদশ বর্ষে উপনীত না হইলে বা তাহা পরিপূর্ণতা লাভ না করিলে তাহার আত্মবোধ সিদ্ধ নহে বলিয়া আইন-পরিষদ স্থির করিয়াছেন। সুতরাং কেহ যদি মনে করেন, গৌড়ীয়ার বর্তমান বর্ষ হইতে আত্মবোধের পূর্ণবিকাশ লক্ষিত হইবে তত্বতরে বক্তব্য এই যে, মানুষ ১৮শ বর্ষে সাবালক হইবার পূর্বে নাবালক কালে তাহার আত্মবোধ না থাকায় পূর্ব-অনুষ্ঠিত ক্রিয়াসকল জ্ঞান-বিজ্ঞান-রাজ্যে বা সাধারণের নিকট অস্বীকৃত অর্থাৎ নাবালকের কোন আইনসম্মত ক্রিয়া গুহ্য নহে। অভিভাবকের দ্বারাই অর্থাৎ হিতকামী ব্যক্তিবিশেষের দ্বারাই তাহার গুহ্যতা লাভ করে। এইরূপ যুক্তি উত্থাপন করিলে শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা সপ্তদশ বর্ষ পর্যন্ত যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অস্বীকৃত হইবে কি-প্রকারে? তজ্জন্মই ‘কাল’ সম্বন্ধে বিচার বর্তমান প্রবন্ধের জীবন-স্বরূপ।

—উত্তরে জানাইতেছি যে, পরমহংসকুল-চূড়ামণি জগদগুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বয়ং শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা”র নিত্য, স্থায়ী অভিভাবকস্বত্রে শ্রীপত্রিকা পরিচালন করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং পূর্বোল্লিখিত প্রশ্নের অবকাশ কোথায়? আমরা প্রতি বর্ষের প্রতি সংখ্যায়ই উক্ত মহাপুরুষকুল-চূড়ামণি শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধ মঙ্গলাচরণমুখে প্রথম হইতে প্রকাশ করিয়া আসিতেছি। সুতরাং বর্তমান যুগের কালগত বৈষম্যের মধ্য দিয়া বিচার করিলেও কাল-বৈষম্য-দোষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকায় প্রবেশ করে না বা করিতে পারে না।

বিশেষতঃ বক্তব্য এই যে, মায়িক কালের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটী কালের অবস্থিতি পরিলক্ষিত হইলেও বৈয়াকরণিকগণ দশবিধ কালের বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈয়াকরণিক কাল আমাদের বৈকুণ্ঠ-কালের একটী ক্ষুদ্রতম অংশকেও স্পর্শ করিতে সক্ষম নহে। বৈকুণ্ঠ-কালগত সর্বাপেক্ষা নিম্নতম পল, বিপল, অনুপলাদি ক্ষুদ্রতম বা সূক্ষ্মতম অবস্থিতির কথা গ্রহণ করিলেও, পার্থিব যুগ-যুগান্তর-মহন্তরাদির অনন্তগুণে গুণিত শ্রেষ্ঠ কালকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং বৈকুণ্ঠ-কালের তুলনায় সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির চতুষ্টয়ীয় ব্যবধানকে মহন্তরে পরিণত করিয়াও শাস্ত্রকারগণ কালের অন্ত না পাইয়া অনন্ত-কালের কথা জানাইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের নির্দেশ অনুসারে বর্তমান কলিযুগকে অষ্টাবিংশতি-চতুষ্টয়ীয় শেষ কালকে লক্ষ্য করিয়াই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চিন্তা করিতেছি। ইহা নিত্যকালের কত নিম্নতম অংশের অংশ, তাহা আজ পর্য্যন্ত সসীম ভাষায় নির্দিষ্ট হয় নাই। তথাপি কাল-বৈষম্যের চিন্তা মনুষ্য বা প্রাণীমাত্রেরই মস্তিষ্কে আলোড়িত বিলোড়িত হইতেছে।

‘বর্তমান কালে’র অস্তিত্ব-অঙ্গীকারকারী দার্শনিকগণের অবিচার ও অজ্ঞতার পরিণতি-স্বরূপ বিবিধ নাস্তিকতার লেলিহান্ জিহ্বা বিশ্বের সর্বত্র পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাহারা ঈশ্বর-চিন্তাকে কালের করাল গ্রাসে নিপতিত করিয়া শূন্যমার্গে নিষ্কিপ্ত করিতেছে। আমরা শ্রীল গুরুপাদপদ্মের কৃপা-দৃষ্টিতে কালাতীত তত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার শিক্ষালাভ করিয়াছি এবং তাহাই সমগ্র বিশ্ববাসীকে দান করিবার জন্ত “শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা”র লেখনী-মাধ্যমে সরব ও নীরব ভাষায় সঙ্কীর্ণ-বিজ্ঞান প্রকাশ করিতেছি।

‘নিত্যকাল’ বলিতে নিত্য বর্তমানকে লক্ষ্য করা হয়। যাহারা বর্তমান স্বীকার করেন না, তাহাদের পক্ষে নিত্যকাল বা নিত্য-বর্তমানকাল রুদ্ধ ও বিভীষিকা-স্বরূপ। এস্থলে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীভগবানের নিত্যলীলার কথা জগজ্জীবকে শিক্ষা দিতে গিয়া শ্রীমন্নহাপ্রভুর নিত্যলীলার কথা যাহা কীর্তন করিয়া থাকেন, তৎসম্বন্ধে পার্থিব কালের লেশমাত্রও স্পর্শ নাই। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ ভগবৎ-তত্ত্বের অষ্টকালীয় লীলাস্বরূপাদি-কালে পার্থিব কালের সহিত উপমিত লক্ষিত হইলেও তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে উপমাণ-স্বরূপ নহে। নিত্যকাল’ বলিলে উহা কখনও পার্থিব-‘কালকে’ বুঝায় না। পরি-ভাষার মাধ্যমে ‘কাল’ শব্দ ব্যবহৃত হইলেও ইহা কালাতীত তত্ত্ব এবং নিত্য-

বর্তমান তত্ত্ব। সুতরাং নিত্যকাল-সংজ্ঞক কালের ছায়া-স্বরূপ বর্তমান-যুগীয় কাল।

ছায়া বস্তুতঃ কায়্য নহে। কায়্য সাক্ষাৎ বস্তু, উহার ছায়া অবাস্তব বস্তু। তথাপি মিথ্যা—সত্যাপ্রিত মিথ্যাবস্তু। উদাহরণ-স্বরূপে কোন একটী পুরুষের ছায়াকে বিভিন্ন অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিলেও কায়্যার তাহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই হয় না; নিরঙ্কুশ বিশুদ্ধভাবে কায়্যার অবস্থিতি উপলব্ধ হয়। এমন কি, সেই পুরুষটী স্বর্ধ্য-রশ্মিপাতের মধ্যে স্থানান্তরে গতামুগতিক ভাব প্রদর্শন করিলেও তাহার ছায়া সেই পুরুষের সঙ্গে সঙ্গেই যাতায়াত করিয়া থাকে। ছায়া কায়্য হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না বা হইতে পারে না। ঠিক সেই প্রকার মায়িক কাল অপ্রাকৃত নিত্য-কালের সহিত সংপৃক্ত থাকিয়া অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ জ্ঞাপন করিয়া থাকে মাত্র। অতএব মায়িক কাল অবাস্তব, উহা বাস্তব নিত্য-কালের ছায়ামাত্র।

ঈশ্বরের নিত্যলীলা নিত্যকালই বর্তমান রহিয়াছে; ইহার কখনও শেষ নাই। শুধু শেষ নাই অর্থাৎ বলিলেই চলিবে না, ইহার কোন আদিও নাই; আদি ও অন্ত—মায়িক কালেই অবস্থিত; মায়াতীত কালে আদি ও অন্ত নাই; নিত্যকালই ইহার অবস্থিতি। ভগবানের জন্ম-লীলা, বাল্য-লীলা, কৈশোর-লীলা, যৌবন-লীলা, প্রৌঢ়-লীলা প্রভৃতি সকলই নিত্য-বর্তমান। এমন কি, ভগবানের বাল্যলীলায়ও যৌবন-লীলার প্রকাশ স্পষ্ট-ভাবে পরিলক্ষিত ও অনুভূত হয় এবং যৌবনেও বাল্যলীলা পরিস্ফুট থাকে। নিত্যলীলায় মায়িক কালগত বৈষম্য এইরূপভাবে ধ্বংসীভূত হইয়াছে। ভগবানের নিত্য-লীলাগত বৈষম্যই মায়িক লীলায় বিকৃতভাবে যাহা প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহাই বৈয়াকরণিককুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ‘শ্রীহরিনামাস্মৃত বাকরণে’র “আখ্যাত প্রকরণে” নিক্রপণ করিয়াছেন। নিম্নে তাহা পাঠকবর্গের অবগতির জন্ত উদ্ধৃত হইল।—

প্রবর্তন্তে ক্রিয়াঃ সর্বা যতোহর্কাটীন-বস্তুষু।

হরেন্তশ্চৈব লীলাস্তা নিক্রপ্যন্তে যথামতি ॥

যে পরমেশ্বর হইতে “অর্কাটীন” অর্থাৎ আধুনিক বস্তুসমূহে (ছায়াস্বরূপে) ‘ক্রিয়া’সকল অবস্থিতি করিতেছে, সেই শ্রীহরির লীলাস্বরূপ ক্রিয়াসকল যথাজ্ঞান সাধিত হইতেছে।

শ্রীল জীবপাদের উক্ত শ্লোকের অনুবাদ করিতে গিয়া বঙ্গনী মধ্যে []

ছায়াস্বরূপে বাব্যাটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল শ্লোকে ঐ শব্দটী না থাকিলেও উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই—

বিশ্ব বৈকুণ্ঠের বিকৃত প্রতিফলন, ইহা দার্শনিক-সমাজে সর্বত্রই সন্নিবিষ্ট। ‘বিকৃত প্রতিফলন’ বলিলে বিপরীত ছায়াকেই লক্ষ্য করা হয়। সুতরাং ভগবানের লীলাসমূহই অর্ধাচীন বা আধুনিক জগতে বিকৃত ‘ক্রিয়া’রূপে পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং ক্রিয়ামাত্রের বৈয়াকরণিকের মতে দশবিধ কালের যে কোন একটী কাল অবস্থিতি করে। এই কাল-ধর্ম্মের অবস্থিতি বৈকুণ্ঠ-জগতে ভগবল্লীলার প্রতিচ্ছবি। ভগবল্লীলায় দশবিধ-কালীয় অথবা তদতিরিক্ত বিভিন্নকালীয় ক্রিয়। বা লীলা অবস্থিত না থাকিলে বর্তমান অর্ধাচীন বিশ্বে তাহার অবস্থিতি সম্ভাব্য নহে। কেবল বৈকুণ্ঠ-জগতের বিকৃতভাবই ইহাজগতে প্রতিফলিত। বিশ্বের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এই বিকৃতভাববিলুপ্ত হইয়া ঈশ্বরে সুপ্ত বা অচেতন অবস্থায় (Latent form) অবস্থিতি করিলেও ছায়ার কোন প্রতিক্রিয়া ঈশ্বরে পরিলক্ষিত হয় না। মানুষের ছায়ায় আঘাত করিলে যে-প্রকার কায়া-স্বরূপ মানুষের কোনরূপ প্রতিক্রিয়া নাই, সেই প্রকার ছায়া-স্বরূপ বিশ্বের কোন প্রতিক্রিয়া ঈশ্বরে নাই। ‘বর্তমান বিশ্বের ক্রিয়া’ বলিতে ভগবানের বিকৃত লীলাই বুঝায়। সুতরাং এই বিশ্ব হইতে মুক্তি লাভ করিলে জীব নিত্য-লীলায় প্রবেশাধিকার লাভ করে।

সুতরাং গৌড়ীয়ের নাবালকত্ব ও সাবালকত্ব উভয়ই সমান। শিশু গোপাল-কৃষ্ণ বৃদ্ধ-বৈষ্ণবগণেরও উপাস্য। পরতত্ত্বে যে বালত্ব অর্থাৎ নাবালকত্ব, তাহাতে পার্থিব কালতত্ত্বের বিন্দুমাত্রও স্পর্শ নাই। সুতরাং ক্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী-বিকাশ-বিগ্রহ “ক্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার” অষ্টাদশ বর্ষ বা প্রথম বর্ষ হইতে সপ্তদশ বর্ষ তত্ত্বতঃ একই এবং একই সিদ্ধান্ত ধারাবাহিক-রূপে গ্রথিত শৃঙ্খলিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER

“SHRI GOUDIYA PATRIKA”

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers
(Central) Rules, 1956]

1. Place of publication—Shri Debananda Goudiya Math,
Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every
Bengali month i. e., once in a month.
3. Printer's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti
Vedanta Baman Maharaj.
Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.
Address—Shri Debananda Goudiya Math, Teghari-
para, P. O.—Nabadwip (Nadia) W. B.
4. Publisher's Name— Do
Nationality— Do
Address — Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti
Vadanta Baman Maharaj.
Nationality—Indian—Goudiya Vaishnab.
Address—Shri Debananda Goudiya Math, Tegharipara,
P. O. Nabadwip (Nadia) W. B.
6. Names and Address— Paramahansa-S w a m i S h r i
of individuals who own the Shrimad Bhakti Projnan Keshab
newspaper and partners or Maharaj, Founder-Acharya &
share-holders holding more Controller, on behalf of Shri
than one percent of the Goudiya Vedanta Society.
capital,


I, Bhakti Vedanta Baman hereby declare that the
particulars given above are true to the best of my
knowledge and belief.

14. 3. 1966.

Sd/- BHAKTI VEDANTA BAMAN
Signature of Publisher,

* স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ক্ষে । *

* ধর্মঃ স্বস্থিতিঃ পুংসাং বিশ্বক্সেন-কথাধর্ম যঃ । *



* নোংপাদমেদেদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥ *

* অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্সা সুপ্রসীদতি ॥ *

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।
অধোক্ক্ষে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥

অন্ত ধর্ম সূচকপে পালে যেই জন ।
হরি-কথায় বতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১৮শ বর্ষ } কারাগোদশায়ী, ৭ মধুসূদন, ৪৮০ গৌরাক্ষ { ২য় সংখ্যা
বৃহস্পতিবার, ৩১ চৈত্র, ১৩৭২ ; ইং ১৪৮৪।১৯৬৬

শ্রী শ্রী নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের সংগৃহীতং সঙ্কলিতং]

প্রমাণখণ্ডঃ

চতুর্থোহধ্যায়ঃ

ভাগীরথীতটে পূর্ব মায়াপুরন্ত গোকুলম্ ।

তস্ত্রাস্তটে পশ্চিমে হি বৃন্দাবনং বিভুবুধাঃ ॥২৫॥

ভাগীরথীর পূর্বতটে গোকুলস্বরূপ শ্রীমায়াপুর এবং তাহার পশ্চিমতটে বৃন্দাবন অবস্থিত, ইহা বুধগণ বলেন ॥২৫॥

তত্র রাসস্থলী দিব্যা পুলিনং বালুকাময়ম্ ।

রাসস্থলী পশ্চিমে তু পুণ্যং ধীরসমীরকম্ ॥

যদ্যদ্বৃন্দাবনে দেবি তত্তত্তত্র ন সংশয়ঃ ॥২৬॥

সেখানে দিব্য রাসক্ষেত্র বর্তমান । রাসক্ষেত্রের পশ্চিমে মন্দ মন্দ সমীরণ—

সুশীতল বালুকাময় পবিত্র সৈকত অবস্থিত । হে দেবি, বৃন্দাবনের যাবতীয় বিষয়ই এখানে বর্তমান রহিয়াছে —এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২৬॥

ত্বং হি মায়া হরেঃ শক্তি দুর্ঘটনপটীয়সী ।

চিন্ময়মন্তুরাদিত্যমাচ্ছাদয়সি সাম্প্রতম্ ॥২৭॥

তুমি অঘটনপটীয়সী শ্রীহরির মায়াশক্তিরূপে চিন্ময় অতঃস্বর্গ্যকে আচ্ছাদিত করিয়া থাক ॥২৭॥

ততো মায়াপুরখ্যাতির্যোগপীঠস্থ ভূতলে ।

প্রৌঢ়ামায়া তব খ্যাতিঃ সর্বত্র বর্ততে প্রিয়ে ॥২৮॥

সেইজন্ম এই যোগপীঠ ভূতলে ‘মায়াপুর’ নামে এবং তুমি ‘প্রৌঢ়ামায়া’ নামে বিখ্যাতা হইয়াছ ॥২৮॥

গতে তু পুলিনাভ্যাসং কালে শ্রীগৌর-বিগ্রহে ।

বংশীবটং সমাশ্রিত্য ত্বং পাসি বৈষ্ণবান্ জনান্ ॥২৯॥

যখন শ্রীগৌরসুন্দর পুলিন সমীপে গমন করেন, তৎকালে তুমি বংশী-টে আশ্রয় করতঃ বৈষ্ণবগণকে পালন করিয়া থাক ॥২৯॥

অহং বৃদ্ধশিবঃ সাক্ষাৎ প্রভোরাঙ্গানুসারতঃ ।

কল্লিতৈরাগমৈস্তৈস্তৈর্বঞ্চয়ামি বহিমুখান্ ॥৩০॥

আমি বৃদ্ধশিব নামে বিখ্যাত হইয়া প্রভুর আঙ্গানুসারে কলিত হস্তে-বঞ্চ প্রকাশ করত বহিমুখগণকে বঞ্চিত করিয়া থাকি ॥৩০॥

লীলাপুষ্টিং ভগবতশ্চৈতন্যস্থ হরেঃ স্বয়ম্ ।

করোমি সততং দেবি তব মায়াবলেন হি ॥৩১॥

হে দেবি, আমি তোমার মায়াবলে সর্বদা শ্রীচৈতন্যরূপ ভগবান্ শ্রীহরির লীলাপুষ্টির বিধান করিয়া থাকি ॥৩১॥

অন্তর্দীপে হরিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণং কৃপয়া স্বয়ম্ ।

গৌরাবতার-তাৎপর্য্যং কথয়ামাস তত্ত্বতঃ ॥৩২॥

অন্তর্দীপে সাক্ষাৎ শ্রীহরি কৃপা-পূর্বক শ্রীব্রহ্মার নিকট শ্রীগৌরাবতারের যথার্থ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছিলেন ॥৩২॥

সীমন্তদীপমাসাঢ় ত্বং হি দেবি সনাতনি ।

দদর্শ সুন্দরং রূপং গৌরাঙ্গস্থ মহাত্মনঃ ॥৩৩॥

হে দেবি, তুমি সীমন্তদ্বীপে গৌরাজ মহাপ্রভুর মনোরম রূপ দর্শন
করিয়াছিলে ॥৩৩॥

তৎসমীপে মহাদেবি মথুরা বিত্ততে পুরী ।

অভবৎ যত্র বৈ কংসো যবনস্ত গৃহে কলৌ ॥৩৪॥

অয়ি মহাদেবি, তাহার নিকটে মথুরাপুরী বর্তমান, সেখানে কলিকালে
কংস যবনগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল ॥৩৪॥

শোধিত্বা তং কীর্তনাদৌ শ্রীগৌরসুন্দরঃ প্রভুঃ ।

তীর্থং দ্বাদশকং তীর্থী শ্রীধরস্ত গৃহং যযৌ ॥৩৫॥

প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর আদিকীর্তনকালে তাহাকে শোধন করত দ্বাদশ তীর্থ
উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীধরের গৃহে গমন করিয়াছিলেন ॥৩৫॥

তদ্ধি নবদ্বীপে দেবি সুদামপুরমীৰ্য্যতে ।

তত্রৈব বর্ততে গৌরি বিশ্রামকুণ্ডমুত্তমম্ ॥৩৬॥

হে গৌরি, সেই নবদ্বীপে সুদামপুর অবস্থিত, তাহার মধ্যে বিশ্রামকুণ্ড
বর্তমান রহিয়াছে ॥৩৬॥

ময়মারীং ততোত্তীৰ্য্য দৃষ্ট্বা রামপরাক্রমম্ ।

সুবর্ণসেনদুর্গে স ননর্ত কীর্তনে হরিঃ ॥৩৭॥

অনন্তর শ্রীহরি ময়মারী নামক স্থান অতিক্রম ও রামচন্দ্রের বীর্য্যদর্শন
করত সুবর্ণসেনের দুর্গে কীর্তনে নৃত্য করিয়াছিলেন ॥৩৭॥

দেবপল্লীং ততো গত্বা দেবান্ সূর্য্যমুখান্ প্রভুঃ ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনানন্দে প্লাবয়ামাস ভামিনি ॥৩৮॥

অয়ি মানিনি, তাহার পর প্রভু দেবপল্লীতে গমন করিয়া সেখানে
সূর্য্যের ন্যায় মুখবিশিষ্ট দেবতাগণকে শ্রীকৃষ্ণনামের কীর্তনানন্দে প্লাবিত
করিয়াছিলেন ॥৩৮॥

ক্ষেত্রং হরিহরং তীর্থী কাশীঞ্চ মোক্ষদায়িনীম্ ।

গোক্রম-দ্বীপমাসাচ্চ সুরভী-সেবিতং হরিঃ ।

ননর্ত পরমাবিষ্টো মৃকণ্ডসুতসন্নিধৌ ॥৩৯॥

অতঃপর শ্রীহরি হরিহরক্ষেত্র ও মোক্ষদায়ক কাশীক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া
সুরভি-কর্তৃক সেবিত গোক্রমদ্বীপে উপনীত হইলেন এবং তথায় মার্কণ্ড
সমীপে পরমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন ॥৩৯॥

মধ্যদ্বীপং ততো গত্বা সপ্তর্ষিমণ্ডপে হরিঃ ।

ননৰ্ত্ত নৈমিষে তীর্থে সাবধূতঃ সপার্ষদঃ ॥৪০॥

অনন্তর তিনি মধ্যদ্বীপে গমন করিয়া নৈমিষতীর্থে সপ্তর্ষিমণ্ডপে অবধূত
ও পার্শ্বদগণসহ নৃত্য করিয়াছিলেন ॥৪০॥

ততো গত্বা পুষ্করাখ্যং তীর্থং বিপ্রনিষেবিতম্ ।

ব্রহ্মাবৰ্ত্তং কুরুক্ষেত্রং প্লাবয়ামাস কীর্তনৈঃ ॥৪১॥

সেস্থান হইতে ব্রাহ্মগণ-পরিষেবিত পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া কীর্তন
দ্বারা ব্রহ্মাবৰ্ত্ত কুরুক্ষেত্রে প্লাবিত করিয়াছিলেন ॥৪১॥

ততো মহাপ্রয়াগাখ্যং পঞ্চবেণীসমন্বিতম্ ।

তীর্থং শ্রীজাহ্নবীং তীর্থং কোলদ্বীপং জগাম হ ॥৪২॥

তথা হইতে পঞ্চবেণীযুক্ত মহাপ্রয়াগ তীর্থ ও শ্রীগঙ্গাদেবী উত্তীর্ণ হইয়া
কোলদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন ॥৪২॥

সমুদ্রসেনরাজ্যে তু গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ।

কীর্ত্তয়িত্বা হরিং দেবি চম্পাহট্টং জগাম হ ॥৪৩॥

হে দেবি, পরে তিনি গঙ্গাসাগর-সঙ্গম-স্থলে সমুদ্রসেনের রাজ্যে হরি-
কীর্ত্তন-পূর্বক চম্পাহট্টে গমন করিয়াছিলেন ॥৪৩॥

ঋতুদ্বীপং ততো গত্বা দৃষ্ট্বা শোভাং বনশ্চ চ ।

রাধাকুণ্ডাদিকং স্মৃত্বা রুরোদ শচীনন্দনঃ ॥৪৪॥

অতঃপর শচীনন্দন ঋতুদ্বীপে উপস্থিত হইয়া বনের শোভা সন্দর্শনে
রাধাকুণ্ডাদির স্মরণ হওয়ায় রোদন করিয়াছিলেন ॥৪৪॥

ততঃ সঙ্কীর্ত্তনানন্দে শ্রীবিদ্যানগরং হরিঃ ।

দদর্শ পার্শ্বদৈঃ সার্কং বেদস্থানমত্যাশ্রমম্ ॥৪৫॥

সেস্থান হইতে প্রভু পার্শ্বদগণ সহ সঙ্কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতে করিতে
বেদবিদ্যার অত্যাশ্রম ক্ষেত্র বিদ্যানগর দর্শন করিয়াছিলেন ॥৪৫॥

জহুদ্বীপং সমাসাচ্চ দৃষ্ট্বা জহুতপোবনম্ ।

মোদক্রমে রামলীলাং স্মরন্ গৌরং মুমোদ হ ॥৪৬॥

অনন্তর শ্রীগৌরসুন্দর জহুদ্বীপে জহুমুনির তপোবন দর্শন করিয়া মোদক্রমে
রামলীলা স্মরণ-পূর্বক আনন্দিত হইয়াছিলেন ॥৪৬॥

বৈকুণ্ঠপুরমধ্যে তু দৃষ্ট্বা নিঃশ্রেয়সং বনম্ ।

ব্রহ্মাণীং বিরজাপারে গতবান্ শ্রীমহৎপুরম্ ॥৪৭॥

বৈকুণ্ঠপুর মধ্যে নিঃশ্রেয়স বন ও বিরজার পারে ব্রহ্মাণীকে দর্শন-পূর্বক শ্রীমহৎপুরে গমন করিয়াছিলেন ॥৪৭॥

স্থানঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং কাম্যনাম বনং শুভম্ ।

দৃষ্ট্বা পঞ্চবটীকাত্র শ্রীশঙ্করপুরং যযৌ ॥৪৮॥

অতঃপর পাণ্ডুপুত্রগণের পরম পবিত্র কাম্যবন ও পঞ্চবটী দর্শনান্তে শ্রীশঙ্কর-পুরে যাত্রা করিয়াছিলেন ॥৪৮॥

ততঃ পুলিনমাসাত্ত পীঠং বৃন্দাবনাত্মকম্ ।

দদর্শ কীর্তয়ন্ কৃষ্ণং শ্রীগৌরাজমহাপ্রভুঃ ॥৪৯॥

তৎপরে শ্রীমহাপ্রভু গৌরসুন্দর কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে পুলিন প্রাপ্ত হইয়া বৃন্দাবনাত্মক পীঠ দর্শন করিয়াছিলেন ॥৪৯॥

তত্র রাসস্থলীং দৃষ্ট্বা সপার্ষদরমাপতিঃ ।

শ্রীভাগবতপদ্যেন রাসগীতং চকার সঃ ॥৫০॥

সপার্ষদ মহাপ্রভু সেখানে রাসস্থলী দর্শন করিয়া শ্রীমদভাগবতের পদ্য অনুসারে রাসলীলা গান করিয়াছিলেন ॥৫০॥

স্বত্বা রাসাত্মিকাং লীলাং মহাভাবদশাং প্রভুঃ

লেভে তত্র মহাদেবি পুলিনে রাসমণ্ডপে ॥৫১॥

অগ্নি মহাদেবি, সেই পুলিনস্থ রাস-মণ্ডপে মহাপ্রভু রাসলীলা শ্রবণ করন মহাভাবদশা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥৫১॥

ইহলোক

এই বিশ্বে স্থূল ও সূক্ষ্ম আকারবিশিষ্ট বস্তু-সমূহের দ্রষ্টা বা জ্ঞাতারূপে বিভিন্ন প্রাণী বিচরণ করে। প্রাণিগণের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন আছে। এই ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে যাহা উপলব্ধ হয়, তাহাকেই ইহলোক বলে। জীবগণ ইন্দ্রিয়-সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা অক্ষজ জ্ঞান-মাত্র। ইন্দ্রিয়ের অবধাতে, অভাবে ও বিকারে পরিদৃশ্যমান জগতের অনেকাংশ পরিলক্ষিত হয় না। আবার নানাপ্রকারে ইন্দ্রিয়-চালনাদ্বারা অনুমানাদির

সাহায্যে দৃশ্যবস্তুর সম্বন্ধে অনেকটা অভিজ্ঞতা জন্মে। এই অক্ষজ জ্ঞানেন্দ্রিয়-গুলি চারি প্রকার দোষে দুষ্ট হইবার যোগ্য। শাস্ত্রে এই দোষচতুষ্টয়কে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করুণাপাটব বলে। জগতের প্রাণিগণ এই চারি-প্রকার দোষে বিজড়িত হইয়া প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি অক্ষ সাপেক্ষ ধারণায় দৃশ্য জগৎ ভোগ করেন। যাহারা ভোগপরায়ণ, তাহারাই ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে ঐহিক বা লৌকিক জ্ঞানদৃষ্ট হইয়া নিজনিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে সমর্থ হ'ন। যেখানে ব্যাঘাত ঘটে সেখানে ইন্দ্রিয়পরিচালনায় সঙ্কোচ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহলোকে কর্মের কর্তা ইন্দ্রিয়তর্পণে অকৃতকার্য হইয়া দৃশ্য-জগতের প্রতি বিরাগ-ভাবের পোষণ করেন। ভোগিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যাঘাত ঘটিলেই তাহারা ব্রতপরায়ণ কচ্ছসাধন কর্মফলভোগ-বিরত সন্ন্যাস ও বাহ্যবস্তুর গ্রহণে বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন। জগৎ দুঃখময়—কতিপয় কর্মীর এই ধারণা, কতকগুলি লোক ইন্দ্রিয়তর্পণের আদর্শকে সংকর্ম-প্রাপ্য জ্ঞান করেন। ইহলোকে ইন্দ্রিয়গুলি নশ্বর, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিষয়গুলিও চিরস্থায়ী নহে; সুতরাং ইহলোকে নিচরণকালে প্রাণিগণ সুখার্থী হইয়া ইন্দ্রিয় পরিচালনা করেন, কিন্তু বিধির কঠিন নিয়তিবলে তাহাদের কপালে “সে গুড়ে বালিই” হইয়া যায়। বৈষ্ণব-কবি জ্ঞানদাস বলেন—“স্বখের লাগিয়া এঘর বাঁধিছু অনলে পুড়িয়া গেল। অমিয় সাযরে, দিনান করিতে, সকলি গরল ভেল। শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিছু রবির কিরণ দেখি।”

ইহলোকে কর্মবীজসমূহ নানাপ্রকার আকাশ-কুসুমের পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইয়া কতই না তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকেন, কিন্তু পরিশেষে বঞ্চিত হইয়া কর্মফলভোগপ্রবৃত্তি হইতে বিরত হ'ন। বিজ্ঞান, শিল্প, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও রসায়ন-শাস্ত্র, ধর্মার্থকাম, প্রভুতত্ত্ব, উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যা, গৃহস্থত্ব, সমাজনীতি, শুল্কনীতি প্রভৃতি নানাবিধ “দিল্লীর লাড্ডু” আমাদিগকে ঐহিক স্বখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাগিকাবিন্দ-বলদের ত্রায় ধাবিত করায়। এই ভ্রমণ-ভূমিই ইহলোক। আমরা এক মুহূর্তের জ্ঞানও মনে করি না যে, এই সকল লইয়া আমরা কতদিন আর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারিব! আমাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ব্যাঘাত ত'পদে পদে! স্ত্রীবিয়োগ পুত্রবিয়োগ, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মরণভীতি, অস্ত্রোপচারের ক্লেশ, বন্ধুবিচ্ছেদ, নৈরাশ্য, কপটের হস্তে নিষ্পেষণ, স্ত্রৈ্ষণা প্রভৃতি নানাবিধ উদ্যম ক্রিয়াকলাপ ও বৃত্তিসমূহ আমাদিগের ইহলোক-বাসের দুঃস্বপ্ন বাসনা হ্রাস করাইয়া দেয়। ইহলোকে এই আগনা-

পায়ীর অধিকার ও অনধিকার-বিচার আমাদেরকে নানা শেখ-জলধিতে তরঙ্গায়িত করে। ‘কেনই বা আমি ইহলোকেব অধিবাসী হইলাম—যে ইহলোকে নশ্বরতা ধর্ম, অবচ্ছেদ-ধর্ম, অপূর্ণধর্ম আমাদেরকে খেলার পুতুল করিয়া তুলিতেছে, পদগোলকের (Foot Ball) ছায়া এখানে দেখানে বিক্ষিপ্ত করিতেছে—একমুহূর্তের জন্তও স্থির থাকিতে দেয় না।’ সুতরাং ইহলোকের আশাভরসা নিতান্তই রুদ্ধ। যে ইন্দ্রিয়গুলিকে আমরা ইহলোকেই ভোগায়তন মনে করি, সেগুলি আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি নহে। আবার, সূক্ষ্মবস্তুজ্ঞানে যে সকল দ্রব্য আমাদের অধিকারে আসে, তাহাদেরও বর্ষুরের ছায়া উৎক্ষেপযোগ্যতা এবং গ্রহণকারী আমাদেরও অনিচ্ছাসত্ত্বে অসময়ে স্থানান্তরে প্রেরিত হইবার যোগ্যতা থাকায় এই ভোগের বস্তুগুলি এবং ভোগের যন্ত্রগুলির উপর আমরা আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারি না।

অনেকে বলেন, ‘ইহলোকে অবস্থান কালে আমরা যতটুকু ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে অধিকারী হই, ততটুকুই আমরা পাইলাম! বিরাগবিশিষ্ট হইলে উহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সেজন্য ইন্দ্রিয়-পরিচালনা শাস্ত্রিক জানিয়াও তদ্বারা সুখাদ্বেষণই আমাদের শ্রেয়ঃ।’ এই আশা-ভরসায় আমাদের পুত্র-কন্যাদিগের ভাবী উন্নতির উদ্দেশ্য করিয়া সুশিক্ষা প্রদান করি। যখন যাহা প্রয়োজন, সেইরূপই করিবার জন্ত ব্যগ্র হই, ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সময় ক্লেশ সমাগত হয়, তাহা তখন পরিহার করিবার জন্ত নানাপ্রকার চেষ্টা করি এবং ইহলোকে ইহাই কর্তব্য বলিয়া বুঝিয়া রাখি। আমরা আরও বুঝি এই যে, ইহলোকের পরে এই ইন্দ্রিয়গুলির অভাবে এবং আমাদের প্রাণের অভাবে ভোগময় জগতের অস্তিত্ব আমরা এইরূপভাবে ধারণা করিতে পারিব না। লোকান্তরিত হইলে আমাদের এই প্রকার ইন্দ্রিয়ের অভাবে, দৃশ্য জগতের পরিবর্তন ঘটবে। ইহলোকে থাকিয়া কল্পনাদ্বারা পরলোকের দৃশ্য জগৎ ও আমাদের অধিষ্ঠান আমরা ধারণা করিতে পারি না। ঐহিক বিচার অবলম্বন করিয়া যদি আমরা পরলোকের বিচার কল্পনা করি, তবে তাহা বাস্তব সত্য না-ও হইতে পারে। ইহলোকে যে কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ আছে, তাহার কি পরিমাণ সমাবেশ আমরা পরলোকে পাইব, ঐহিক চেষ্টাদ্বারা তাহা নিরূপণ করিতে গেলে আমরা যে ভ্রমে পতিত হইব না, তাহা কিরূপে জানা গেল? পরলোকের বিষয় ঐহিক ধারণায় প্রমত্ত

ব্যক্তিগণের নিরন্তর ইন্দ্রিয়তর্পণে পর্যাবসিত। কিন্তু তাহাও নশ্বর বলিয়া বিচারশাস্ত্রে লিখিত আছে। গীতা-পাঠকালে “ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি” অর্থাৎ ত্রিদশপুর-বাস স্থল-ইন্দ্রিয় পরিহার করিয়া স্নেহেন্দ্রিয়দ্বারা সম্ভবপর হইলেও নিত্য নহে, নশ্বর মাত্র—এই কথা বেশ উপলব্ধি হয়।

পরলোকের স্বর্গাদি-সুখভোগ বা নরকাদি-দুঃখভোগ নিত্য নহে। কিন্তু আত্মার ধর্ম অপরিবর্তনীয় ও নিত্য, সুতরাং অনাত্মবৃত্তিতে অরস্বিতিকালে পরলোকের ধারণায় ইহলোকে কতকটা হেয়াংশ না থাকিলেও স্বর্গাদিতে নশ্বরাদিরূপ হেয়াংশ সর্বদা বর্তমান। এই স্বর্গসুখের ভোক্তা ইহলোকের কর্মী প্রভৃতি প্রাণিগণ, নরকাদির ভোক্তাও তাঁহারা। যে উপাদান অবলম্বন করিয়া নশ্বর সুখদুঃখাদি-ভোগ হয়, তাহা উপাধি মাত্র। বস্তুর নিত্যশক্তির উহা পরিচয় নহে। কতকগুলি ব্যক্তি স্বর্গসুখাদির হেয়তা উপলব্ধি করিয়া আপনাদিগকে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে রত জানেন, তাহাও বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা ভেদে বিবিধ হওয়ায় সেই লোকে নিত্যত্বের ব্যাঘাত আছে। নির্ভেদব্রহ্ম কেনই বা ইহলোকে বিভিন্ন হইয়া জীব-উপাধিতে অনর্থক কষ্ট পাইবেন? আর যিনি তাদৃশ কষ্ট পান, তাঁহার বন্ধনমোচনই বা কেন নিত্যত্বের ব্যাঘাত করিবে?—এই সকল কথার সমীক্ষা এইহিক যুক্তি দ্বারা নানাপ্রকারে বিপন্ন হয়। ইহলোকে প্রত্যক্ষ বা স্থল-ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রবল, স্বর্লোক, পরলোক বা সূক্ষ্ম ভোগ প্রবল এবং তাহাও বালকদিগের অহুশাসন মাত্র। এইরূপ জানিয়া অপরোক্ষ পরলোকবাদী প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় ইন্দ্রিয়ের বিনাশ সাধনপূর্বক জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সম্মেলন আকাজ্জক করেন। তাঁহাদের তাদৃশ ঐহিক সম্মেলনাকাজ্জক পরলোক সম্বন্ধীয় জ্ঞানপথের আদৌ নির্দেশক না-ও হইতে পারে। যেখানে ঐহিক জ্ঞানের প্রবলতাক্রমে বিচিত্রতা একেবারেই বিনষ্ট হইল, সেখানে ‘চিন্মাত্র’ শব্দ অচিৎ-এর অপসারক হইলেও কেবল-চিৎ-এর বাক্য মাত্র নির্দেশক হইয়া অচিৎ-এর সহিত সমন্বয়-ভাববিশিষ্ট অর্থাৎ ‘চিদচিৎ-সমন্বয়’ এই ঐহিক ধারণা তাঁহাদের পরলোকের ধারণা করিতে দেয় না।

— জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(বিদ্ধ বৈষ্ণব)

১। নামাপরাধী কি শুদ্ধবৈষ্ণব নহে ?

“নামাপরাধিগণ কখনই শুদ্ধ বৈষ্ণব নয়; এইজন্য শ্রীমদ্ভগবৎ তাঁহাদিগকে ‘শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, মাত্র বৈষ্ণবের প্রায়’—বাক্য দ্বারা পৃথক্ করিয়াছেন।”

—‘নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি একটি অপরাধ,’ সঃ তোঃ ৮।৯

২। সাত্ত্বিক-বিকার বাহিরে দৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যদি কাহারও পাপ-প্রবৃত্তি থাকে, তিনি কি ‘বৈষ্ণব’ নহেন ?

“কাহার পাপ-প্রবৃত্তি আছে, তিনি অনন্ত-শ্রদ্ধার সহিত নামাশ্রয় করেন নাই। যদি তিনি অন্ত সকল লক্ষণ দেখানও, তথাপি তাঁহার অনন্ত নামাশ্রয়-প্রবৃত্তি কখনও স্বীকার করা যাইবে না। যে ব্যক্তির সত্যই পাপ-প্রবৃত্তি আছে, তিনি কৃষ্ণনামে পুলকাক্রোশপাত করিয়াও কপট বৈষ্ণব-মধ্যে গণিত হইবেন; কেন না তিনি নামাপরাধী।”

—‘নাম বলে পাপ-প্রবৃত্তি একটি নামাপরাধ,’ সঃ তোঃ ৮।৯

৩। মায়াবাদীতে যদি বাহিরে সাত্ত্বিক বিকার দৃষ্ট হয়, তথাপি কি তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা যাইবে ?

“মায়াবাদী—প্রতিবিম্ব-নামাভাসী, অতএব তাঁহারা অপরাধী; ইহাদের পক্ষে শুদ্ধ বৈষ্ণব হওয়া বড়ই কঠিন। তাঁহারা যতই সাত্ত্বিক ভাবের আভাস প্রকাশ করুন না কেন, তাঁহাদিগকে ‘বৈষ্ণব’ বলা যাইবে না।”

—‘মায়াবাদী কাহাকে বলি’ ? সঃ তোঃ ৫।১২

৫। পঞ্চোপাসক যদি শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা করেন, তবে কি তাঁহাকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলা যাইবে না ?

“বিদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্য দুই-প্রকার অর্থাৎ কর্মবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্য ও জ্ঞানবিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্য। স্মার্ত্ত মতে যে-সকল বৈষ্ণব ধর্ম্মের পদ্ধতি আছে, সে-সমস্তই কর্মবিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম। সেই বৈষ্ণবধর্ম্মে বৈষ্ণবমন্ত্র-দীক্ষা থাকিলেও বিশ্বব্যাপী পুরুষরূপ বিষ্ণুকে কর্মাজরূপে স্থাপন করা হয়। সেই মতে, বিষ্ণু সকল-দেবতার নিয়ন্তা হইলেও তিনি স্বয়ং কর্মাজ ও কর্মাধীন; বিষ্ণুর

ইচ্ছাধীন কৰ্ম নয়,—কৰ্মের ইচ্ছাধীন বিষ্ণু। এইমতে, উপাসনা, ভজন ও সাধন সমস্তই কৰ্ম্মাক্ষ, যেহেতু কৰ্ম্ম অপেক্ষা উচ্চ তত্ত্ব আর নাই। জড়-মীমাংসকদিগের বৈষ্ণবধৰ্ম্ম এইরূপ বহুদিন হইতে চলিতেছে। ভারতে ঐ মতের অনেকেই আপনাদিগকে ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া অভিমান করেন; শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া স্বীকার করিতে চান না। সে কেবল তাঁহাদের ছুৰ্ভাগ্যমাত্র।

ভারতে জ্ঞানবিন্ধ বৈষ্ণবধৰ্ম্মও প্রচুররূপে চলিতেছে। জ্ঞান-সম্প্রদায়ের মতে অজ্ঞেয় ব্রহ্মতত্ত্বই সর্বোচ্চ-তত্ত্ব। সেই মতে—নির্কিংশেয় ব্রহ্ম পাইবার জন্ত সাকার সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, শিব ও বিষ্ণুকে উপাসনা করা আবশ্যিক। জ্ঞান পূর্ণ হইলে সাকার উপাস্ত দূর হয়; শেষে নির্কিংশেয় ব্রহ্মতা লাভ হয়। এই মতে অনেক মনুষ্য অবস্থিত হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবকে অনাদর করেন। পঞ্চোপাসনার মধ্যে বিষ্ণুর যে উপাসনা আছে, তাহাতে দীক্ষা, পূজাদি—সমস্ত বিষ্ণুবিষয়ক, বা কখনও রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক হইলেও তাহা শুদ্ধ বৈষ্ণবধৰ্ম্ম নয়।

এবস্থত বিদ্ধবৈষ্ণবধৰ্ম্মকে পৃথক্ করিলে যে শুদ্ধবৈষ্ণবধৰ্ম্মের উদয় হয়, তাহাই প্রকৃত বৈষ্ণবধৰ্ম্ম। কলিদোষে অনেকেই শুদ্ধ-বৈষ্ণবধৰ্ম্ম বৃষ্টিতে না পারিয়া বিদ্ধ-বৈষ্ণবধৰ্ম্মকেই ‘বৈষ্ণব-ধৰ্ম্ম’ বলেন।”

—ভৈঃ ধঃ ৪র্থ অঃ

৫। রামানন্দিগণ কি শুদ্ধবৈষ্ণব ?

“যিনি হৃদয়ে ‘মুগ্ধু’, তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত ন’ন। বস্তুত রামোপাসক থাকায় রামদাসকে (রামানন্দি-সম্প্রদায়ভুক্ত) ‘বৈষ্ণবপ্রায়’ বলা যায়; কিন্তু সেকালে শুদ্ধবৈষ্ণবের শ্রেণীভেদ করিতে অনেকেই অশক্ত ছিলেন বলিয়া কায়স্থ-কুলোদ্ভব শ্রীরামদাসও জগতে ‘পরম বৈষ্ণব’ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ, অ ১৩৯২

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

ঠাকুর, তোমায় চাই *

ঠাকুর, তোমায় চাই !

আরো বহু বছর তোমায়

মোদের মাঝে চাই ।

আমরা আছি তোমার কাছে

গরবে তাই হৃদয় নাচে,

তোমার কাছেই আমরা সদা

শান্তি খুঁজে পাই !!

ঠাকুর, তোমায় চাই !

সব কথারই খাঁটি জবাব

তোমার কাছে পাই ।

বেদের খাঁটি সত্য কথা

তোমার কাছে শুন্ছি সদা,

পণ্ডিত এবং তর্কিকেরাও

লুটায় তব পায় !!

ঠাকুর, তোমায় চাই !

তোমার চরণ ছাড়া জীবের

ঠাই তো কোথাও নাই ।

আমাদেরই উদ্ধার আশে

গড়িলে মঠ দেশ-বিদেশে,

কত যে জীব উদ্ধারিলে,—

তুলনা তার নাই !!

ঠাকুর, তোমায় চাই !

তোমায় দেখি পাতকীও

হর্ষে শ্রীনাম গায় ।

মধুর তুমি,—পরশমণি,
ভক্তি লভে প্রতি প্রাণী,
কৃষ্ণ দিতে তুমিই পার
তোমার মহিমায় !!

ঠাকুর, তোমায় চাই !
জীবের তুমি পরম শরণ
তোমায় পূজি' তাই ।
তোমার চরণ-ধূলি ক'রে
রাখো আমায় চির তরে,
ঠাকুর, মম প্রাণের ঠাকুর !
তোমার কুপাই চাই !!

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

* ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত পৰ্য্যটক মহারাজের পত্রে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের অসুস্থ-শীলাভিনয়ের সংবাদ পাইয়া লেখক তাঁহার মনোবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন ।—প্রকাশক

সন্দর্ভ-সং

(ভক্তিসন্দর্ভ-১৪)

শ্রেয়ঃস্বতিং ভক্তিযুদশ্য তে বিভো
ক্লিশুস্তি যে কেবলগোধলক্ৰয়ে ।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নাশুদু যথা স্থলতুষাবঘাতিনাম ॥

ভক্তি ভিন্ন জ্ঞান সিদ্ধ হয় না, এজ্জ্ঞ এই শ্লোকের অতবারণা । ‘শ্রেয়ঃস্বতি’ শব্দে শ্রেয়ঃসমূহ অর্থাৎ অভ্যুদয় ও অপবর্গ, তাহাদের স্বতি অর্থাৎ গতি যাহার অর্থাৎ ভক্তিগার্গই ভোগ ও মোক্ষের শেষ পতি ; যেমন কোন বৃহৎ সরোবর বারণা অর্থাৎ জলপ্রবাহ সমূহের শেষ আশ্রয়, তদ্রূপ । অথবা মঙ্গলসমূহের পথস্বরূপ তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা জ্ঞানের

প্রয়াস করেন, তাহাদের অবশেষে ক্লেশই লাভ হয়। অন্তঃকণা বিশিষ্ট অল্প পরিমাণ ধাতুকে পরিত্যাগ করিয়া স্থূল ধাতু বলিয়া প্রতীয়মান তুষ-সমূহকে যাহারা কুট্টিত করে, তাহাদের যেমন কোন ফল (অর্থাৎ তণ্ডুল) লাভ হয় না, তদ্রূপ ভক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কেবল জ্ঞানের জন্ত যত্ন করিলে কেবল দুঃখমাত্রই লাভ হয়।

শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জ্ঞানের স্বরূপ বলিয়াছেন—

অমানিষ্মদস্তিত্ত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্ ।

আচার্যোপাসনা শৌচং শৈশ্ব্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনোহহঙ্কার এব চ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিহুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥

অসক্তিরনভিষঙ্গপুত্রদারগৃহাদিষু ।

নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বগিষ্ঠানিষ্ঠোপপত্তিষু ॥

ময়ি চানন্তর্যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

বিবিক্তদেশসেবিত্ত্বমরতির্জনসংসদি ॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহনুথা ॥ (গীঃ ১৩।৭-১১)

অমানিত্ব—উৎকর্ষসত্ত্বেও আত্মপ্রাধারাহিত্য, অদস্তিত্ব—দন্তের অভাব, পূজাদি-স্বধর্মলাভের চেষ্টা না করা, অহিংসা—প্রাণীপীড়ার অভাব, ক্ষান্তি—ক্ষমা, আর্জব—সরলতা, আচার্যোপাসনা—গুরুসেবা, শৌচ—শরীরের ও মনের শুদ্ধি, শৈশ্ব্য—সাধন পথে স্থিরতা, আত্মবিনিগ্রহ—শরীর ও মনকে অসৎ পথ হইতে নিবারণ করা, ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য—চক্ষু-কর্ণ-নাসা-জিহ্বা ও ত্বক্-ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয় হইতে মনকে দূরে রাখা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে বিরক্তি, অনহঙ্কার—অভিমান শূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা ও ব্যাধিরূপ দুঃখে পুনঃ পুনঃ দোষ দর্শন, বিষয়ে অনাসক্তি, স্ত্রীপুত্রগৃহাদিতে মমতাভাব, শুভাশুভ প্রাপ্তিতে চিত্তের সমভাব, ভগবানে অনন্ত ভক্তি, নির্জন বাস—প্রাকৃত-জনসঙ্গত্যাগ, আত্মতত্ত্ব নিত্য আলোচনা ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন অর্থাৎ তত্ত্ববিষয়ক আলোচনা—এই সকলকে জ্ঞান বলে। এতদ্ব্যতীত ইহার বিপরীত আর যাহা কিছু সবই অজ্ঞান।

পুনশ্চ—

অবিশ্মিতং তং পরিপূর্ণকামং যেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তং ।

বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ শ্বলাঙ্গুলেনাতিততির্ভক্তি সিন্ধুম্ ॥

(ভাঃ ৬।২।২২)

‘অবিস্মিত’-শব্দে ভগবদ্ ব্যতিরিক্ত অত্ৰ কোন অভিনব বস্তুর অভাব নিবন্ধন বিস্ময়রহিত অতএব তিনি নিজে পরিপূর্ণকাম, অত্ৰ বস্তুর লাভদ্বারা পূর্ণকাম নহেন। সম অর্থাৎ উপাধিপরিচ্ছেদরহিত এবস্তৃত পরমেশ্বরকে ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অপরের শরণাগত হয়, সে বালিশ—মূর্থ; কারণ সে কুকুরপুচ্ছ ধরিয়া ছস্তর সাগর পার হইবার ইচ্ছা করে। কুকুর পুচ্ছ ধরিয়া যেক্রপ ছস্তর সাগর পার হওয়া যায় না, তক্রপ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে শরণাগতি ছাড়া অত্ৰ কোন দেবদেবী বা প্রাণীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছস্তর ভব সাগর পার হওয়া যায় না।

তজ্জগুই বলিতেছেন—

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যেহুদেবমুপাসতে ।

স্বমাতরং পরিত্যজ্য স্থপচীং বন্দতে হি সঃ ॥ (স্কান্দে)

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যেহুদেবমুপাসতে ।

তাক্ষ্যামৃতং স মৃত্যুয়া ভুঙক্তে হলাহলং বিবন্ ॥ (অনুত্র)

যে তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদত্তমুপাসতে ।

তে হেমরাশিমুৎসজ্য পাণ্ডুরাশিং জিঘৃক্ষতি ॥ (মহাভারত)

ন যৎ প্রসাদায়ুতভাগলেশমন্তে চ দেবা গুরবো জনাঃ স্বয়ম্ ।

কর্তুং সমেতাঃ প্রভবন্তি পুংসস্তমীশ্বরং বৈ শরণং প্রপদ্যে ॥

(ভাঃ ৮।২৪।৪২)

ভগবান বাসুদেবকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অত্ৰ দেবতার উপাসনা করে, সে নিজ মাতাকে ত্যাগ করিয়া চণ্ডালীকে বন্দনা করে।

ভগবান বাসুদেবকে ত্যাগ করিয়া যে অত্ৰ দেবতার উপাসনা করে, সেই মূঢ় অমৃত ত্যাগ করিয়া হলাহল বিষ পান করে।

যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া মোহবশতঃ অত্ৰ দেবের উপাসনা করে, সে সুবর্ণরাশি ত্যাগ করিয়া ধূলিরাশি গ্রহণ করে।

শ্রীমৎশ্রুদেবের প্রতি সত্যব্রত বলিয়াছেন—সকল দেবতাগণ পিত্রাদিগুরুবর্গ ও সমগ্র রাজা সকলে সমবেত হইয়া যে ভগবানের অনুগ্রহের অমৃত ভাগের এক ভাগও অনুগ্রহ করিতে পারেন না, আমি সেই ভগবানের শরণ গ্রহণ করি।

ব্রহ্মা ও শিবকে বৈষ্ণব বলিয়াই জানিবে। দ্বাদশ স্বন্ধে শ্রীশিবের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তি—

বরমেকং বৃণেহথাপিপূর্ণকামাভিবর্ষণাৎ ।

ভগবত্যচ্যুতাং ভক্তিং তৎপরেষু তথা হুয়ি ॥ (ভাঃ ১২।১০।৩৪)

কামের পূর্ণ অভিব্যক্তি আশ্রয় আপনার নিকট আমি একটি মাত্র বর প্রার্থনা করি, ভগবান বিষ্ণুর প্রতি ও ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠ আপনার প্রতি আমার অন্তর্লিতা ভক্তি হউক।

বৈষ্ণবপ্রায় হইয়া বিষ্ণু ও শিবের সমদর্শনকারী ব্যক্তির ভক্তি লাভ হয় না, বরং প্রত্যবায় হয়। যথা—

ন লভ্যেযুঃ পুনর্ভক্তিং হরৈরেকান্তিকীং জড়ঃ ।

একাগ্রমনসশ্চাপি বিষ্ণুসামান্যদর্শিনঃ ॥

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরূদ্ভাদিদৈবতৈঃ ।

সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

যে সকল মূর্খ বিষ্ণুর সহিত অত্র দেবতার সমবুদ্ধি করে, তাহারা একাগ্রচিত্ত হইলেও হরিতে ঐকান্তিকী ভক্তি লাভ করিতে পারে না।

যে ব্যক্তি নারায়ণকে ব্রহ্মাশিবাদির সমান জ্ঞান করে সে পাষণ্ডী। তবে যে স্থানে স্থানে অভেদদর্শন-সূচক বাক্য দেখা যায়, তাহা বিষ্ণুর নিরপেক্ষ উপাসক জ্ঞানীর পক্ষে বুঝিতে হইবে। যথা, ১২শ স্বাক্ষর মার্কেণ্ডেয়ের প্রতি শিবের উক্তি—

ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা নিঃসঙ্গা ভূতবৎসলাঃ ।

একান্তভক্তা অস্মান্ন নিবৈরাঃ সমদর্শিনঃ ॥

সলোকা লোকপালান্তান্ বন্দস্তার্চস্ত্যাপাসতে ।

অহং ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং হরিরীশ্বরঃ ॥

ন তে ময্যচ্যুতেহজ্ঞে চ ভিদামথপি চক্ষতে ।

নাস্তনশ্চ জনস্তাপি তদ্ বুধ্যান্ বয়মীমহি ॥ (ভাঃ ১২।১০।২০-২২)

ব্রাহ্মণগণ সাধু, শান্ত, নিঃসঙ্গ ও ভূতবৎসল এবং আমাদের প্রতি একান্ত ভক্তিয়ুক্ত, বৈরতাবিহীন ও সমদর্শী। লোকসহিত লোকপালগণ, আমি, ব্রহ্মা স্বয়ং ঈশ্বর শ্রীহরি ও তাঁহাদিগকে (ব্রাহ্মণদিগকে) বন্দনা, অর্চনা ও উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাতে অজ্ঞে বা অচ্যুতে অণুযাত্র ভেদ এবং নিজের সহিত অপরের ভেদ দর্শন করেন না ; তাহা হইলেও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে আপনাদিগকে অর্থাৎ আপনার স্থায় শুদ্ধবৈষ্ণবকে আমরা ভজনা করি অর্থাৎ প্রিয় জ্ঞান করি।

ব্রহ্মপুরাণে শিববাক্য—

যো হি মাং দ্রষ্টুমিচ্ছেত ব্রহ্মাণং বা পিতামহম্ ।

দ্রষ্টব্যস্তেন ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্ ॥

যিনি আমাকে (শিবকে) অথবা পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সর্বশক্তিমান ভগবান্ বাসুদেবকেই দর্শন করা উচিত। কেননা

পরব্রহ্ম স্বরূপ বাসুদেবের বিজ্ঞান লাভ হইলেই সকল বস্তুর বিজ্ঞান লাভ হয়। অতএব শিবকে বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করাই সম্মত।

কোন কারণে শিবপূজার প্রয়োজন হইলে বৈষ্ণবগণ শিবমূর্তিতে শ্রীহরিরই উপাসনা করেন। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্মোত্তরে একটি ইতিহাস আছে—বিশ্বকুসেন নামক এক পরম ভাগবত পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছিলেন। একদিন তিনি কোন বন সনীপে উপস্থিত হন। তথায় গ্রামাধ্যক্ষপুত্র আসিয়া সেই ব্রাহ্মণকে বলিল—অণু আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে। সেজন্য আমার ইষ্টদেবের পূজা করিতে অক্ষম, তুমি আমার প্রতিনিধি স্বরূপে শিবের পূজা কর। ব্রাহ্মণ বলিলেন যে, শ্রীহরিই আমাদের পূজ্য, আমরা অণুদেব পূজা করি না। তখন গ্রামাধ্যক্ষপুত্র ব্রাহ্মণের শিরশ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ মনে মনে বিচার করিয়া বলিলেন, আমি যাইতেছি। সেখানে গিয়া তিনি মনে বিচার করিলেন—রুদ্রদেব তমোগুণের মূর্তি। আর তামস দৈত্যসংহারক শ্রীনৃসিংহদেব তমো-ভঞ্জনকারী বলিয়া স্বীয় ভজন প্রদর্শনার্থ তমোরাশি নাশ করিয়া উদিত হন। অতএব ‘শ্রীনৃসিংহায় নমঃ’ বলিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে উদ্যত হইলে গ্রামাধ্যক্ষপুত্র পুনরায় খড়্গ উত্তোলন করায় ঐ লিঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া শ্রীনৃসিংহ-দেব আবির্ভূত হইয়া গ্রামাধ্যক্ষপুত্রকে বিনাশ করিলেন। অত্যাশি লিঙ্গস্ফোট নামক শ্রীনৃসিংহদেবের মূর্তি তথায় বিরাজিত আছেন।

শ্রীনৃসিংহ তাপনীর উক্তি—

অনুপনীতশতমেকেনোপনীতেন তৎ সমম্। উপনীত শতমেকেন গৃহস্থেন তৎ সমম্। গৃহস্থশতমেকমেকেন বানপ্রস্থেন তৎ সমম্। বানপ্রস্থশতমেকমেকেন যতিনা তৎ সমম্। যতীনাস্ত শতং পূর্ণমেকেন রুদ্রজাপকেন। রুদ্র জাপক-শতমেকমথর্বাদীরসশাখাধ্যাপকেন তৎ সমম্। অথর্বাদীরসশাখাধ্যাপকশত-মেকমেকেন মন্তরাজাধ্যাপকেন তৎ সমম্।

এক জন উপনীত ব্যক্তি এক শত অনুপনীতের সমান, এক জন গৃহস্থ শত উপনীতের সমান, একজন বানপ্রস্থ শত গৃহস্থের সমান, একজন যতি শত বানপ্রস্থের সমান। একজন রুদ্র মন্ত্র জাপক এক শত যতির সমান। একশত রুদ্রজাপক একজন অথর্বাদীরসশাখাধ্যাপকের তুল্য; আর, একজন মন্তরাজ —শ্রীনৃসিংহ মন্ত্রাধ্যাপক এক শত অথর্বাদীরস শাখাধ্যাপকের তুল্য।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৃন্দেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীশ্রী একাদশী-মাতাত্মা

[পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ড, চতুর্বিংশ অধ্যায়]

(পূর্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৩৩ পৃষ্ঠার পর)

উৎপন্ন একাদশী-উৎপত্তি ও বিবরণ

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে দেব ! গোণচান্দ্র অগ্রহায়ণের পুণ্যপ্রদা কৃষ্ণা একাদশী কি জন্ত উৎপন্ন-নামে এ জগতে কথিত হন, কিজন্তই বা তিনি পবিত্রা ও দেবগণের প্রিয়া ?—তাহা জানিতে বাসনা করি । শ্রীভগবান্ কহিলেন—
হে পার্থ ! পূর্বকালে সত্যযুগে মুরনামে এক দানব ছিল । সে অতি অদ্ভুত আকৃতি, মহাকোপন স্বভাব ও দেবগণের ভয়-উৎপাদক রূপে বর্তমান ছিল । যুদ্ধে দেবগণের সহিত ইন্দ্রকেও সে পরাজিত করিয়াছিল, এবং যমতুল্য সেই দুরাশ্রা অশুর দেবগণকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়ায় দেবগণ পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিলেন । সর্বদা শঙ্কায়ুক্ত ও ভয়বিহ্বল ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তখন মহেশ্বরের নিকট গমনপূর্বক আপনাদের সমস্ত দুঃখ নিবেদন করিলেন । ইন্দ্র বলিলেন—হে মহেশ্বর ! সমস্ত দেবগণ মুরাশুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া মর্ত্য লোকে বিচরণ করিতেছেন । দেবগণ মর্ত্য-লোকে কি শোভা পায় ? আপনি আমাদের দুঃখনিবারণের উপায় বলুন । আমরা তাহা অবলম্বন করিব । মহাদেব কহিলেন—হে দেবরাজ ইন্দ্র ! তোমরা সকলে যেখানে শরণ্য জগন্নাথ—গুরুভৃঙ্জ নারায়ণ রহিয়াছেন সেখানে গমন কর । তিনি আশ্রিতজনের পরিভ্রাণকারী, নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ষার উপায় করিবেন ।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—হে যুধিষ্ঠির ! মহাদেবের বাক্য শুনিয়া মহামতি দেবরাজ ইন্দ্র সমস্ত দেবগণের সহিত ক্ষীরসমুদ্রতীরে গমন করিলেন ; জলমধ্যে প্রসুপ্ত সেই গদাধরকে দেখিতে পাইয়া ইন্দ্র তখন কৃতাজলিপুটে তাঁহার স্তুতি আরম্ভ করিলেন । স্তুতিতে নিজেদের দৈন্ত, দুঃখের কারণ মুরাশুর কর্তৃক পরাজয় ও স্বর্গচ্যুতি নিবেদন করিলেন । ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণ বলিলেন—হে ইন্দ্র ! সেই মুরদানব কিরূপ ? তাহার বল কি প্রকার, কোথায় থাকে, বীর্য্য ও শক্তি কতদূর, এবং সেই দুষ্টির প্রতি কাহার কি ভয় আছে, সে সমস্ত আমাকে বল ।

ইন্দ্র বলিলেন—হে দেবেশ ! পুরাকালে ব্রহ্মবংশে তালজঙ্ঘ নামে এক অতিপরাক্রান্ত মহা অশুর ছিল । তাহারই পুত্র মুরনামক অশুর অতীব

বলশালী, অত্যাংকট এবং দেবতাগণের-ভয়ও উৎপাদক। সে চন্দ্রাবতী নামক পুরীতে বাস করে। দেবতা সকলকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়া তাহারই স্বজাতি একজনকে ইন্দ্ররূপে স্থাপন করিয়াছে। সেরূপ অত্যাচার অসুর বন্ধুকে কাহাকেও অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ এবং কাহাকেও বায়ু প্রভৃতি দিক্‌পাল-রূপে নিজের মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক দেবলোক সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া আছে। তাহার প্রতাপে আমরা সকল দেবগণ মর্ତ্যে বিচরণ করিতেছি। ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণ কোপাবিষ্ট হইলেন এবং দেবতাদের ভয়কারী এই দুষ্ট দৈত্যকে বধ করিব—এই বলিয়া দেবতাগণসহ নারায়ণ চন্দ্রাবতী-পুরীতে গমন করিলেন। সেই দৈত্যরাজ নারায়ণকে দেবতাগণেরহ ত আগত দেখিয়া পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন করিতে লাগিল। যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিলেন। তখন যুদ্ধক্ষেত্রে মাত্র নারায়ণকে অবস্থিত দেখিয়া সেই দানব তাঁহাকে “দাঁড়াও দাঁড়াও” বলিতে লাগিল। ভগবান্-ও ক্রোধারক্তলোচনে সেই দৈত্যকে বলিতে লাগিলেন—রে ছুরাচার দানব! আমার বাহু-বল দেখ, এই বলিয়া অসুর-পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধগণকে দিব্য বাণদ্বারা বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন তাহারা ভয়ে বিহ্বল হইয়া উঠিল ও নানাদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে যুধিষ্ঠির! তখন নারায়ণ দৈত্য-সৈন্য মধ্যে সুদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে শত শত দৈত্য ছিন্ন হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইল, একমাত্র মুরাসুরই পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিতে লাগিল। সে সমস্ত দেবগণকে বিনাশ করিয়াছে, যুদ্ধে মধুসূদনকেও পরাজিত করিল। অস্ত্রযুদ্ধে নারায়ণ পরাজিত হইয়া দৈত্যের সহিত বাহুযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। এইরূপে দিব্য পরিমাণে সহস্রবৎসর যুদ্ধ করার পরও দৈত্যকে পরাজিত করিতে না পারিয়া বিষ্ণু চিন্তাবিষ্ট হইলেন এবং সমস্ত দেবতাকে নষ্টপ্রায় দেখিয়া নিজে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন তথায় সিংহাবতী নামে একটি একদ্বারবিশিষ্ট দ্বাদশযোজন-বিস্তৃত গুহা আছে, বিষ্ণু ঐ গুহায় শয়ন করিয়া রহিলেন। হে যুধিষ্ঠির! সেই গুহায় প্রসুপ্ত বিষ্ণুকে বধ করিবার নিমিত্ত সেই দানবও তাঁহার পাছে পাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল। দৈত্যের সহিত মহাযুদ্ধে পরিশ্রান্ত বিষ্ণু যোগমায়া-আশ্রমে শয়ন করিয়া আছেন, এদিকে তাঁহার পশ্চাদাগত সেই দানবও ঐ গুহায় তখন প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুকে তথায় শয়ন করিয়া

রহিয়াছেন দেখিয়া হর্ষান্বিত হইল। মনে মনে সে ভাবিল—‘নিশ্চয়ই আমার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিষ্ণু ভয়ে এখানে আসিয়া গোপনে শয়ন করিয়া আছে, অশ্বর-কুলারি এই বিষ্ণুকে আমি অবশ্যই বধ করিব।

হে যুধিষ্ঠির! দানবের এইরূপ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীবিষ্ণুর শরীর হইতে একটি কণ্ঠা উৎপন্ন হইলেন। এই কণ্ঠাই ‘উৎপন্ন একাদশী’। তিনি রূপবতী, সৌভাগ্যশালিনী ও দিব্য অস্ত্রশস্ত্রাদিধারিণী। বিষ্ণুতেজাংশ সম্ভূতা বলিয়া মহাবল-পরাক্রমশালিনী ছিলেন। দানবরাজ মুরও তখন সেই কণ্ঠাকে দেখিতে পাইল। সেই স্ত্রীকপিনী দেবী এই অশ্বরের সহিত যুদ্ধ-বাসনা জানাইলে দানবও যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইল। অনন্তর সেই দানবের সহিত সর্বযুদ্ধ-কৌশলনিপুণা কণ্ঠা তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর সেই দেবীর হুঙ্কারের দ্বারাই মুর নামক অশ্বর ভস্মসাৎ হইয়া গেল। সেই দানব নিহত হইলে পর বিষ্ণু জাগরিত হইলেন এবং সম্মুখে ভস্মীভূত দানবকে দেখিতে পাইয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

বিষ্ণু বলিলেন—অতি পরাক্রান্ত উগ্রমূর্ত্তি আমার পরমশত্রু এই মুর দানবকে কে বধ করিল? আমার প্রতি করুণাবশত যিনি উহাকে বধ করিয়াছেন তিনি নিশ্চয়ই প্রশংসাযোগ্য কৰ্ম্ম করিয়াছেন। সেই কণ্ঠা কহিলেন—এই দানব দেবতা, গন্ধৰ্ব্ব, যক্ষ, উরগ, রাক্ষসগণের সহিত ইন্দ্রকে জয় করিয়া স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। সম্প্রতি আমি দেখিলাম যে ভগবান্ শ্রীহরি শয়ন করিয়া করিয়াছেন আর এই মুরদৈত্য তাঁহার পাছে পাছে আসিতেছে। সে ত্রিলোক সংহার করিবে ভাবিয়া আমিই তাহাকে বধ করিয়াছি। কণ্ঠার এই কথা শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন—আমি যাহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছি, তুমি কিরূপে তাহাকে বধ করিলে? একাদশী কহিলেন—হে প্রভো! আপনার অনুগ্রহেই আমি এই মহাদৈত্যকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

উৎপন্ন একাদশীর মাহাত্ম্য

ভগবান্ কহিলেন—আমি এই ত্রিলোকে দেবতা ও ঋষিগণকে অনন্ত বর প্রদান করিয়াছি। হে ভদ্রে! সেমতে তুমিও তোমার মনোমত বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা সুরগণের দুর্লভ হইলেও তোমাকে প্রদান করিব, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। একাদশী বলিলেন—হে দেব জনার্দন! আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমার হৃদয়ে একটি বরের কামনা রহিয়াছে। আপনি যদি তাহা প্রদান করিবেন বলিয়া ত্রিসত্য করেন তবেই

সেই বর প্রার্থনা করিব। ভগবান কহিলেন—তোমার নিকট আমি ত্রিসত্য করিলাম যে প্রার্থিত বর অবশ্যই প্রদান করিব, ইহাতে অত্যাধা হইবে না।

একাদশী বলিলেন—হে দেবেশ! ত্রিভুবনের মধ্যে চতুর্যুগ ব্যাপী সমস্ত তীর্থ স্থানেই অত্যাধি আমার এরূপ বৈশিষ্ট্য স্থাপন করুন, যাহাতে আমি সমস্ত হইতেও প্রধান, সর্ববিঘ্ননাশিনী ও সর্বসিদ্ধিদায়িনীরূপে আপনার প্রসাদে পূজা ও বিখ্যাতা হইতে পারি। হে জনার্দন! আপনার প্রতি ভক্তিবশতঃ যাহারা ভক্তির সহিত আমার উপবাস করিবে (অর্থাৎ উৎপন্ন একাদশীর উপবাস করিবে) তাহাদের সর্বসিদ্ধি লাভ হইবে—এই বর প্রদান করুন। তাহা হইলেই আপনি পরিতুষ্ট জানিব। যে ব্যক্তি উপবাস, নক্ত ও একভুক্তরূপ ব্রত পালন করিবে, তাহার ধন, ধর্ম ও মোক্ষ লাভ হইবে—এই বর প্রদান করুন।

বিষ্ণু কহিলেন—হে কল্যাণি! তুমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, তোমার ব্রত-পালনকারীর সে সমস্তই লাভ হইবে। তুমি তাহার সকল মনোবাসনা পূরণ করিবে, ইহাতে সংশয় নাই। একাদশী বলিলেন—হে প্রভো! এ জগতে যাহারা আমার ভক্ত এবং যাহারা কার্তিকের ভক্ত (অর্থাৎ কার্তিক ব্রতকারী) তাহারা ত্রিলোকে চারিযুগ ব্যাপিয়া বিখ্যাত হউক।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—তোমাকে আমি আমার শক্তি বলিয়াই মনে করি, ক্ষুতরাং তোমার ব্রতচরণকারী সকলেই আমার পূজা করিবে; ইহার ফলে তাহারা সকলেই মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। তৃতীয়া, অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী এবং বিশেষতঃ একাদশী তিথি হরিপ্রিয়া নামে বিখ্যাত। ঐ একাদশী তিথিতে উপবাসে সমস্ত তীর্থফলের অধিক পুণ্য সত্য সত্যই লাভ হইয়া থাকে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। তুমি ব্রতকারীর অপর শত্রুগণকে বিনাশ কর এবং তাহাকে পরমা গতিও দান করিয়া থাক। সর্বসিদ্ধিবর-প্রদায়িনী তুমি নিজেই তাহার সকল বিঘ্ন বিদূরিত কর।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—হে কুন্তীনন্দন! বিষ্ণু ‘উৎপন্ন-একাদশীকে’ ত্রিসত্যপূর্বক এই বর প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই বর লাভ করিয়া একাদশী মহাব্রত হুষ্ঠ ও পুষ্ঠ হইলেন ইহাতে কোনও সংশয় নাই। উভয় পক্ষের একাদশীই তুল্যা ও শুভদাত্রী। শুক্লপক্ষের ও কৃষ্ণপক্ষের একাদশীর মধ্যে কোন ভেদবুদ্ধি করিবে না। সমস্ত ব্রতকারীই দিবসে বা রাত্ৰিতে ভক্তি-পরায়ণ হইয়া এই উৎপন্ন একাদশীর উৎপত্তি কথা শ্রবণ করিবে। একমাত্র

এই একাদশীতেই সকল মাসের উভয় পক্ষের সমস্ত একাদশী তিথি পালিতা হন ।

একাদশী তিথির বিদ্বা বিচার

যদি সূর্যোদয়ের পর অল্প একাদশী থাকে, শেষ রাত্রে ত্রয়োদশী আরম্ভ হয় এবং মধ্যবর্তী কালে পূর্ণ্যা দ্বাদশী তিথি থাকে, তবে ঐ দ্বাদশী ত্রিম্পূষা মহাদ্বাদশী বলিয়া কথিত হয় । একমাত্র এই ত্রিম্পূষা মহাদ্বাদশীতে উপবাসে সহস্র একাদশীর উপবাস ফল লাভ হয় । পরদিন ত্রয়োদশীতে পারণে ও স্বাভাবিক পারণের সহস্র গুণ ফল হইয়া থাকে । অষ্টমী, একাদশী, ষষ্ঠী, তৃতীয়া ও চতুর্দশী তিথিগ্ৰন্থ উপবাস কখনও পূর্ববিদ্বায় করিবে না, এই সকল তিথির উপবাস পরবিদ্বাতেই করিবে । আর শুদ্ধা একাদশী অহোরাত্র ব্যাপিনী হইয়া যদি দ্বাদশী দিনে সূর্যোদয়ের পরও কিছুকাল থাকে, তবে ঐ শুদ্ধা একাদশীকেও পরিত্যাগ পূর্বক দ্বাদশী যুক্ত একাদশীতেই উপবাস করিবে ।

বিদ্বা বিচারপূর্বক একাদশী তিথি পালনের মাহাত্ম্য

উভয় পক্ষীয় বিদ্বা একাদশীর বিষয় আমি তোমাকে বলিলাম । এই রূপে বিদ্বা-বিচার পূর্বক যে মানব একাদশীতেই উপবাস করে, সে ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ নারায়ণ যেখানে অবস্থান করেন সেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করে । এ জগতে বিষ্ণু-ভক্তি পরায়ণ মানবগণই ধন্য যিনি সকল সময় একাদশীর মাহাত্ম্য পাঠ করেন, সেই মানব সহস্র গো-দানের যে ফল সেইরূপ পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । দিবসে অথবা রাত্ৰিতে যাহারা ভক্তি সহিত এই একাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাহারাও ব্রহ্মহত্যাदि সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন । ইহাতে কোনও সংশয় নাই । হে যদিস্তি । বিষ্ণুর সমান বলিয়া উল্লেখযোগ্য যেমন এ জগতে কোন বস্তু নাই, একাদশীর সমান পাপনাশকারী তেমন কোনও ব্রত নাই ।

ইতি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে গোপা চান্দ্র অগ্রহায়ণের কৃষ্ণপক্ষীয় উৎপন্ন্য

নামক একাদশীর উৎপত্তি-বিবরণ-কথনে চতুর্বিংশ

অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

— পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাकरण তীর্থ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যাবর্য্য ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্-
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের উনসপ্ততিতম
শুভ আবির্ভাব বাসরে ভক্ত্যর্থ

(১)

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুদেব,

অভয়পাদপদ্মে অনন্তকোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন,—

দেব! শ্রীশ্রীমাঘী কৃষ্ণ-তৃতীয়া মহাপূণাতমা তিথি নিকটে উপস্থিত। এই ভূতল-পবিত্রকারিণী তিথিতে আমার হৃদয়ের অভিব্যক্তি কি প্রকার, আপনার শ্রীপাদপদ্মে তাহা আমি ব্যক্ত করিতে অসমর্থ; তবে এই মাত্র নিবেদন—কাল অতি ভয়ঙ্কর, আমরা সকলেই শিশুমতি দুর্ব্বল-হৃদয়, ভক্তি পরিপাকের কথা ত' দূরে থাকুক, হৃদয়ে তাহার বীজাক্ষরও উৎপন্ন হইয়াছে কিনা তাহাতেও সন্দেহ। এমতাবস্থায় আপনার পুনঃ পুনঃ অসুস্থলীলাভিনয় দর্শন করিয়া আমরা সকলেই পুনঃ পুনঃ মুহুমান হইয়া পড়ি। যে সময়ে সংসারে আপনার বলিয়া কেউ থাকে না, ধরাতল শূন্য ও চতুর্দিক অন্ধকার বলিয়া বোধ হয় তখন নানাপ্রকার কুচিন্তা হৃদয়ে উপস্থিত হয়—আমরা নিরাশ্রয় হইয়া পিতৃহীন বালকের ছায় নষ্ট হইয়া যাইব নাকি? আমাদের ভক্তিলতা কাহাকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হইবে? সাক্ষাৎভাবে প্রীতিপূর্ব্বক ছলে-বলে-কৌশলে আমাদের মত অনভিজ্ঞ অন্ধগণকে কে শাস্ত্র-উপদেশের দ্বারা ভক্তিরস পান করাইবে? এই সমস্ত চিন্তায় হৃদয় উদ্বিগ্ন ও শোকাকুল হইয়া উঠে।

হে করুণাসাগর, সেবক বৎসল আচার্য্যাদেব! এই আপনার আবির্ভাব তিথিতে ইহাই প্রার্থনা যে, ভগবৎ ইচ্ছাই আপনার ইচ্ছা—ইহা সত্য; তথাপি আপনি কৃষ্ণদয়িতা-দয়িত, অতএব আপনার ইচ্ছা ও কৃষ্ণের ইচ্ছা, আপনি সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র, কালের বিক্রম আপনার উপরে থাকিতে পারে না। আপনি পুন-রায় আপনার অসুস্থলীলাভিনয় দর্শন করাইয়া আমাদেরকে ত্রস্ত করিবেন না।

হে গৌরকরুণা শক্তি! আপনি আমাদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করুন, যেন আপনার নির্ম্মল ও জগতে অতুলনীয় শ্রীগুরুসেবকের আদর্শ আমরা জগতে রক্ষা করিতে পারি।

হে শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্ট পরিপূরণকর, হে শ্রীল সরস্বতীপ্রেষ্ঠ! আপনি আমাদের হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করুন যেন আমরা আপনার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শুদ্ধ-

ভক্তি-প্রচার-ধারা অক্ষুন্ন রাখিয়া আপনার মনোভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারি, সহস্র সহস্র বিঘ্ন বাধা ও লাঞ্ছনা গঞ্জনার মধ্যেও আপনার সেবা হইতে যেন পথভ্রষ্ট না হই, আমরা পুনঃ পুনঃ আপনার শ্রীপাদপদ্মে কোটি কোটি নমস্কার বিধান করিতেছি। ইতি—

আপনার অহৈতুকী কৃপালেশ প্রার্থী

দাসাভিমানী

(শ্রীমৎ) নারায়ণ (মহারাজ)

(২)

দীনের ভক্তি-পুষ্পঞ্জালি

জয় জয় গুরুদেব, অভিন্ন নিতাই !
 আজি এই শুভ দিনে তব গুণ গাই ॥
 সুপবিত্রা হ'ল তিথি তব আবির্ভাবে ।
 গোলোক হইতে তুমি আসিলে এ ভবে ॥
 বরিশাল জেলার 'বানারীপাড়া' গ্রামে ।
 উজ্জ্বল করিলে কুল সুপুত্র রূপেতে ॥
 না আছে ভক্তি-স্তুতি, নাহি কোন ধন ।
 কি দিয়ে পূজিব আমি তব শ্রীচরণ ॥
 গৌরপ্রের্ষ হও তুমি গৌরগত প্রাণ ।
 গৌরের আচার-বিচার-শিক্ষা কর দান ॥
 সরস্বতী প্রভুপাদের তুমি প্রিয়তম ।
 গুরুমনোভীষ্ট পূরণ সদা তব কাম ॥
 সর্বগুণে শিরোমণি হেরিয়া তোমায় ।
 গুরুবর “কুতিরত্ন” ঘোষিল ধরায় ॥
 অসাধ্য সাধন কর সদা সেবারত ।
 তব ভয়ে শান্ত কুলিয়ার পাষণ্ড কত ॥
 জগমধ্যে সুবিদিত কোলদ্বীপ স্থান ।
 তথা প্রভুপাদ-শ্রীবরাহে করিলে স্থাপন ॥

গৌরহরি পাদপদ্মে তুমি মত্ত ভৃঙ্গ ।
 তথা আশ্বাদিলে কত ভক্তিরসভাণ্ড ॥
 গগনে উড়ন্ত পক্ষী নাহি পায় অন্ত ।
 তেমনি মহিমা তব অসীম অনন্ত ॥
 বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ আর ।
 জিহ্বাবেগ, উদর, উপস্থ-বেগ আর ॥
 মিলিত হইয়া সবে আমাকে ঘিরিল ।
 নিমজ্জিয়া ভবকূপে পাগল করিল ॥
 এহেন সময়ে তুমি ওহে কৃপাসিন্ধু !
 উদ্ধার করহ মোরে ওহে দীনবন্ধু ॥
 অধম পামর আমি কর শুভদৃষ্টি ।
 তোমার অভয় চরণ করিয়াছি দৃষ্টি ॥
 জন্মে জন্মে পাই যেন তব শ্রীচরণ ।
 অধম প্রার্থিছে সদা লইয়া শরণ ॥

—শ্রীকৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয় সরস্বতী

কালের প্রভাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের গতি নিত্য নহে, পরিবর্তনশীল। যাবতীয়
 বস্তু সর্বক্ষণী কালের হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভে অসমর্থ। এমন কি “ক্ষীণে
 পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি”—শ্লোকটী হইতে দেবগতি-ও সাময়িক এবং কণ্ঠ-
 ফল ভোগান্তেই তাহার পতন, শাস্ত্রকার প্রমাণ সহকারে তাহা বিশদভাবে
 জানাইয়াছেন। “কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা”—শ্লোকের তাৎপর্য বোধগম্য না
 হওয়ায় প্রাকৃত বদ্ধজীব আপনাকে ভোক্তা-জ্ঞানে আত্মেন্দ্রিয়-তোষণী বৃত্তির
 প্রচুর আবাহন করায় কালাতীত অতীন্দ্রিয় আত্মা বিশ্বত্বের অতল গহ্বরে
 নিদ্রা যাইতে থাকে। ষষ্ঠেন্দ্রিয় মন তখন সেই আত্মায় পরিচালক-অভিমাণে
 জীবকে সংসারের নাগরদোলায় নিষ্পেষণ করিতে থাকে। এই অবস্থায় যে
 কোন শিক্ষাই লাভ করিলেও সে সমস্তই মায়িক রাজ্যের বেড়াজালে নিবদ্ধ।
 এই সকল শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবীই ‘বীণাপাণি সরস্বতী’।

আমাদের আলোচ্য “গৌড়ীয় সরস্বতী” তাদৃশ নহেন। তিনি মায়িক-বিকারী অপরিণামদর্শী জীবগণের হিতসাধনে নিরন্তর নিরত। প্রয়োজন-বিশেষে স্ননিপুণ শল্য চিকিৎসকের স্থায় “মনোব্যাসঙ্গমুক্তি” দ্বারা বিরজার নিম্নলোকে অবস্থিত ত্রিগুণবদ্ধ জীবের দৈশবিরোধী সংশয় নির্দয়হস্তে ছেদন করেন। বীণাপাণির শিক্ষণীয় যাবতীয় প্রাকৃত জ্ঞানাদিতে ভবব্যাদি নিরাময়-করণে অদ্বিতীয় এই অতিমর্ত্য মহাপুরুষ সহজ অধিগত থাকিলেও অগ্রাহ-পূর্বক ঐ সকল কুজ্ঞান জগতে শিক্ষা না দিবার লীলাই তিনি বাল্যেই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালে বিশ্বাসী তাঁহার এই লীলার কথা ন্যূনাধিক অবগত আছেন। মনোধর্ম্মজাত রাজ্যে অস্থায়ী ভূপের নকলনবিশী করিতে এই সরস্বতী শিক্ষা দেন না।

গৌড়ীয় সরস্বতীর আবির্ভাবের কারণ

মায়িক, কুণ্ডারাজ্যের বৈচিত্র্যে অবিমুক্ত, তদ্রাজ্যের জ্ঞানান্বেষণে অপ্রবৃত্ত —পরম সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই সাক্ষাৎ ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীগৌরাদেব চরণাশ্রয়পূর্বক অপ্রাকৃত ‘গৌড়’-রাজ্যে অধিষ্ঠান করায় ‘গৌড়ীয়’-সংজ্ঞায় অলঙ্কৃত। তাদৃশ গৌড়ীয়গণের শিক্ষিতব্য বিষয়সমূহের সরস্বতীই ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী। একমাত্র ভক্তিই সিদ্ধান্ত, তদনুগত বিষয়সমূহ সকলই মাধব; পার্থিব বিজ্ঞানে অধীতব্য বিষয়সমূহ-মাত্রই অসিদ্ধান্ত, কুসিদ্ধান্ত, অপসিদ্ধান্ত ও ভ্রান্তসিদ্ধান্তপর—হৃদশাগ্রস্ত জগদ্বাসীকে এই শিক্ষা প্রদান করিবার জন্তই সম্প্রতি গোলোক হইতে “গৌড়ীয় সরস্বতীর” শুভাবির্ভাব হইয়াছিল।

গৌড়ীয় সরস্বতীর আবির্ভাব

পার্থিব জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বীণাপাণির আবির্ভাব মাঘী শুক্লা পঞ্চমী কিন্তু শাস্ত্রপাণি শ্রীগৌড়ীয় সরস্বতীর আবির্ভাব মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী—জ্যোতিষ-বিচারে এক পক্ষ কাল পরে উদয়। এই প্রকার বৈষম্যের বিদ্বৎ-প্রতীতি এই যে, মায়িক বিচার যথায় পরাস্ত, সেই স্থান হইতেই নিরন্তরকুহক পরম সত্য সিদ্ধান্তের আবির্ভাব। বীণাপাণি যাহা প্রদানে অসমর্থ, সেই অভাব পূরণ করিতেই তাঁহার ধরায় আগমন। মায়িক শিক্ষা ধ্বংস না হইলে অপ্রাকৃত সহজ সিদ্ধান্ত হৃদয়ে স্ফূর্তিলাভ করে না। তজ্জন্তই গৌড়ীয় সরস্বতীপাদ-কর্তৃক প্রায়শঃই উক্ত হইত, “পূর্বার্জিত সকল বিদ্যা সম্পূর্ণ Undo (পরিত্যাগ) করিতে না পারিলে লোকে আমার নিকট আসিতে পারে” না।

গৌড়ীয় সরস্বতী কালাতীত

সাধারণ মানব সমাজ বহু শিক্ষা লাভ করিলেও ‘কাল’ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা তাহাদের নাই। প্রাকৃত বিজ্ঞান কালের কোন স্পষ্ট সংজ্ঞা অত্যাপি নির্দ্ধারণে অসমর্থ। তাহাদের ‘কাল’-এ Aging আছে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ কালে এইরূপ কোন পরিবর্তন বা Aging না থাকায় উহা নিতা নবায়মান—ইহাই ব্যাসানুগ সিদ্ধান্ত-সার। গৌড়ীয় সরস্বতী এবিষয় ‘বৈকুণ্ঠ-কালের’ অতুলনীয় সমীক্ষক। এ জগৎ তাহার শিক্ষা জগতে জরা, বার্দ্ধক্য আনয়ন করে না।

“যে সমর্থ্য জগত্যস্মিন্ সৃষ্টি-সংহার-কারকঃ।

তেহপি কালেন লীয়ন্তে কালো হি বলবন্তরঃ ॥”

—বীণাপাণির অনুগৃহীত জনগণ এই প্রকার কালের উন্নতাবস্থা লাভ করিয়া থাকেন মাত্র। এই কালও অক্ষয় নহে, অসীম নহে। ভারতীয় জ্যোতিষ তাহার বিচার করিতে জানে, করিয়াছেও। দিগন্তব্যাপ্তি অসীমত্বের বা অক্ষরত্বের পরিচায়ক নহে। কালান্তর্গত দেবদেবীর উপাসনায় এতৎ অতিরিক্ত কোনও কোন লাভ সম্ভবপর নহে। গৌড়ীয় সরস্বতীপাদ কালান্তর্গত তাদৃশ কোন বস্তু নহেন।

প্রাকৃত বিজ্ঞান কালান্বীন

প্রাকৃত পদার্থ-বিজ্ঞানী, গণিতবিদগণের চর্চিত কাল কোনও নিত্য বস্তু নহে, উহা বীণাপাণিরই অধীনস্থ। গ্রহ-মক্ষত্রাদি গৌরচক্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই কালের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পার্থিব কালের কোন Absolute Measurement কালধর্মী বৈজ্ঞানিকগণ অত্যাপি নির্দিষ্ট করিতে পারেন নাই, পারিবেনও না; কারণ যদ্বারা কাল গণনা করা হইবে, তাহা স্বয়ংই একটি অনিত্য ও অস্থির বস্তু হওয়ায় তাহার সাহায্যে পরিমিত বস্তুতেও অস্থিরতা সচরাচর পরিলক্ষিত হইবেই—ইহা অনস্বীকার্য।

অপ্রাকৃত সুধীই কালের পরিমাপক

কাল মায়ায় চক্র। এই কালের দ্বারাই মায়া তাহার শাসনক্ষমতা বিস্তার করে; সুতরাং প্রাকৃত কাল পরিমেয়, অতিক্রমণীয়। ইহা অতিক্রম করিলেই মায়িক কুণ্ঠারহিত রাজ্যে অবস্থিতি সম্ভব—অপ্রাকৃত সুধীজন-মাত্রেই ইহা অবগত থাকিলেও জড়বিদ্যাশাস্রদের সীমিত মস্তিষ্ক অত্যাপি ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা এই কালকেই অনন্ত বলিয়া

থাকেন। যাহা হউক, জাগতিক বিজ্ঞানগুলির মধ্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রই এই কালের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিমাপক। অত্র প্রবন্ধে আলোচিত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, পৃথিবীর সৰ্বাপেক্ষা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান সর্বোন্নত অবস্থা তাঁহাতে লক্ষ্য করিয়া সমগ্র পৃথিবীর তৎকালীন পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে “সিদ্ধান্ত সরস্বতী” আখ্যায় বিভূষিত করিয়া স্ব-স্ব সঙ্কীর্ণ জ্ঞানের মস্তুক ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর পাদপদ্মে অবনত করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে জাগতিক বহু পণ্ডিত এই মহাপুরুষের সম্ভ্রষ্টবিধানে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত-গুণ সাহিত্য, মায়ায় গৌরববৃদ্ধিকারিণী অসজ্জড়-শিক্ষার সহিত চির বিবদমান এই মহাপুরুষ কিন্তু পূর্বপ্রকার চেষ্টার নিষ্ফলতা প্রতিপাদন করেন। প্রাকৃতবিজ্ঞা নিষ্ফলা হইলেই ঈশানুসন্ধানে বদ্ধজীবের প্রবৃত্তি জন্মে—এই শিক্ষাই আচরণ-মুখে “গোড়ীয় সরস্বতী”-পাদ সমগ্র জগতকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

গোড়ীয় সরস্বতীর তিরোভাব -লীলা

বিশ্বের সর্বোত্তম মঙ্গলসাধনোদ্দেশে অগ্রহায়ণী কৃষ্ণ-চতুর্থী তিথিতে দৃশ্য জগৎ হইতে “গোড়ীয় সরস্বতী”-পাদের শুভ অপ্রকট লীলাবিকার পারমার্থিক রাজ্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। “কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্নুখ” —অর্থাৎ কাল সৃষ্টির পূর্বেই জীবের বহির্নুখ দশা প্রাপ্তি হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের মঙ্গল চিন্তায় ভগবান্ যে কাল সৃষ্টি করেন তাহা গণনা আছে, —অগ্রহায়ণই সেই গণনার সর্বপ্রথম মাস (অগ্র = আগে, প্রথম; হায়ণ = বর্ষ); সুতরাং স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে “সিদ্ধান্ত-বাণীর” বিশ্বতিহী জীবের বহির্নুখতার কারণ। সেই জন্ম মায়িক কালের প্রারম্ভেই “গোড়ীয় সরস্বতী”-পাদের বিরহ মঙ্গল্য হরিকীর্তনের মাধ্যমে জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। যিনি বদ্ধ জীবের প্রতি কৃপাবারিবর্ষণে এতাদৃশ হরিকীর্তন-বিগ্রহ ধারণ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক করুণা আর কে কবে জগতে বর্ষণ করিয়াছেন?

সারস্বত-ধারা নিত্য্য

‘বাণী’ শব্দে বেদ, বেদ নিত্য্য। সুতরাং ‘বাণী’ ও নিত্য্য অর্থাৎ সারস্বত-ধারা নিত্য্য। কালপ্রভাবে এই ধারা লুক্কায়িত হইলেও ধ্বংস হইবার নহে। ভূমণ্ডলোপরি অপ্রাকৃত বাণী—ভক্তিসিদ্ধান্তের সম্প্রতি পুনরাবির্ভাব ইহার জাজ্জল্য প্রমাণ।

‘বাণীই’ মুক্কে বাচাল করিতে পারে, অজ্ঞান ব্যক্তিই মুকদশা প্রাপ্ত হয়।
মায়িক কলভাষণই ভেকের কোলাহল, তদ্বারাই অজ্ঞান-কালসর্প জীবের
অপ্রাকৃত জ্ঞানকে দংশন করিতে চেষ্টা করিলেও “গৌড়ীয় সরস্বতীই”
ওঁ বিষ্ণুপাদ-স্বরূপে তাহার রক্ষক ও পালক ।

শ্রীগৌড়ীয় সরস্বতী শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর অবতার

স্বধীসজ্জন-মাত্রেই “গৌড়ীয় সরস্বতী”—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমত্তত্ত্বসিদ্ধান্ত
সরস্বতী প্রভুপাদকে জীব গোস্বামিপাদের অবতার বলিয়া থাকেন । কথাটী
অমূলক বলিয়া মনে হয় না । “গৌড়ীয় সরস্বতী”র রূপা ব্যতীত যেকোন
কোন জ্ঞানলাভ হয় না, তদ্রূপ জীব গোস্বামিপাদের সিদ্ধান্ত-সলিলে বদ্ধ
জীবের কুতর্কানল নির্বাপিত না হইলে অরূপ, কুরূপ, বিরূপ পরিত্যাগ
পূর্বক শ্রীরূপ রাজ্যে প্রবেশাধিকার হয় না ।

শ্রীজগন্নাথদেবই গৌড়ীয় সরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা প্রচারক

মাত্র পঞ্চ/ষষ্ঠ মাস বয়ঃপ্রাপ্ত শ্রীল প্রভুপাদের নীলাচলে অবস্থিতি-কালে
স্বয়ং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথারোহণে গুণ্ডিচাবাড়ী বিজয় পথে স্বীয় একান্ত প্রেষ্ঠ-
জন-দর্শন-মানসে তাঁহার গৃহ সম্মুখে হঠাৎ স্থির হইয়া যান । বিশেষভাবে রথ-
রজ্জু আকর্ষণকারী লক্ষ লক্ষ লোক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এইরূপ আকস্মিক
স্থিরাবস্থা দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হন । ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ তখন উক্ত
শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পাদস্পর্শ করাইলে অনন্তর রথ চলিতে
আরম্ভ করেন । বাল্যকালেই এইরূপ অলৌকিক দৃষ্টান্তের দ্বারা স্বয়ং জগন্নাথ-
দেবই তাঁহার একান্ত প্রেষ্ঠ সেবকের মহিমা সমগ্র বিশ্বে বিঘোষিত করেন ।

গৌড়ীয় সরস্বতীর অলৌকিক শক্তির প্রকাশ

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর অননুমোদিত কোন বস্তুর অপ্রাকৃত গোড়ের “রূপ”
দর্শনে অধিকার ছিল না । স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্নহাপ্রভু অপ্রাকৃত গোড়ের
“রূপ”ই বিশ্বে প্রদর্শন করিয়াছেন । এইজন্য গৌড়ীয় সরস্বতী—শ্রীল প্রভুপাদের
প্রতিষ্ঠা ক্রিয়াতেই রূপানুগত্যই সর্বতোভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে । পারমার্থিক
সাম্রাজ্যের ঐতিহ্য-সংরক্ষণে, ভক্তির্থ্যপ্রচারকল্পে নবনব উপায় উদ্ভাবনে
এবং গোস্বামিবর্গের প্রতিষ্ঠা অক্ষরই কার্য্যে পরিণতকরণে তিনি যেকোন
চেষ্টা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন অত্যাধি সমগ্র ভারতবর্ষের কোন আচার্য্যের

মধ্যেই তাহা দৃষ্ট হয় না।

মধ্যযুগীয় আচার্য্যবর্গ সকলেই প্রচুর পরিমাণে দেশীয় অধিপতি ও শাসক-বৃন্দের সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন ভারতবর্ষও দেশীয় হিন্দু-রাজগণের অধীন ছিল; সুতরাং ভগবৎ শক্তিতে স্বল্প বিশ্বাসী, বেদ-বিরোধী পাশ্চাত্য জড়বাদী ও তদনুগতগণের দৌরাভ্যে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র শক্তিও নষ্ট করিতে হয় নাই। কলিরও তখন বাল্যাবস্থা। মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার বিপরীত ঝঞ্ঝা ব্যতীতও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ—শ্রীগৌড়ীয় সরস্বতী পাদের আবির্ভাবকাল—ভারতবর্ষের একটি বিশেষ সঙ্কটময় যুগ; সুতরাং সামাজিক রাজনৈতিক,—সর্বপ্রকার প্রতিকূল বাতের মধ্যে অপ্রাকৃত গোড়ের “রূপ” ভারতবর্ষ, প্রাচ্য অত্যাচর দেশ এবং লগুন প্রভৃতি সমগ্র পাশ্চাত্যদেশে বিপুল ভাবে প্রচার ও প্রসারিত করা শ্রীগৌড়ীয় সরস্বতী পাদের কিরূপ অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক, তাহা সহজেই বোধগম্য।

গৌড়ীয় সরস্বতীর বাণীসেবাই প্রকৃত মঙ্গল

হে গৌড়ীয় সরস্বতী শ্রীল প্রভুপাদ! আপনি সাক্ষাৎ ভক্তিবিনোদন-কারীরও নিত্য বৈভব। কৃষ্ণভক্তিই আপনার হৃদয়। নির্ভীকভাবে অপ্রাকৃত গৌরবাণী প্রচার আপনার স্বরূপ। আপনি প্রচুর কৃপা করুন আমরা যেন ভবদীয় শ্রীমুখনিঃসৃত “বাণী”র প্রকৃত “রূপ” উপলব্ধি করিতে পারি, “বপু”র চিন্তাকর্ষক রূপ যেন কখনও আমাদের হৃদয় মথিত না করে, অর্থাৎ বাণী ও বপুর পার্থক্য যেন প্রকৃত হৃদয়ঙ্গম হয়।

—শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী B. H (Cal)

বাসপূজা-বাসরে

শ্রীল আচার্য্যাদেবের বক্তৃতার চুম্বক

বৈষ্ণবগণের তিরোভাব ও বিশেষ মঙ্গল জনক

দেশের মঙ্গল হউক—এই বিবেচনা ক’রে বৈষ্ণবগণ অন্তর্হিত হন। আমরা শ্রীল প্রভুপাদের আরতি-কীর্তন প্রত্যহই করি। তাঁ’র অপ্রকটলীলা জগৎ ধ্বংসের নিমিত্ত নহে। তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া জগতে আগমন করেন, লীলা-সংগোপনকালে সেই উদ্দেশ্যই সাধন করেছেন। প্রকটকালে সমগ্র পৃথিবীতে তিনি ভক্তিধর্মের কথা প্রচার করেছেন, আবার অপ্রকট হইয়াও

শিষ্যবর্গের দ্বারা সেই ভক্তির কথাই প্রচার করছেন। সেটা আগে যেমন মঙ্গলজনক ছিল, এখনও সেইরূপ মঙ্গলজনক।

আবির্ভাব—উৎসব, সহজে বুঝতে পারা যায়। কিন্তু তিরোভাবে আবার উৎসবটা কি? ‘উৎসব’ শব্দের অর্থ আনন্দ; সুতরাং আবির্ভাব ও তিরোভাব—দুইটাই আনন্দ হয় কি প্রকারে? বৈষ্ণবগণের এই একটা অতি চমৎকার বিচার।

যদ্বারা সমস্ত দুঃখ বিদূরিত হয় তাহাই আনন্দ। মৃত্যু-ঘটনার দ্বারা আমরা বিমোহিত হ’য়ে মায়ায় মধ্যে আচ্ছন্ন হই। বৈষ্ণব-মহাজনগণ কিন্তু অন্তর্হিত হ’লে যে দুঃখ তাতে মায়া আক্রমণ করতে পারে না। তা হ’লেই আনন্দ। মায়ায় ষোল আনাই নিধানন্দ।

পাষাণগণই সংসারের পরিশ্রমোপক

গ্রায় শাস্ত্রে “মৃগ-তৃষ্ণিকা” নামে একটা গ্রন্থ প্রচলিত আছে। প্রকাণ্ড মরুভূমি ধু ধু করছে, কোথাও একটা বৃক্ষলতা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তখন মনে হয় ঐ নিকটেই বুঝি জল; সুতরাং জল পাবার আশায় মানুষ, পশু সেই স্থানে ছুটে যায়; কিন্তু দেখে জল নেই—জল আবার নিকটেই দেখা যাচ্ছে। আবার তা’রা দূরে ছুটে থাকে। কয়েকবার এইরূপ করার পর দৌড়ে হাঁপিয়ে মৃত্যুলাভ করে। মায়াও সেইরূপ আমাদের একটা সুখের ছায়া দেখিয়ে দেয়। যে সংসার করে না সেটা মূর্খ—এরূপ কথা পাষাণরা বলে। তা’রাই মায়ায় প্রচার কর্তা, আর কেহ নয়। মায়া তাদের বলে দিয়েছে, ‘তোমরা প্রচার কর—সংসারের মত এমন সুখের আগার আর কোথাও নাই, সকলেই সংসার কর। প্রকৃত পক্ষে সংসারই মায়ায় প্রধান আড্ডা।

আমরা পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করি, কিন্তু একটাও উদাহরণ কখনও খুঁজে পাই না—যেখানে গৃহীরা সুখে আছে। কাজেই মৃগতৃষ্ণিকার গ্রন্থ মায়ায় মধ্যে যতই ছুটে যাব ততই কষ্ট পাব, মৃত্যু ততই সন্নিকট।

বিবাহকরণই মায়ায় ফাঁদ

নূতন বিবাহ হ’য়েছে—স্ত্রী রয়েছে, বেশ রান্নাবান্না করে দেয়, কত না আরাম! তুলসীদাস বলেন, “দীনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী, পলক পলক লহ চুষে। ছুনিয়া সব বাউরা হো কর বাঘিনী ঘর ঘর পুষে”। যারা কামুক পুরুষ তা’রাই স্ত্রীর সন্ধানে ছুটে। নারীরা দিনের বেলা মোহিনী-মূর্তিতে

পুরুষ মন হরণ করে অত্ন মেয়েদের মন ত হরণ করেই ; রাতকা বাঘিনী—
অর্থাৎ রাতে খেয়ে ফেলবে, কি ভীষণ গ্রাস!

ঘরে আমরাও থাকি ; কিন্তু এখানে দীনকা মোহিনী নেই। যেখানে
এই ‘দীনকা মোহিনী’ সেখানে দণ্ডবৎ কর,—বাবা ওখানে যাব না।

মহাপুরুষগণের চিন্তা জগতের চিন্তার বিপরীত

মহাপুরুষদের কাছে গেলে, তাঁদের কথাগুলি একপ্রকার Revolting
বলে মনে হয়। এই যে মহাপুরুষগণ, তাঁরা চিরকালই জীবের মঙ্গল চিন্তা
করে থাকেন। তাঁরা যে দেহরক্ষা ও দেহধারণ করেন—সবটাই জগতের
মঙ্গল। যাঁরা মনে করে, সরস্বতী ঠাকুরের অপ্রকটের পর তাঁর শিষ্যরা
ঝগড়া করেই গেল,—তাঁরা নিজেরাই ঝগড়াটে। তাঁরা বুঝতে পারে না
যে, বিরহটা স্মৃথ।

লীলা-স্মরণ সর্বত্রই হ’তে পারে

একবার শ্রীল প্রভুপাদের কোন একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী আমাকে
বলেছিলেন, “প্রভুপাদের সমাধি-ক্ষেত্রে আবির্ভাব উৎসব কেন? আপনি
ইহার প্রতিবাদ করুন”। এ কথা ঠিক নয়। লীলা-স্মরণ যে কোন স্থানেই
হ’তে পারে। তিনি মৃত নহেন,—অপ্রকট, এরূপ ব’লে থাকি।

গুরুপূজাই ব্যাসপূজা

গুরুপূজা-তিথিকে-‘ব্যাসপূজা তিথি’ বলা হয়, কারণ অদ্বয়ভাবে এই
গুরুপূজা-বাসরে ব্যাসদেবেরই আবির্ভাব। শ্রীবাস অঙ্গনে নিত্যানন্দ প্রভু
ব্যাসপূজা করেছিলেন। শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলেছিলেন,—

“বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর”।

শ্রীবাস পণ্ডিত তহুস্তরে বলেছিলেন,—

“তোমার প্রসাদে সর্ব—ঘরেই আমার ॥

বস্ত্র, মুদগ, বজ্র, সূত্র, ঘৃত, গুয়া, পান।

বিধিযোগ্য যত সজ্জ সর্ব বিদ্যমান ॥

পদ্ধতি-পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।

কালি মহাভাগ্য, ব্যাসপূজন দেখিব ॥

(১৮: ভা: মধ্য ৫ম অ: ১২-১৫)

সুতরাং শ্রীমন্নহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং এই ব্যাসপূজা করেন। নিত্যা-

নন্দ প্রভু ব্যাসপূজার মাল্য মহাপ্রভুর গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, “আপনি ধর্ম প্রচারক। বেদব্যাস যেমন সমগ্র পৃথিবীতে ধর্ম প্রচার করেন, আপনিও সেই প্রকার করছেন। ব্যাসদেব আপনারই অংশ, আপনাতেই ব্যাসের পূর্ণ অবস্থিতি লক্ষ্য করছি, অতএব মাল্য আপনারই প্রাপ্য।”

ব্যাসপূজা অতি প্রাচীন

এই ব্যাসপূজা নূতন নয়। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে বহুকাল থেকে এই ব্যাস-পূজা চলে আসছে। বঙ্গদেশে ব্যাসপূজা প্রবলভাবে না থাকায় পদ্ধতিগ্রন্থ-খানি সর্বত্র সহজলভ্য ছিল না। শ্রীবাস পণ্ডিতও এই পদ্ধতিগ্রন্থ অত্যন্ত মাগিয়া লইয়া ব্যাসপূজা করেছিলেন। এই মহাপুরুষ (শ্রীল প্রভুপাদ) গৌড়ীয় সমাজে তথা সমগ্র বঙ্গদেশে ৪০০ শত বর্ষ পরে ব্যাসপূজার পুনঃ প্রবর্তন করেন। তিনি সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করে ব্যাসপূজা-পদ্ধতি সংগ্রহ করেন। দুই স্থান থেকে এই পুঁথি পাওয়া যায়— (১) পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠে (২) পুষ্কর তীর্থের এক মঠে। এই শেষোক্ত মঠে আমি নিজে গিয়ে ঐ পুস্তক দেখেছি। শ্রীল ভক্তবিনোদ ঠাকুর ঐ গ্রন্থ সাত্তত মতানুসারে সংশোধিত করেন।

এই ব্যাসপূজা সহক্ষে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্য ভাগবতের গৌড়ীয় ভাষ্য * আপনারা প্রত্যেকেই আলোচনা করবেন। তথায় শ্রীল প্রভুপাদ যা’ বলেছেন তা’র কিঞ্চিৎ আমি উল্লেখ করছি,— “জড়-ভোগ নিবৃত্ত হইলেই জীব পরিত্রাজক হইয়া আচার্য্যের চরণ আশ্রয় করেন। সেই আচার্য্য-চরণাশ্রয়েই ভাষান্তরে ‘ব্যাসপূজা’ কহে। আচার্য্যবর্তে শ্রীব্যাসদেবের অনুগত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদানুগ-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব স্ব জন্মদিনে পূর্ব গুরুর পূজা বিধান করেন।শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর ‘শ্রীগুরু পাদপদ্মে পাঁত্কার্পণ’ বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট যে স্তুতি ভগবৎসেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়।

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈকৈব নরোত্তমম্।

দেবী সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

—শ্লোকটী থেকে ব্যাসপূজা চরমে, ইহাই জানিতে পারা যায়। ব্যাসের শিক্ষায় শিক্ষিত হ’য়ে লোকে কথা বলতে শিখেছে, অথচ সেই বেদব্যাসের

* ‘শ্রীচৈতন্য ভাগবত’ মধ্যখণ্ড, ৫ম অধ্যায়ের ৮ম পয়ারের শ্রীল প্রভুপাদ লিখিত ‘গৌড়ীয় ভাষ্য’।

পূজা কেউ করছে না। আমরা এখানে ব্যাসপূজা আবার করব। সমগ্র নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীকে আহ্বান করব। তা'রা দেখে যাক, ব্যাসপূজা কাকে বলে? সরস্বতী পূজা আগে করে তাঁর কাছ থেকে কৃপা চাইতে হবে—ব্যাস শিখা দাও। “যা'র জন্ম রামের মা, তা'কে তুমি চিনলে না!”

পাশ্চাত্যগণ ব্যাস বিরোধী

পাশ্চাত্যদেশের শয়তান চরিত্রহীন পণ্ডিতগণ। বেদব্যাস সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে থাকে,—“বেদব্যাসকে উড়িয়ে দাও, কারণ তাঁর মত এত বড় পণ্ডিত থাকলে আমরা মরে যাব, অতএব তাঁকে অস্বীকার কর।”

ব্যাস-বিস্মৃতিই ভারতবর্ষের উৎসন্নতার কারণ

স্মার্তরা, যা'রা, বেদব্যাস ছাড়া চলে না, চলতে পারে না, তা'রাও এই দূষিত আবহাওয়ায় পড়ে অসুবিধা হ'লে বলে,—এটা বেদব্যাসের লেখা নয়, এটা প্রক্ষিপ্ত ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, ভারতে এত বড় বড় University হ'য়েছে, কিন্তু কোথাও বেদব্যাসের প্রতিমূর্তির পূজা হয় না। ফলে দেশটা উৎসন্ন যাচ্ছে।

শঙ্কর সম্প্রদায়ের ব্যাসপূজা-পদ্ধতি

ব্যাসপূজায় বিবিধ পূজাশঙ্ককের বিধি আছে। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে ঐ পূজা শঙ্ককের মধ্যে ‘কৃষ্ণ পঞ্চক’ পূজার বেদীর মধ্যস্থলে পূজিত হন। শঙ্করাচার্য্যও ‘ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দম্’ বলেছেন। ঐ সম্প্রদায়ে চরমে ব্যাসের কথাই আছে।

আচার্য্য শঙ্কর কেবল মহাভারতের গীতা, সনকসুজাতীয়, ও ১০ খানা উপনিষদ্ মেনেছেন। তিনি পুরাণ মানেননি, যেহেতু পুরাণগুলি তাঁর মতের বিরুদ্ধ। শঙ্করাচার্য্যের চারজন প্রধান শিষ্য ছিল—আনন্দগিরি, পদ্মপাদ, হস্তামলক ও মণ্ডনমিশ্র। শঙ্করাচার্য্য কাশীতে বেদান্ত আলোচনা ক'রতেন। একদিন ঐরূপ আলোচনা সভায় পদ্মপাদ প্রভৃতি অগ্রাগ্র কৃতদিগ্য আচার্য্যগণ উপস্থিত হ'য়েছেন, কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর দার্শনিক আলোচনা না করে চুপ করে বসে আছেন। শঙ্করের ঐরূপ অবস্থা দর্শন করে আলোচনা সভার প্রধানরূপে পদ্মপাদ তাঁর গুরুদেব শঙ্করাচার্য্যকে সম্বোধন করে বল্লেন, “প্রভো আলোচনা আরম্ভ করুন। আমরা সকলেই উপস্থিত আছি।” শঙ্করাচার্য্য তদুত্তরে বলেছিলেন, “আনন্দগিরি এখনও আসে নাই। তাহার আমার জন্ম অপেক্ষা করিতেছি।” এই কথা শ্রবণে পদ্মপাদ শঙ্করাচার্য্যকে বলেছিলেন, “সে ত মূর্খলোক, আপনার বেদান্তের কঠিন উচ্চ বিচার সে কিছুই বুঝিতে

পারিবে না। তাহার জ্ঞান অপেক্ষা করিতেছেন কেন? আপনি বিচার আরম্ভ করুন।” এর কিছুক্ষণ পরে আনন্দগিরি সভাস্থলে এসে তাঁ’র গুরুদেব শঙ্করাচার্য্যকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করে সংস্কৃত শ্লোকে তাঁ’র স্তব করতে থাকেন। এই স্তবের ভাব, ভাষা, বিচার এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিল যে, পদ্যপাদের ত্রায় বহু পণ্ডিত ব্যক্তিরও তাঁ’র অর্থ বুঝা বেশ কষ্টের হ’য়েছিল। ইহা দেখে তাঁ’রা সকলেই চমৎকৃত হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে থাকেন, “আনন্দগিরি আচার্য্যের অঙ্গ-সেবাদি ও কৌপীন বহির্কাসাদি বিধোত করেন এবং রসুই-এ বামুন-স্বরূপে খাত্তদ্রব্যাদি প্রস্তুত করেন মাত্র। তাহার পক্ষে এইরূপ শ্লোক রচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ আচার্য্যদেবের স্তব করা অসম্ভব ব্যাপার।”

“গুরুর সেবক হয় মাথু আপনার”—এই বিচার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পদ্যপাদাদি আনন্দগিরির প্রতি যেক্রপ ব্যবহার প্রদর্শন করেছিলেন, তাহাতে আচার্য্য শঙ্কর নিজ প্রিয় সেবকের অবমাননা সহ করতে না পেরে যোগবলে তাহাতে সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত করে তাহার স্তবের দ্বারা সমস্ত শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সেই আনন্দগিরির গীতার টীকা, বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যের টীকা আছে। খুব শক্ত সংস্কৃত, সেরূপ Literature আজকাল প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না,—পাঠক নেই। আনন্দগিরির ‘শঙ্কর-জয়’ শঙ্কর-জীবনীর প্রামাণিক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে আনন্দগিরি বলেন,—

“শঙ্করঃ শঙ্করো সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণতুখা।

দ্বয়োর্মধ্যে ভেদে দৃষ্টে কিস্করঃ কিং করিষ্যতি ॥”

—আনন্দগিরির পক্ষে এটা বলা বা সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, কারণ তিনি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য। এই শ্লোকের দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে শঙ্কর মত ও বেদব্যাসের মত পৃথক। এ বিষয়ে শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। শঙ্করাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য আনন্দগিরি সেই বিষয় আমাদের পরিস্ফুট করে দিয়েছেন। একদিকে বেদব্যাস—নারায়ণ, অত্ৰ্যদিকে শঙ্করাচার্য্য—স্বয়ং শিব। আমরা কা’র কথা মানিব। এ ক্ষেত্রে আনন্দগিরির প্রশ্নের উদয় হ’য়েছিল, কিন্তু সাধারণের তা হ’বে না; কারণ শিব অপেক্ষা নারায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। আনন্দগিরি স্বীয় গুরুর বিরুদ্ধে কিরূপে যাবেন? তজ্জ্ঞাত সংশয়াপন্ন হ’য়ে বিনাশপ্রাপ্ত হ’তে চলেছেন। তবে এটা ক্রব সত্য, শঙ্করাচার্য্য বেদব্যাসের বিচার অবলম্বন না করে, ‘জগন্নিথ্যাত্ম’-রূপ নূতন

অদ্বৈতমতের স্থাপন ক'রেছেন। ইহা বেদব্যাসের কখনও মত নহে। কবিরাজ গোস্বামী শঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন,—

“ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ।

ব্যাস ভ্রান্ত বলি তা'য় উঠাইল বিবাদ।”

আমরা ব্যাসপূজা দিবসে এই সমস্ত গুপ্ত কথা প্রকাশ্যভাবে যদি জগৎকে না জানাই, তা' হলে জগতের মঙ্গল কি প্রকারে হবে? জীব গোস্বামিপাদও 'ষট্‌সন্দর্ভে' এই শঙ্করমতের খণ্ডন ক'রেছেন। তজ্জগুই আমরা বলি, আবির্ভাব ও তিরোভাব একই। গুরুপূজা দিনেই জগৎকে বৈয়াসকি-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করবার জগুই ব্যাসপূজা খুব বিরাটভাবে করা কর্তব্য সহজিয়া সম্প্রদায়ের বাবাজীদের মত মালাবদল ক'রে যুগল-ভজনের ব্যাসপূজা করলে চলবে না।

প্রকৃত পাণ্ডিত্যের নিকট শঙ্কর-গ্রন্থ আদরণীয় নহে

প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সমাজ থেকে শঙ্কর-গ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-তুলে দিয়েছেন। যা'রা মূর্খ, পাণ্ডিত্য-অভিমানী তা'রাই শঙ্কর-গ্রন্থ পড়ে। আমি যে কোন শঙ্কর, স্মার্ত্ত পণ্ডিতকে তা' বুঝিয়ে দিতে পারি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—“মায়াবাদীর ভাষা শুনিলে হয় সর্বনাশ”।

মধ্ব-সম্প্রদায়ে-ব্যাসপূজা বৈশিষ্ট্য

শ্রীমদ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ে ব্যাসদেবের বামে লক্ষ্মী রেখে ব্যাসপূজা করা হয়। ব্যাসদেব যেহেতু সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাঁ'র পার্শ্বে তাঁ'র অঙ্কলক্ষ্মী ত থাকবেনই। এই হ'ল শ্রীমদ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ে ব্যাসপূজার বিধি।

শঙ্করাচার্য্যের মতেই নবদ্বীপ ব্যাস-বিরোধী স্থান

নবদ্বীপ মূর্খের স্থান। এরা প্রায় সকলেই ব্যাস-বিরোধী। এটা আমাদের বৈষ্ণবদের কথা নয়। শঙ্করাচার্য্যই তাঁ'র বেদান্তভাষ্যের প্রথম অধ্যায়েই এ কথা উল্লেখ ক'রেছেন। ত্রায়, বৈশেষিক, সাংখ্য এবং পাতঞ্জল—এই সব নবদ্বীপের পাণ্ডিত্যের প্রভা বিস্তার করে। এগুলি সমস্তই বেদ-বিরোধী—ব্যাস মানে না। সুতরাং এগুলির দ্বারা ব্যাস-মহিমা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। এখানকার স্মার্ত্ত পণ্ডিতগুলো পয়সা নেবার বেলা মুখে বলে, আমি ভগবানের দাস। কাজের বেলায় কিন্তু অতরূপ—খাঁটি অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদ নিরীশ্বর চিন্তায় পরিপূর্ণ।

গুরুদেব ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ

গুরুদেব ভগবানের Manifestive Aspect—প্রকাশ-বিগ্রহ। সেইজন্য গুরুদেবের জন্মতিথি লক্ষ্য করে আমরা ব্যাসপূজা করে থাকি। স্মার্ত-পঞ্জিকাকার মধ্যে কেহ কেহ আজ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের আবির্ভাব ও ব্যাসপূজা লিখছেন। অত ব্যাসপূজা দিবসে আমরা সকলেই শ্রীল ব্যাসদেবের নিকট, জগদগুরু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট তাঁর আবির্ভাব দিবসে ব্যাসপূজার অঞ্জলিস্বরূপ একটা প্রার্থনা জ্ঞাপন করছি যে, ব্যাস-বিরোধী নাস্তিক্যবাদ বা অঈশ্বরবাদ আমাদের দেশ থেকে বিদূরিত হউক। এই প্রার্থনাজ্ঞাপি প্রদান করে আমি অগ্নি আমার বক্তব্য সমাপন করলাম।

—প্রকাশকের সংগৃহীত

শ্রী শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

পূর্বে পূর্বে বৎসরের জায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি গত মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া হইতে কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি পর্যন্ত দিবসত্রয় (২৫শে মাঘ মঙ্গলবার হইতে ২৭শে মাঘ বৃহস্পতিবার ইং ৮২৬৬ হইতে ১০২৬৬), বিশেষ আড়ম্বরের সহিত শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া অকৃত্রিম সত্যস্থাপক শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি অশ্বদীপ্য গুরুপাদপদ্ম পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমন্তপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের এবং কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিখিল ভুবন পবিত্রকারিণী শুভ আবির্ভাব-তিথি। গুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব তিথিতে ব্যাসপূজা করিবার বিধি শাস্ত্রে প্রদান করিয়াছেন, কারণ সৎগুরুদেব সাক্ষাৎ বেদব্যাসের অবতার, ব্যাসবাণী কৌতূহল করাই তাঁহার একমাত্র ধর্ম।

বেদব্যাস সমগ্র পৃথিবীর সভ্যতার প্রতীক। ভারতবর্ষই সেই সভ্যতার প্রাচীনতম পৌরানিক দেশ। যখন নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, পরমাণুবাদ, প্রকৃতিবাদ, কর্মবাদ প্রভৃতি বিবিধ সৃষ্টি-সংহারী মতবাদসকল পৃথিবীকে প্রবলভাবে গ্রাস করিয়া কলির হস্তে তাহাকে সমর্পণোত্তম হইয়াছিল, ঠিক সেই দারুণ সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে সাক্ষাৎ নারায়ণ বেদব্যাসরূপে ধরায় আবিভূত হইয়া নিখিল জীবের অশীম কল্যাণ বিধান করেন। বেদব্যাসেরবাণীচ্যুত জনগণ অতি শীঘ্রই তাহাদের নগ্ন সামাজিকতার পরিচয় দিয়াছে, আরও দিবেও। কলি তাহাদের নিপীড়িত করিতে কখনই কুণ্ঠাবোধ করে নাই। আহার-বিহার-নিদ্রা

শিক্ষা প্রভৃতি মানবজীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই ব্যাসদেব যে বিজ্ঞান প্রদর্শন করিয়াছেন, অত্യാপি সমগ্র পৃথিবী সেই বিজ্ঞান বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হয় নাই। সেই বেদব্যাসের পূজা-প্রচারে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অকৃত্রিম প্রচেষ্টা অশিক্ষিত জনগণকে বিশেষভাবে সাড়া দিয়াছে। তাহারই ফল-স্বরূপ এই বৎসর সমিতির নিকট বহুস্থান হইতে ব্যাসপূজা-শিক্ষা প্রদান করিবার আহ্বান আসে।

সমিতির মূলকেন্দ্র **শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে** অশ্বদীয় শ্রীশ্রীল গুরু-পাদপদ্ম স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারই সাক্ষাৎ প্রেরণায় এতদুৎসব একটা বিচিত্ররূপ পরিগ্রহ করে। উষাকাল হইতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীল প্রভুপাদ ও বেদব্যাসের মহিমাধীর্ভনে সমস্ত মঠ মুখর হইয়া উঠে। উল্লিখিত দিবসদ্বয় মধ্যাহ্নে শ্রীল গুরুদেব ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হইলে বহু শত ব্যক্তি ব্যাসপূজার বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া জীবন সার্থক করেন। পূর্বোন্নিখিত দিবসদ্বয় অপরাহ্নে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ও শ্রীল প্রভুপাদের সম্বন্ধে ভক্তগোষ্ঠী-প্রেরিত বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরাজী, আসামী প্রভৃতি ভাষায় বিবিধ পুষ্পাঞ্জলি পাঠ হয়। ২৫ ও ২৭শে মাঘ সন্ধ্যায় শ্রীহরিকীর্তন নাট্যমন্দিরে বিবজ্জনসমাবৃত এক মহতী সভায় পরমারাধ্যাতম শ্রীল আচার্য্যদেব বেদব্যাসের সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ ও সমিতির অত্যাশ্চর্য শাখামঠ সমূহেও তত্তৎ মঠাধ্যক্ষবৃন্দের চেষ্টায় এই উৎসব যথারীতি পালিত হইয়াছে।

মেদিনীপুর জিলায় **চক্কাড়ুপোতা গ্রামে** শ্রীগৌরহরি দাসাধিকারী ও তদীয় ভ্রাতা শ্রীহরিমোহন ব্রহ্মচারী মহোদয়ের প্রচেষ্টায় সমিতি কর্তৃক ব্যাস-পূজা করিবার আহ্বান আসে। তদনুযায়ী শ্রীপত্রিকার সম্পাদক পরম পূজ্যপাদ ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্রিবাদান্ত বামন মহারাজ মঠবাসী কয়েকজন ব্রহ্মচারীসহ উক্ত গ্রামে শুভ-বিজয়পূর্বক বিরাটভাবে ব্যাসপূজা করেন। ব্যাস-বিরোধী স্মার্তসমাজ কখনও এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার মৌভাগ্য লাভ করে নাই। সুতরাং পূজামণ্ডপে বহু সহস্র দর্শকের আগমন হয়। আগন্তুক সকলকে ব্যাসপূজার প্রসাদ প্রদান করিবার এবং সহস্রাধিক ব্যক্তিকে আকর্ষণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করিবার আয়োজন করিয়া সগণ শ্রীগৌরহরি দাসাধিকারী ও শ্রীহরিমোহন ব্রহ্মচারী মহোদয় সমিতির বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

এই অপূর্ণ পূজা-দর্শকমাত্রেই বলিতে থাকেন, শাস্ত্রে এত বড় ব্যাপার থাকিতে আমাদের পুরোহিতগণ বা সরকার বাহাদুর ত তাহার একবিদ্যুৎ সন্ধান রাখেন না, ইহাই ঘোরকলি !! ব্যাসপূজা উপলক্ষ্যে উক্ত গ্রামে দুই দিবস ধর্মসভা আয়োজিত হয়। উক্ত দুই দিবসই পরম পূজ্যপদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মঠবাসী অত্যন্ত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের বক্তৃতাতে দুই দিবসই উক্ত সভাপতি মহোদয় বিপুল জন-সমাবেশের সম্মুখে তেজস্বীকণ্ঠে “পৃথিবীর সভ্যতায় বেদব্যাসের স্থান” সম্বন্ধে অদ্ভুত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদানে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিম্বিত করেন। তাঁহার এই হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা বহু লোককে ভক্তিপথে ব্যাস-বাণীতে আকর্ষণ করিয়াছে। এতদঞ্চলে সমিতির এই ব্যাসপূজা একটি নব জাগরণ আনয়ন করিয়াছে।

২৪ পরগণায় গদামথুরা এম খণ্ডে রামনগর আবাদ গ্রামে শ্রীযুক্ত নারায়ণী দেবীর আস্থানে সমিতি কর্তৃক তৎস্থানেও বিরাটভাবে ব্যাসপূজা সম্পন্ন হয়। সমাগত বহু শতদর্শক ব্যাসপূজার স্বার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। দর্শকগণকে শ্রীযুক্তা নারায়ণী দেবী আকর্ষণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া সমিতির ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। মঠবাসী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ তথায় শ্রীগুরুদেব ও শ্রীব্যাসদেব সম্বন্ধে চমৎকার স্মৃতিপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বেদব্যাসের শিক্ষা প্রসারে ঐহাদের হৃদয় ক্রন্দন করে সমাজ তাহাদের প্রকৃত মূল্য কখনও দিতে পারিবে না। পৃথিবীর সর্বত্রই ব্যাসপূজার ধ্বনি উঠুক—সমিতির ইহাই একমাত্র কামনা। ঐহারা ব্যাসপূজায় আগ্রহী হইবার নিশ্চয় তাহাদের পরম মঙ্গল বিধান করিবেন।

মেদিনীপুর জিলায় খামটী গ্রামে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ জানা মহাশয়ের বাটীতেও সমিতির গৃহস্থ-ভক্ত ও অনূগত জনগণ শ্রীব্যাসপূজা করেন। আরও বহুস্থানে সমিতি প্রদর্শিত পন্থায় শ্রীব্যাসপূজা সম্পন্ন হইয়াছে। স্থানাভাবে সমস্ত সংবাদ প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। —নিজস্ব সংবাদদাতা

পরলোকে শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস স্বামী শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের
কৃপাভিষিক্ত শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ ৯৫ বৎসর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ-
নাম স্মরণ করিতে করিতে বিগত মাঘী শুক্লা প্রতিপদ শ্রবণা নক্ষত্রে শনিবার
(২২শে জানুয়ারী ১৯৬৬) মধ্যাহ্নে তদীয় প্রতিষ্ঠিত গঞ্জুস্থ 'শ্রীসারস্বত আশ্রমে'
ইহলীলা সংবরণ করেন।



তিনি গার্হস্থ্য-আশ্রমে থাকাকালে সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া
নিত্য-মঙ্গলের জন্ম সদগুরুর অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সেই সময় ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের চিত্রপট তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়।
সেই আলেখ্য দর্শনে ইনি বিশেষ আনন্দ লাভ করেন, এবং মনে মনে
শ্রীল প্রভুপাদকে একমাত্র উপযুক্ত গুরু মনে করিয়া তাঁহার দর্শন লাভের
জন্ম উৎকণ্ঠিত হইয়া সংসার পরিত্যাগপূর্বক ১৯৩৩ সালে শ্রীধাম মায়াপুরে

উপস্থিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ ইঁহার ভক্তিপথে সাতিশয় আগ্রহ দেখিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা প্রদানপূর্বক শ্রীউজ্জলরসানন্দদাস নামে পরিচিত করেন। ইহা তাঁহার বাণপ্রস্থ-অবস্থা।

পূজনীয় মহারাজের পূর্বনাম ছিল শ্রীউজ্জলেশ্বর পটুঘোষী। ইনি উড়িষ্যার বড়গড় মহারাজের পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে পটুঘোষী উপাধিতে ভূষিত করেন।

শ্রীউজ্জলরসানন্দদাসের ভজনে বিশেষ উৎসাহ দেখিয়া শ্রীশ্রীগৌড়েন্দ্রের আবির্ভাব তিথিতে, ৪৪৮ গৌরাদ, ইং ১৯৩৪, ১লা মার্চ শুক্রবার শ্রীমন্মহা প্রভুর প্রকটভূমি শ্রীযোগপীঠে শ্রীল প্রভুপাদ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁহাকে ত্রিদিগ-সন্ন্যাস প্রদান করেন। তদবধি তিনি ত্রিদিগ্ভিষামী শ্রীভক্তিগৌরবৈখানস মহারাজ নামে পরিচিত হন। অতঃপর পরিব্রাজক বেশে ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ পূর্বক শ্রীগুরুগোরাঙ্গের বাণী প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন।

শেষ বয়সে তিনি স্বীয় শিষ্যদের অনুরোধে উড়িষ্যায় ব্রহ্মপুরের নিকট গঞ্জুগ্রামে ‘শ্রীসারস্বত আশ্রম’ স্থাপন ও শ্রীগৌরগোবিন্দ-সেবা প্রকট করিয়া তথায় ভজন করিতেন। ইং ১৯৬৬ সালের ২২শে জানুয়ারী শনিবার মধ্যাহ্ন এক ঘটিকায় গুরুরূপা সখী শ্রীবার্ঘভানবীদেবী-দয়িতের ইঙ্গিতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মাধ্যাহ্নিক লীলায় প্রবেশ করেন। —নিজস্ব সংবাদ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্তিত দ্বারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সারস্বত
শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি ষা বর্তীয় দিন ‘শ্রীহরিভক্তি-বিলাস’-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য।

সম্পূর্ণ গ্রন্থের মূল্য — ১.২৫ টাকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রী শ্রী ভরসোপাঙ্গো ভরস:

বৈদ্যপট

১৮ নং } টেনশাখ, ১৩৭৩ { ৩য় সংখ্যা



সম্পাদক—ত্রিদিগ্‌স্বামী শ্রীশ্রীনন্দ ভক্তিবাদ্য বানন মহারাজ
কাখালয় শ্রীদেবানন্দ গোড়ীর মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (নদীয়া)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরাধোক্ষজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়স্যঃ স্প্রসজীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম । অল্প ধর্ম সূত্ররূপে পালে বেই জন ।
 অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥ হরি-কথায় বাকি নৈলে পণ্ড মেরে শ্রম ॥

১৮শ বর্ষ } শ্রীরোদশাষী, ১০ ত্রিবিজয়, ৪৮০ গৌরাদ { ৩য় সংখ্যা
 শনিবার, ৩০ বৈশাখ, ১৩৭৩; ইং ১৪।৫।১৯৬৬

শ্রী শ্রী নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ]

প্রমাণখণ্ডঃ

চতুর্থোহধ্যায়ঃ

দিবি ছন্দুভয়ো নেহঃ বভূবুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ।

জগদ্বর্মুনয়ো বেদান্ হান্দোগ্যাদিম্বরূপকান্ ॥৫১॥

তখন স্বর্গে ছন্দুভি নিনাদ এবং তথা পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল । মুনিগণও
 ছান্দোগ্যাদি বেদগান করিয়াছিলেন ॥৫২॥

শ্রুতিমূলগতে নাম্নি দীর্ঘবাহুর্মহাপ্রভুঃ ।

হরে কৃষ্ণেতি সংক্ৰোশ্য চচাল জাহ্নবী তটে ॥৫৩॥

অতঃপর কণমূলে নাম উচ্চারণ করিলে পর দীর্ঘবাহু মহাপ্রভু ভাবদশা হইতে
 উত্থিত হইয়া 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' ধ্বনি করত গঙ্গাতটে গমন করিয়াছিলেন ॥৫৩॥

ভাগীরথীং সমুত্তীৰ্ঘ্য সপার্বদঃ শচীশ্রুতঃ ।

নাম সঙ্কীৰ্ত্তনে রেমে রুদ্রদ্বীপে সমন্ততঃ ॥৫৪॥

তাহার পর শ্রীশচীনন্দন পার্বদগণসহ ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া নামসঙ্কীৰ্ত্তন সহকারে রুদ্রদ্বীপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥৫৪॥

বিল্বপক্ষ ততো গত্বা বিপ্রান্ কৃষ্ণপরাযণান্ ।

প্রেম্না সংপ্লাবয়ামাস কাঞ্চীপুরং জগৎপতিঃ ॥৫৫॥

সেখান হইতে জগৎপতি শ্রীগৌরসুন্দর বিল্বপক্ষ নামক স্থানে গমন করত কৃষ্ণপরাযণ বিপ্রগণকে ও কাঞ্চীপুরকে কৃষ্ণ-প্রেমে প্লাবিত করিয়াছিলেন ॥৫৫॥

ততো গত্বা ভরদ্বাজস্থানং সঙ্কীৰ্ত্তয়ন্ হরিম্ ।

ততো মায়াপুরাবাসং প্রবিবেশ স্বয়ং হরিঃ ॥৫৬॥

তথা হইতে ভরদ্বাজের আশ্রমে গমনপূর্বক কীৰ্ত্তন করত মায়াপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥৫৬॥

শৃণ্বন্তি পরয়া ভক্ত্যা যে গৌরকীৰ্ত্তনক্রমম্ ।

ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ শিবে সংসারসাগরে ॥৫৭॥

অগ্নি দুর্গে, যাহারা পরমভক্তি সহকারে শ্রীগৌরাসুন্দর কীৰ্ত্তনের ক্রম শ্রবণ করেন, তাঁহাদের আর সংসার-সমুদ্রে পতিত হইতে হয় না ॥৫৭॥

নবদ্বীপসমং স্থানং শ্রীগৌরান্ধসমঃ প্রভুঃ ।

কৃষ্ণপ্রেমসমা প্রাপ্তির্নাস্তি দুর্গে কদাচন ॥৫৮॥

অগ্নি দুর্গে, নবদ্বীপ তুল্য স্থান, শ্রীগৌরাসুন্দর তায় প্রভু এবং কৃষ্ণপ্রেমের তুল্য লভ্য বস্তু আর কোথাও কোন দিন মিলিবে না ॥৫৮॥

এতদ্বি জন্মসাফল্যাং বৈষ্ণবানাং বিশেষতঃ ।

ভজনং শ্রীনবদ্বীপে ব্রজলোকানুসারতঃ ॥৫৯॥

লোকের বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের ইহাই জন্মের সার্থক যে, তাহারা নবদ্বীপ ধামেই ব্রজধামের অনুরূপ ভজন করিতে সমর্থ হয় ॥৫৯॥

ক্ষৌরমুপোসনং শ্রাদ্ধং স্নানদানাদিকং হি যৎ ।

অন্যতীর্থেষু কৰ্ত্তব্যং নবদ্বীপে ন তদ্বিধিঃ ॥৬০॥

অন্যতীর্থে ক্ষৌর, উপবাস, শ্রাদ্ধ, স্নান, দানাদি কৰ্ম বিহিত আছে, কিন্তু নবদ্বীপে তাহার বিধান নাই ॥৬০॥

তানি তানি হি কৰ্ম্মাণি কৃতানি যদি তত্র বৈ ।

নশ্যন্তি সহসা দেবি কৰ্ম্ম-গ্রন্থিনিকৃতানাং ॥৬১॥

যদি সে সমস্ত কৰ্ম্মের তথায় অনুষ্ঠান করাও হয়, তথাপি কৰ্ম্মগ্রন্থির
ছেদ বশতঃ ঐ সকল নাশ হইয়া যায় ॥৬১॥

ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিশ্চিহ্নন্তে সৰ্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে জড় কৰ্ম্মাণি গৌরে দৃষ্টে পরাংপরে ॥৬২॥

পরাংপর শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনে হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ, সমস্ত সংশয়ের ছেদ
ও জড়কৰ্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ॥৬২॥

অতো বৈ মুনয়ো দেবি নবখণ্ডং সমাপ্রিতাঃ ।

কৰ্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজে ॥৬৩॥

দ্বীপে দ্বীপে প্রপশ্যন্তি বিষ্ণোরবয়বং পরম্ ।

গায়ন্তি হরিনামানি মজ্জন্তি জাহ্নবী জলে ॥৬৪॥

নবরাত্রে নবদ্বীপং ভ্রমন্তি ভক্তিপূর্বকম্ ।

জীবন্তি পরমানন্দে মহাপ্রসাদসেবয়া ॥৬৫॥

অসি দেবি, সেইজহই মুনিগণ নবদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করত রাধাকৃষ্ণের
পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি অবলম্বন এবং প্রতিদ্বীপে স্বাংশ-ভগবানের বিগ্রহ-
সকল দর্শন, জাহ্নবী-জলে স্নান, নয় রাত্রিতে ভক্তিপূর্বক নবদ্বীপে ভ্রমণ ও
মহাপ্রসাদ সেবনে মহানন্দে জীবন ধারণ করিয়া থাকেন ॥৬৩-৬৫॥

প্রসাদং পরমেশানি গৌরাস্ত্য মহাপ্রভোঃ ।

পাবনং সৰ্ব্বজীবানাং দুর্লভং দুষ্কৃতাং কিল ॥৬৬॥

হে মহেশ্বর! মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের প্রসাদ সমস্ত জীবের পবিত্রতাজনক,
কিন্তু পাপিগণের পক্ষে উহা দুর্লভ ॥৬৬॥

অহং ব্রহ্মা ত্বমীশানি দেবাশ্চ পিতরস্তথা ।

মুনয়ো ঋষয়ঃ সৰ্ব্বৈ প্রসাদযাচকাঃ ধ্রুবম্ ॥৬৭॥

আমি ব্রহ্মা, তুমি দেবগণ, ও পিতৃগণ, মুনিগণ, ঋষিগণ সকলেই ঐ
প্রসাদ-যাচক ॥৬৭॥

গৌরনিবেদিতানেন যষ্টব্যঃ সৰ্ব্বদা বয়ম্ ।

পবিত্রং গৌরনির্ম্মাণ্যং গ্রাহ্যং দেয়ং জনৈঃ সদা ॥৬৮॥

শ্রীগৌরুন্দের নিবেদিত অন্নদ্বারা সর্বদা আমাদের পূজা করিবে । মনুষ্য-
গণের পক্ষেও পবিত্র গৌরনিষ্ঠাল্য দেয় এবং গ্রহণীয় ॥৬৮॥

জাত্যভিমানমোহান্কাবিদ্যাহঙ্কারপীড়িতাঃ ।

দুষ্কৃতিদূষিতাঃ সত্ত্বাঃ প্রসাদে রতিবজ্জিতাঃ ॥৬৯॥

অহং তান্ রোরবে দেবি নিক্ষিপ্য যাতনাময়ে ।

দণ্ডং দদামি সত্যং তে বদামি নাত্র সংশয়ঃ ॥৭০॥

যে সকল ব্যক্তি জাত্যভিমান ও মোহে অন্ধ, বিদ্যাজনিত অহঙ্কারগ্রস্ত
এবং দুষ্কৃতিযুক্ত হইয়া মহাপ্রসাদে আসক্তিহীন হয় আমি তাহাদিগকে যন্ত্রণাময়
রোরবে নিক্ষেপ করত দণ্ড প্রদান করিয়া থাকি,—ইহা তোমার নিকট সত্য
বলিলাম ; এ বিষয়ে সংশয় নাই ॥৭০॥

যত্র তত্র নবদ্বীপে যদন্নং তন্নিবেদিতম্ ।

তদগ্রাহ্যং ব্রহ্মণা সাক্ষাৎ চণ্ডালাদপি চণ্ডিকে ॥৭১॥

অগ্নি চণ্ডিকে ! নবদ্বীপের যে কোন স্থানে চণ্ডালও যদি বিষ্ণুনিবেদিত
অন্ন ব্রহ্মাকে প্রদান করেন তাহ' হইলে তিনিও তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥৭১॥

শুষ্কং পশু্যাসিতং বাপি নীতং বা বহুদূরতঃ ।

প্রাপ্তিমায়েণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা ॥৭২॥

উক্ত মহাপ্রসাদ শুষ্ক পশু্যাসিত অথবা বহুদূরে নীত হইলেও প্রাপ্তিমায়েই
ভক্ষণ করা উচিত, এ বিষয়ে কাল-বিচার নাই ॥৭২॥

ন দেশনিয়মস্তত্র ন পাত্রনিয়মস্তথা ।

ন দাতৃনিয়মো দেবি গৌরভুক্তনিষেবনে ॥৭৩॥

গৌরান্বের প্রসাদভক্ষণে দেশ, পাত্র সংক্ষেপে কোন নিয়ম নাই ॥৭৩॥

আকর্ষ্যভোজনাদেবি গৌরে ভক্তিঃ প্রজায়তে ।

ন চাতিধর্ম্বাধোহস্তি গৌরভুক্তনিষেবনে ॥৭৪॥

হে দেবি ! আকর্ষ্য পরিপূর্ণ করত মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলে গৌরমুন্দের
প্রতি ভক্তি জন্মিয়া থাকে । গৌরভুক্ত প্রসাদভক্ষণে অতিধর্ম্ব-দোষ (অধিক
ভক্ষণজনিত দোষ) বিচার্য্য নহে ॥৭৪॥

অহো দ্বীপশ্চ মাহাত্ম্যং ন কোহপি বর্ণনে ক্ষমঃ ।

অন্যতীর্থমৃতিঃ পুংসাং ভুক্তিমুক্তি প্রদায়িনী ।

নবদ্বীপমৃতিঃ সাক্ষাৎ কেবলা ভক্তিদায়িনী ॥৭৫॥

এই নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য বর্ণনে কাহারও ক্ষমতা নাই । অতীতীর্থে মৃত্যু হইলে মানবের ভোগ ও মুক্তি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু এই নবদ্বীপে মৃত্যু ঘটিলে শুদ্ধভক্তি লাভ হইয়া থাকে ॥৭৫॥

অকালমরণং বাপি কষ্টমৃত্যুর্গৃহে মৃতিঃ ।

অপমৃত্যুর্ন দোষায় নবখণ্ডে বরাননে ॥৭৬॥

অগ্নি স্মৃতি ! নবদ্বীপে অকাল মরণ, কষ্ট-মরণ, গৃহ-মৃত্যু বা অপমৃত্যু-জনিত দোষ ঘটে না ॥৭৬॥

অন্যত্র যোগমৃত্যুর্বা কাশ্যাং জ্ঞানমৃতির্ভবেৎ ।

তৎসর্বং ফলু চাক্ষি নবদ্বীপে মৃতস্য বৈ ॥৭৭॥

অন্যস্থানে জাত যোগমৃত্যু অথবা কাশীস্থ জ্ঞানমৃত্যু, নবদ্বীপে মৃত ব্যক্তির নিকট নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার জানিবে ॥৭৭॥

বরং দিনং নবদ্বীপে প্রয়াগে কল্পযাপনাং ।

বারাণসীনিবাসাদ্বা সর্বতীর্থনিষেবনাং ॥৭৮॥

প্রয়াগে কল্প-পরিমিত-কাল বাস করা, বারাণসী ক্ষেত্রে অথবা অতীতীর্থে বাস করা অপেক্ষা নবদ্বীপে একদিন বাস করাও শ্রেষ্ঠ ॥৭৮॥

যোগেহন্যত্র ফলং যত্নদ্রোণে দ্বীপে নবে শুভে ।

পদক্ষেপে মহাযজ্ঞ শয়নে দণ্ডবৎ ফলম্ ॥৭৯॥

অন্যস্থানে যোগ দ্বারা যে ফল লাভ হয়, এই নবদ্বীপসেবায় তাদৃশ ফল জন্মিয়া থাকে । এখানে প্রত্যেক পদক্ষেপে মহাযজ্ঞ ও শয়নে প্রণামক্রিয়ার ফল অর্জিত হইয়া থাকে ॥৭৯॥

ভোজনে পরমেশস্য প্রসাদসেবনং ভবেৎ ।

কিং পুনঃ শ্রদ্ধাধানস্য হরিনামপরস্য চ ।

গৌর প্রসাদভক্তস্য ভাগ্যং তত্র বদাম্যহম্ ॥৮০॥

এখানে সাধারণ ভোজনমাত্রেই ভগবানের প্রসাদসেবনের ফল হয় ; আর যাহারা শ্রদ্ধাযুক্ত ও হরিনামপরায়ণ হইয়া গৌরানন্দেবের প্রসাদ সেবন করেন, তাহাদের ভাগ্যের কথা আমি আর কি বলিব ! ॥৮০॥

এতত্তে কথিতং দেবি সমাসেন তবাগ্রতঃ ।

গোপ্যং হি ভবতা সর্বং গৌরাজ্জ প্রভোরিচ্ছয়া ॥৮১॥

হে দেবি ! আমি সংক্ষেপে যাবতীয় বক্তব্য তোমার নিকট বলিলাম । শ্রীগৌরাজ্জপ্রভুর ইচ্ছানুসারে ইহা গোপন রাখিবে ॥ ৮১ ॥

ধন্যে কলৌ সংপ্রবিষ্টে গৌরলীলা মনোরমা ।

প্রকটা ভবিতা হ্যেতৎ ব্যক্তং তদা ভবিষ্যতি ॥৮১॥

ধন্য কলিকাল আরম্ভ হইলে মনোরম গৌর-লীলা প্রকটিত হইবে ।

তৎকালে এই ধাম-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইবে ॥৮২॥

ইতি শ্রীউর্দ্ধ্বায়-মহাতন্ত্রে

শ্রীমন্নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ ।

ইতি শ্রীউর্দ্ধ্বায় মহাতন্ত্রে শ্রীমন্নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য সমাপ্ত ।

কথিতং শ্রীবিষ্মসারে চণ্ডিকায়ৈ শিবেন হি ॥ ৭ ॥

শ্রীবিষ্মসারতন্ত্রে শ্রীমহেশ্বর পার্শ্বতীর প্রতি বলিয়াছেন ॥ ৭ ॥

গঙ্গায়া দক্ষিণে ভাগে নবদ্বীপে মনোহরে ।

কলিপাপবিনাশায় শচীগর্ভে সনাতনঃ ॥১॥

জনিষ্যতি প্রিয়ে মিত্র পুরন্দর গৃহেশ্বরম্ ।

ফাল্গুনে পৌর্ণমাস্তাং চ নিশায়াং গৌরবিগ্রহঃ ॥২॥

অয়ি প্রিয়ে ! গঙ্গার দক্ষিণভাগে মনোরম নবদ্বীপধামে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগের পাপবিনাশের জন্ত ফাল্গুনী পূর্ণিমা রাত্রিতে মিত্র-পুরন্দরের গৃহে শচীদেবীর গর্ভে গৌররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন ॥১-২॥

তন্ত্রে কুলার্ণবে শম্ভুরবদৎ পার্শ্বতীং প্রতি ॥ ত ॥

কুলার্ণব-তন্ত্রে পার্শ্বতীর প্রতি মহেশ্বর বলিয়াছেন ॥ ত ॥

ততঃ কালে চ সংপ্রাপ্তে কলৌ কোহপি মহানিধিঃ ।

হরিনামপ্রকাশায় গঙ্গাতীরে জনিষ্যতি ॥৩॥

অনন্তর কলিযুগের আরম্ভে হরিনামপ্রচারের জন্ত গঙ্গাতীরে কোনও মহাগুণনিধি জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৩ ॥

বৃহদ্রক্ষ্যামলাখ্যে তন্ত্রে তৎ কথিতং পুরা ॥ ৪ ॥

পুরাকালে বৃহদ্রক্ষ্যামল-তন্ত্রে কথিত হইয়াছে । ৪ ॥

কলৌ পূর্ণানন্দস্ত্রিভুবনজয়ী গৌরসুতনূর্বদ্বীপে

জাতঃ সুরধুনিসমীপে নরহরিঃ ।

দদৎ পাপীভ্যঃ সংস্কৃতমপি হরেনাম শ্রুতং তরিঙ্গা

পাপাক্ৰিৎ ভুবি বিজয়তে শ্রীগৌরচন্দ্রাভিধঃ ॥৪॥

কলিযুগে যে পূর্ণানন্দ ত্রিভুবনজয়ী সুন্দর গৌরবিগ্রহ নরহরি গঙ্গাসমীপে
নবদ্বীপে উদিত হইয়া পাপিগণকে অতিশয় পবিত্র হরিনাম প্রদান-পূর্বক
পাপসমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন, সেই শ্রীগৌরচন্দ্র সর্বদা পৃথিবীতে জয়যুক্ত
হউন ॥ ৪ ॥

বন্দে গৌরাবতারং কলিমলমথনং শ্রীনবদ্বীপবাসং

কণ্ঠে মালাং দধানং শ্রুতিযুগবিলসং স্বর্ণসংস্কৃতগণ্ডম্ ।

কেয়ু রাজদদিব্যরত্নঘটিতং বাহুদ্বয়ে বিভ্রতং

ভক্তেভ্যো দদতং মলাপহরণং নামাপি সর্বং হরেঃ ॥৫॥

যিনি কলিগল-বিনাশের জন্ম নবদ্বীপে বাস করিতেছেন, যাহার কণ্ঠদেশে
মালা, গণ্ডদ্বয়--কর্ণযুগলে সুশোভিত সুবর্ণকুণ্ডলচ্ছটায় উজ্জ্বল, বাহুদ্বয় কেয়ুর
ও বলয়ের দিব্যরত্নে অলঙ্কৃত, যিনি ভক্তগণকে পাপনাশন হরিনাম প্রদান
করিতেছেন, সেই শ্রীগৌরসুন্দরকে বন্দনা করিতেছি ॥ ৫ ॥

কপিল-তন্ত্রে—

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে ।

জানত্বা পার্শ্বদৈঃ সাক্ষিং কীর্তনং কারয়িষ্যতি ॥৬॥

কপিলতন্ত্রে উক্ত আছে,—

ঘোর কলিকালে জম্বুদ্বীপান্তর্গত মায়াপুরে ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ করত
ভগবান্ পার্শ্বদগণের সহিত কীর্তন করিবেন ॥ ৬ ॥

মুক্তিসঙ্কলিনী-তন্ত্রে—

কুরুক্ষেত্রং কৃতে তীর্থং ত্রেতায়াং পুষ্করং স্মৃতম্ ।

দ্বাপরে নৈমিষারণ্যং নবখণ্ডং কলৌ কিল ॥৭॥

মুক্তিসঙ্কলিনী তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

সত্যযুগে কুরুক্ষেত্রে, ত্রেতাযুগে পুষ্কর, দ্বাপরে নৈমিষারণ্য এবং কলিযুগে
'নবদ্বীপ' তীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মযামলে—

অথবাহং ধরাধামে ভূত্বা মন্তুক্তরূপধ্বক্ ।

মায়ায়াং চ ভবিষ্যামি কলৌ সঙ্কীর্ণনাগমে ॥৮॥

ব্রহ্মযামলে বলিয়াছেন,—

অথবা আমি আমার ভক্তরূপে কলিযুগে সঙ্কীর্ণনকালে পৃথিবীতে মায়াপুরে
অবতীর্ণ হইব ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ্যামলে—

পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যতি শচীসুতঃ ॥৯॥

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্যে প্রমাণথণ্ডে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥

কৃষ্ণ্যামলে বলিয়াছেন,—

পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে শচীসুতরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণথণ্ডে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

নবদ্বীপস্ত মাহাত্ম্যং বিদ্বদ্ভির্ষং সমীরিতম্ ।

সংগৃহীতং ময়া সর্বমধ্যায়েহস্মিন্ সুখাবহম্ ॥ দ ॥

নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে— পাণ্ডিতগণ যাহা বলিয়াছেন, এই অধ্যায়ে আমি সেই সকল আনন্দদায়ক বাক্য সংগ্রহ করিতেছি ॥ দ ॥

আদৌ কর্ণপুরশ্চৈব বর্ণনং শৃণু যত্নতঃ ।

চৈতন্যচরিতে কাব্যে নবদ্বীপকথাশ্রয়ে ॥ ধ ॥

চৈতন্যচরিত-কাব্যে নবদ্বীপ-কথা আশ্রয় করত কবিকর্ণপুর যাহা বর্ণন করিয়াছেন, প্রথমে তাহাই যত্নসহ শ্রবণ কর ॥ ধ ॥

ইয়ং মহৌ ভাগ্যবতী মহীয়সী দিবোপি

দিব্যাদপি নির্মলৈগুণৈঃ ।

মহাস্তি রত্নানি যদা দদাতাতে

দধৌ নবদ্বীপমতীৰ্হ তুল্যম্ ॥ ১ ॥

অশেষ পুণ্যগুণশালিনী এই ধাত্রী দিব্য স্বর্গধাম হইতে ভাগ্যবতী এবং শ্রেষ্ঠত্বরা যেহেতু এই বসুন্ধরা সর্বদা উৎকৃষ্ট নানারত্ন প্রদান করিয়া থাকে, সেই জন্তই তাহার ফল-স্বরূপ নবদ্বীপ-নামক অতিতুল্য পুণ্যস্থানকে অঙ্কে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে ॥ ১ ॥

অনেকধা সঞ্চিত ভাগ্য সঞ্চয়ং

সমস্তমেকত্র বিধায় সর্বতঃ ।

মহীকুহৈরুৎপুলকেয়মুৎসুকা দধৌ

নবদ্বীপ ইতি প্রথাং কিমু ॥ ২ ॥

পৃথিবী তাহার বহুবিধ সঞ্চিত ভাগ্যরাশিকে একস্থানে সংগ্রহ করিয়াই কি এই নবদ্বীপরূপা খ্যাতি ধারণ করিয়াছেন এবং এখানকার বৃক্ষরাশি কি সেই ভাগ্যরাশিসঞ্চয়-নিবন্ধন পুলকজনিত রোমাঞ্চ-স্বরূপ ॥ ২ ॥

প্রভুঃ কদা বাবতরিষ্য তীত্যদো

বিচিন্তয়ন্ত্য। মনসি প্রফুল্লয়া ।

মনোরথাক্রান্তিবশাদনেকশঃ

সতাং পদাজ্জানুগতির্যয়া দধে ॥ ৩ ॥

কোন কালে প্রভু অবতীর্ণ হইবেন,—এই চিন্তায় মনে মনে অতিশয় প্রফুল্লা হইয়া এই ভূমি মনোরথের তাড়নায় বহু-প্রকারে সাধুগণের পাদপদ্মের অনুসরণ করিয়াছে ॥ ৩ ॥

ইয়ং নবদ্বীপমিষেণ মেদিনী

দধার ভূয়ো মথুরামিবাপরাম্ ।

বদেদমুগ্ধ্যাং চ বিমুক্তিদায়িনী

প্রভোঃ পদস্পর্শরসামলাত্মনঃ ॥ ৪ ॥

এই পৃথিবী যেন নবদ্বীপ-রূপে পুনরায় অত্র এক মথুরাপুরীকেই ধারণ করিতেছে, এবং প্রভুপদস্পর্শরসে যাহার চিত্ত নির্মল হইয়াছে, তাহাকে মুক্তি দান করত যেন নিজকে মথুরাপুরী বলিয়াই বলিতেছে ॥ ৪ ॥

আপ্লাব্য যা ধূর্জটিসজ্জটাতটীং

কপালমালাচ্ছটয়া সমন্বিতাম্ ।

শশাঙ্কলেখা প্রতিবিশ্বরূপিণীম-

লরূপূর্ব্বাং শফরীং সমাসদং ॥ ৫ ॥

প্রভোঃ পদান্তোজযুগ্মস্ত পাবনী

ধারামনোজ্ঞা মধুরা মহীয়সঃ ।

চকার যত্রাস্পদমুৎসুকা সতী

সমন্ততোহসৌ বিমলাম্বুবাহিনী ॥ ৬ ॥

দ্রবস্বরূপাপি ভবাক্রিশোষিণী

শুভ্রাপি যাসীদ্ধতকৃষ্ণবিগ্রহা ।

ক্ষিত্যাশ্রিতাপি ত্যনদীতি বিশ্রুতা

ভ্রমাপহাপি ভ্রমিবিভ্রমাবহা ॥ ৭ ॥

সেয়ং নবদ্বীপ ভুবো মহীয়সীং

শোভামিবাধায় তদন্তবাসিনী ।

প্রভোঃ পদান্তোজযুগন্ত সৌরভং

প্রাপ্যৈব ভূয়োংকলিকাকুলীকৃতা ॥ ৮ ॥

যিনি কপালমালার কাতিযুক্ত মহাদেবের জটাতট প্রাবিত করায় স্বকীয় বারিগর্ভে তদীয় ললাটস্থ চন্দ্রকলার প্রতিবিশ্বপাতে যেন অলঙ্কপূর্ব শফরীর (মংস্ত বিশেষ পুঁটী মাছের তায়) শোভা ধারণ করিয়াছেন।

যিনি প্রভুর পদযুগল হইতে রম্য-ধারায় প্রবাহিতা হইয়া জগৎ পবিত্র করেন, এবং চতুর্দিকে মধুর ও বিমল জলভার বহনপূর্বক জীবকে মহৎপদ প্রদান করেন।

যিনি দ্রবস্বরূপা হইয়াও ভবসমুদ্র শোষণ (অর্থাৎ জীবের সংসার-দশা-নাশ) করেন, যিনি শুভ্রবর্ণা হইয়াও কৃষ্ণ-বিগ্রহা (অবগাহন-কালে নিজের সলিলে শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করেন), যিনি পৃথিবীতে প্রবাহিতা হইয়াও স্বর্গতরঙ্গিনী-নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন (স্বর্গ হইতে আগতা বলিয়া ঐ নাম), যিনি জীবের যাবতীয় ভ্রম দূর করিয়াও ভ্রমি-বিভ্রম ধারণ করিতেছেন (ভ্রমি—আবর্ত, এবং বিভ্রম—তদীয় ভঙ্গী, পক্ষে, ভ্রমে পতিত), সেই গঙ্গাদেবী প্রভুর পাদ-পদ্মের সৌরভ-লাভেই যেন কল্লোলধ্বনিতে আকুলিতা হইয়া নবদ্বীপের প্রান্তে বাস করত তত্রত্য ভূমিভাগের পরম সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন। (কুলক এস্থলে চারিটী শ্লোকে একত্র অবয়) ॥ ৫-৮ ॥

চতুভিঃ কুলকম্ । বসন্তি যত্র ক্ষিতিদেব-

সত্তমাঃ সদা সদাচারপরাঃ পরায়ণাঃ ।

নিরন্তরং বেদবিধানকর্ম্মসু শ্রুতি-

স্মৃতীনাং বিধয়ঃ শরীরিণঃ ॥ ৯ ॥

যেখানে (নবদ্বীপ) সর্বদা সদাচার-পরায়ণ এবং বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত-কর্ম্ম-সকলের সাক্ষাৎ মূর্ত্ত বিধিস্বরূপ উত্তম ব্রাহ্মণগণ বাস করেন ॥ ৯ ॥

স্বভাবভাজাং ভিষজাং মহত্তমাঃ

সধর্ম্মনিষ্ঠাশ্চ বিশাস্বরাঃ পরে ।

প্রতিষ্ঠয়া নির্ভরশুভ্রয়া সদা

সমন্বিতা যত্র বসন্তি মানবাঃ ॥ ১০ ॥

যেখানে উত্তমস্বভাব ভিষক (বৈদ্য) গণ স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ বৈশ্বগণ স্বেপার্জিত শুদ্ধ-প্রতিষ্ঠাযুক্ত হইয়া বাস করিতেছে ॥ ১০ ॥

তেনৈব বর্ণিতং চন্দ্রোদয়াখ্যে নাটকে পুনঃ ॥ ন ॥

গৌড়ক্ষৌণী জয়তি কতমা পুণ্যতীর্থাবতঃসপ্রায়া

যাসৌ বহতি নগরীং শ্রীনবদ্বীপনাম্নীম্ ।

যস্তাং চামীকরবররুচেরীশ্ববস্ত্রাবতারো

যস্মিন্মূর্তা পুরি পুরি পরিস্পন্দতে ভক্তিদেবী ॥১১॥

তিনিই 'চন্দ্রোদয়'-নামক নাটকে বর্ণনা করিয়াছেন ॥ ন ॥

যিনি পুণ্যতীর্থ-সকলের শিরোভূষণস্বরূপা, যিনি নবদ্বীপ-নাম্নী নগরীকে নিজমণ্ডলের মধ্যে ধারণ করিতেছেন, সেই গৌড়ভূমি জয়যুক্ত হউন । সেই গৌড় ভূমিতে (অথবা, নবদ্বীপে) কনককান্তি শ্রীগৌর সূন্দর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সেখানে প্রতিপুরীতে ভক্তিদেবী স্পন্দিত হইতেছেন ॥ ১১ ॥

পরলোক

আমাদের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান হইতে আমরা ইহলোকের ধারণা লাভ করি । এই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানকে সম্বল করিয়া পরলোকের ধারণা কতদূর সম্ভব, তাহাও দেখা আবশ্যক । ঐহিক ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা যে সকল ঐহিক ধারণা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত, উহার সকলগুলিই আমাদের শরীর-পতনে এই খানেই রহিয়া গেল, আর যে জিনিষটী স্থূল শরীর হইতে বিচ্যুত হইল, তাহার কোন সন্ধানই আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ করিতে সমর্থ হইল না । আমাদের ইন্দ্রিয়-জ্ঞান ও তাহার পরিণতি অনুমান—সম্বল করিয়া পরলোকে যাইবার জন্ত চেষ্টা হইতে পারে সত্য, কিন্তু তাদৃশ অনুমান সেখানে কতদূর কার্য্যে লাগিবে, সে বিষয়ে নিঃসন্দ্বিগ্ন প্রমাণ পাওয়া যায় না । লৌকিক প্রমাণ, প্রত্যক্ষ ও তদনুবর্তী অনুমান ইহ জীবনেই অসত্য নিরাকরণ করিয়া সত্য ধারণায় উপনীত করায় । যেখানে স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি চলচ্ছিত্তিরহিত হইল, তথায় ইন্দ্রিয়-পরিচালক মন বাহ্য-করণের অভাবে অন্তঃকরণসমূহকে চালনা করিতে পারে মনে করিয়া যদি আমরা স্থূল উপাধির হস্ত হইতে পরিভ্রান পাই, তাহা হইলে স্থূল উপাধিতে অন্তঃকরণ লইয়া বিচরণ করি । ইহাও পরলোকের একটী স্তর বলিয়া গৃহীত হইতে পারে ।

ইহলোকে পূর্বের বাসনা, পরবর্তী কালে স্থূল জগতের সান্নিধ্যে ক্রিয়াকলাপ । যেখানে স্থূলের সংস্পর্শ হইল না, তথায় বনীভূত করাইয়া,

স্থূল বিষয়ে সংলিপ্ত করে। ইহলোকে স্থূল-সূক্ষ্ম মিশ্রিত ভাব যে সময়ে স্থূলের সহিত সূক্ষ্ম বিচ্ছিন্ন হয়, তখন দুইটী পৃথক্ বস্তু বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি; কিন্তু সেই সূক্ষ্ম-প্রতীতি স্থূলের সংমিশ্রণে জাত, সে কারণ সূক্ষ্মও স্থূলাধারে প্রত্যাবর্তিত হইবে,—জন্মান্তর-বাদী শাক্যসিংহ, জৈমিনি প্রভৃতি মনিষিগণ এক্রূপ স্বীকার করেন স্থূলোপাধির অভাবে সূক্ষ্মোপাধি স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় জগৎ হইতে বিরামলাভ না করিলে ঐহিক অশান্তি নিরাকৃত হয় না। আবার সূক্ষ্মোপাধির উন্নতাংশ স্বর্গাদিকে অনেক বিচারক সম্প্রদায় আকাশ-পুষ্প অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া মনে করেন। মৃত গাভী কখনও ঘাস ভক্ষণ করে না, পিতৃ উদ্দেশে প্রদত্ত শ্রাদ্ধপিণ্ড ও তর্পণ-জলাদি কিরূপভাবে প্রেতা-লোকপ্রাপ্ত পূর্ব পুরুষগণ পাইবেন, এ বিষয়েও প্রত্যক্ষ-বাদিগণের মধ্যে নানা মতভেদ উপস্থিত হয়। পাপপুণ্য-মিশ্র অবস্থায় কেবল স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিতে এই জগতে অবস্থান, কেবল পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গাদি-গতি, কেবল পাপ-প্রভাবে নরকাদিই আমাদের গম্যস্থান হয়। স্বর্গ, নিরয় ও কর্মভূমি—এই ত্রিভুবনই অক্ষজ-জ্ঞান ও অহুমানের প্রাপ্য ভূমিকা। অথ ভাষায় বলিতে গেলে, এই ত্রিভুবনই অথবা সপ্তব্যাহতি ও সপ্ত অবর লোকে চতুর্দশ ইন্দ্রাধিষ্ঠিত রাজ্যে জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও ইন্দ্রিয়-তৎপরতাই লক্ষিত হয়।

ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে অতীন্দ্রিয় পুরুষগণ বাস করেন। সেখানে জীবের ইন্দ্রিয়জ বাসনা নাই। নখর ইন্দ্রিয় তথায় গমন করিতে অসমর্থ। তাদৃশ পরলোক, বিচারকের ভাষায়, পরোক্ষবাদ-লক্ষিত চতুর্দশভুবনাতীত গুণত্রয়-সাম্য-সলিলা বিরজা নদীর অপর পারে স্থিত নির্বিশেষ-ব্রহ্মলোক। কাহারও কাহারও বিবেচনায় এই নির্বিশেষ-ব্রহ্মধামই মুক্ত পুরুষগণের লভ্য ভূমিকা। এই ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান স্তব্ধ হওয়ায় ভোগময় বস্তুবিশেষকে পাওয়া যায় না। যাহাদের বিচারে ইহাই পরলোক, তাঁহারা ইহ জগতে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু বলিয়া খ্যাত এইরূপ পরলোক লাভ করাইবার জন্ত নাস্তিক, প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী ব্যস্ত। আর প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী, আত্মার নিত্যধর্ম ভক্তি—এই বেদ-প্রতিপাদ্য অভিধেয় গিনষ্ট করিয়া নির্বিশেষ-ধামকেই পরলোক বলিতে পারেন; কিন্তু তাহাও এই পার্থিব জ্ঞানের অতগ্নিরসন-মাত্র। উহা কখনই 'নিত্যধাম' শব্দ বাচ্য হইতে পারে না। যেখানে অনিত্যের উপাধি প্রবল, তাদৃশ অজ্ঞানদূপ্ত জ্ঞানী যে কাল্পনিক মুক্তধামের কল্পনা করেন, তাহা তাঁহার অধিকৃত বিষয় নহে। সুতরাং অন্ধকারে ঐ রূপভাবে হাঁতড়াইতে গেলে তাহা পরলোক নাও হইতে পারে।

পরলোকে ইহলোক অপেক্ষা এমন একটী স্বতন্ত্র ধর্ম বিদ্যমান—যদ্বারা আমরা ইহলোকের সহিত পরলোকের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারি। সেই পরলোক-সম্বন্ধীয় আলোচনার আভাস দিবার উদ্দেশে ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ সাময়িক পত্রখানি নানা প্রকারে সংসারাভিনিবিষ্ট জীবকুলকে বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্ত বর্ষকাল চেষ্টা করিয়াছেন। আগামী বর্ষেও সেই চেষ্টা আরও সূক্ষ্মভাবে করিবার জন্তই শ্রীগোরাঙ্গের ঐকান্তিক ভক্তগণ চেষ্টার ক্রটি করিবেন না। পারলৌকিক জ্ঞানকেই অপর ভাষায় ‘পরমার্থ’ বলে; আর, ঐহিক জ্ঞানকেই পারমার্থিকের ভাষায় ‘অনর্থ’ বলে।

ঐহিক ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান ইহলোকে জীবকে উদ্যমভাবে নৃত্য করায়; আবার, উদ্যম নৃত্যের বিশ্রামস্থলী বলিয়া নির্বিশেষ ভাবেই চরম প্রাপ্য বলিয়া নিরুপণ করে। যাহারা পরমার্থে অতিষ্ঠ, তাহারা জীবের মুক্ত অবস্থাকে ভগবানের তটস্থা শক্তি বলিয়া বদ্ধজীবকুলকে বুঝাইয়া থাকেন। ভগবানের পারমাত্ম্য-ভাব শুদ্ধ জীবাত্মার গ্রহণীয় বিষয়-জ্ঞানে বৈদান্তিক অপরোক্ষ-বাদের অবতারণা করেন। ইহাই জীবাত্মার অধোক্ষজ-সেবা। ‘শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা’ সাময়িক পত্রের কেবল পরমার্থের কথা আলোচনা করিতে গেলে অক্ষজ জ্ঞানবাদী সম্ভ্রষ্ট হন না বলিয়াই অক্ষজজ্ঞানি-সজ্জায় পারমার্থিকের ইহাই প্রয়াস।

—জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(গৃহস্থ-বৈষ্ণব)

১। সদৃ গৃহস্থ কে? কাহার গৃহে শুদ্ধবৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন?

“তিনিই সদৃ গৃহস্থ—যিনি প্রত্যহ লক্ষ-নাম গ্রহণ করেন; তাহার গৃহেই শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ প্রসাদ গ্রহণ করিবেন।” —‘সাধুবৃত্তি’, স: তো: ১১১২

২। গৃহত্যাগী ও গৃহস্থের সাধারণ অধিকার কি?

“যাহারা বিষয়রাগে পূর্ণ, তাহারা কখনই উপস্থবেগ সহিতে পারেন না, অনেক অবৈধ-কর্মে প্রবৃত্ত হন। এই প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে দুই প্রকার ভজন-পিপাস্ব দৃষ্ট হয়। সাধুসঙ্গ-বলে যাহাদের রতি শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে, তাহারা একবারে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে থাকেন—ইহারা “গৃহত্যাগী” বৈষ্ণব। যাহাদের স্ত্রীসঙ্গ-প্রবৃত্তি দূরীকৃত হয় নাই, তাহারা বিবাহ-বিধিক্রমে ‘গৃহস্থ’ থাকিয়া ভগবদ্ভজন করেন।” —‘ধৈর্য’, স: তা: ১১৫

৩। বৈষ্ণব-গৃহস্থের পত্নী ও সন্তান-সন্ততির প্রতি আচরণ কিরূপ হইবে ?

“বিবাহিতা স্ত্রীকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে যতদূর পারা যায়, বৈষ্ণব-তত্ত্ব শিক্ষা দিবেন। * * * বৈষ্ণবী পত্নী-সহকারে বৈষ্ণব-জগৎ সমৃদ্ধ করিলে আর বহির্গুণী প্রবৃত্তির অলোচনা হয় না। যে-সকল সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহাদিগকে ভগবদ্দাস বলিয়া জ্ঞান করিবে।”

৪। ষড়্বেগ-দমনের উপদেশ কি গৃহস্থগণের জন্ত নহে ?

“ষড়্বেগজয়কারী আত্মানুগত ব্যক্তিই পৃথ্বীজয়ী হন। এই বেগসহন উপদেশ কেবল গৃহি-ভক্তের পক্ষে ; কেন না, গৃহত্যাগীর পক্ষে পরাকাষ্ঠারূপ সম্পূর্ণ বেগাদি-বর্জন গৃহত্যাগের পূর্বেই সিদ্ধ হইয়াছে।”

পীঃ পঃ বঃ, ১ম শ্লোক

৫। সাধারণ গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণের জীবনযাত্রা-বিধি কিরূপ ?

“সাধারণ গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ সর্বদা নিষ্পাপ-চরিত্রে, ঋণ-দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া কৃষ্ণের সংসার নির্বাহ করিবেন।” — ‘বৈরাগী বৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নিম্নলিখিত হওয়া চাই’, সং তোঃ ৫।১০

৬। গৃহস্থগণের সর্বাপেক্ষা সদ্ভায় কিরূপে হইতে পারে ?

“ঐহাদের বেতন স্থূল এবং ঐহারা রাজার মূলধন দিয়া কিছু বিশেষ উদ্ধৃত্ত ধন পান, তাহাদের সংসারযাত্রা নির্বাহ হইয়া কিছু কিছু সঞ্চয় হয়। সঞ্চিত অর্থ সংকর্ণে ব্যয় করা উচিত। মদ্য-মাংস-ভোজন, অসৎ নাট্যাদি-দর্শন, বৃথা মোকদ্দমা, অসৎ পাত্রের দান ইত্যাদি বহুবিধ অসদ্ভায় আছে। ঐহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাস হইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা উদ্ধৃত্ত অর্থের দ্বারা অসদ্ভায় না করিয়া সদ্ভায় করিবেন। অতিথি-সেবা, দুঃখী লোককে অন্ন-দান, পীড়িত লোককে ঔষধ ও পথ্য দান, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যা-দান, দরিদ্র লোককে কণ্টাদি-দায় হইতে মুক্তকরণ—এই সমস্ত সদ্ভায় অপেক্ষা একটী বিশেষ গুরুতর সদ্ভায় আছে। সেই ব্যয় শ্রীভগবৎসেবা ও শ্রীভাগবত সেবাতে হইয়া থাকে। * * প্রভুর দৈনন্দিন সেবা-সংস্থাপনের জন্ত সমস্ত গৃহস্থ বৈষ্ণবের উদ্ধৃত্ত অর্থ হইতে কিছু কিছু দেওয়া কর্তব্য।”

—‘গৃহস্থবৈষ্ণবদিগের জীবনবৃত্তি’, সং তোঃ ৭।২

৭। অতিথি-সেবা গৃহস্থগণের কর্তব্য কেন ?

“আতিথ্য একটি প্রধান ধর্ম্ম। যে দেশে-আতিথ্য নাই, সে-দেশ মরুভূমি তুল্য পরিত্যাজ্য। সাধারণ গৃহস্থের মধ্যে ঐহার আতিথ্য নাই, তাহার

বৃথা জীবন—লোকে প্রাতঃকালে তাঁহার নাম করে না ; সুতরাং তিনি এক জন পাপিষ্ঠদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য । আতিথ্যই গৃহস্থের প্রধান ধর্ম । গৃহস্থের যে-সকল অনিবার্য পাতক হয়, তাহা আতিথ্যের দ্বারা দূর হয় ।”

—‘বৈষ্ণব গৃহস্থের আতিথ্য’, সঃ তোঃ ৮।১২

৮। সাধারণ-অতিথি ও বৈষ্ণব-অতিথির সেবায় বৈষ্ণব-গৃহস্থের কোন তারতম্য করা উচিত কি ?

“ভক্ত-গৃহস্থও যখন অতিথি পান, তখন দেখিয়া থাকেন যে, সে অতিথিটী সাধারণ অতিথি, কি বৈষ্ণব-অতিথি । যদি বৈষ্ণব-অতিথি দেখেন, তবে তাঁহাকে স্থায় ভ্রাতার অধিক স্নেহ করিয়া তাঁহার সেবা করেন এবং তাঁহার সঙ্গে সন্ততির উন্নতি সাধন করেন । যদি সাধারণ অতিথি পান, তবে সাধারণ-আতিথ্য-বিধানে সেই অতিথিকে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সেবা করেন । এইরূপ ব্যবহারই বৈষ্ণব-গৃহস্থের ব্যবহার ।”

—‘বৈষ্ণব গৃহস্থের আতিথ্য’, সঃ তোঃ ৮।১২

৯। গৃহস্থের প্রধান কার্য কি ?

“ভক্ত-সেবাই গৃহস্থের প্রধান কর্ম ।” —‘সাধুবৃত্তি’, সঃ তোঃ ১১।১২

১০। গৃহস্থ কোন্ বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইবেন ?

“গৃহস্থ-বৈষ্ণবের সাধুসঙ্গে বিশেষ যত্ন থাকা চাই ।”

—‘সাধুবৃত্তি’, সঃ তোঃ ১১।১২

১১। বৈষ্ণব-গৃহস্থ কোন্ আদর্শ অনুসরণ করিবেন ? তাঁহাদের পক্ষে অত্যাভিলাষ একান্তভাবে পরিত্যাজ্য কেন ?

“মহাপ্রভু ও মহাপ্রভুর গণের গৃহস্থ-চরিত্র দেখিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণব আপনার চরিত্র গঠন করিবেন । জীবনযাত্রা ও জীবনোপায় সংগ্রহার্থ প্রভুর ভক্তগণ ও প্রভু স্বয়ং যে চরিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাই ভক্ত-গৃহস্থের অনুকরণীয় । কৃষ্ণকাম হইয়া যে কার্যই করুন, তাহাই ভাল । আর অনাস্তুর-ফল-কামনার ও ইন্দ্রিয়-তৃষ্টির জন্য যাহাই করিবেন, তাহাতেই সংসারী হইয়া পড়িবেন ।”

—‘সাধুবৃত্তি’, সঃ তোঃ ১১।১২

১২। গৃহস্থ-বৈষ্ণবের অত্যাগ্র কৃত্য কি ?

“গৃহস্থ-বৈষ্ণব তুলসীর সম্মান করিবেন ।” —‘সাধুবৃত্তি’, সঃ তোঃ ১১।১২

১৩। অধিক সঞ্চয় করা কি বৈষ্ণব-গৃহস্থের কর্তব্য নহে ?

“গৃহী বৈষ্ণবের যাবৎ ভক্তি-নির্বাহ তাবৎ সঞ্চয়েরই আবশ্যকতা

ততোহধিক সঞ্চয়ে অত্যাহার। ভজন-প্রয়াসিগণ বিষয়িদিকের হায়
সেৰূপ অত্যাহার করিবেন না।” —পীঃ পঃ বঃ, ২য় শ্লোক

১৪। বৈষ্ণব-গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত বিশেষ প্রয়াস করা কি উচিত
নহে ?

“গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ত যাহা অনায়াসে পান, তাহাতেই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের
সুখবোধ করা উচিত।” —‘সাধুবৃত্তি’, সঃ তোঃ ১১।১২

১৫। কিরূপ বৈষ্ণব লইয়া বৈষ্ণব-গৃহস্থ মহোৎসব করিবেন ?

“বৈষ্ণবকে সম্মান করিবেন, বৈষ্ণবতর ও বৈষ্ণবতমের চরণাশ্রয় করিবেন
এবং এইরূপ বৈষ্ণব লইয়াই গৃহস্থ-বৈষ্ণব মহোৎসব করিবেন।”

—শ্রীগঃ শিঃ ১০ম পঃ

১৬। গৃহস্থ কোন্ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন ?

“বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ না হয়,—ইহাতে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন।”

—‘সাধুবৃত্তি’, সঃ তোঃ ১১।১২

১৭। ভক্তের পক্ষে ‘গৃহত্যাগী’ বা ‘গৃহস্থ’ কোন্টি হওয়া উচিত ?

“ভক্ত লোকের পক্ষে গৃহস্থ থাকা বা গৃহ ত্যাগ করা—একই কথা।”

—‘সাধুবৃত্তি’, সঃ তঃ ১১।১২

১৮। গৃহস্থ-অবস্থাটি কি ? ইহা কি চিরকাল রক্ষা করিতে হইবে ?

“গৃহস্থ-অবস্থাটি জীবের আত্ম-তত্ত্ব উদ্দিত করিবার ও শিক্ষা
করিবার চতুষ্পাঠী-বিশেষ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে চতুষ্পাঠী ত্যাগ
করিতে পারে।” —জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

১৯। গৃহস্থ কি ভেক বা সন্ন্যাসাশ্রম প্রদান করিতে পারেন ?

“গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের নিকটই বেযাশ্রম গ্রহণ করা উচিত। গৃহস্থ ভক্ত
গৃহত্যাগীর ব্যবহার আশ্বাদন করেন নাই ; এইজন্য কাহাকেও
বেযাশ্রম দিবেন না।” —জৈঃ ধঃ ৭ম অঃ

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

দীনের কাতর প্রার্থনা

হে পরমাব্যর্থ্য প্রভো !

লহ মম অগণিত ভক্তি-অর্থ্য,

অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছনে পতিত এ দীন ;

কি দিয়ে পূজিব চরণ তোমার—

কিছু নাহি জানে এই ছুরাচার হীন ॥

শুনিয়াছি তুমি বড় দয়াময়,

দীনের প্রতি তোমার করুণা অপার ;

অকাতরে যেবা লয় তোমার শরণ—

শ্রীচরণ দিয়ে তার নাশহ আঁধার ॥

আমি অতি মূঢ় অভাজনাধম

মায়াচক্রে ঘুরি বহু আবর্তনে ;

সদা আশা মোর হয় বিষয় ভুঞ্জিতে—

নাহি হয় রতি মোর আত্মার সাধনে ॥

ভ্রান্ত পথিক সম ধাই অনর্থ,

ষড়রিপু সিঞ্চে তাহে কামনা প্রচুর ;

বিষয়ের ভোগ লাগি কতনা সাধনা—

মায়া গিয়া তাহে দেয় ইন্ধন যোগাড় ॥

মায়া কুহকিনী-মোহে হইয়া প্রলুব্ধ,

কামনায় বাসনায় নেচে উঠে প্রাণ ;

কুহেলিকা সম হেন ছলনা তাহার—

বিলাস-ব্যসনে মুগ্ধ নাহি মোর ত্রাণ ॥

কলুষে দলিত হিয়া ত্রিতাপে তাপিত,

দুর্লভ জীবন মোর যেতেছে বিফলে ;

কি তরে আইলু (আমি) সকলি ভুলিলু—

প্রবঞ্চনা করে মোরে ইন্দ্রিয় সকলে ॥

কজ্জলিত হিয়া এই তামস আচ্ছনে,

অশান্তির চিতা-বহি সদা ধু-ধু জ্বলে ;

নিমজ্জিত হ'য়ে আছি ভবসিন্ধুমারে
 তথায় পড়িয়া চিত্ত কাঁদিছে আকুলে ॥
 সীমাহীন পারাবার কৰ্মপথ-মারে,
 বিঘূণিত কাল-রূপ চক্রের ঘূর্ণনে ;
 দারুণ বিপদগ্রস্ত নাহিক পাথেয়—
 এ অধমে কে রক্ষিবে তব কৃপা বিনে ??
 যবে এ শরীর হ'বে পতন-উন্মুখ,
 কি হ'বে আমার গতি ভাবিয়া না পাই ;
 কত না জনমে যাতনা ভুগিয়া আমি—
 লভেছি মানব-জন্ম কোথা পাব ঠাই !!
 হেলায় গোয়া'নু সব সময় সকল
 না ভজিনু গুরু-কৃষ্ণে অমূল্য রতনে ;
 আমি যে কাল্পাল অতি পতিত অধম—
 শরণ লইনু তব অভয় চরণে ॥
 দেব ! (তাই) মলিনতা লয়ে মনের আবেগে
 এসেছি ছুটিয়া তব শ্রীচরণ পাশে ;
 ওই রাজ্য পদে আমি শরণার্থী হ'য়ে
 অজ্ঞান-আধার নাশ' আলোক-প্রকাশে ॥
 বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি অগতির গতি,
 নিরাশার আশা তুমি অকুলের কূল ;
 পতিত-পাবন তুমি দয়াময় প্রভু—
 পামর জনার সব ভেঙ্গে দিও ভুল ॥
 হে দয়াময় ! অতীব অযোগ্য যে আমি
 মম সম পাতকী ত নাহি পাবে আর ;
 তোমার কৃপাতে যেন মায়া কেটে যায়—
 ভক্তিতে আপ্লুত হোক হৃদয় আমার ॥
 বন্দিতে তোমায় মোর প্রাণে নাহি ভাষা,

হৃদয়ে ভকতি নাই তোমায় তুষিতে ;
 গুণের সাগর তুমি ভবভয়-ত্রাতা
 তোমার চরণ বন্দি' তোমার কৃপাতে ॥
 পরীক্ষার তরে যত দুঃখ দাও—
 সহিতে শকতি দাও এই অকিঞ্চনে ;
 কৃপা করি' শোধ' মম মন-মরু
 নিত্যদাস করি' রাখিও চরণে ॥
 যতই ঝঙ্কা আসুক জীবনে আমার,
 কভু যেন নাহি ভুলি নিত্যধনে ;
 মায়ামুক্ত হ'য়ে একনিষ্ঠ-মনে
 কায়-মনো-বাক্যে যেন সেবি ও চরণে ॥
 নিত্য সেবাকাজী—
 শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-১৫)

স্বতন্ত্ররূপে শিব ভজন বিষয়ে ভৃগু মুনির শাপ আছে—

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ ।

পাষণ্ডিগণ্ডে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপস্থিনঃ ॥ (ভাঃ ৪।২।২৮)

যাহারা ভবব্রতধারী (শিবোপাসক) অথবা তাহাদের অনুগামী হইবে, তাহারা সচ্ছাস্ত্র পঞ্চরাত্রাদির প্রতিকূল আচরণকারী বলিয়া পাষণ্ডী নামে খ্যাত হইবে। স্বতন্ত্ররূপে শিবের উপাসনায় পাষণ্ডিত্ব দোষ হয়, কিন্তু বৈষ্ণবরূপে তাহার উপাসনাতে দোষ হয় না।

বৈষ্ণবশাস্ত্রাদিতে বিষ্ণুর বহিরঙ্গ আবরণ-সেবকরূপে অপ্রাকৃত অত্যাশ্র দেবগণের পূজার বিধান আছে। বিষ্ণুর প্রীত্যর্থ যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে ভগবল্লোক-সংগ্রহ-উদ্দেশ্যবিশিষ্ট অথবা তাদৃশী লীলার উপযোগী নরলীলাকারী পাষণ্ডগণের দ্বারা অত্যাশ্র দেবতাগণেরও ভগবদ্ বিভূতিরূপে পূজার বিধান আছে। যথা—

ততঃ সম্পূজ্য শিরসা ববন্দে পরমেষ্ঠিনম্ ।

ভবং প্রজাপতীন্ দেবান্ প্রহ্লাদো ভগবৎকলাঃ ॥ (ভাঃ ৭।১০।২৬)

ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব অন্তর্হিত হইলে প্রহ্লাদ ভগবৎকলাশ্রুপ ব্রহ্মা, শিব, প্রজাপতি ও অন্যান্য দেবগণকে পূজা করিয়া মন্তক দ্বারা অভিষেক করিলেন।

শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন —

ক্রতুরাজেন গোবিন্দ রাজস্বয়েন পাবনী।

যক্ষ্যে বিভূতির্ভবতন্তং সম্পাদয় নঃ প্রভো ॥ (ভাঃ ১০।৭২।৩)

হে গোবিন্দ ! আমি যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজস্বয় দ্বারা আপনার পবিত্র বিভূতি সকলের যজন করিব। হে প্রভো, আপনি তাহা সম্পাদন করুন।

অতএব বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবতাগণকে ‘তদীয়’ বলিয়া উপাসনায় কোন দোষ হয় না ; কিন্তু স্বতন্ত্ররূপে অন্য দেবোপাসনা শ্রীভগবদগীতায়ও নিষিদ্ধ হইয়াছে,—

যেহপাত্তদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াষিতাঃ ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্ ॥

অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মাং অভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চাবন্তি তে ॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥

(গীতা ৯।২৩-২৫)

শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যাহারা অন্য দেবতার ভজন করে তাহারা অবিধিপূর্বক আমার ভজন করিয়া থাকে। আমিই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা ও ফলদাতা। এবিধ না জানিয়া তাহারা স্বস্থান হইতে চ্যুত হয়। অন্য দেবতার ব্রতপরায়ণ বক্তিগণ সেই সেই দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। পিতৃপূজকগণ পিতৃলোক, যক্ষরক্ষাদি ভূতপূজকগণ তত্তৎ ভূতকে এবং আমার ভজনকারী ব্যক্তি আমাকেই লাভ করে।

অতএব তদীয়-বিচারে উপাসনায় কোথায় ও গুণ বলিয়া বিবেচিত হয় ; কিন্তু অন্য দেবতার অবজ্ঞায় দোষ হয়।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ ।

ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন ॥ (পদ্মপুরাণ)

সর্বদেবেশ্বর বলিয়া শ্রীহরিই সদা আরাধ্য, কিন্তু তদিতর দেবতা ব্রহ্মরুদ্রাদিকে কখনও অবজ্ঞা করা উচিত নহে।

ন সৌরো ন চ শৈবো বা ন ব্রাহ্মো ন চ শাক্তিকঃ ।

ন চাহত্বেদেবতাভক্ণো ভবেদ্ ভাগবতোত্তমঃ ॥

শৈব, সৌর, ব্রাহ্ম বা শাক্ত কিম্বা অত্বেদেবতার ভক্তগণ কখনই ভগবদ্ভক্ত-
তুল্য হইতে পারে না । বিষ্ণুধর্মে এইরূপ উপাখ্যান শুনা যায়—পূর্বকালে
অম্বরীষ মহারাজ বহুকাল ভগবদারাধনা করিয়াছিলেন । অতঃপর একদিন
শ্রী ভগবান্ ইন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া ও গরুড়কে ঐরাবত রূপ ধারণ করাইয়া
তহুপরি আরোহন করত অম্বরীষকে বর গ্রহণে প্রলুব্ধ করেন । অম্বরীষ
ইন্দ্ররূপ দর্শনে নমস্কার করিয়া বলিলেন—যিনি আমার আরাধ্য, তিনিই
আমাকে বর দিবেন, অত্বে কেহ আমার বরদাতা নহেন । তখন ইন্দ্ররূপী
ভগবান্ বলিলেন—তোমার আরাধ্যদেবের প্রদেয় বর আমিই তোমাকে
দিব । অম্বরীষ তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় ইন্দ্র চক্র উত্তোলন করেন ।
অম্বরীষ তাহাতেও ভীত না হওয়ায় ভগবান্ নিজরূপ প্রকট করিয়া অম্বরীষকে
কৃপা করিয়াছিলেন ।

শ্রীকপিলদেব মহৎ বৈষ্ণবগণের অবজ্ঞা করা ত দূরের কথা, সাধারণ
প্রাণীদিগের অপমান কার্যেরও নিন্দা করিয়াছেন,—

অহং সর্কেষু ভূতেষু ভূতাবজ্ঞাতঃ সদা ।

তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেহর্চাবিড়ম্বনম্ । (ভাঃ ৩২৯২১)

যে ব্যক্তি সর্কভূতে অবস্থিত পরমাত্মা আমাকে মূঢ়তাবশতঃ অবজ্ঞা করিয়া
লৌকিকী রীতিতে প্রাকৃত বুদ্ধি অনুসারে আমার অর্চার পূজা করে, সে
ভগ্নে ঘৃতাহতি প্রদান করে মাত্র । এই প্রতিমাটী প্রস্তরময়ী, কাষ্ঠময়ী ইত্যাদি
রূপ মূঢ়বুদ্ধিপ্রযুক্ত যে ব্যক্তি সর্কভূতে বর্তমান পরমাত্মা আমার সহিত অর্চা
মূর্তির ঐক্যবুদ্ধি না করিয়া প্রতিমার পূজা করে সেই মূঢ় ব্যক্তির সর্কভূতে
আমার দর্শনাভাব হেতু ভূতাবজ্ঞারূপ দোষ হইয়া থাকে । সেই কারণে ভগ্নে
হোম করিলে যেমন বৃথা হয়, তদ্রূপ বিষ্ণু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিরও ফললাভ
হয় না ।

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ ।

ভূতেষু বদ্ধবৈরশ্চ ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥ (ভাঃ ৩২৯২৩)

পরদেহে অন্তর্যামী ও আশ্রয়রূপে অবস্থিত আমাকে না জানিয়া অপরের
বিদ্বেষকারী, দেহে আত্মাভিমামী এবং প্রাণীদের প্রতি শত্রুতাবদ্ধ ব্যক্তির
মন কখনও শান্তি লাভ করে না ।

মহাভারতেও আছে--

পিতৈব পুত্রং করুণো নোদ্বৈজয়তি যোজনম্ ।

বিশুদ্ধস্ত হৃষীকেশস্তস্ত তুর্গং প্রসীদতি ॥

রূপালু পিতা যেমন পুত্রকে উৎপীড়ন করে না, তদ্রূপ যিনি অশু ব্যক্তিকে উদ্বিগ্ন দেন না, তাহার প্রতি ভগবান সত্ত্বর সন্তুষ্ট হন ।

সাধক যে পর্য্যন্ত সর্বভূতে অবস্থিত ভগবানকে না জানিতে পারেন তাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রতিমার অর্চন করা কর্তব্য ।

অর্চাদৌ অর্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মকুং ।

যাবন্ন বেদ স্ব-হৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥ (ভাঃ ৩।২৯।২৩)

আবার স্বধর্মপূর্বক অর্চন করিলেও প্রাণীদের প্রতি দয়া না করিলে অর্চন সিদ্ধ হয় না ।

আত্মনশ্চ পরস্তাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্ ।

তস্ত ভিন্নদৃশৌ মৃত্যুবিদধে ভয়মুৎপাদনম্ ॥ (ভাঃ ৩।২৯।২৬)

যে ব্যক্তি নিজের ও পরের মধ্যে অতাল্প মাত্রও ভেদ দর্শন করে, মৃত্যু-স্বরূপ আমি সেই ভেদ-দর্শীকে অত্যুৎকট ভয় প্রদর্শন করি । অতএব মিত্র-ভাবে অভেদ দর্শনপূর্বক সর্বভূতে অবস্থিত ভগবানকে দানমানাদির দ্বারা পূজা করা কর্তব্য ।

জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হুজীবানাং ততঃ প্রাণভূতং শুভে ।

ততঃ সবিজ্ঞাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥

তত্রাপি স্পর্শবেদিভাঃ প্রবরা রসবেদিনঃ ।

তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥

রূপভেদবিদাস্তত্র ততশ্চোভয়তোদতঃ ।

তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুস্পাদন্ততো দ্বিপাং ॥

ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ ।

ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হর্থজ্ঞোহভ্যধিকস্ততঃ ॥

অর্থজ্ঞাং সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বকর্মকুং ।

মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোক্ষা ধর্মমাত্মনঃ ॥

তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ ক্রিয়ার্থান্না নিরস্তরঃ ।

ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংতুস্তকর্মণঃ ॥

ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তুঃ সমদর্শনাং । (ভাঃ ৬।২৯।২৮-৩৩)

অচেতন পদার্থ অপেক্ষা সচেতন পদার্থ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা স্বাসাদি ক্রিয়াশীল প্রাণবৃদ্ধিমান জঙ্গম পদার্থ শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা জ্ঞানবান শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা ইন্দ্রিয়-বৃত্তিবিশিষ্ট বৃক্ষাদি শ্রেষ্ঠ । স্পর্শ অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবশীল বৃক্ষাদি অপেক্ষা জিহ্বেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবশীল মৎস্তাদি শ্রেষ্ঠ ; তাহাদের অপেক্ষা নাসিকেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভবশীল ভ্রমরাদি শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা কর্ণদ্বারা অনুভবশীল সর্পাদি শ্রেষ্ঠ । তাহাদের অপেক্ষা রূপভেদবিৎ কাকাদি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা উভয় দিকে দন্তুবিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ । তদপেক্ষা বহুপদজীব শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা চতুষ্পদ এবং চতুষ্পদ হইতে দ্বিপদ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ । মনুষ্য মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্মণ মধ্যে বেদজ্ঞ, বেদজ্ঞ অপেক্ষা বেদার্থবিৎ, তদপেক্ষা সংশয়চ্ছেত্তা, তদপেক্ষা স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানকারী শ্রেষ্ঠ । তাহা অপেক্ষা নিকাম জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষাও আমাতে কায়মনোবাক্য সমর্পণকারী ভক্তই শ্রেষ্ঠ । আমাতে সর্বস্ব সমর্পণকারী ও সর্বভূতে সমদর্শী ভক্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই ।

অন্য জীবের প্রতিও যোগ্যতাসারে যথাশক্তি আদর করা কর্তব্য ।
তৎসম্বন্ধে ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি—

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ব বহমানন্ ।

ঈশ্বরে। জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ (ভাঃ ৩।২৯।৩৪)

ভগবান্ কিছুই অন্তর্যামিরূপে জীব হৃদয়ে প্রবিষ্ট আছেন, ইহা জানিয়া সকল প্রাণীকেই মনে মনে বহমানপুরঃসর প্রণাম করিবে । ‘জীবকলয়া’ অর্থে সেই সেই জীবহৃদয় পরিদর্শনপূর্বক অন্তর্যামিরূপে । এইরূপে প্রথমোপাসক-গণের সম্বন্ধেই সর্বভূতের আদর বিহিত ; কিন্তু শ্রদ্ধাবান সাধকগণের সর্বত্র ভগবদ্বৈভব স্মৃতি বিদ্যমান বলিয়া তাহাদের সর্বভূতাদর স্বভাবতই হইয়া থাকে । জাতরতি ব্যক্তিদের অহিংসা ও বৈরাগ্যই স্বভাব ।

যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা ব্যপোহু দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্ ।

ব্রজন্তি তৎপারমহংসমন্ত্যং যস্মিন্নাহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্ম ॥ (ভাঃ ১।১৮।২২)

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যখন ভগবানে অনুরক্ত হইয়া সহসা দেহাভিমান পরিত্যাগ করিয়া সাধনের পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত পরমহংসাবস্থা লাভ করেন, তখন অহিংসা ও উপশম-নিরুত্তি তাহাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম হয় ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী ত্রীমন্ত্রিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

দুই চোর

(নাটিকা)

শ্রীধাম মায়াপুর

জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ

[জগন্নাথ মিশ্র ও শিশু নিমাইকে কোলে করিয়া শচীদেবী]

শচীদেবী—ওগো, বাছা নিমাইয়ের এবার একটা বেশ ভাল দেখে বিশেষ শক্তিশালী রক্ষাকবচ ক'রে দাও। কি জানি,—আমার বড় ভয় করে।

মিশ্র—কেন কি হ'ল?

শচীদেবী—হয় নি কিছুই; তবে আমাদের ঘরে এখন খুব বিপদ চলছে কিনা, তাই!

মিশ্র—তা' যা বলেছো! বিপদের পর বিপদ একটা লেগেই আছে। তবে নারায়ণ যা' করেন, তাই হবে। তুমি রক্ষাকবচ করার কথা বলছ বটে,—কিন্তু রক্ষাবন্ধ তো নিমাইয়ের অনেক রয়েছে।

শচীদেবী—যতই রক্ষাবন্ধ থাকুক তবু একটা গড়িয়ে দিও। আর এবারের রক্ষাকবচ! যেন মহাশক্তিসম্পন্ন আজীবন ফলপ্রদ হয়। (নিমাইয়ের মুখে চুম্বন করিয়া) অহা বাছা রে! এই সেদিন বাছা আমার এক সাপের উপর গুয়ে খেলা করছিল;—এ সমস্ত কাণ্ড দেখেও কি তোমার একটু হুঁস হয় না! হাজার রক্ষাবন্ধ থাকলেও সে দিনের বিপদ দেখে আর স্থির থাকা যায় না। শীঘ্র শীঘ্র রক্ষাকবচটা গড়াবার ব্যবস্থা কর।

মিশ্র—দেখছি নিমাইকে রক্ষাকবচ পরাবার তোমার একান্তই ইচ্ছা! আচ্ছা, আচ্ছা! খুব শীঘ্রই ওর রক্ষাকবচ গড়াতে দিচ্ছি। কোন ভয় নেই,—ভগবান ওকে রক্ষা করবেন। তিনিই একমাত্র রক্ষাকর্তা!

(নিমাইকে কোলে লইবার জন্ত হাত বাড়াইয়া) আয় বাবা, আয়—বুকে আয়।

(শিশু নিমাইকে মিশ্র ক্রোড়ে লইলেন)

শচীদেবী—তবে তুমি একে নিয়ে একটু এইখানে থাক। আমি একবার ভিতরে যাচ্ছি। বাছার আমার বড় খিদে পেয়েছে, একটু দুধ নিয়ে আসি। (মিশ্র-ক্রোড়-স্থিত নিমায়ের প্রতি) বাবা, তা'হলে আমি যাই। (নিমাইকে চুম্বন করতঃ) আমি এখনই আসছি। এসে তোমায় দুধ খাওয়াব।

[শচীদেবীর গমন]

মিশ্র—(নিমাইকে কোলে করিয়া পাঁচারি করিতে করিতে ও নিমাইকে পুনঃ পুনঃ চুষন করিতে করিতে)

ওরে আমার বুকের মাণিক

আমার প্রাণ-ধন,

নিমাই আমার সোনার নিমাই

জগৎ-জীবন।

(কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা চিস্তিত হৃদয়ে)

তাইতো, বড় ভুল হয়ে গেছে! এখনও তো শালগ্রাম পূজা হয় নি'।
(নিমাইয়ের প্রতি) বাবা নিমাই, তুমি এইখানে একটু খেলা কর। আমি শালগ্রাম পূজা সেরে এখনই আসছি। আর তোমার মা-ও এখনই এসে পড়বে। [নিমাইকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া মিশ্রের প্রস্থান]

[শিশু নিমাই খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন]

* * * *

জগন্নাথ মিশ্রের বাটীর বহিঃভাগ

[নিমাই নিরালায় হামাগুড়ি দিতে দিতে ঘরের দরজা পার হইয়া অঙ্গনে আপন মনে খেলা করিতেছেন। তাঁহার জ্যোতির্ষ্ময় শ্রীঅঙ্গে স্বর্ণ ও মণি মুক্তার অলঙ্কার শোভা পাইতেছে]

(ইত্যবসরে ১ম চোর ও ২য় চোরের প্রবেশ)

১ম চোর—(দূর হইতে নিমাইকে দেখিতে পাইয়া) দেখ, দেখ,—কেমন সুন্দর নয়নাভিরাম একটা খোকা খেলা করছে। আহা, এমন জ্যোতির্ষ্ময় দেহ তো কখনও দেখি নি। যেমন রঙ্, তেমনি উঙ্। দেখ্ ভাই, দেখে মনে হচ্ছে যেন কোন ময়ূর নৃত্য করছে। (নিমাইয়ের নিকটবর্তী হইয়া) অহো, দেখ্ দেখ্, শিশুর দিব্য অঙ্গে কত দামী দামী গহনা ঝল্‌ঝল্‌ করছে। এমন দামী গহনা তো কখনো চোখেও দেখি নি! কত মণি মুক্তা দিয়ে এ সমস্ত গহনা তৈরী! ভাইরে,—কেয়াবাং, কি স্মৃতি; এবার ওগুলো খুলে নেবার ব্যবস্থা কর।

২য় চোর—তাইতো, ছেলেটির দেহের রঙ্ ঠিক যেন কাঁচা সোনার মত। এর দেহের অনুপম ঔজ্জ্বল্য যেন মণি মুক্তার গহনাগুলোর সৌন্দর্য্যকেও চাপা দিয়েছে। এ শিশুর নিকটে তো কোন অভিভাবকও দেখ্‌ছি না। এ শিশু কার?

১ম চোর—ও যারই ছেলে হোক, তোর তা' জেনে লাভ কি ? এখন স্থানটার চারিদিক ভাল করে তাকিয়ে দেখে নে,—নিকটে কেউ আছে কি না। (ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করতঃ) কই—আমার তো কাউকে নজরে পড়ে না। নে—নে, এই সন্ধ্যোগে ওর গহনাগুলো খুলে নে।

২য় চোর—(১ম চোরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া একমনে শিশু নিমাইয়ের প্রতি চাহিয়া) দেখ—দেখ, কি সুন্দর শিশু! চরিত্রের চোখের মত চোখ দুটি টানা টানা। হাত দু'খানি কি তুলতুলে,—হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা। ঠোঁট দু'টি ঝক ঝিকের মত। আহা, ছেলেটির গায়ে কি দিব্য জ্যোতি...
.....পূর্ণিমা চাঁদের স্নিগ্ধ শুভ্র কিরণের মত মনোমুগ্ধকর। পা দু'টি লাল টিকটকে। নখগুলির আভাষ চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে। বাঃ—কি সুন্দর! ছেলেটি হামাগুড়ি দিয়ে যাচ্ছে, আর ঐ রাঙা পা দু'টি দিয়ে যেন রক্ত ঝড়ে পড়ছে। বাছার সর্ব্ব শরীর পদ্মগন্ধে ভরপুর! নদীয়া নগরে এমন ছেলে তো কোথাও দেখি নি!

১ম চোর—তুই কি ছেলেটার রূপ দেখে পাগল হয়ে গেলি? নাঃ—এ ছোঁড়াটা কোন কাজের নয় দেখছি। (২য় চোরের গায়ে হাত দিয়া) এই, কি ভাবছি? তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নে,—শিশুর রূপ দেখে মুগ্ধ থাকলে চলবে না। দেরী হ'লে কেউ এসে পড়তে পারে। তুই ওকে ধর দেখি; আমি বরং ওর গহনাগুলো একে একে তাড়াতাড়ি করে খুলে নিই। অবিলম্বে কাজ হাঁসিল ক'রে চম্পট দিতে হবে।

[নিমাইয়ের গায়ের গহনা খুলিতে উদ্যত হইল]

২য় চোর—(১ম চোরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) ভাই, গহনা খুলতে গেলে দেরী হয়ে যাবে। ঐ ছেলেটা কাঁদতে শুরু করতে পারে। তার চেয়ে ওকে বরং কাঁধে তুলে নিয়ে পালাই চল। আমাদের ঘরে নিয়ে নিশ্চিন্তে ওর সমস্ত গহনা খুলে নেওয়া যাবে। আর শিশুটির অমন রূপ দেখে ওকে কেনা চুরি ক'রে নিয়ে যাবে ভাই! কাজেই এখানে তাড়াতাড়ি ক'রে গহনা না খোলাই ভাল।

১ম চোর—তাই হোক! তবে ছেলেটা যদি পথে কোথাও কাঁদে তা'হলে কিন্তু ধরা পড়ে যাবার ভয়।

২য় চোর—আমার কাছে এক খণ্ড সন্দেশ আছে। ওকে সন্দেশের লোভ দেখিয়ে কাঁধে করে অনায়াসেই নিয়ে যাওয়া চলবে। তো'কে অত ভাবতে হবে না।

১ম চোর—তা'হলে আমিই কাঁধে করি !

২য় চোর—তাই কর । তবে ওকে নানারকম প্রবোধ কথায় ভুলিয়ে তুষ্ট করে কাঁধে নে, ...দেখিস্ যেন ও চাঁৎকার করে না । তা'হলেই ব্যস্—কৰ্ম্ম ফতে ।

১ম চোর—(নিমাইকে কাঁধে লইবার জন্ত হাত বাড়াইয়া) আয় বাবা—বুকে আয় ! (শিশু নিমাইয়ের হাত দু'টি ধরিয়া) আয় মাণিক, ওরে নয়নের ধন,— আমার সোনামণি, বাছা রে.....আয় বাবা !..... [শিশু নিমাই

হাসিমুখে হাত বাড়াইলেন ও ১ম চোর নিমাইকে কাঁধে করিল]

২য় চোর—এতক্ষণ কোথা ছিলি বাপ্ ! চল বাপ্, ...তাড়াতাড়ি ঘরে যাই । নে,—সন্দেশ খা (নিমাইয়ের হস্তে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সন্দেশ দিতে লাগিল) ।

[১ম চোর নিমাইকে কাঁধে করিয়া অগ্রে ও ২য় চোর তাহার পিছু পিছু রওনা হইল] ।

“আথে ব্যাথে কোলে করি দুই চোর ধায় ।”

লোকে বলে যার শিশু সেই ল'য়ে যায় ॥

অৰ্কুদ অৰ্কুদ লোকে কেবা করে চিনে ।

মহাতুষ্ট চোর অলঙ্কার দরশনে ॥”

[কিয়ৎদূর গমন করতঃ]

১ম চোর—আমি ছেলেটার বালা ছ'জোড়া নেব ।

২য় চোর—তুই যদি বালা নিস্, তা'হলে আমি কিন্তু ওর হুপূর নেবো ।

১ম চোর—যাই নাও, উভয়ের ভাগ তো সমান হ'তে হবে ।

২য় চোর—বালা ও হুপূরের ওজন এমন কিছু কম বেশী হবে না ।

তা'ছাড়া আরও তো বহু গহণা রয়েছে,—হার, তাগা, অঙ্গুরী আরও কত কি !

১ম চোর—ভাই রে, আজ আমার কি আনন্দ ! আজ সকালে যে কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, ...না চাইতেই এত সোনা,—মাণিক্য !

২য় চোর—চল, এখানে রাস্তায় বেশী কথা বলে কাজ নেই ! আগে আমাদের ঘরে পৌঁছাই,—তারপর..... ! [উভয়ের প্রস্থান]

(ক্রমশঃ)

—শ্রীচিন্তরঞ্জন মণ্ডল

নববর্ষে শরণাগতি ।

একে একে কত	পুরাতন বর্ষ	মিলিত অতীতকালে ;
ক'দিনের কথা	জানে ইতিহাস	গণিয়া সনাক্দসালে ?
আজি নববর্ষে	ভাবি আরো কত	আসিবে নবীন বর্ষ,
এ বিশ্ববাসীর	জীবনে লাগাবে	কত সুখ-দুঃখ-স্পর্শ ।
এই যাতায়াত	নাগর দোলায়	উত্থান-পতন খেলা,
বিরহ-মিলন,	জীবন-মরণ	চলে বিশ্বে সারা বেলা ।
অবিরামগতি	চলিছে জগৎ,	মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নাই ;
পরিবর্তনের	নিষ্পেষণ যন্ত্রে	নব নব রূপ পাই ।
কে আছে কোথায়,	কোন্ বিশ্বকর্মা	যন্ত্র কি থামাতে নারে ?
সংখ্যাভীত গ্রহ,	তারা, চন্দ্র, সূর্য্য,	নিশিদিন ঘুরে মরে ।
ঘোরে বিশ্বজীব,	অনুপরমানু,	কা'রো অব্যাহতি নাই,
দে'খে বিবর্তন,	ব্রহ্মাণ্ড-নর্ত্তন,	মাথা ঘোরে সর্বদাই ।
কোথায় দাঁড়াব,	কা'র কাছে যাব,	কে অপরিবর্তনীয় ?
ভক্ত-ভাগবত.	বৈষ্ণব চরণ	সর্বাগ্রেই বন্দনীয় ।
সর্বকালাতীত	সত্য ভগবান্-	নিত্যতৃপ্ত আত্মারাম ;
সেইরূপ ভক্ত,	শ্রীগুরু-বৈষ্ণব,	আত্মতৃপ্ত আপ্তকাম ।
শ্রীভগবানের	তদীয় জনের	সঙ্গই পরমাশ্রয় ;
লভে যেই জন	এ চৌদ্দ ভুবন	আর না ভ্রমিতে হয় ।
তাই নব বর্ষে	শ্রীহরি-শ্রীগুরু-	বৈষ্ণবচরণ-তরী,
ভব সিন্ধুপার	হ'ব অনায়াসে	যতনে শরণ করি ।

বৈষ্ণব দাসানুদাস

কবিরত্ন শ্রীযতুবর ভক্তিশাস্ত্রী, M. A., B. T.

শ্রীশ্রী একাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, পঞ্চবিংশ অধ্যায়]

(পূর্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬১ পৃষ্ঠার পর)

মোক্ষদা একাদশী-উৎপত্তি ও বিবরণ—

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“হে দেবদেবেশ ! হে বিষ্ণু ! আপনাকে আমি বন্দনা করি। আপনি ত্রিলোকের সুখদায়ক, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বকর্তা, পুরুষোত্তম। আমার একটি মহাসংশয় আছে। লোক সকলের হিতার্থে ও পাপক্ষয়-নিমিত্ত আমি তাহা আপনাকে নিবেদন করিতেছি। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয়া যে একাদশী তাহার কি নাম, কি বিধি ও কোন্ দেবতা ঐ একাদশীতে পূজিত হন তাহা আমাকে সবিস্তারে বর্ণনা করুন।”

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—“হে মহারাজ ! আপনি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উহা দ্বারা আপনার যশঃ চতুর্দিকে বিস্তৃত হইবে। এক্ষণে অগ্রহায়ণী শুক্লপক্ষীয়-একাদশীর কথা বলিতেছি। ইহা শ্রবণ মাত্রেই বাজপেয়-যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে।”

হে যুধিষ্ঠির ! এই একাদশী ‘মোক্ষদা’ নামে কথিতা হন। ইনি সর্বপাপনাশিনী ও ব্রতমধ্যে শ্রেষ্ঠা। ইহার দেবতা শ্রীদামোদর। যত্নের সহিত তুলসী, তুলসী-মঞ্জরী, ধূপ, দীপ প্রভৃতি দ্বারা শস্ত্রীয় বিধি অনুসারে শ্রীদামোদর দেবের পূজা করিবে। দশমী ও একাদশী দিবসের কৃত্যাদি পূর্বে কথিত একাদশী ব্রতের জ্ঞায়। এই ব্রতদিনে আমার স্তব, নৃত্য ও গীতাদি সহযোগে রাত্রি-জাগরণ করিবেন। হে মহারাজ ! এই একাদশীর সম্বন্ধে একটি অলৌকিক কাহিনী আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহার শ্রবণ মাত্রেই সকল পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যাহার পিতৃগণ নিজ নিজ পাপবশতঃ অধোযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই ব্রতাচারণের পুণ্যফল তাহাদিগকে বিন্দু মাত্রও প্রদান করিলে তাহারাও মোক্ষ প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই।

মনোরম চম্পক নগরে বৈষ্ণব সদৃশে বিভূষিত বৈখানস নামক এক নৃপ ছিলেন। তিনি পুত্রের জ্ঞায় প্রজাগণকে পালন করিতেন। তাঁহার রাজ্যে বেদবেদাঙ্গ-পারঙ্গত বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। উক্ত ভূপতির রাজ্য-মধ্যে প্রজাগণ সকলেই সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। এইরূপ সুশৃঙ্খল

ভাবে রাজ্য পরিচালনাকারী সেই নৃপ অনন্তর একদিন রাত্রিকালে স্বপ্ন মধ্যে দেখিতে পাইলেন, নিজের পিতৃগণ অধোযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপে সেই পিতৃগণকে নরকে পতিত দেখিয়া বৈখানস রাজা বিস্ময়া-বিষ্টচিত্তে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় ব্রাহ্মণগণের নিকট পরদিবস বর্ণনা করিতে লাগিলেন,—“হে ব্রাহ্মণগণ! আমি গত রাত্রে স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলাম যে আমার পিতৃপুরুষগণ নরকে পতিত হইয়াছেন এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া ‘হে পুত্র তুমি আমাদেরকে এই নরক-সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর’—এইরূপ বলিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ রোদন করিতেছেন। আমি তাহাদিগের এতাদৃশ অবস্থা দেখিতে পাইয়া অন্তরে তদবধি কোনও স্মৃতি প্রাপ্ত হইতেছিলাম। হে ব্রাহ্মণগণ! আমার এই বিশাল রাজ্য, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি এবং অশ্ব, হস্তী কিছুতেই স্মৃতিবোধ হইতেছেন। কি করি, কোথায় যাই,—এই চিন্তায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। বাহা হারা আমার পূর্বপুরুষগণ মুক্তিলাভ করিতে পারেন, সেক্ষেপ কোন ব্রত, তপস্যা বা যোগের কথা আমাকে উপদেশ করুন। আমি তাহাই আচরণ করিব। আমার মত শক্তিশালী পুত্র বিচ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি পিতামাতা পূর্বপুরুষগণ ঘোর নরকে পতিত হ’ন, সেক্ষেপ পুত্র হওয়া কি প্রয়োজন? ব্রাহ্মণগণ কহিলেন—“হে মহারাজ! আপনার রাজ্যের সন্নিকটেই পর্বত মুনির বিশাল আশ্রম রহিয়াছে, সেই মুনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষি। তাঁহার নিকট গমন করুন। তিনি আপনার কর্তব্য নির্ণয় করিয়া দিবেন।”

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—“হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণগণের এক্ষপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাত্মা বৈখানস রাজা তৎক্ষণাৎ শীঘ্রই সেই পর্বতমুনির আশ্রমে গমন করিলেন। রাজাকে গমনোদ্যত দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণগণ ও সভাস্থ প্রজাগণ তাঁহাকে বেষ্ঠন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই রাজা পর্বত ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ মুনিগণ বেষ্টিত দ্বিতীয় ব্রহ্মার হায় উপবিষ্ট সেই ঋষিকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়াই সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। তৎপর নিকটে যাইয়া পুনরায় তাঁহার চরণদ্বয় স্পর্শ পূর্বক প্রণাম করিলেন। মুনিবর রাজার সপ্তাঙ্গের কুশল, রাজ্যের নিদ্রাক্তকত্ব ও রাজ্য-সুখ অব্যাহত আছে কি না ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

রাজা বলিলেন—“হে প্রভো! আপনার অনুগ্রহে আমার সপ্তাঙ্গের কুশল।

বিষ্ণুরত ভবাদৃশ মহৎজনের যাহারা ভক্ত, তাহাদের কখনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। তবে আমি একদিন রাত্রে স্বপ্নযোগে আমার পিতৃপুরুষগণকে নরকে অবস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তাঘ্রিত হইতেছি। হে ঋষিবর! কোন্ পুণ্যের ফলে তাহারা এই নরক হইতে মুক্তিলাভ করিবেন, তাহা জানিবার জন্ত আপনার এখানে আমার আগমন। আপনি এ বিষয়ে আমার জন্ত একটি উপায় নির্ণয় করিয়া দিন। পিতৃপুরুষগণের মুক্তির জন্ত আমি তাহাই আচরণ করিব।”

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মতুল্য তপস্বী পর্বত মুনিরাজ পিতৃগণের নরক যাতনার কারণ অবগতির জন্ত নির্মলিত নেত্রে ধ্যানস্থ হইলেন। এক মুহূর্তকাল ধ্যানস্থ অবস্থায় থাকিবার পর রাজাকে বলিলেন—“হে মহারাজ তোমার পিতৃগণের পূর্বজন্মের দুষ্কর্ম আমি জানিতে পারিয়াছি। পূর্বজন্মে তোমার পিতা রাজ্য গর্বে গর্ভিত ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তিনি নিজ পত্নীর ঋতু দান না করিয়াই রাজধর্মের প্রেরণায় ঋতুমতী স্ত্রীকে গৃহে রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। পত্নীর ঋতুকালে ঋতুদান না করা পাপপ্রভাবেই তোমার পিতা পিতৃগণের সহিত দারুণ নরকে পতিত হইয়াছেন।” এই কথা শ্রবণ করিয়া বৈখানস রাজা পুনরায় পর্বত ঋষিকে বলিতে লাগিলেন,— “হে মুনিবর! কোন্ ব্রতের প্রভাবে তাহাদের এই হইতে মুক্তি হইতে পারে?”

মুনি কহিলেন—“হে রাজেন্দ্র! অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয় মোক্ষদা-নামা শ্রীহরির তিথি আছে অর্থাৎ একাদশীব্রত আছে; তোমরা সকলে সেই ব্রত পালন পূর্বক তাহার পুণ্যফল তোমার পিতাকে প্রদান কর সেই মোক্ষদা ব্রতের পুণ্য প্রভাবে তোমার পিতার মোক্ষ লাভ হইবে।”

রাজা মুনির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ গৃহে আগমন করিলেন এবং অতিকষ্টে অনেকদিন পরে সেই অগ্রহায়ণী শুক্লা একাদশী তিথিকে প্রাপ্ত হইয়া, পুত্র ও অস্তঃপুরচারী সকলের সহিত যথা বিধানে সেই মোক্ষদা—একাদশী ব্রত পালন করিয়া তাহার ফল নিজ পিতার উদ্দেশে প্রদান করিলেন। উক্ত পুণ্যফল পিতৃপুরুষগণকে প্রদান মাত্রই আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। অনন্তর বৈখানস রাজার পিতা পিতৃগণের সহিত নরক হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গে গমনকালে আকাশ হইতে রাজাকে পুণ্য বাক্য বলিতে লাগিলেন, হে পুত্র! তোমার মঙ্গল হউক! তোমার মঙ্গল হউক!!

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই প্রকারে যে ব্যক্তি এই শুভদায়িনী মোক্ষদা একাদশী ব্রতচারণ করে তাহার সমস্ত পাপই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং মৃত্যুর পর সে মোক্ষ লাভ করে। এই মোক্ষদা একাদশী হইতে পুণ্যতর কোন ব্রত অতীবাদি সৃষ্ট হয় নাই। এই ব্রতের পুণ্য সংখ্যা আমিও জানি না, চিন্তামণি তুল্য এই ব্রতটি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এই ব্রত মানবগণকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে। এই ব্রতকথা পঠন এবং শ্রবণ করিলেও বাজপেয় যজ্ঞের ফললাভ হইয়া থাকে।

ইতি—শ্রীপদ্ম পুরাণে উত্তর খণ্ডে মার্গশীর্ষ-গুরুপক্ষীয় মোক্ষদা একাদশী-ব্রত
-কথন নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণ তীর্থ

আর কেন ?

আর কেন ছুট মন রয়েছ ভুলিয়া ?

মোহ-ঘোরে অন্ধ আঁখি গেল না খুলিয়া ?

আর কেন মাংসপিণ্ডে কর আত্মজ্ঞান ?

তার সূত্রে মাংসপিণ্ডে আত্মীয় সম্মান !

আর কেন জড়রূপে দেখ পূজ্য দেবে ?

জলমাত্রে তীর্থজ্ঞানে লাভ কিবা সেবে ?

আর কেন ভক্তবরে নাহি কর রতি ?

আত্ম নিজ-পূজ্য তীর্থ-বোধে দৃঢ় মতি ?

আর কেন গোখরের বুদ্ধি নাহি ত্যজ ?

মায়ামোহে প'ড়ে মিছা জড়স্থখে মজ ?

আর কেন তর্ক্য দেবে শিলাবুদ্ধি কর ?

কৃষ্ণপ্রার্থ গুরুদেবে মর্ত্যবুদ্ধি ধর ?

আর কেন বিপ্রগুরু বৈষ্ণব-প্রধানে,

জাতিবুদ্ধি অপরাধ কর দৃষ্টজ্ঞানে ?

আর কেন কলিমল-বিধৌতকারণ—

বিষ্ণু বৈষ্ণব-পাদোদকে কর নীর-জ্ঞান ?

আর কেন সর্বপাপনাশন-ঔষধি

শ্রীবিষ্ণু-শ্রীনাম-মন্ত্রে শব্দসাম্য-বুদ্ধি ?

আর কেন সর্বেশ্বর বিষ্ণুর সমান

অন্য দেব দেবীসম করিছ রে' জ্ঞান ?

এই সব বুদ্ধি যা'র নারকী সে জন।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র ফুকারিয়া ক'ন ॥

—শ্রীঅধোক্ষজ দাস ব্রহ্মচারী, B. A.

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

পূর্ব পূর্ব বৎসরের অতুলনীয়, অতুজ্জল ঐতিহ্য মণ্ডিত শ্রীনবদ্বীপ ধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিগত ১৮ই ফাল্গুন ১৩৭২, ইং ২রা মার্চ ১৯৬৬ বুধবার হইতে ২৪শে ফাল্গুন, ৮ই মার্চ মঙ্গলবার পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিরাট মহামহোৎসবের মাধ্যমে সমন্বিত হইয়া গৌররসবিহীন বিবর্তবাদী মরুবিধে পুনরায় কৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তন-সুধধ্বনির মায়াশৈলেন্দ্র বিচূর্ণকারী খরশ্রোতা বান প্রবাহিত করিয়াছেন। তদুৎ অবিশ্রান্ত শ্রীনাম-নিবাদ অক্ষজ জ্ঞান-প্রমত্ত-বর্গের সর্পিলা জিহ্বা শুভনপূৰ্ব্বক বৈয়াকরণিক তথা পদার্থ বৈজ্ঞানিক-গণের ধ্বংসশীল শব্দের স্ফোট হইতে বেদান্তের সৰ্বশেষ সূত্র—“অনাবৃতি শব্দাৎ অনাবৃতি শব্দাৎ”—এ লক্ষিত Ever existing spontaneous—শব্দব্রহ্মের অসকল আবৃতি-স্ফোটেরই সৰ্বশ্রেষ্ঠ স্থাপন করিয়াছে। নিত্যবস্তুর ধ্বংস হইবার নহে। ভোগাভাবে ইন্দ্রিয়সৰ্ব্ব অতৃপ্ত জনগণের ক্রোধাক্রণ লোচনে ভীত, সমস্ত দেশনেতৃবৃন্দের হিতাহিতজ্ঞানশূন্যাবস্থায় কেবল জিগীষু মনোভাবের ভয়ঙ্কর অভিব্যক্তির ফলস্বরূপ দেশব্যাপী চরম অরাজকতা ও অনাচারে লুপ্ত ষড়ৈশ্বর্যানুসন্ধানে ব্যস্ত কর্মকান্ত জগৎ এই কয় দিবস শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পাদপীঠে সমগ্র ঐশ্বর্যের নীর৷ স্থিতি দর্শনে বিস্মিত, বিমুগ্ধ।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত কলিপাবন গৌররস-পিপাসু সহস্র সহস্র যাত্রীবৃন্দের মুহূৰ্হু হরিকীৰ্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণে উৎসব-প্রাঙ্গণে সমাগত অগণিত জনশ্রোত সেদিন কেবল একটাই জিজ্ঞাসা অপ্রাকৃত-কুলমুকুটমণি অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিয়াছিলেন, —“স্বামীজি, এ-কি ক'রে আপনার সম্ভবপর হ'ল?” কয়েক সহস্র-সংখ্যক যাত্রীর প্রাতাহিক প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনীয় বিষয়ের (বাসস্থান-মহাপ্রসাদ-দানাদি) গুরুদায়িত্ব গ্রহণ নিতান্ত নাস্তিকের হৃদয়েও “কৃষ্ণেচ্ছায় সকলই সম্ভব”—বাক্যাটীতে অনাদর পোষণকারীর প্রতি একাত্মী বাণ যোজনার তীব্রাকাজ্জ্বল সমিতির সদস্যবৃন্দের সহিত বাক্যালাপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। স্নহঃখদ রাষ্ট্রবিপ্লবে সৰ্বত্রই হতাশার কালধ্বনি, নগ্ন ভোগ-পিপাসায় চঞ্চল ইন্দ্রিয়ের দোদীর্ঘ প্রতাপে ইন্দ্রিয়ীর উদ্দাম নর্তন ও মাংসস্থায় নীতিতে একের অন্তপ্রতি বিশ্বগ্রাসী লেলিহান জিহ্বার সম্প্রসারণে শৃঙ্গোপরিস্থিত সর্বপের ত্রায় অস্থির

বিশ্বের যাবতীয় আধিপত্য-রহিত কৃষ্ণকীর্তন-মহোৎসব-মুখর শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণ চিত্তানিরোধ-মানসে কৃষ্ণোপাসনালালসায়ুক্ত হইয়া সর্বত্র পরিভ্রাম্যমান দেবর্ষি নারদের অন্তিমে গম্যন্তল Law of Gravitation, তথা প্রজাপতি দক্ষের অভিশাপমুক্ত ধারকাপুরীর সমতুল অবস্থাই দর্শককে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে।

সঙ্কীৰ্ত্তনমুখে ষোড়শকোশব্যাপী শ্রীনবদীপধাম-মণ্ডল পরিক্রমাকালে ফাল্গুনের নবনিদাঘ তপ্ত সহস্র সহস্র যাত্রিবৃন্দ শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন্ত-মুদঙ্গ ত্রিদিগ্ভিপাদ

১। শ্রীমদ্ভক্তিজীবন জনার্দন মহারাজ। ২। শ্রীমদ্ভক্তিব্যারিধি পুরী মহারাজ।
৩। শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমসুত উদ্ধারিত মহারাজ। ৪। শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ।
৫। শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমসুত ত্রিবিক্রম মহারাজ। ৬। শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমসুত বামন মহারাজ।
৭। শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমসুত নারায়ণ মহারাজ। ৮। শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমসুত হরিকণ্ঠ মহারাজ।
৯। শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমসুত মুণি মহারাজ। ১০। শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমসুত উর্দ্ধমহী মহারাজ।
১১। শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমসুত পর্যটক মহারাজ। ১২। শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমসুত ত্রিদিগ্ভী-
মহারাজ। ১৩। শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমসুত দ্বিগুদৈবত মহারাজ। ১৪। শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমসুত
ব্যোমসুত পরগাধৈতী মহারাজ। ১৫। শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমসুত রাধাকান্তী মহারাজ। ১৬।
শ্রীমদ্ভক্তিব্যোমসুত সজ্জন মহারাজ-বৃন্দের ভক্তিরসামৃত হরিকথা, সুরসিক ভক্ত-
বৃন্দের কৃষ্ণকথা-রহস্য, অযন্তে অকণ্ঠী ভক্তগণ-গীত গৌরবিহিত স্মধুর কীর্তন
শ্রবণে অপনোদিত ক্লান্ত হইয়া বিমলানন্দ ও পরমাশান্তি লাভ করিতেন।
এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীহরি-কীর্তন নাট্যমন্দিরে সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী,
ওড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি ভাষায় গৌর-গুণগ্রাহিগণের জ্বলন্ত কীর্তন,
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত সচ্ছাস্ত্রজ্ঞ ত্রিদিগ্ভিসন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী-
গণের মুখোদগীর্ণ বিবিধভাষায় অমৃতময়ী বাণী, সর্বোপরি পরমারধ্যাতম
শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের শ্রীমুখনিঃসৃত গুরুগভীর বিচারপূর্ণ অভিভাষণে
সকলেরই অত্যন্ত সুখপ্রাপ্তি হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অচ্যুত মন্ত্রদেশস্থ
শ্রীপাদ রাঘবচৈতন্য ব্রহ্মচারীর (ইংরাজীতে ওড়িয়া “সিদ্ধান্ত” মাসিক ধর্ম্ম-
পত্রিকার সম্পাদক) শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর উড়িয়াতে, শ্রীমন্নারায়ণ
মহারাজের হিন্দীতে, শ্রীমৎউর্দ্ধমহী মহারাজ ও শ্রীপাদ পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী,
আমৃতীর্থের সংস্কৃত ভাষায়, শ্রীপাদ নারসিংহ কবিরাজ প্রভুর (শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব-
পুরী মহারাজ) তেলেগু ভাষায় এবং শ্রীপাদ বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারীর অসমীয়াতে
ভাষণ শ্রোতৃবৃন্দের হৃৎ-কর্ণের প্রীতিপ্রদানে বৈচিত্র সাধন করিয়াছে।

পঞ্চাশতি-লাঘব-জ্ঞাত দিবসত্রয় শ্রীনৃসিংহপল্লী, মামগাছি ও শ্রীধাম-
মামাপুরে মাধ্যাহ্নিক প্রসাদের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেই কালে প্রতিটি স্থানেই

মহাপ্রসাদ গ্রহণ লাভাশায় আগত স্থানীয় অসংখ্য জনগণকে অবিমুখীকরণে সমিতির উদারতা প্রত্যক্ষদর্শী মহতেরও কল্পনার বাঁধ ভাঙিয়া দিয়াছে। বিশেষতঃ গৌর-পূর্ণিমার পরদিবস পূর্বাহ্ন ৮ ঘটিকা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত আগন্তুক মাত্রেই আকর্ষণ মহাপ্রসাদ-বিতরণে হরিতোষণী বৃত্তির প্রচুর আবাহন সমিতির কালজয়ী ক্রিয়া-কলাপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

হরি-কীর্তন-ভুক্তি পৃথিবীর বুকে গোড়ীয় বেদান্তের স্মৃতিষ্ক কণ্ঠধ্বনি-সজাত স্মহান্ সঙ্কর্তীন-রোলে সপ্তাহাধিক ব্যাপী প্রকম্পমান নবদ্বীপ-ধামমণ্ডলের আকাশ বাতাস অত্য়পি স্পন্দনশীল। ধর্ম্মজগতে সমন্বয়বাদীর বুদ্ধিহীনতায় ছঃখিত সমিতি মহাপ্রসাদ-ভোজী একটি কুকুরেরও ভগবৎ-পাদপদ্মপ্রাপ্তি-ক্ষমতার যে বিচার শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীশিবানন্দ সেন-প্রসঙ্গে পারমার্থিক বিশ্বে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে তাহারই ন্যূনতম পদাঙ্ক অনুসরণে বিশ্ববাসী সকলকেই প্রতি বৎসরই এই মহামহোৎসবে যোগদানের উদাত্ত আহ্বান জ্ঞাপন করিতেছেন। এই মহান্ উদ্দেশ্যে মঠবাসী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণের দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম যাহারাই দর্শন করিয়াছেন সকলেই বিগলিত। সর্ব্বোপরি সমিতির এই প্রচেষ্টা সার্থক করিতে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সহানুভূতিশীল সকলের নিকট পুনঃপুনঃ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া অত্য়কার লেখনী স্তিমিতা হইল।

—শ্রীজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, (ভক্তি-ভূষণ)

শ্রীমৎ ত্রিগুণাতীত দাস বাবাজী মহারাজের নির্য্যাণ

বিরহ বেদনায় ভারাক্রান্ত চিত্তের অস্থিরতা সমিতির শ্রীসিদ্ধবাণী গোড়ীয় মঠ রক্ষক পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ত্রিগুণাতীত দাস বাবাজী মহারাজের ৭৭ বৎসর বয়সে ৪৮০ গৌরাক্ষে গত ১৩ই বিষ্ণু, ২০শে মার্চ রবিবার অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে বাণীগর্ভ-কক্ষে প্রপঞ্চলীলা পরিহার বার্তা-জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। ধর্ম্মজীবনে কলির চরণানুচরণের বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও প্রশান্তাত্মা শ্রীল মহারাজের গোড়ীয় প্রজ্ঞান-স্বর্য্যোদয়ে প্রস্ফুটিত কমলবৎ সদা মধুর স্মিতানন সমিতির সেবকবর্গকে চরম পরীক্ষা করিবার তরে ঔঁহাদিগকে বিরহ-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া আত্ম অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত চিরকুমার এই

মহাপুরুষের গৌড়ীয় মঠে শ্রীবুদ্ধিসাধনে অবদান নির্মাণসর সারস্বতগণ মাত্রেই অবগত আছেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরহ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ মালায় উদ্বেলিত গৌড়ীয় মিশন-তরণীকে কালধর্মীর করাল দংশন হইতে রক্ষা করিতে সুদক্ষ কর্ণধারের আয় যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় তিনি দিয়াছেন তাহা একমাত্র বৈদান্তিক-কৃতীরত্বের আনুগত্যেই সম্ভবপর হইয়াছিল। গৌড়ীয় মিশনের সর্বত্র 'মুখার্জি মহাশয়'-নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। ত্যক্তাশ্রমযাপনের পূর্বে সুপ্রসিদ্ধ J. B. Dutta Company-তে তিনি Chief cashier পদে নিযুক্ত ছিলেন।



নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীব্রত পরিবর্তন করিয়া প্রায় দ্বিষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ১৩৫৮ সালের ২৭শে বৈশাখ সমিতির আচার্য্যপাদ-পদের নিম্নে শ্রীসিদ্ধবাণী গৌড়ীয় মঠে তিনি বেষাশ্রয় করেন। হুগলী জেলাসুর্গত আর আশু-তোষ মুখোপাধ্যায়ের নিজবাণী 'বলাগড়' গ্রামের গৌরবময় বিখ্যাত মুখার্জি পরিবার তাঁহার পূর্বাশ্রম। মাধ্যাক্তিত মাদৃশ কপটধর্মের ক্ষুদ্র লেখনী অসীম গুণাধার তাঁহার জীবনের পূর্ণ-স্বরূপ উদ্ঘাটনে সম্পূর্ণ অক্ষম। তাঁহার সহিত বহুদিন সেবাকার্য্য পরিচালনকারী শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজের মথুরা হইতে প্রেরিত বিরহ-কাতর পত্রখানি এ স্থানে

মুদ্রিত হইল। পাঠকবর্গ উহা-পাঠে শ্রীল বাবাজী মহারাজের অমূল্য জীবনের কয়েকটি দিক উপলব্ধি করিতে পারিবেন। পত্রটি এই,—

“বৃন্দাবন! তোমার পত্র গতকল্য প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধবাণীস্থ পরম পূজ্যপাদ শ্রীগোবিন্দ মহারাজের—অপ্রকট সংবাদ অবগত হইয়া অত্যন্ত মাহর্ম হইলাম।

আমি বহুদিন তাঁহার সঙ্গে একত্রে বাস করিয়া সেবা করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তিনি বড়ই স্নেহ করিতেন। তাঁহার নিকটে যাহারাই থাকিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাহারা কি প্রাচীন সন্ন্যাসী কি ব্রহ্মচারী হইতে নবাগত শিশু ব্রহ্মচারীগণ বা শান্ত সুশীল সজ্জন হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মদান্ত ব্যক্তিগণ—সকলেই তাঁহার প্রিয় ভাজন ছিলেন, সকলেই মনে করিতেন—বাবাজী মহারাজ আমাকেই অধিক স্নেহ করেন। এইরূপ পরচিষ্টাকর্ষক ব্যক্তিত্ব অতীব দুর্লভ। তিনি সরলের কাছে সরল হইতে ও সরল; কিন্তু দুর্দান্তগণের কাছে যমসদৃশ ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে পরমারাধ্যতম অস্মদীয় শ্রীল গুরুদেবের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল।

তিনি কোনও দিন লেশমাত্রও কনক কামিনী ও প্রতিষ্ঠার দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। আকুমার ব্রহ্মচারী, অদ্ভুত ও তুলনারহিত হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা পূর্ণ তাঁহার জীবন নিরতিমান, চতুর, দক্ষ্য, মিতবাক্, আড়ম্বরহিত, অকিঞ্চন, সর্বোপকারক শান্ত, অকাম, কৃষ্ণৈকশরণ, নিরীহ, স্থির, গভীর, করুণ - যাবতীয় বৈষ্ণবগুণে ভূষিত ছিলেন। আজ ইহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বিরহে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জিত হইতেছি। চেষ্টা করিয়াও অশ্রুবেগ থামিতেছে না। তাঁহার গুণের কথা—বৈষ্ণবতা-আদি কাহার কাছে বলিব ও গুনিব! শ্রীপাদ অনঙ্গপ্রভু ত পূর্বেই অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধাবাটিতে ও মদ্রদেশের অন্তর্গত টাঙ্গারম-এ থাকাকালে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবা চেষ্টা অতুলনীয় ছিল। সেই সকল কথা স্মরণ পথে আসিয়া প্রাণ আকুল করিয়া তুলিতেছে।

মনে হয়, শ্রীমন্নহাপ্রভুর প্রেরণাতেই এবার নবদ্বীপমণ্ডল পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীধামে তিনি আসিয়াছিলেন। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব স্বহস্তে বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী-সহ উচ্চসঙ্কীর্ণনযোগে ভগবতী জাহ্নবী-পুলিনে-শ্রীগৌরাস্বরের নিত্য-ক্রীড়াভূমিতে তাঁহার মহাসমাধি দিয়াছেন—ইহা জানিয়া তাঁহার সৌভাগ্যের মহিমা চিন্তা করিয়াও আনন্দে হৃদয় দ্রবীভূত হইতেছে। আর তাঁহারসাক্ষাৎ দর্শন হইবে না, ইহা বিশ্বাস হইতেছে না। তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা তিনি আমাদের পূর্ববৎ স্নেহ করিতে থাকুন।”

হা দুর্লভ প্রশান্তাত্মা শ্রীল বাবাজী মহারাজ! আশীর্বাদ করুন যেন আপনার ঐকান্তিকী গুরুনিষ্ঠা কপর্দকমাত্রও আমাদের জীবনের আদর্শ স্বরূপে গ্রহণ করিতে পারি।

—জন্মৈক বিরহী

সাত্তত শ্রাদ্ধ

গত ১৬ই চৈত্র ১৩৭২, ইং ৩০।৩।৬৬ তারিখে ২৪ পরগণায় ক্যানিং এর নিকটবর্তী জ্যোতিষপুর গ্রামে সমিতির আশ্রিত শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের পত্নীর (সমিতির আশ্রিতা) সাত্তত শ্রাদ্ধ তদীয় দেহান্তের একাদশাহে প্রাচীনতম স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীসংক্রিয়াসার দীপিকানুসারে পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ-এর পৌরোহিত্যে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তুক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ ও অজ্ঞাত ব্রহ্মচারি-বৃন্দের ভক্তিনিষ্ঠার অতুলনীয় 'প্রতাপে' স্মার্তাহুশাসিত অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহকেন্দ্রিক সমাজ এবং উন্মার্গগামী সহজিয়া বাবাজী বণ্টোমদের তীব্র বিরোধিতার মধ্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ২৯।৩।৬৬ এতদুপলক্ষে এক ধর্ম-সভার আয়োজন হয়। তথায় শ্রীযুক্ত নুরেল্ল নাথ ব্যানার্জি, ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় সনাতন ধর্ম, কন্ঠভেদ স্মার্তবাদের, বিষময় ফল ও হরিভক্তিবিলাসের সুবিচারাদি, স্মার্তের ধূর বহনকারী রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের অপেক্ষাকৃত নবীন স্মৃতি অষ্টবিংশতি ভক্তের শাস্ত্রীয় অসৌজত্বহেতু হেয়ত্ব বর্ণন-মুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে সভাপতি স্বামীজী শ্রীমৎ বামন মহারাজ সাত্তত-স্মৃতি ও কর্মজড়-স্মৃতির পার্থক্য বুঝাইয়া দিলে সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দ চমৎকৃত হন।

পরদিন শ্রাদ্ধবাসরে বিরাট বৈদিক বেদী নিৰ্ম্মাণপূর্বক তদুপরি বাসু-দেবার্চন, ভোগ, যজ্ঞহোমাদির অহুষ্ঠান ও তদন্তর বৈষ্ণবসেবান্তে শ্রীযুত-রাধাকৃষ্ণ প্রভু মহাপ্রসাদ দ্বারা পিতৃপুরুষের সহিত সহধর্মিণীর পিণ্ডপ্রদান করেন। পূর্বোল্লিখিত বিরোধী সমাজ প্রথমে প্রসাদ পাঠতে অস্বীকার করিলেও শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে এতাদৃশ সুন্দর শাস্ত্রীয় বিধি ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির শাস্ত্রতোষণী সূচমংকার যুক্তিগুলি শ্রবণে বিস্মিত হইয়া তৃপ্তি সহকারে বিচিত্র মহাপ্রসাদ আকর্ষণ সেবনে ধন্য হয়। শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজের ভাগবত পাঠ, পূজ্যপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ও পূজ্যপাদ কানাই লাল ব্রহ্মচারী প্রভুর জুললিত কীর্তন জাতি-ধর্ম-শিক্ষা-নির্ব্বিশেষে সকলকেই বিশেষ আনন্দ দিয়াছে। হরিভক্তের নিকট জ্যোতিষ (পুর) বদ্ধ স্মার্তের সর্বকাল পরাজয় আছে—ইহার আর একটি নমুনা আমরা পাঠকবর্গের নিকট উপস্থাপন করিলাম। তাঁহারাই এখন ইহার বিচার করিতে সমর্থ হইবেন। মহাপ্রসাদ-দ্বারা লব্ধপিণ্ড আত্মার উর্দ্ধগতি জাগতিক ব্যক্তিত্বের খণ্ডাইবার কি ক্ষমতা ?

প্রচার প্রসঙ্গ

দক্ষিণবঙ্গে পত্রিকা-সম্পাদকের কণ্ঠধ্বনি

পারমাণ্বিক বিশ্বের অদ্বিতীয় বার্তাবহ শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার সম্পাদক মহোদয় প্রপূজ্যপাদ শ্রীমৎ বামন মহারাজ গত ৭ই চৈত্র ১৩৭২, ইং ২১।৩।৬৬ তারিখে প্রপূজ্যপাদ শ্রীমৎ ত্রিদণ্ডী মহারাজ ও কয়েক মূর্তি ব্রহ্মচারী-সহ শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে বহির্গত হইয়া মুকুন্দ-বিদ্যেশ্বরী মদনদত্ত মেদিনীকে বৃন্দাবনবিহারী বিভূজমুরলীধর কৃষ্ণ-কনুহইয়ার অসমোর্দ্ধ কৃপাবারিতে সঞ্জীবিত করিবার সুমহান আদর্শ হৃদয়ে ধারণপূর্বক প্রথমেই কাশী (নগর)-বাসীর 'জ্ঞান'-স্পৃহাছেদনব্রত-উদ্যাপনে তত্রস্থ সনাতন- (দাসাধিকারী) শিক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত বিরাট ধর্মসভায় অসংখ্য সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবর্গের বক্তৃতাশ্রেণী-মাটিকযোগে সম্পাদক প্রবরের ভাগবতীয় কণ্ঠধ্বনি সমাগত অসংখ্য শ্রোতৃমণ্ডলীকে সনাতনী বাণীতে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। অতঃপর সম্পাদক-স্বামীজী মহারাজ ২৪ পরগণার ক্যানিং, জ্যোতিষপুর, হত্রভোগ, কৃষ্ণচন্দ্রপুর, মহাপীঠ-নগেনাবাদ, একতারা, হট্টগঞ্জ, প্রভৃতি হইয়া মেদিনীপুরে খেজুরী থানাঞ্চলে প্রচারে রত আছেন।

কাশীনগরে শ্রীযুত হরিশাধন মণ্ডল M.A.B.T. (খাড়াপাড়া Higher Secondary School এর Head Master.), পণ্ডিত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ব্যাকরণতীর্থ, ডাঃ শ্রীযুত পুণ্ডিনবিহারী বৈষ্ণ, শ্রীযুত অচ্যুতানন্দ মণ্ডল, B. A. B. T. এবং মহাপীঠে শ্রীযুত গুরুপদ দাস, হট্টগঞ্জে ক্যাপ্টেন ডাঃ-শ্রীযুত দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী একতারানিবাসী শ্রীযুত সুদর্শন ব্রহ্মচারী ব্যাকরণ-তীর্থ, প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ব্যক্তি সমিতির আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া প্রচারে প্রচুর সাহায্য করায় সমিতির ধন্যবাদহঁ। শ্রীযুত সনাতন দাসাধিকারী মহাশয়ের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়। সর্বত্রই সম্পাদক স্বামীজী মহারাজের কণ্ঠধ্বনি ছায়াচিত্র, ভাগবতপাঠ ও বক্তৃতার মাধ্যমে গৌড়ীয় বেদান্তের বিজয়নিশান উদ্ভীনপূর্বক 'কলি-অনুকূল'-আবহাওয়ায় পৃষ্ঠ পতনোন্মুখী জীবনিচয়কে উদ্ধার করিতেছে।

দমদম দেশবন্ধুনগর কলোনিতে পত্রিকা-

কার্য্যাধ্যক্ষের মায়াহস্ত বজ্রবাণী

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যাধ্যক্ষ পরম প্রপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজ মঠবাসী কয়েক মূর্তি ব্রহ্মচারী-সহ গত ২৫ চৈত্র ১৩৭২, ইং ৮।৪।৬৬ শুক্রবার

শ্রীযুক্ত স্বরূপ দামোদর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে দমদম দেশবন্ধু-নগর কলোনীতে তদালয়ে শুভ পদার্পণ করেন। ২৫-২৬শে চৈত্র উক্তালয়ে এবং ২৭শে চৈত্র বঙ্গের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ শ্রীযুত মনোমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃহং ভূগামণ্ডপে প্রপূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ অগণিত দেশ-হিতৈষীবর্গের সম্মুখে প্রকৃত মঙ্গল-প্রদর্শক গৌড়ীয় বেদান্তের মায়াহত্বে বজ্রবাণীর বিস্ফোরণে বহুলোককে ভাগবত-বেদ বাস্তব বস্তুর সন্ধানে ব্যাপ্ত করিয়াছেন।

উত্তরবঙ্গে গৌড়ীয় বেদান্ত-প্রচার-সম্পাদকের কৃতিত্ব

গত ২৬শে চৈত্র ১৩৭২ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের সুযোগ্য প্রচার-সম্পাদক পরম প্রপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্ত্রিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ এমটি প্রচার-সঙ্ঘ-সহ রায়গঞ্জে শুভবিজয় করেন। তথায় বিপুলভাবে গৌড়ীয় বেদান্ত-বাণী প্রচারান্তে স্বামীজী মহারাজ বর্তমানে শিলিগুড়িতে অবস্থান করিতেছেন। উভয় স্থানেই বহু শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট গৌড়ীয় বেদান্তের কুট বিচার উপস্থাপন মুখে পরমতনীরাসনে স্বামীজী মহারাজ বিশেষ-কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন (সংবাদ পৌঁছিয়াছে)। রায়গঞ্জের শ্রীযুত-কৃষ্ণপ্রসাদ দাসাধিকারী, শ্রীযুত হরিগোপাল চৌধুরী এবং শিলিগুড়িতে পূজ্যপাদ শ্রীযুত হরিপদ মণ্ডল, স্বনামখ্যাত শ্রীযুত অমূল্য দত্ত মহাশয়, শ্রীযুত-ভোলানাথ ঘোষ, শ্রীযুত অচিন্ত্যগৌর দাসাধিকারী প্রমুখ তাঁহাদের প্রচারে প্রভূত সাহায্য করিতেছেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা


শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্তিত ধারায়
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্তৃক প্রকাশিত
বিশুদ্ধ সান্ন্যাসত

শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা

ইহাতে বৈষ্ণব-ব্রতোৎসবাদি ষা বর্তীয় দিন 'শ্রীহরিভক্তি-বিলাস'-মতে বিশুদ্ধ-বিচারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণব মাত্রেরই ইহা সংগ্রহ করা একান্ত কর্তব্য।

মূল্য—১.২৫ পঃ মাত্র, ডাক মাণ্ডল স্বতন্ত্র।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যন্মাদ্যা স্প্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অত ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরশূত ॥ হরি-কথার বত্তি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

১৮শ বর্ষ } অনিরুদ্ধ, ১২ বামন, ৪৮০ গৌরাক্ষ
বুধবার, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৩; ইং ১৫৮৬; ১৯৬৬ { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্

[শ্রীল-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরের সংগৃহীতং সঙ্কলিতঞ্চ]

প্রমাণখণ্ডঃ

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং চ ।

রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাল্লব্ধবিদো

যমেতং গোলকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে ।

সিতদ্বীপং প্রাহুঃ পরমপি পরব্যোম জগদু-

নবদ্বীপঃ সোহ্যং জয়তি পরমাশ্চর্য্যমহিমা ॥ ১২ ॥

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকায়ও উক্ত হইয়াছে,—রসজ্ঞগণ যাহাকে শ্রীবৃন্দাবন, বহু বিষয়জ্ঞগণ যাহাকে গোলোক, অপর কতিপয় ব্যক্তি যাহাকে শ্বেতদ্বীপ এবং অত্রে পরব্যোম বলিয়া থাকেন, অত্যাশ্চর্য্য-মহিমাময় সেই নবদ্বীপধাম জয়যুক্ত হউন ॥ ১২ ॥

শ্রীচৈতন্যস্তবে যতংরূপেণ গদিতং শৃণু ॥ প ॥

গতির্যঃ পুণ্ড্রাণাং প্রকটিনবদ্বীপ-মহিমা

ভবেন্নালং কুর্বন্ভুবনমহিতং শ্রোত্রিয়কুলম্ ।

পুনাত্যঙ্গীকারাদুবি পরমহংসাশ্রমপদঃ

স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ১৩ ॥

প্রবোধানন্দবাক্যং যতুদিদং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥ ফ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের স্তবে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর ॥ প ॥

যিনি পুণ্ড্রগণের একমাত্র গতি-স্বরূপ, যিনি নবদ্বীপের মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন, যাহার জন্মদ্বারা ভুবনপূজ্য শ্রোত্রিয়কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে, যিনি পরমহংস (সন্ন্যাস) আশ্রমকে স্বীকার করতঃ তাহা পবিত্র করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যরূপী সেই ভগবান্ আমাদের প্রতি অতিশয় কৃপাযিত হইতু ॥ ১৩ ॥

সম্প্রতি শ্রীপ্রবোধানন্দ মহোদয়ের বাক্য শ্রবণ কর ॥ ফ ॥

সুতমস্তং চৈতন্যাকৃতিমতিবিমর্যাদপরমাদুভৌ-

দার্য্যং বর্য্যং ব্রজপতিকুমারং রসয়িতুম্ ।

বিগুন্ধস্বপ্রেমোন্মদ-মধুরপীযুষলহরীং

প্রদাতুং চাত্তেভ্যঃ পরপদনবদ্বীপপ্রকটম্ ॥ ১৪ ॥

যিনি স্বকীয় মর্যাদা (ভগবৎস্বরূপ) লঙ্ঘন করতঃ (অর্থাৎ ভক্তরূপে) অতিশয় উদারতার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রীণিত, এবং অল্প জীবকে স্বকীয় বিগুন্ধ প্রেমামৃতের উন্মাদক মধুর-ধারা প্রদানের জন্য পরমপদ নবদ্বীপধামে প্রকটিত হইয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যরূপী ভগবানকে স্তব করিতেছি ॥ ১৪ ॥

শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুরশ্রু, —

নিত্যানন্দাঈতৈতন্যমেকং-

তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃতং ব্রহ্মসূত্রম্ ।

নিতৈতৈতৈনিত্যয়া ভক্তিদেব্যা

তাতং নিত্যেধামি নিত্যং ভজামঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের উক্তি, —নিত্যধামে নিত্যভক্তগণ ও নিত্য ভক্তিদেবীর সহিত নিত্যকাল প্রকাশিত শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅঈত ও শ্রীচৈতন্যস্বরূপ নিত্য অলঙ্কৃত ব্রহ্মসূত্রতত্ত্বকে নিত্যভজনা করি ॥ ১৫ ॥

শ্রীমন্নবদ্বীপধ্যানম্,—

ফুল্লং শ্রীমদ্ভ্রমবল্লিতল্লজলসতীরা তরঙ্গাবলী

রম্যা মন্দমরুন্মরালজলজশ্রেণীষু ভৃঙ্গাস্পদম্ ।

সদ্রথ-চিততীর্থদিব্যানিবহা শ্রীগৌরপাদাম্বুজধূলি-
 ধূসরিতাঙ্গ ভাবনিচতা গঙ্গাস্তি যা পাবনী ॥ ১৬ ॥
 তস্মাস্তীরসুরম্যাহেমসুরসামধ্যে লসচ্ছীনবদ্বীপো
 ভাতি সুমঙ্গলো মধুরিপোরানন্দবন্তো মহান্ ।
 নানাপুষ্পফলাঢ্যবৃক্ষলতিকারম্যো মহৎসেবিতো
 নানাবর্ণবিহঙ্গমালিনিদৈ হ্রৎকর্ণহারীহি যঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীনবদ্বীপধামের ধ্যান এইরূপ,—যাহার তীরদেশ প্রফুল্ল, রম্য ও
 প্রশান্ত বৃক্ষ-লতায় এবং গর্ভদেশ তরঙ্গরাজি দ্বারা পরিশোভিত, যেখানে
 মন্দ-মারুত সতত প্রবাহিত হইতেছে, মরাল, পদ্ম প্রভৃতির মধ্যে ভৃঙ্গগণ
 সর্বদা বিহার করিতেছে, যাহার সুরম্য জলাবতরণ-খট্ট (খাট) সমূহ সদ্রু
 পরিখচিত, যিনি শ্রীমদগৌরসুন্দরের পাদপঙ্কজ-পরাগ-ধূসর-বিগ্রহ-নিবন্ধন
 ভাববিশিষ্টা, তাদৃশী সুপরিভ্রা গঙ্গার তীরদেশে সুরম্য হিরণ্ময় ভূতগে
 শ্রীভগবানের আনন্দ-বচা-প্লাবিত সুমঙ্গল নবদ্বীপধাম-বিরাজিত ।

সেইস্থান সর্বদা মহাজনগণ-দ্বারা পরিষেবিত ও নানাবিধ পুষ্প-ফলশালি-
 বৃক্ষলতায় পরিশোভিত হইয়া নানাবর্ণ বিহঙ্গ সকলের সুমধুর গানে কর্ণ ও
 চিত্ত হরণ করিতেছে । ॥ ১৬-১৭ ॥

তন্মধ্যে দ্বিজভব্যলোকনিকরাগারাগি রম্যাক্ষণ-
 মারামোপ-বনালিমধ্যবিলসদ্বৈদীবিহারী স্পদম্ ।
 সদ্ভক্তিপ্রভয়া বিরাজিতমহদভক্তালিনিত্যোৎসবং
 প্রত্যাগারমঘারিমূর্ত্তি সুমহৎ ভাতীহ যৎপত্তনম্ ॥ ১৮ ॥

সেই নবদ্বীপধামে ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোকসমূহের সুরম্য অঙ্গন, আরাম
 উপবনে সুন্দর বেদী ও বিহার স্থান বর্ত্তমান । সেখানে সর্বদা সদ্ভক্তিশীল
 মহাভক্তগণের উৎসব সম্পন্ন হইতেছে এবং সেই পুরের প্রতিগৃহ কৃষ্ণমূর্ত্তিতে
 পরিশোভিত রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥

তন্মধ্যে রবিকান্তিনিন্দিকনকপ্রাকারসন্তোরণং
 শ্রীনারায়ণগেহমগ্রবিলসৎসংকীর্ত্তন প্রাক্ষণম্ ।
 লক্ষ্যন্তুঃ পুরপাকভোগশয়ন শ্রীচন্দ্রশালং পুরং যদ্
 গৌরাক্ষহরেবিভাতি সুখদং স্বানন্দসংবৃংহিতম্ ॥ ১৯ ॥

সেখানে শ্রীগৌরাক্ষমহাপ্রভুর পুর বর্ত্তমান আছে, তাহা অতিশয় সুখদ

ও আনন্দে পরিপূর্ণ। তাহার তোরণ (সিংহদ্বার) ও প্রাচীর স্বর্গ্যকান্তি অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল স্ববর্ণ-নির্মিত। মধ্যে শ্রীনারায়ণের গৃহ, তাহার সম্মুখে সঙ্কীর্ণনের প্রাঙ্গণ, ঐ পুরে যথাস্থানে লক্ষ্মীদেবীর অন্তঃপুর, পাক, ভোগ, গয়ন ও চন্দ্রশালিকা গৃহাদি অবস্থিত ॥ ১৯ ॥

তন্মধ্যে নবচূড়রত্নকলসং বজ্রেন্দুরত্নান্তর-

মুক্তাদামবিচিত্রহেমপটলং সন্তুষ্টিরত্নাচিতম্।

বেদদ্বারসদৃষ্টমৃষ্টমণিরুটশোভা কবাটাঘ্রিতং

সচ্চন্দ্রাতপপদ্মরাগবিধুরত্নালম্বি যন্মন্দিরম্ ॥ ২০ ॥

ঐ পুর-মধ্যে, সুনির্মল চন্দ্রাতপ ও চন্দ্রকান্তমণি-পরিশোভিত শ্রীমন্দির অবস্থিত। ঐ মন্দিরের চারিটি দ্বার, আটটি কপাট, প্রত্যেক কপাটই অত্যুৎকৃষ্ট পরিমৃষ্ট-মণি-কিরণে দেদীপ্যমান। মন্দিরের চূড়াটি রত্ন-কলস-পরিশোভিত এবং ঐ মন্দিরের স্থানে স্থানে হীরকগণ ও চন্দ্রকান্তমণি, তাহারই মধ্যে মধ্যে মুক্তাদাম ও বিচিত্র স্ববর্ণরাজি-সমবিত ও সন্তুষ্টিতুল্য নানা-রত্ন-খচিত ॥ ২০ ॥

তন্মধ্যে মণিচিত্রহেমরচিত্তে মস্তার্ণঘন্থাঘ্রিতে

ষট্‌কোণান্তরকর্ণিকারশিখর শ্রীকেশরসন্নিভে।

কূর্মাাকার মহিষ্ঠযোগমহসি শ্রীযোগপীঠেহম্বুজে

আকাশাতপচন্দ্রপত্র বিমলে যদ্ভাতি সিংহাসনম্ ॥ ২১ ॥

তাহার মধ্যে মণি ও বিচিত্র হেম-রচিত মস্তবর্ণ ও যন্তযুক্ত ষট্‌কোণ মধ্যবর্তী বীজকোষের শিখর-প্রদেশে কেশরতুল্য কূর্মাাকার যোগপীঠে আকাশ, স্বর্গ্যকিরণ কপূরপত্র-তুল্য শুভ্রপদ্মে যে সিংহাসন বিরাজমান ॥ ২১ ॥

পার্শ্বাধঃপদ্মপট্টাঘটিতহরিমণি স্তম্ভবৈদূর্য্যপৃষ্ঠং

চিত্রচ্ছাদাবলম্বিপ্রবরমণিমহামৌক্তিক্যকাস্ত্যজ্জলম্।

তুলান্তশচীন চেলাসনমুড়ুপ-মুহুপ্রান্তপৃষ্ঠোপধানং

স্বর্ণান্তশ্চিত্রমস্ত্রং বস্তুহরিচরণধ্যানগম্যাষ্টকোণম্ ॥ ২২ ॥

যাহার পার্শ্বে আধোদেশে পদ্মরাগ-মণি-পট-খচিত যে ইন্দ্রনীলমণিময় স্তম্ভ, পৃষ্ঠ দেশে বৈদূর্য্যমণি এবং বিচিত্রাবরণাবলম্বিত শ্রেষ্ঠ মণি ও মহা-মৌক্তিক কান্তি-দ্বারা সমুজ্জ্বল, যাহাতে শশাঙ্ক-কোমল স্ফল্গবস্ত্রাবৃত তুলি-কাসন এবং প্রান্তদেশে পৃষ্ঠোপধান (পৃষ্ঠবালিশ) বিরাজমান এবং যাহাতে

স্বর্ণখণ্ডোপরি বিচিত্র অষ্টমস্তবর্ণ অষ্টকোণে বিরাজমান এবং যাহা হরি-
চরণ-ধ্যান-গম্য, সেই সিংহাসন বিরাজমান ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যার্চন-চন্দ্রিকোক্ত শ্রীমন্নবদ্বীপ-ধ্যানং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীমন্নবদ্বীপ-স্তোত্রম্,—

শ্রীগোড়দেশে সুরদীর্ঘিকায়াস্তীরেহতিরম্যে ইহ পুণ্যময্যাঃ ।

লসন্তুমানন্দভরেণ নিত্যং তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥১॥

ইতি চৈতন্যার্চনচন্দ্রিকোক্ত শ্রীমন্নবদ্বীপ-ধ্যান সম্পূর্ণ ।

শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-প্রভুর শ্রীনবদ্বীপ-স্তুতি, যথা—

শ্রীগোড়দেশে পুণ্যময়ী ভাগীরথীর সুরম্যতটে অবস্থিত নিরন্তর আনন্দভরে
বিরাজমান শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ১ ॥

যত্স্ম পরব্যোম বদন্তি কেচিৎ কেচিচ্চ গোলোক ইতীরয়ন্তি ।

বদন্তি বৃন্দাবনমেব তজ্জ্ঞাস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥২॥

যাহাকে কেহ কেহ পরব্যোম, কেহ কেহ গোলক এবং তত্ত্বজ্ঞগণ
বৃন্দাবন বলিয়া জানেন, সেই শ্রীনবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ২ ॥

যঃ সর্ব দিক্ষু সুরিতৈঃ স্নশীতৈর্নানাদ্রুমৈঃ সুপবনৈঃ পরিতঃ ।

শ্রীগৌর-মধ্যাহ্নবিহার পাত্রেস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৩॥

যে-স্থানে নিরন্তর চতুর্দিকে প্রকাশমান সুখময় স্নশীতল পবন-পরিচালিত,
নানাবৃক্ষে শুশোভিত থাকিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যাহ্ন-বিহারে স্যোগ দান
করে, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করি ॥ ৩ ॥

শ্রীস্বর্ণদী যত্র বিহারিতা চ সূবর্ণসোপান-নিবন্ধতীরা ।

ব্যাপ্তোন্মিভি-র্গৌরবগাহ ময্যে স্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৪॥

যেখানে ভাগীরথী তরঙ্গ-ব্যাপ্ত হইয়া বিহার করিতেছেন এবং তাহার
তীরদেশ সূবর্ণের সোপান (সিঁড়ি) সমূহে আবদ্ধ রহিয়াছে ॥ ৪ ॥

মহান্ত্যনস্তানি গৃহানি যত্র সুরন্তি হৈমানি মনোহরানি ।

প্রত্যালয়ং যং শ্রয়তে সদা শ্রীস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৫॥

যেখানে সূবর্ণময় অসংখ্য শ্রেষ্ঠ গৃহ বর্তমান এবং লক্ষ্মীদেবী যেখানে
প্রতিগৃহে অধিষ্ঠিতা, সেই নবদ্বীপধামকে স্মরণ করিতেছি ॥ ৫ ॥

বিদ্যাদয়াক্ষান্তিমথৈঃ সমন্তৈঃ সদ্ভিগুণৈর্ঘজনাঃ প্রপন্নাঃ ।

সংস্তুয়মানা ঋষিদেবসিদ্ধৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৬॥

যেখানে লোক-সকল, বিদ্যা, দয়া, ক্ষমা, যজ্ঞ প্রভৃতি সদ্বৃত্তি বিভূষিত, ঋষি, দেবতা, সিদ্ধগণ ও ঋষীহাকে স্তুতি করেন সেই নবদ্বীপধামকে অরণ করিতেছি ॥৬॥

যস্মিন্তরে মিশ্রপুরন্দরস্য স্বানন্দ গমৌকপদং নিবাসঃ ।

শ্রীগৌরজন্মাদিকলীলয়াচ্যুতং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৭॥

ঋষীহার মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মাদিলীলা সম্পন্ন হয় এবং একমাত্র স্বানন্দ-লভ্য শ্রীপুরন্দর গির্শের গৃহ বর্তমান, সেই নবদ্বীপধামকে অরণ করিতেছি ॥ ৭ ॥

গৌরো ভ্রমন্ যত্র হরিঃ স্বভক্তৈঃ সঙ্কীৰ্ত্তন প্রেমভরেণ সৰ্ব্বম্ ।

নিমজ্জয়তাজ্জলভাবসিকৌ তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি ॥৮॥

শ্রীগৌরহরি ভক্তগণসহ যেখানে ভ্রমণ করতঃ সঙ্কীৰ্ত্তন-প্রেমভরে সকলকে উজ্জল ভাব-সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়াছিলেন, সেই নবদ্বীপধামকে অরণ করিতেছি ॥৮॥

এতন্নবদ্বীপ-বিচিন্তনাচ্যং পঢ়্যাষ্টকং শ্রীতমনাঃ পঠেদ্ যঃ ।

শ্রীমচ্চটীনন্দন পাদপদ্মে সুদুর্লভং প্রেমমবাপ্নয়াৎ সং ॥৯॥

যিনি শ্রীতমনে এই নবদ্বীপধামের স্মৃতি-পূর্ণ পঢ়্যাষ্টক পাঠ করেন, তিনি শ্রীশটীনন্দন গৌরহরির পাদপদ্মে সুদুর্লভ প্রেম লাভ করেন ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতং

শ্রীমন্নবদ্বীপাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ।

গীতং গোড়ীয়ভাষায়াং বিদ্বতির্বহুভির্মুহঃ ।

নবদ্বীপস্য মাহাত্ম্যং গ্রন্থেষু বহুযু পৃথক্ ।

তাতি তানি হি বাক্যানি সমালোচ্য সমন্ততঃ ।

নবদ্বীপ কথাযান্তু রমন্তু ভগবৎ প্রিয়াঃ ॥ ব ॥ *

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-বিরচিত শ্রীনবদ্বীপাষ্টক সম্পূর্ণ ।

আরও বহু বহু পণ্ডিত ব্যক্তি অনেকানেক গ্রন্থে গোড়ীয়-ভাষায় শ্রীনবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য পৃথক্ ভাবে বারংবার কীর্ত্তন করিয়াছেন । সেই সমস্ত বাক্য সমালোচনা পূর্বক ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীনবদ্বীপের কথায় আসক্ত হউন ।

ইতি শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যে প্রমাণখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

শ্রীগৌর-ভজন

গৌরভজন করিতে হইলে শ্রীগৌরান্দের সহিত একটু পরিচয় করিতে হয়। 'ভজন' শব্দে সেবাকেই লক্ষ্য করে। সেবা বস্তুর পরিচয়ের অভাবে অপর বস্তুর সেবা হইয়া পড়ে ; সে জন্তই বেদ, সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটি বিষয়ের আবাহন করিয়াছেন।

বস্তুবিষয়কে অভিজ্ঞানই সেই বস্তুর সহিত জ্ঞাতার সম্বন্ধ। ভক্তের ভজনে ভগবান্ই সম্বন্ধ। ভগবান্, ভজন ও ভক্ত-সম্বন্ধ জ্ঞানরহিত হইয়া অবস্থান করেন না। যেখানে সম্বন্ধ ভগবান্ নহেন, তথায় ভক্ত ও ভক্তি নাই। ভোগময় বিচার তর্কের আবাহন করে। যেখানে ভক্তের ইন্দ্রিয় অনিত্য জড় নশ্বর ভোগে ব্যস্ত, তথায় সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গৌরসুন্দরের স্বরূপ বদ্ধজীবের নেত্রে অদৃশ্য। বদ্ধজীবের ভোগের অন্ততম নশ্বর বস্তু-প্রতীতি গৌরসুন্দরে সংবদ্ধ হইলে গৌরান্দের ভোগাজ্ঞান করা হয়—ইহা ভজনের নিতান্ত বিরোধী। ভজনের নামে ইন্দ্রিয়তর্পণ বা নশ্বর ভোগময়ী ধারণামাত্র শোভনীয় নহে।

অতাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায় ।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায় ॥
প্রভুর শ্রীধাম ভক্তি নিত্য পরিকর ।
ইথে অণু মত যার সেই ত পামর ॥

শ্রীমন্নরোত্তম ঠাকুর বাক্য—

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমে, যেবা জানে চিত্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—

প্রভু কহে, আমি বিশ্বস্তর নাম ধরি ।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেনে বিশ্ব ভরি ॥
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার ধর্ম ।
নবদীপে আর্যন্তল ফলোচ্ছান কর্ম ॥

শ্রীমন্নরহরিদাস—

নবদীপ বৃন্দাবন ছই এক হয় ।
গৌরশ্যাম রূপে প্রভু সদা দিলসয় ॥
সমাপ্তশচায়ং প্রমাণখণ্ডঃ ।

গৌরভক্ত বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করিয়া যাঁহারা নিজেদ্রিয়-তর্পণমাত্র সার জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারা গৌরাক্ষকে ভজনীয় বস্তু জ্ঞানিবার প্রতিকূলে নিজ নম্বর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ-গঠিত গৌর কল্পনা করেন মাত্র, তাহাতে শ্রীগৌরভজন হওয়া দূরে থাকুক, অনর্থময় বিষয়গ্রহণ মাত্র হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, ভগবদ্বস্তু অধোক্ষজ।

‘অধোক্ষজ’ শব্দে ইহাই বুঝায় যে, যিনি জড়েদ্রিয়-জ্ঞানের অতীত বস্তু অর্থাৎ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগের বস্তুমাত্র নহেন। শ্রীভীব-গোস্বামীপাদ সন্দর্ভের কয়েকস্থানেই বলিয়াছেন, ‘অধঃকৃতং অতিক্রান্তং অক্ষজং জ্ঞানং যেন সঃ অধোক্ষজঃ’। যেখানে ‘অধোক্ষজ’ শব্দে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর লক্ষিত হন, তথায় গৌরসুন্দর আমাদের ভোগ্যবস্তু নহেন। অপর ভাষায় বলিতে গেলে, গৌরের রূপ জড়ের রূপ নহে। আমাদের নম্বর স্থূল ইন্দ্রিয় জড়ের রূপভোগে বা ইন্দ্রিয়-তর্পণ জন্ত ব্যস্ত হয়—তাহাতে কৃষ্ণবিস্মৃত হয় মাত্র। শ্রীগৌরহরির অপূর্ণ রূপ আর কিছুই নয়—উঁহার দর্শনে আমাদের ভোগ-প্রতীতির উদ্রেক হওয়া দূরে থাকুক, ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা নিত্যকালের জন্ত থামিয়া যায়। গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাঁহাতে শ্রীরায় রামানন্দ প্রমুখ ভক্তগণের সেবনীয় বস্তু-বিজ্ঞান উচ্ছলিত হয়, নদীয়া-নাগরীকগণের জড় ভোগবাসনা প্রদীপ্ত হয় না। নাগরীগণ জড়ভোগময়ী ধারণার তাৎকালিক বশবর্তিতায় কামরিপু-চরিতার্থতার জন্ত জড় নাগর অন্বেষণ করেন। তাহাতে উত্তরোত্তর জড়কাম বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া জীবকে হরিভজন হইতে বিষয়ভোগে প্রমত্ত করায়। অহৈতুক নিশ্চল প্রেম তথায় তিরোহিত হইয়া নিজেদ্রিয়প্ৰীতি-তাৎপর্যে পর্যাবসিত হয়। আমরা গেলাম নিজের নিঃশ্রেয়ঃ-লাভের জন্ত, গমনপথে রিপুহস্তে পতিত হইয়া নিত্যকালের জন্ত নিত্য ভজন ধ্বংস করিয়া কক্ষকাণ্ডে ভোগের আবাহন করিয়া বসিলাম! গেলাম শ্রীজগদগুরুদেবের চরণপ্রান্তে পূজা করিবার জন্ত, পড়িলাম ভোগ-গর্ভে! নর্তকীদিগের নৃত্যগীতাদি যেরূপ ইন্দ্রিয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে দুর্বল জীবকে মজলের পথ হইতে বিচ্যুত করে, আমাদিগকেও গৌরভজন করিবার নামে নাগরীর ভোগ পিপাসা গ্রাস করিয়া ফেলে।

গৌরহরি ভোগের বস্তুবিশেষ নহেন। তিনি পূজার, বস্তু - কৃষ্ণোন্মুখ জীবের ভজনের বস্তু। বিষয়ভোগস্পৃহারত ব্যক্তিগণ কামাদি রিপুষ্টকের

বশবর্তী হইয়া যে দৃশ্য ভোগময় জগতে বিচরণ করেন, গৌরভক্তনের চলনায়ও আমাদের তাদৃশ জড়েন্দ্রিয়পরায়ণতাই বুদ্ধি লাভ করে। জড়ভোগরত আমরা; আমাদের পতি, পত্নী, পুত্র, প্রভু, ভৃত্য ভোগের বস্তু; গৌরাদ্য তাদৃশ অনিত্য, অজ্ঞানময় ও নিরানন্দের আধারমাত্র নহেন। তিনি নদীয়ার নাগরীর ভোগের বস্তু নহেন বলিয়াই নিজ স্বরূপ প্রকট করাইয়াছেন। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি তাঁহাকেও জড় ভোগের অন্ততম বস্তুজ্ঞানে নাগর বলিয়া খাড়া করি এবং আমরা ভোক্তা রমণী-সজ্জায় নাগরী বলিয়া অভিমান করি, তাহা হইলে উহা ভজন না বলিয়া জড়েন্দ্রিয়তর্পণ নামে অভিধান করাই আমাদের পক্ষে সত্যপ্রিয়তা। অবশ্য বৈষ্ণবধর্মের প্রতিকূলে ভক্তিহীন জড়েন্দ্রিয়-ভোগপ্রবণা শক্তি-উপাসনা তো অনেকদিন হইতেই আছে। শ্রীগৌরসুন্দরকে কেন্দ্র করিয়া গৌরভক্তি কলঙ্কিত করিবার উদ্দেশে গৌরকে জড়ের রূপ, জড়ের গুণ, জড়ের ক্রিয়ায় সজ্জিত করিয়া ক্ষণকালের জন্ত নিজের ইন্দ্রিয়-পরিভূষিত কল্পনাকে ভজন বলিয়া প্রচার করিতে যাওয়া কি আমাদের গৌরবিদ্বেষ মাত্র নহে? গৌরের নাম তো জড়বস্তুর সংজ্ঞাবিশেষ নহে, গৌরের রূপ তো দৃশ্য জড়বস্তুর অন্ততম নহে, গৌরের গুণ তো প্রাকৃত নম্বর গুণমাত্রের অন্ততম নহে এবং গৌরলীলা তো ইন্দ্রিয়পরায়ণের ভজন-চলনামাত্র নহে।

শ্রীগৌরহরির নাম কৃষ্ণচৈতন্য, গৌরহরির রূপ গৌর, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, নিত্য গৌররূপ বলিয়া কৃষ্ণের নহেন, তিনি মহাপদাত্ম অর্থাৎ নির্বোধের প্রতিও তিনি অসামান্য কৃপাবিশিষ্ট অর্থাৎ কোন কৃষ্ণ কর্মের (black act এর) অনিত্যতা, অজ্ঞান-নিরানন্দরূপ অবরতা তাঁহাতে অবৈধভাবে আরোপ করিতে গেলে তিনি সেই আবরণ হইতে বদ্ধজীবকে কৃপাবিতরণে মুক্ত করেন। তাঁহাকে অবৈধ জড়ভোগ-তাড়নায় নাগর বলিতে নাই। নাগরীভাবে তাঁহার ভজন-সাধনের কল্পিত আবাহন কৃষ্ণভক্তনের প্রতিকূল পথমাত্র। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় শুদ্ধভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত প্রভুগণদ্বারা, শ্রীসনাতন-রূপপ্রমুখ গোস্বামীষট্কে দ্বারা, শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীদ্বারা, শ্রীগদাধর নরহরি প্রভৃতি প্রেমিক ভক্তদ্বারা, চতুষষ্টি মহাপুরুষদ্বারা, জড়ভোগমিশ্র অনর্থময় সাধনকালের ভক্তির অনুষ্ঠানে সিদ্ধিকালের ভক্তির অনুষ্ঠান অবৈধভাবে সংমিশ্রণে কতই না বাধা দিয়াছেন! কিন্তু আমরা অপরাধী তর্কনিষ্ঠ-হৃদয়বিশিষ্ট অনর্থময় জীব সেই

শ্রীগৌরসুন্দরকে জড়বস্তুবিশেষ মনে করিয়া তাঁহাকে জড়-সন্তোগের মুক্তিমান বিগ্রহরূপে গড়িতে যাইতেছি! ইহা অপেক্ষা আর আমাদের শ্রীগৌরবিষয়ে কি হইতে পারে? তাঁহাকে জগদাচার্য্য মুখে বলিয়া জড়-কুভোগ-রাজ্যে ছুরাচার নাগর বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে যাই বলিয়াই মৃত অক্ষয়কুমার দত্ত, সংস্কৃত 'ভক্তমাল'-লেখক চন্দ্র দত্ত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় ক্ষীণ সমালোচক ও খৃষ্টানদিগের সাময়িক পত্র-প্রচারার্থ্য্য প্রবন্ধাদিতে শ্রীগৌর বিগ্রহকে অবৈধ প্রচারক মাত্র বলিয়া সজ্জিত করায়। বাস্তবিক শ্রীগৌরসুন্দর কি কোন ছুরাচার অভিনয় নিজ লীলায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে আমরা দুঃসাহসিকতার বশবর্তী হইয়া তাঁহাকে অবৈধ ভোগ্য নাগর বলিতে যাই? পরস্তু-প্রেক্ষণপর পরস্তু-চিন্তনপর, অবৈধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর নাগররূপে শ্রীগৌরভক্তগণ কোনদিনই তাঁহাকে কুকর্ষুরত বলিয়া জানিতে পারেন নাই। তবে নবদ্বীপ-নাগরীবাদ কে উদ্ভাবন করিল, কোন্ সময় এই দুর্নীতি ধর্মজগতে প্রবেশ করিল, কাহারাই বা এই দুর্নীতিকে অনর্থময় কালে ধর্মের সাধন-ভজন বলিয়া চালাইতে আরম্ভ করিল? ঠাকুর নরহরির সহিত কি এই ভজন-সাধন-বিবোধী অবৈধ অনুষ্ঠানের কোন সম্বন্ধ আছে? প্রশ্ন হইলে আমরা বলিতে চাই, যাহারা ঠাকুরের 'ভক্তনামৃত' দেখিয়াছেন, তাঁহাদের একরূপ ভ্রম হইতে পারে না। সিদ্ধ চৈতন্যদাস এই অবৈধ অনুষ্ঠানকে ভজন বলিয়া চালাইয়াছিলেন কি না, তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। শুদ্ধভক্তগণ বলেন, কতিপয় অবৈধ দুর্নীতি-পরচিন্ত ব্যক্তি চৈতন্যদাসের ক্রিয়া-কলাপ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে সাধক চৈতন্যদাস বলিতে গিয়া স্বীয় কুদ্বীতি-পুষ্ট চঞ্চল প্রতীতিদ্বারা নিজ ধারণায় সত্যানুষ্ঠানকে বিকৃত করিয়াছেন মাত্র। চিড়িয়া কুস্তুর সিদ্ধ কৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে এই নদীয়া-নাগরীভজনের কথা অত্যাশ্চর্য্যক আরোপ করা সত্যদ্রষ্টব্য মাত্র। চৈতন্যদাসের অলৌকিক ভাব বুঝিতে না পারিয়া আমরা যদি তাঁহাকে নদীয়া-নাগরীর দৌরাভ্যপূর্ণ অবৈধ সাধক শ্রেণীভুক্ত করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধ ব্যতীত আমরা আর কিছুই করিলাম না। ছাগল-হারাগ বুড়ির রামায়ণের কথক ঠাকুরের দাঁড়ি-সঞ্চালন দেখিয়াও পাঠ-শ্রবণের মত মহৎ বৈষ্ণবগণের চরিত্র পবিত্রময় আমি বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়া নিজ কুদ্বীতি ভাবের সংযোজন করা আদরণীয় নহে।

যাহারা গৌরসুন্দরের দাসগণের অলৌকিক চেষ্টা নিজের জড়

ভোগময় ভাবের অত্মতমজ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদিগকে আমরা নির্বোধ বলিয়া স্থির করিলে আর গৌরকথার অনুশীলন করিতে বলিতাম না। তাঁহারা নির্বোধ নহেন বলিয়াই নদীয়া-নাগরী বাদের দুর্গন্ধ তাঁহাদিগকে বিজড়িত না করিতে পারে এবং তাদৃশ সাধন-ভজন শুদ্ধভক্তির আদৌ অনুমোদিত নহে বলিয়া জানাইয়া দিবার জন্ত সভা-সমিতি পত্রিকাদিতে আলোচনারূপ কৃষ্ণানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ছিল ও আছে। ইহা পরচর্চা নহে, আচার্য্য বা গুরুসেবা। এই আচার্য্যসেবা-রহিত হইলে বদ্ধজীব পরমার্থ-বিষয়ে নির্বোধ হইয়া পড়েন। দুঃসঙ্গপ্রভাবে শুদ্ধভক্তি হইতে বিচ্যুত হইবার কুচেষ্টাই জীবকে গৌরভক্ত হইতে দেয় না। শ্রীগৌরহরি মহাবদান্ত বলিয়া কালে কালে ভক্তিবিরোধী সিদ্ধান্তের হস্ত হইতে কুবিষয়-ভোগ-মত্ত তর্কনিষ্ঠ ভক্তিরহিত গৌরভক্ত প্রতিষ্ঠাকামী জনগণকে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে নিজজনসমূহ প্রেরণ করেন। যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয়, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় সেই কালে ভগবান্ এবং ভক্তগণ আসিয়া আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং জীবকুলের দুর্বাসনা-গঠিত ভজন-ছলনা হইতে নির্বোধ প্রশিক্ষিতগণকে উদ্ধার করেন।

সত্যসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাম্বাস-দোষদুষ্ট কোন কথাই শ্রীদামোদর স্বরূপ গোড়ীয়গণের মঙ্গলের জন্ত প্রচারিত হইতে দেয় নাই। শুদ্ধ গৌরভক্তগণ সেই গোড়ীয়াচার্য্য শ্রীদামোদর স্বরূপের সিদ্ধান্ত, ছয় গোষামীর সিদ্ধান্ত অতুলনীয় গ্রন্থ শ্রীচরিতামৃত হইতে পাইতে পারিবেন। শুদ্ধভক্ত শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে নদীয়া-নাগরী-মতের অকর্ম্মণ্যতা-নিরূপণের যে সূত্র দিয়াছেন, তাহা যাহাদের আলোচ্য বিষয় হয় না, তাহারা শুদ্ধভক্তি কাহাকে বলে, তাহার সম্বন্ধ কখনই পাইবেন না। হরিভজন বদ্ধজীবের মনগড়া অনুষ্ঠান মাত্র নহে। যাহারা ভগবদ্ভজন না করিয়া অত্ম জড় ধারণার সহিত হরিভজনকেও ভোগময় অনুষ্ঠান মনে করেন, তাঁহারাই ভক্তিয়াজনের নামে নদীয়া-নাগরী-বাদ অস্তায়পূর্ব্বক ভক্তিপথের অন্তর্গত বলিয়া চালাইতে থাকিবেন।

—জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(পরমহংস-স্বরূপ)

১। সহজ-পরমহংস কাহার?।

“স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণই ‘সহজ’ পরমহংস।”

— চৈঃ শিঃ ৬।৪

২। গৌর-লীলায় ও পৌরাণিক যুগের কতিপয় সহজ-পরমহংস কাহার?।

“শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি ভগবৎ-পার্বদগণ, * * সকলেই সহজ-পরমহংস। পূর্বকালে ঋতু প্রভৃতি অনেকের গৃহস্থাশ্রমে এইরূপ পারমহংস দেখা যায়।”

— চৈঃ শিঃ ৬।৪

৩। পরমহংসগণের স্বরূপ কি? তাঁহাদের শাস্ত্র কি?

“যে-সকল লোকের দিবাচ্ক্ষু আছে, তাঁহারা তাঁহাদিগকে (পরমহংস-গণকে) সমন্বয়যোগী বলিয়া জানেন। হাঁহারা অনভিজ্ঞ বা কোমলশ্রদ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদিগকে সংসারাসক্ত বলিয়া বোধ করেন; কখনও কখনও ভগবদ্বিমুখ বলিয়াও স্থির করিতে পারেন। সারগ্রাহী জনগণ স্বদেশীয় বিদেশীয় সর্বলক্ষণ-সম্পন্ন সারগ্রাহী ভ্রাতাকে অনায়াসে জানিতে পারেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ, ভাষা, উপাসনা-লিঙ্গ ও ব্যবহার-সকল ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাঁহারা পরস্পরকে ‘ভ্রাতা’ বলিয়া অনায়াসে সম্বোধন করিতে পারেন। এই সকল লোকই পরমহংস এবং পারমহংসী-সংহিতারূপ শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহাদের শাস্ত্র।”

—‘উপক্রমণিকা’. কৃঃ সং

৪। পরমহংস কি শাস্ত্রের শাসনাধীন বা বিধি-বাধ্য?

“উচ্চ সোপানস্থ মহাপুরুষগণ নিম্ন-সোপানস্থ যে-কিছু নিয়ম পালন করেন, সে কেবল তাঁহাদের স্বৈচ্ছ-বিলাস-মাত্র।” —‘নিয়মাগ্রহ’, সঃ তোঃ ১০।১০

৫। পরমহংসগণ কাহাদের সঙ্গ বর্জন করেন?

“কর্মধর্মসাপেক্ষ ভক্ত ও কর্মজড়ের মধ্যে অনেক ভেদ আছে; কৃষ্ণভক্তি-শূন্য কর্মীর ত’ কথাই নাই। কর্মধর্মসাপেক্ষ-ভক্ত শুদ্ধভক্তিকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবসেবা-কীর্তন-ব্যবহারাди করিয়া থাকেন; হৃদয়ে কর্ম-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ এবং ব্যবহারে ভক্তির অনুকূল জানিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম স্বীকার করেন। যদিও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম অনেক সময়ে ভক্তির বাধক হয়, তথাপি স্বচ্ছন্দে নিষ্পাপে শরীরযাত্রা নির্বাহের জন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে তিনি যথাযোগ্য যত্ন করেন; সুতরাং কৃষ্ণভক্তি-সাধনে তিনি

সর্বদা নিরপেক্ষ ; কিন্তু কৰ্ম্মজড়ের কার্য্য এই যে, মনে মনে কৰ্ম্মকেই তিনি নিস্তারের হেতু জানিয়া কৃষ্ণ-কৰ্ম্মে আত্মভাব অনুভব করেন না ; কৃষ্ণের সুখ-দুঃখে উদাসীন হইয়া লোকদিগকে জড়ময় কৰ্ম্মধৰ্ম্ম শিক্ষা দেন। বৈদিক হইয়াও নিরপেক্ষ পক্ষযোগীকে নিন্দা করেন এবং নিজের সিদ্ধান্তকে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত বলিয়া লোকদিগের বুদ্ধি নাশ করেন। মূৰ্খ লোক তাহাকে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত মনে করিয়া মোহপ্রাপ্ত হন এবং নিরপেক্ষ পক্ষযোগীকে লঘুবুদ্ধির দ্বারা বিতর্ক করিয়া নষ্ট হন। পক্ষযোগীর হৃদয়নিষ্ঠা বৈদিকগণ জানিতে পারেন না ; সুতরাং কৰ্ম্মজড় শিক্ষককে মহাপুরুষ মনে করিয়া তদ্রূপ ব্যবহারাদি করিয়া থাকেন। পরমহংস মহাত্মগণ তাঁহাদিগকে অবৈষ্ণব জানিয়া তাঁহাদের সঙ্গ করেন না।”

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

৬। এ জগতে সৰ্ব্বাপেক্ষা ধন্য কে ?

“এ জগতে চিদচিদ্ বিচার-চতুর পরমহংস-ভক্তগণই ধন্য। ভক্তগণই পণ্ডিত ; কেন না, তাঁহারা জড়-জগতের মোহ-সলিলের পার পাইয়াছেন। ভক্তগণই গুণী ; কেন না মায়ায় কুণ্ঠিত সত্ত্বরজস্তমোগুণকে ভেদ করিয়া তাঁহারা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভক্তগণই সুখী ; কেন না, জড়গত সুখ-দুঃখ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা ব্রজের চিৎসুখ লাভ করিয়াছেন। ভক্তগণই নির্ভয় ; কেন না, মায়িক ভূত-ভবিষ্যদাত্মক কালকে অতিক্রম করিয়া তাঁহারা শুদ্ধ গোলকবাসী হইয়াছেন। ভক্তগণ যুগে যুগে জীবিত থাকুন এবং হতভাগ্য মায়া-পীড়িত ব্যক্তিগণকে দর্শন, স্পর্শন, আলাপনের দ্বারা কৃতার্থ করুন।”

—আঃ বিঃ ভাঃ টীঃ

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

জীব-মঙ্গল

রে জীব,

ভেবেছ কি মনে কিবা মঙ্গল-নিলয় ?—

যে মঙ্গলে নাহি মাত্র অমঙ্গল-কণা ?

যে মঙ্গল নিত্যকাল বর্তমান রয় ?

চরম মঙ্গল তব ভেবে কি দেখ না ??

রে জীব,

বুদ্ধিমান্ যেবা হয়, লক্ষণ কি তার ?—

চরম মঙ্গল লাভে সদা যত্নপর ।

যাহে ক্ষণ সুখোদয়, ক্ষণে নাহি আর,

কভু তাহে রত নাহি হয় সুধী নর ॥

রে জীব,

স্বর্গ-সুখ নহে তব চরম কল্যাণ ।

পুণ্যক্ষয় যবে হয় স্বর্গসুখ-ভোগে,

পুনঃ কৰ্ম্মক্ষেত্রে জন্ম নিয়তি-বিধান,

চক্রবৎ স্বর্গমর্ত্য লভে কৰ্ম্ম-যোগে ॥

রে জীব,

মোক্ষলাভ নহে তব শ্রেয় সর্বোত্তম ।

বহু ক্লেশে ফল্গুত্যাগে সাধি' সোহংজ্ঞান,

আপনারে মুক্ত মানি' করে মহাভ্রম,

উল্লজিয়া হরিপদ অধঃপাতে যা'ন ॥

রে জীব,

শ্রেষ্ঠ শুভলিপ্সু যদি, পর ধৰ্ম্মে চর—

যাহে অধোক্ষজে কৃষ্ণে ঐকান্তিকী ভক্তি,

অহৈতুকী, অব্যাহতা-মাত্র সেবাপর,

আত্মার প্রসাদ তবে কৃষ্ণে অনুরক্তি ॥

রে জীব,

চরম কল্যাণ তব শুদ্ধা ভক্তি হয়,
তাহা লভিবারে যদি করহ প্রয়াস,
সাধু-গুরু-পাদপদ্ম কর সমাশ্রয়,
মহাজন সঙ্গ বিনা ভক্তে নাহি আশ ॥

রে জীব,

মহাজনরূপে কিন্তু বহু সে কপট
ভ্রমিতেছে পথে ঘাটে লোক সংঘটিয়া ।
বুঝে না নিরর্থক লোক—কে সাধু, কে শঠ,
না বুঝে' বঞ্চিত হয় অসতে মজিয়া ॥

রে জীব,

তাই বলি সাবধান ! কৃষ্ণসেবা-রত ।
অকিঞ্চন, কৃষ্ণনিষ্ঠ, সাধু, মহাজন,
ভুক্তি-মুক্তি কাম-শূন্য, তত্ত্ব-পারঙ্গত,
শান্তচেতা গুরুদেব, আর কেহ ন'ন ॥

রে জীব,

বেদে ভাগবতে এই দেয় উপদেশ,
ইহা ছাড়ি, অন্তমত যত যেবা আছে,
তাহাতে অনর্থরাশি, নাহি শুভ-লেশ ।
অসাধু ছাড়িয়া রহ সাধুজন কাছে ॥

রে জীব,

চাহ যদি স্বকল্যাণ, বিলম্ব না কর ।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্ব বিচারিয়া লহ ।
লভিয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানে সদা নাম কর,
ইহাতে সর্বার্থ-সিদ্ধি, হরেকৃষ্ণ কহ ॥

—শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, B. Sc.

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-১৬)

সর্বভূতেষু যঃ পশ্চেত্তগবদ্ভাবমত্মনঃ ।

ভূতানি ভগবত্যাশ্রয়েষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ (ভাঃ ১১।২।৪৫)

যিনি সর্বভূতে বহির্দৃষ্টি ছাড়িয়া আত্মায় চিহ্নিলাস ভগবানের আবির্ভাব এবং আত্মস্বরূপ শ্রীহরিকে চিহ্নিলাসোপকরণসকল দর্শন করেন, তিনি ভাগবতোত্তম। এই শ্লোকানুসারে পরমসিদ্ধ পুরুষগণেরও সর্বভূতাদর সিদ্ধ ও দৃষ্ট হয়। তরুর মূল সেচন দ্বারা যেমন তাহার শাখা-প্রশাখা-উপশাখাদি তৃপ্তি লাভ করে, তদ্রূপ অচ্যুত-সেবাতেই সর্বভূত-পূজা হয়—এই ভুক্তিদ্বারা সাধকগণের সম্বন্ধে বিষ্ণু ব্যতীত অত্যাশ্রিত ভূত পূজাদির যে পুনরুক্তি দেখা যাইতেছে, তাহা কেবল স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টিতে (জড়ীয় দর্শনে) সেই সেই ভূতপূজাদির পুনরুক্তি বুঝিতে হইবে। এস্থলে সেই সেই প্রাণীতে অন্তর্যামী ঈশ্বররূপে অধিষ্ঠানযুক্ত ভগবানের উপাসনায় বিহিত হইতেছে এবং ভগবৎ সম্বন্ধেই (হরি সম্বন্ধিবস্তু ভাগবৎ জ্ঞানেই) তাহাদের আদর আবশ্যকতা বুঝিতে হইবে। নিজ ব্যতীত অপরাপর প্রাণীতে যাহাতে রাগ-দ্বेष নিবৃত্তি হয় তন্নিমিত্তই তাদৃশ ভগবৎসম্বন্ধি-জ্ঞানে ভূতাদর-বিধি বুঝিতে হইবে। অতএব ভক্তি ভিন্ন কৰ্মবাসনাময়ী ভূতানুকম্পাবশে ভগবদর্চন ত্যাগকারী জড়ভরতের ভগবৎ-প্রাপ্তির অনুরায় ঘটিয়াছিল। অতএব ভগবদ্ভজন পরিত্যাগ করিয়া ভূতদ্বাররূপ ভগবদ্ভজন কেবল কৰ্মকাণ্ডের আবাহন মাত্র—ইহাই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল। অত্যাশ্রিত ভূতগণের অনাদর কর্তব্য নহে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে অত্যাশ্রিত দেবতা বা ভূতগণের উপাসনাকে ধিকার দেওয়া হইয়াছে। তজ্জন্ত বলিতেছেন—

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং

শ্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।

বিনোপসর্পতাপরং হি বাণিশঃ

শ্বলাঙ্গুলেনাতাতিতর্জি দিক্কুন্ ॥ (ভাঃ ৬।১।২২)

নিরহঙ্কার, প্রাকৃতরাগাদিশূন্য, নিজলাভে পরিপূর্ণকাম, উপাধি-পরিচ্ছেদ রহিত পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অপরের শরণ গ্রহণ করে, সে অস্ত্র কুকুরের আশ্রয় করিয়া দুস্তর সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে।

কঃ পণ্ডিতস্তদপরং শরণং সমীয়া-

ভুক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাং ।

সৰ্ৱান্ দদাতি সুহৃদো ভক্ততোহভিকামা-

নাত্মানমপ্যুপচয়াপচর্যো ন যশ্চ ॥ (ভাঃ ১০।৪৮।২৬)

শ্রীভগবানের প্রতি অক্লুরের উক্তি—হে প্রভো! আপনি ভুক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞ; এবস্থিধ আপনাকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি অপরের শরণাপন্ন হয়? আপনি ভজনকারীকে তাহার অভিলষিত যাবতীয় বস্তু প্রদান করিয়াও নিশ্চিন্ত হন না। যাহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই অর্থাৎ যিনি নিত্য, এবস্থিধ আপনাকে পর্য্যন্ত প্রদান করেন। আপনি সুহৃৎ অর্থাৎ হিতকারী স্বভাববিশিষ্ট, তাহাতে আবার কৃতজ্ঞ অর্থাৎ ভক্তের সেবার আভাস মাত্রেই বহুমানন করেন। অতএব ভক্তের সকল অতীষ্ট বস্তুই প্রদান করেন, তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া নিজেকে পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। অথচ তাদৃশ সৰ্ব্বতোভাবে দানক্রিয়ায় অথবা বহুলোককে অতীষ্ট বস্তু প্রদান-ব্যাপারে তাহার সংস্থিতির কোন অভাব ঘটে না। এজন্ত বলিতেছেন, তাহার উপচয়—দানাভাবে বৃদ্ধি বা সঞ্চয় এবং অপচয়—দানফলে ক্ষয় নাই। এখানে অভক্তমাত্রকে অনাদরপূর্বক বলিতেছেন—

যেহভ্যর্থিতাম'প চ নো নৃগতিং প্রপন্না

জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্মং যত্র ।

নারাধনং ভগবতো বিতরন্ত্যনুষ্য

সম্মোহিতা বিততয়া বত মায়য়া তে ॥ (ভাঃ ৩।১৫।২৪)

দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি—যে মন্তব্যজ্ঞে ভগবদ্বাক্তের সহিত ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় এবং যে জন আমাদেরও প্রার্থনীয়, সেই মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াও যাহার দান প্রদান শ্রীহরির আরাধনা করে না তাহার তাহার বিশাল মায়ায় মোহিত ।

এজন্তই নিম্নলিখিত শ্লোকে বলিতেছেন—

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে

ন শৃণ্বতঃ বর্ণপুটে নরশ্চ ।

জিহ্বা সতী দার্দ্র্যুরিকেব সূত

ন চোপগায়তুর্গায়গাথাঃ ॥ (ভাঃ ২।৩।২০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বর্ণপুটে ভূরিগুণসম্পন্ন ভগবান উরুক্রমের বিক্রমের

কথা শ্রবণ না করে, তাহার কর্ণরজ্জ্বদ্বয় বৃথা ছিদ্র মাত্র । যে জিহ্বা ভগবানের
বিক্রম কীর্তন না করে, সেই জিহ্বা ভেকাজিহ্বাতুল্য ও দুষ্ট ।

ব্রহ্মবৈবর্তেও বলিয়াছেন—

প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুস্যং বিবুধেপ্সিতম্ ।

যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দৈস্তুরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরম্ ॥

অশীতিষ্মতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু ।

ভ্রমন্তিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্য মানুস্যং জন্মপর্য্যয়াৎ ।

তদপ্যফলতাং জাতং তেষামাত্মাভিমানিনাম্ ।

বরাকাম্যমনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ম্ ॥

দেবগণেরও বাঞ্ছিত দুর্লভতর মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও যাহারা গোবিন্দের
আশ্রয় করে না তাহারা চিরকালের জন্য আত্মাকে বঞ্চিত করে ।
চতুরশীতিলক্ষ জীবযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে মনুষ্যজন্ম লাভ
হয় । যে সকল আত্মাভিমानी নীচ অশোচ্য ব্যক্তি গোবিন্দ চরণদ্বয়ের
আশ্রয় গ্রহণ না করে, তাহাদের দুর্লভ মনুষ্য জন্মও বৃথা হয় ।

যশ্যাস্তি ভক্তিভগবত্যকিঞ্চনা

সর্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরা ।

হরাবভক্তস্য কুতো মহদগুণা

মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ । (ভাঃ ৫।১৮।১২)

যাহার ভগবান্ শ্রীহরিতে নিষ্কাম সেবা প্রবৃত্তি বা অহৈতুকী ভক্তি বর্তমান,
ধর্মজ্ঞান-বৈরাগ্যাदि সকল গুণের সহিত সমস্ত দেবতা তাহাতে সম্যগ্‌রূপে
নিত্যকাল অবস্থান করেন । শ্রীহরিতে ভক্তিহীন (অত্যাভিলাষী, কর্মী, জ্ঞানী,
যোগী প্রভৃতি অথবা গৃহাদিতে আসক্ত) অসং অভক্ত অনিত্য বাহবিষয়-
সুখে ধাবমান ; সুতরাং তাহাতে মহৎ বা সজ্জনগণের গুণ কোথায় থাকিবে ?

শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতরূপে জীবগণের শরীরে বিরাজ
করেন । গুরুভক্তের শরীরে থাকিয়া তাহার ধর্মজ্ঞানাदि গুণ প্রকাশ করিয়া
থাকেন । অতএব ভক্তিহীন মুনিগণেরও নিন্দা নিম্নলিখিত শ্লোকে দৃষ্ট হয়—

অহ্যাপ্ত্যর্জকরণা নিশি নিঃশয়ানা

নানামনোরথাধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ ।

দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োহপি দেব

যুগ্মংপ্রসঙ্গ-বিমুখা ইহ সংসরন্তি ॥ (ভাঃ ৩।৯।১০)

বিষ্ণুর প্রতি ব্রহ্মার উক্তি—হে দেব ! আপনার শ্রবণকীৰ্ত্তন-প্রসঙ্গে বিমুখ হইলে মুনিগণও এই সংসারে গমনাগমন ক্রেশ লাভ করেন। দিবাভাগে তাহাদের ইন্দ্রিয়সকল ভগবদিতর বিষয়ে নিযুক্ত থাকিয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট হয় ; আবার রাত্রিতে বাহ্য-ইন্দ্রিয়-ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া নিদ্রাগত হইলেই নানা অসদ্বস্তুতে ধাবমান ও মনোধর্ম্মবশে দুঃস্বপ্নাদি দর্শনযোগে ক্ষণেক্ষণে নিদ্রা ভঙ্গ হয়। আবার অর্থের জন্ত উদ্যম করিলেও দৈবকর্ত্তক তাহা প্রতিহত হইয়া পড়ে।

স্বভাবক্রমে ভগবন্তজন-বিমুখ সামান্য মনুষ্যগণ ত সংসারী হয়ই, ভক্তি ব্যতীত অন্য মার্গে সিদ্ধ মুনিগণও ভগবৎপ্রসঙ্গে বিমুখ হইলে তাহাদেরও সংসারলাভ হয়। মুক্ত ভিম্বানী জ্ঞানিগণ অতিকষ্টে জীবনুত্তরদশায় আরোহণ করিয়াও ভক্তিবহীন হওয়ায় অধঃপতিত হন।

যদি বলা যায় যে তাহাদের কি ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ নাই ? তহুত্তরে যম-রাজের উক্তি—

ধর্ম্মন্ত সাক্ষাভগবৎপ্রণীতং

ন বৈ বিহুর্ধ্ব্যো নাপি দেবাঃ।

ন সিদ্ধমুখ্যা অশুরা মনুষাঃ

কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয় ॥

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।

প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলিবৈর্ঘ্যাসকিবর্যম্ ॥

দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং ভাগবতং ভটাঃ।

গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্বোধ্যং যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে ॥

(ভাঃ ৬।৩।১৯-২১)

বৈষ্ণবরাজ যম নিজ দূতগণের প্রতি বলিতেছেন—সাক্ষাৎ ভগবান শুদ্ধভক্তিদর্ম্ম প্রণয়ন করিয়াছেন। ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবগণ, প্রধান প্রধান সিদ্ধগণও সেই ধর্ম্ম অবগত নহেন। অশুরগণ, মনুষ্যগণ, বা বিদ্যাধর চারণাদি নিকৃষ্ট প্রাণী তাহা কিরূপে জানিবে ? ব্রহ্মা, নারদ, শিব, চতুঃসন, কপিলদেব, স্বয়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব, ও আমি (যম)—আমরা এই দ্বাদশ জন মাত্র ভাগবতধর্ম্ম অবগত আছি। ইহা অতীব গুহ্য, বিশুদ্ধ ও দুর্বোধ্য, ইহা জানিতে পারিলেই অমৃত লাভ হয়।

উল্লিখিত দ্বাদশজন বৈষ্ণব ব্যতীত অপরের বুদ্ধি বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ। তাহারা

আপাতমধুর অর্থবাদরূপ কর্মকাণ্ডময় বেদে জড়ীভূত-বুদ্ধি হওয়ার জন্য কর্ম-কাণ্ডের মহা আড়ম্বরে প্রবৃত্ত হয় ; কিন্তু অনায়াসসাধ্য পরমার্থপ্রদ হরিনামের মহিমা জানে না । সুতরাং তাহারা মহাশূণী হইলেও সংসার-দশা লাভ করে ।

—ত্রিদিগ্ভিম্বামী শ্রীমন্ত্ৰিত্ত্বদেব শ্রোতী মহারাজ

দুই চোরা

(নাটিকা)

(পূর্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০৭ পৃষ্ঠার পর)

* * * *

জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ

(দুগ্ধভাণ্ডহস্তে শচীদেবীর প্রবেশ)

শচীদেবী—নিমাই—নিমাই !! (ঘরে নিমাইকে না দেখিতে পাইয়া উদ্ভিন্ন চিত্তে) কই ! নিমাই কই ! বাবা নিমাই—কোথায় রে ! আয় বাবা, —দুধ খাবি আয় ! (ঘরের বহিঃভাগে যাওয়া) নিমাই—নিমাই ! কোথা গেলি বাপ ! ও বাবা নিমাই,—নিমাই !.....(ক্রন্দন)

(জগন্নাথ মিশ্রের প্রবেশ)

মিশ্র—(গৃহের বাহির হইতে) নিমাই তো ঐখানেই খেলা করছে । (গৃহে প্রবেশপূর্বক নিমাইকে না দেখিতে পাইয়া) নিমাই কই ? নিমাই কোথা ? (চোখে জল আসিল) নিমাই—নিমাই !.....[ইতস্ততঃ অন্বেষণ]

শচীদেবী—(কাঁদিতে কাঁদিতে) কই ? নিমাই তো সাড়া দেয় না ! তবে কি নিমাই নাই ! (হস্ত হইতে দুগ্ধভাণ্ড মাটিতে পড়িয়া গেল) ওগো, তোমায় যে আগি নিমাইকে দিয়ে গেলাম, তুমি তা'কে কি করলে ? কেন তুমি তা'কে একেলা রেখে গেলে ? তোমার শালগ্রাম পূজা না হয় পরেই হ'তো ! আমার নিমাইকে একা পেয়ে হয়ত তা'কে কেউ নিয়ে গেছে ! (বক্ষে করাঘাত করতঃ) হা ভগবান্, আমি কি সর্বনাশিনী ! আমার নিমাই কি নেই ! (অঝোর ধারে কাঁদিতে কাঁদিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিষ্ফেপ করতঃ) ওরে নিমাই,—নিমাই !.....

মিশ্র—(কাঁদিতে কাঁদিতে) নিমাই ! বাবা নিমাই ! সাড়া দে ।

ওরে আমি তোকে ছেড়ে আর যা'ব না। আমি বড় ভুল করেছি বাবা।
ও মানিক! তুই আমার উপর রাগ করিস্ নে। আয় বাবা, আর
লুকাস্ নে,—কাছে আয় সোনা!

শচীদেবী—(কাঁদিতে কাঁদিতে) নিশ্চয়ই তা'কে কেউ চুরি করে
নিয়ে গেছে, নয়তো লোকের ভীড়ে বাছা আমার কোথায় হারিয়ে গেছে।
ওগো, আমাদের যে এখন বড় বিপদ চলছে। (শিরে করাঘাতপূর্বক)
হা আমার ভাগ্য, হা আমার পোড়া কপাল,.....আমার নিমাইকে কি
হারালাম! হা নারায়ণ! হা ভগবান্! আমার নিমাইকে রক্ষা কর!
আমার নিমাইকে ফিরে দাও হরি!

মিশ্র—হে অধোক্ষজ নারায়ণ, আমি কি তোমায় প্রাণভরে ডাকি নাই!
তুমি তো জান আমি অবোধ জীব। আমার জ্ঞানে-অজ্ঞানে সকল ক্রটি ক্ষমা
ক'রে আমার বাছা নিমাইকে ফিরে দাও! আমার সুখ-সম্পদ, বিষয়-বৈভব,
দেহ-গেহ, ধন-জন কিছুই চাই না, আমাকে আর কিছু দিও না—শুধু
নিমাইকে দাও। হে ভগবান্, মঙ্গলময়...তুমি আমার নিমাইকে রক্ষা কর প্রভু!

শচীদেবী—ওগো ভগবান্, তুমি কি নিষ্ঠুর! আমার নিমাইকে
কেড়ে নিয়ে কি তোমার এতই শান্তি হ'ল! ওগো, এ অধর্মের প্রতি
নিষ্ঠুর হ'য়ো না! নিমাইকে কেড়ে নিয়ো না! সেদিন এক সাপে আমার
নিমাইকে দংশন কর্ত, সে তো তোমারই কৃপায় প্রাণ ফিরে পেয়েছে
প্রভু! আজও তাই বলি,—ওগো মঙ্গলময় বিপদবারণ হরি, তুমিই এক-
মাত্র আমার নিমাইয়ের রক্ষাকর্তা! তুমি তা'কে ফিরে এনে দাও,.....
নইলে আমি নিশ্চয়ই আর এ জীবন রাখ'ব না। নিমাই—নিমাই!.....
কই, এখনও তো তার সাড়া মিলে না! তবে কি সে নেই!

মিশ্র—ক্ষান্ত হও গিন্নী! একটু তল্লাস করা যাক! সে নিশ্চয়ই
কাছাকাছি কোথাও আছে। আমাদের ঘরে বিপদভঞ্জন “অধোক্ষজ বিষ্ণু-
পাদপদ্ম” থাকতে তার কোন বিপদই আসতে পারে না—আসবে না।

শচীদেবী—ওগো তুমি যতই প্রবোধ দাও,...আমার মন মানে না।
আমি তো দেখছি আমার নিমাইয়ের পদে পদে বিপদ। আহা, বাছা আমার
কোথা গেল! সে যে মা ছাড়া এককর্ণও থাকে না। কাছাকাছি কোথাও
থাকলে সে নিশ্চয়ই আমার ডাকে সাড়া দিত। নিমাই—নিমাই.....
...ও বাবা নিমাই.....

মিশ্র—নিমাই—ও নিমাই ! (কাঁদিতে কাঁদিতে ইতস্ততঃ অব্বেষণ)

[নেপথ্যে :—

...নিমাইকে কাঁধে করিয়া ১ম চোর ও তৎপশ্চাতে ২য় চোর মিশ্র বাটীর
বহির্ভাগের রাস্তায় আসিতে আসিতে...

১ম চোর—(২য় চোরের প্রতি) আর আমাদের বাড়ী পৌঁছে গেছি
ভাই !

২য় চোর—চল, বাড়ীর ভিতরে গিয়ে নিশ্চিতে অলঙ্কারগুলো
খুলে নেওয়া হবে] ।

“বৈষ্ণবী মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে ।

জগন্নাথ-ঘরে আইল নিজ ঘর জানে ॥

চোর দেখে আইলাম নিজ মন্দিরস্থানে ।

অলঙ্কার হরিতে হইলা সাবধানে ॥”

[মিশ্রের গৃহদ্বারে নিমাইসহ ১ম চোর ও ২য় চোরের প্রবেশ]

১ম চোর—(নিমাইয়ের প্রতি) নামো বাবা, আমরা ঘরে এসেছি ।

[নিমাই নামিতে চাহিলেন ও ১ম চোর স্বকৃত হইতে নিমাইকে নামাইল]

মিশ্র—কে ?.....নিমাই—নিমাই !

নিমাই—[পিতৃদেব মিশ্রকে দেখিতে পাইয়া] বাবা,—বাবা !.....

(দৌড়িয়া গিয়া মিশ্রের কোলে উঠিলেন)

মিশ্র—(নিমাইকে কোলে করিয়া পুনঃপুনঃ চুম্বন করত)

ওরে আমার বুকের মানিক

আমার প্রাণধন,

নিমাই আমার সোনার নিমাই

জগত-জীবন ।

(শচীদেবী মিশ্র-কোলে অবস্থিত নিমাইকে দেখিয়া মাঝে মাঝে নিমাইকে
চুম্বন করিতেছেন)

২য় চোর—(১ম চোরের প্রতি) এ—কি ! এতো আমাদের ঘর
নয় ! এ কোথায় এলি ? এ ভেক্সি লাগ্‌ল নাকি রে !

১ম চোর—তাইতো রে ; আবার সেই জায়গাতেই ঘুরে ফিরে
হাজির হয়েছি । কি সর্বনাশ, চল্—চল্—পালাই চল্ ।

২য় চোর—জয় মা চণ্ডী ! বাঁচাও। চল্—তাড়াতাড়ি চল্।

(দুই চোরের দৌড়াইয়া প্রস্থান)

“পরমার্থে দুই চোর মহাভাগ্যবান্।

নারায়ণ যার স্বন্ধে করিলা উত্থান ॥”

শচীদেবী—(মিশ্র-কোলে শায়িত শিশু নিমাইকে বারংবার চুষন করিতে করিতে নিমাইয়ের প্রতি) দৈবে ভগবান্ তোকে রক্ষা করেছেন, বাবা ! ও আমার সোনা মানিক, এতক্ষণ কোথায় ছিলি বাপ্ !

(নিমাইকে কোলে লইলেন)

“প্রভু বলে আমি গিয়াছিহু গঙ্গাতীরে।

পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে ॥

তবে দুই জনা আমা কোলেতে করিয়া।

কোন্ পথে এইখানে থুইল আনিয়া ॥

সবে বলে মিথ্যা কভু নহে, সত্যবানী।

দৈবে রাখে শিশুবুন্ধে অনাথ আপনি ॥

এই মত বিচার করেন সর্বজনে।

বিষ্ণু-মায়া-মোহে কেহ তত্ব নাহি জানে ॥

এই মত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।

কে তারে জানিতে পারে যদি না জানায় ॥”

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

শ্রীশ্রী একাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়]

(পূর্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১২ পৃষ্ঠার পর)

সফলা একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে প্রভো ! পৌষ-কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশীর কি নাম, কি বিধি এবং কোন্ দেবতা ঐ দিন পূজিত হইয়া থাকেন, তাহা আমাকে বিস্তৃতভাবে বলুন। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে মহারাজ ! আপনার প্রতি স্নেহবশতঃ উক্ত ব্রতসম্বন্ধে বলিতেছি। বহু দক্ষিণা-দানযুক্ত যজ্ঞাদি দ্বারাও আমি সেরূপ তুষ্ট হই না, এই একাদশীব্রত আমাকে যেরূপ

তুষ্ট করিয়া থাকে। হে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ! সর্বপ্রকার চেষ্টা দ্বারা এই একাদশী-ব্রত পালন করা কর্তব্য। ইহা সত্য বলিয়া জানিবে, কদাচ মিথ্যা নহে।

সফলা একাদশীতে কৃত্য

পৌষের গৌণচান্দ্রীয়া (কৃষ্ণ-পক্ষীয়) একাদশী 'সফলা' নামে কথিতা হন। নাগগণের মধ্যে যেমন শেষনাগ, পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, দেবগণের মধ্যে নারায়ণ, মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ব্রতগণের মধ্যে একাদশী-ব্রতই সর্বশ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! যাহারা হরিবাসবযুক্ত একাদশী-ব্রতাচরণ করেন, তাহারা আমার প্রিয়। তাহাদের এ জগতে ধনলাভ ও মৃত্যুর পর মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। এই 'সফলা একাদশীতে' ফলের দ্বারা ও শ্রীনামোচ্চারণ দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবে। নারিকেল ফল, গুবাক, বীজপূরক, বাতাপিলেবু, দাড়িম্ব, আমলকী, লবঙ্গ, বদরীফল, আম্র ও ধূপ-দীপ প্রভৃতি দ্বারা দেবদেব বিষ্ণুর পূজা করিবে। 'সফলা একাদশীতে' দীপদান বিশেষ ভাবে করণীয়। রাত্রিতে বৈষ্ণবের সাহিত জাগরণও করণীয় জানিবেন।

হে যুধিষ্ঠির! রাত্রিতে একনিমেষও একাগ্রমনে যিনি জাগরণ করেন, তাঁহার পুণ্য অসীম। এই জাগরণ-তুল্য ফলদায়ক কোনও যজ্ঞই নাই, কোন তীর্থও নাই। অত্র সমস্ত ব্রতের ফল এই জাগরণের ষোড়শাংশের একাংশ তুল্যও নহে। সহস্র বৎসর তপস্তায়ও যে ফললাভ হয় না, একমাত্র সফলা একাদশীতে রাত্রি জাগরণের দ্বারা মনুষ্যগণ তাহা লাভ করিয়া থাকে।

উৎপত্তি ও বিবরণ

মাহিষ্মত নগরে চম্পাবর্তী নামে এক প্রসিদ্ধ পুরী ছিল। তথায় রাজর্ষির পঞ্চপুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র লুন্তক সর্বদা পরদারভিগমন, বেশ্যাসক্তি ও মদগান প্রভৃতি মহাপাপকার্যে রত থাকিয়া পিতার সমস্ত ধনই নষ্ট করিয়া ফেলে। অসদ্ব্যবহার ঐ পুত্র সর্বজন ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দেবগণকে নিন্দা করিত। মাহিষ্মত-রাজ জ্যেষ্ঠ পুত্রের ঈদৃশ আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। পিতা ও আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত বিপথগামী সেই লুন্তক নিজের স্ত্রী-পুত্রাদি কর্তৃকও পরিত্যক্ত হইল।

পিতা ও বন্ধুগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত লুন্তক চিন্তা করিল, "আমি পিতা ও বন্ধুগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছি; সুতরাং সিংহ ও ব্যাঘ্রাদিগণের গহন বনে অবস্থান করিলে পাপাচরণ ও পিতৃ-রাজ্য বিনষ্ট করিবার সুবিধা হইবে।" এইরূপ স্থির করিয়া দৈবযোগে

সে পিতৃরাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া এক গহন বনে প্রবেশ করিল। চৌর্য্য ও দ্যুত ক্রীড়ায় অভিজ্ঞ সে অনুক্ষণ জীব-হত্যায় রত থাকিত এবং বন-সমীপস্থ নগরসমূহে চুরি করিতে লাগিল। এক দিবস সেই পাপকর্ম্মা লুপ্তক চুরি করিবার জন্ত নগরে যাইয়া গ্রামবাসী প্রহরিগণ-কর্তৃক ধৃত হয়। সে তখন তাহাদিগকে বলিল, আমি মাহিষ্মত রাজার পুত্র। প্রহরীরা তাহাকে রাজার পুত্র জানিতে পারিয়া ছাড়িয়া দিল। তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সেই পাপচারী লুপ্তক পুনরায় বনে আগমন করিল। এইরূপে নিত্য জীবহত্যা-দ্বারা আমিষ-ভোজন ও বৃক্ষের ফল-ভক্ষণে সে দিন কাটাইতে লাগিল।

ঐ গহন বনে বহু বৎসরের একটি জীর্ণশীর্ণ অশ্বথ বৃক্ষ ছিল। তথায় ভগবান্ বাসুদেব বিরাজ করায় বৃক্ষটি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই অশ্বথ বৃক্ষের নিকটে পাপবুন্নি লুপ্তক অবস্থান করিত। অনন্তর বহুদিন গত হইলে পূর্ব্বজন্মের কোনও পুণ্যফলে পোষ্যামের কৃষ্ণপক্ষীয় দশমীদিনে সে কেবল ফল ভক্ষণ করিয়া থাকিল। ঐ দিবস রাত্রিতে শীতে অত্যন্ত কাতর হইয়া দৈত্বের দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করতঃ দৃষ্টিহীন সেই পাপিষ্ঠ লুপ্তক ভগবদধিষ্ঠান সেই অশ্বথ বৃক্ষের সমীপে বিবসন মৃতপ্রায় হইয়া অনিদ্রায় রাত্রিযাপন করে। সূর্য্যোদয় হইয়া গেলেও সেই পাপিষ্ঠ চेतনা লাভ করিল না। সফলা-ব্রতদিনে সংজ্ঞাহীন লুপ্তক এইভাবে সমস্ত দিবস পড়িয়া থাকিয়া মধ্যাহ্নকালে সংজ্ঞালাভ করিল।

চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শয্যা হইতে উত্থানপূর্ব্বক খঞ্জের ত্রায় পুনঃপুনঃ পদস্থলিত হইয়া সে বনমধ্যে প্রবেশ করিল। ক্ষুধাতৃষ্ণায় সে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিল, কিন্তু জীব হস্তাধারাও ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে অসমর্থ হইয়া সেই পাপিষ্ঠ ইতস্ততঃ অনেকগুলি ফল সংগ্রহ করিয়া নিজ স্থানে পৌঁছিল। সূর্য্যদেব তখন অস্তগামী হইয়াছেন। তাহার ইন্দ্রিয়গুলিও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। সে জীবনভয়ে ভীত হইয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে “হে পিতঃ! আমার গতি কি হইবে” এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর সংগৃহীত ফলসমূহ সেই অশ্বথ-বৃক্ষমূলে নিবেদনপূর্ব্বক ‘হে লক্ষ্মীপতি নারায়ণ তুষ্ট হউন’—এইরূপ বলিতে বলিতে লুপ্তক সারারাত্রি কাটাইয়া দিল। রাত্রিমধ্যে তাহার আর নিদ্রা হইল না।

“হে নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! সেই পাপিষ্ঠ লুপ্তকের এই রাত্রি-জাগরণকে

নারায়ণ সফলা একাদশীর জাগরণ বলিয়া এবং ফলার্পণকে পূজা বলিয়া গ্রহণ করিলেন । দৈব ঘটনাক্রমে কোন সৌভাগ্যবশতঃ লুপ্তকের এইভাবে সফলা ব্রতটি নিষ্পন্ন হইয়া গেল । এই অশ্বখ বৃক্ষে রাত্রিতে বিষ্ণুর অধিষ্ঠান হয়, সূর্য্যোদয় হইলেই বিষ্ণু প্রস্থান করেন । উক্ত ঘটনার পর দিবস প্রাতে বিষ্ণুর গমনকালে আকাশে একটি দৈববাণী উথিত হইল, যে পুত্র তুমি সফলা ব্রতের অনুগ্রহে রাজ্যলাভ করিবে । এই দৈববাণীর উদ্দেশ্যে সেই লুপ্তক ‘তাহাই হউক’ বলিবামাত্র দিব্যরূপ লাভ করিল ।

তদবধি তাহার পাপ বুদ্ধি দূর হইয়া পরম বৈষ্ণব-বুদ্ধির উদয় হইল এবং দিব্য আভরণাদিতে শোভিত হইয়া নিকটক রাজ্যলাভ করিল । পঞ্চদশবর্ষ পর্য্যন্ত সেই রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া কৃষ্ণকৃপায় লব্ধ মনোজ্ঞ পুত্রে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিল । তৎপর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সে অশোক অভয় কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করিল ।

“হে মহারাজ ! এইরূপে উক্ত সর্বোত্তম সফলা একাদশীব্রত যিনি পালন করেন, তিনি এজগতে নানা সুখ প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর পর মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন । এই সফলা ব্রতে যাহারা আসক্ত তাহারাই এজগতে ধন, তাহাদের জন্মই সার্থক—ইহাতে কোন সংশয় নাই । এই ব্রত-মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করিলে মানব রাজস্বয় যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে ।”

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে পৌষ-কৃষ্ণপক্ষীয় সফলা-একাদশী-ব্রত-কথন নামক ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

—পাণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি ব্যাকরণতীর্থ

জৈবধর্ম্মের ফলশ্রুতি

পৃথিবীতে যত কথা ‘ধর্ম্ম’ নামে চলে ।

ভাগবত কহে, সব পরিপূর্ণ ছলে ॥ ১ ॥

ছল ধর্ম্ম ছাড়ি’ কর সত্যধর্ম্মে মতি ।

চতুর্বর্গ ত্যজি’ ধর নিত্য প্রেমগতি ॥ ২ ॥

আমিত্ব-মীমাংসা-ভ্রমে নিজে জড়বুদ্ধি ।

নিবিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানে নহে চিত্তশুদ্ধি ॥ ৩ ॥

বিচিত্রতাহীন হ'লে নির্বিশেষ হয় ।

কাল-সীমাতুল্য সেহ অপ্রাকৃত নয় ॥ ৪ ॥

খণ্ডজ্ঞানে হেয় ধর্ম আছে সুনিশ্চয় ।

প্রাকৃত হইলে কভু অপ্রাকৃত নয় ॥ ৫ ॥

জড়ে দ্বৈতজ্ঞান হেয়, চিৎ-এ উপাদেয় ।

কৃষ্ণভক্তি চিরদিন উপায়-উপেয় ॥ ৬ ॥

জীব কভু জড় নয়,—হরি কভু নয় ।

হরি-সহ জীবাচিন্ত্য-ভেদাভেদময় ॥ ৭ ॥

দেহ কভু জীব নয়, ধরা ভোগ্যা নয় ।

দাস, ভোগ্য—জীব, কৃষ্ণ প্রভু-ভোক্তা হয় ॥ ৮ ॥

জৈবধর্ম নাহি আছে দেহধর্ম-কথা ।

নাহি আছে জীবজ্ঞানে মায়াবাদ-প্রথা ॥ ৯ ॥

জীব-নিত্যধর্ম ভক্তি, তাহে জড় নাই ।

শুদ্ধ জীব প্রেম-সেবাকলে পায় তাই ॥ ১০ ॥

জৈবধর্ম-পাঠে সেই শুদ্ধভক্তি হয় ।

জৈবধর্ম না পড়িলে কভু ভক্তি নয় ॥ ১১ ॥

রূপানুগ-অভিমান পাঠে দৃঢ় হয় ।

জৈবধর্ম-বিমুগ্ধকে ধর্মহীন কর ॥ ১২ ॥

যাবৎ জীবন যেই পড়ে জৈবধর্ম ।

ভক্তিমান সেই জানে, বৃথা জ্ঞান-কর্ম ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণের অমল-সেবা লভি' সেই নর ।

সেবাস্থখে মগ্ন রহে সদা কৃষ্ণপর ॥ ১৪ ॥ *

* ইংরাজী ১৯১৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত 'জৈবধর্ম'-পাঠকের কি ফল লাভ হইতে পারে তৎসম্বন্ধে স্বজ্ঞানস্বরে এই কয়েকটি অমূল্য উপদেশ পড়ে গ্রথিত করিয়াছেন । — সম্পাদক

সংখ্যাধারা দার্শনিক-শিক্ষা

জগদগুরু পরমহংস-চুড়ামণি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-কুলবরেণ্য অনুমান ৩৭ বৎসর পূর্বে তাঁহার প্রবর্তিত সাপ্তাহিক “গৌড়ীয়” পত্রিকার ৮ম খণ্ড, ৩০শ সংখ্যায় “সাংখ্যাবাগী” শীর্ষক একটি মৌলিক প্রবন্ধ তত্ত্ববিৎ বৈষ্ণবগণের জন্ত প্রকাশ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রকার অভিনব সংখ্যাগত তত্ত্বের সঙ্কলন বৈষ্ণবজগতে এক নূতন আবিষ্কার। তিনি ভারতীয় গণিত-জ্যোতিষের সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আধনায়ক ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি বঙ্গে পঞ্জিকাসংস্কার বাপারে ও পারমাখিক পঞ্জিকা প্রণয়নে বিশ্ববাসী সকলকেই স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করিয়াছেন। সমগ্র ভারতে সর্বপ্রধান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকুল-চুড়ামণি শ্রীশ্রীমদ্ জীবগোস্বামিপাদ জীবমাত্রেরই পরামুক্তিলাভের সহজ উপায়স্বরূপ শ্রীহরিনামামৃত-সঙ্কেতের দ্বারা “হরিনামামৃত ব্যাকরণ” রচনা করিয়া পৃথিবীতে অভিনব সর্বোত্তম উপকার সাধন করিয়াছেন। মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম পরমহংস কুল-চুড়ামণি জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের,

“সাক্ষ্যেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভ-হেলনমেব বা।

বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং অশেষাঘহরং বিদ্বঃ ॥”

—শ্লোকের সার্থকতা সম্পাদনের জন্ত “বিষ্ণুধর্মোত্তর” ও “হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র” হইতে সর্বপ্রথম পঞ্জিকার দিন-কালাদির সংজ্ঞাসমূহ উদ্ধার করিয়া সমগ্র জগতে এক যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি সূর্যের গতিদ্বয়, ঋতুচক্র, পক্ষদ্বয় ও মলমাস, মাসদ্বাদশক, বারসপ্তক, ষোড়শী তিথি, সপ্তবিংশতি নক্ষত্র প্রভৃতির সংজ্ঞা ভগবন্নামের দ্বারা নিরূপিত করিয়াছেন। ইহা বৈষ্ণবজগতে তাঁহার অতুল-কীর্তি “হরিনামামৃত-ব্যাকরণে”র ন্যায় বিঘোষিত থাকিবে। তাঁহার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা নাম অনুসারে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে বিদ্বৎ সারস্বত “শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা” দ্বাদশ বৎসরের অধিককাল প্রকাশিত হইতেছেন। গণিত-জ্যোতিষের পঞ্জিকা-গণনাব্যাপারেও পারমার্থিক চিন্তাধারা হইতে সাধারণ লোক যাহাতে বিচলিত না হয় তজ্জন্ত তিনি গণিত-জ্যোতিষ মণ্ডলেরও নানাবিধ সংজ্ঞাকে ভগবৎ ও ভাগবত-সংজ্ঞার দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।

গণিতশাস্ত্রের বিচার-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা ‘১’ (এক) বলিয়া একটি সংখ্যা লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই সংখ্যাগত ‘১’ (এক)-এর মৌলিকত্ব অনুসন্ধান করিলে ইহা গণিত-শাস্ত্রবিদগণের ‘কাল্পনিক সংখ্যা’ বলিয়াই

প্রতীত হইয়া থাকে। যে-বস্তু বা সংখ্যার উদ্ভবের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহাকেই মানস-রাজ্যের কাল্পনিক পদার্থ বলা হয়। পৃথিবীতে ‘১’ (এক) বলিয়া কোন সংখ্যাই নাই তথাপি ‘১’ সংখ্যাই গণিত-শাস্ত্রের আদি সংখ্যা এবং ‘১’ হইতে সমস্ত উন্নত সংখ্যাসমষ্টির উদ্ভব হইয়াছে—ইহাই গণিত-শাস্ত্রের মত। কেহ কেহ ‘০’—শূন্যকেও গণিত-শাস্ত্রের আদি সংখ্যা বলিয়া বিচার করিয়া বৌদ্ধ-পদাবলেহী হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ ‘১’-এর ধারণা কি, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, —Diversity in unity অর্থাৎ একত্বের চিন্তায় বিশেষত্বের বিকাশ অবশুসম্ভাবী; সুতরাং নির্বিশেষ ‘১’ কোন বস্তু নহে। যাহার মৌলিকত্ব কাল্পনিক বা শূন্য, তাহা হইতে বাস্তবের আবির্ভাব অলীক ও অসম্ভব। কেহ কেহ মনে করেন, “অসত্যঃ সদজায়ত”—এই বেদবাণী তাহাদিগকে আপাততঃ সমর্থন করেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উপনিষদের উক্ত অংশ দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উহা বেদের পূর্বপক্ষস্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। কারণ তৎপরক্ষণেই উহা খণ্ডন করিয়া উপনিষদ বলিয়াছেন, —“সত্যঃ সদজায়তঃ”। পূর্বোক্ত বাক্য সিদ্ধান্তপক্ষে গ্রহণ করিলে ও অসৎ বস্তু হইতে সত্তার উৎপত্তি কিরূপে সম্ভবপর হয় বৈজ্ঞানিক জগৎ তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

‘অসৎ’ বলিলে ‘আত্যন্তিক অসৎ’ বুঝায় না। বস্তু-প্রসবের সত্তা তাহাতে অনুসৃত থাকিবেই; নচেৎ ‘আত্যন্তিক অসৎ’ বস্তু হইতে কোন বস্তুরই উদ্ভব সম্ভবপর হয় না। সুতরাং ‘অসৎ’ বলিলেও বাহ্যতঃ অসত্যের গ্রায প্রতিভাত হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহাতে বস্তু-প্রসবিনী সত্তা নিশ্চয়ই অনুসৃত আছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, আম্রের বীজ পুঁতিলে তাহা হইতে পনমের (কাঁঠালের) বৃক্ষ হইবে না বা কাঁঠালের বীজ পুঁতিলে তাহা হইতে আম্রবৃক্ষ হয় না। ইহাই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ “অসত্যঃ সদজায়তঃ”—এ পূর্বপক্ষস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার উত্তরে বলিয়াছেন, “সত্যঃ সদজায়তঃ”। বৈদান্তিক কুল-চুড়ামণি গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও বিচারের দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ‘অসৎ’-শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ-আকার-রহিত অনবস্থা বুঝাইলেও বস্তুসত্তা প্রকাশের সত্তা (Potency) তাহার অন্তর্নিহিত ব্যাপার।

গণিত-শাস্ত্রে ‘১’ হইতে ‘৯’ এবং ‘০’ শূন্যসহ দশটী অঙ্কই সর্বপ্রধান। ইহাদের Permutation and Combination অর্থাৎ আনুলোমিক ও প্রাতিলোমিক ক্রিয়াপ্রভাবে ভারতীয় গণিত-শাস্ত্র যে সর্বোচ্চ সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন, পৃথিবীর কোন দেশই তাহার নিকটে পৌঁছাইতে পারেন নাই। এ বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গাণিতিক বিকাশ আর্য্য ঋষিগণের মধ্যেই সর্বতোভাবে অধিক পরিলক্ষিত হইয়াছে।

মদীয় গুরুপাদপদ্ম গণিত-জগতের সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গণিতের ‘সাংখ্য’ বিচারের তুলনায় দর্শনশাস্ত্রের ‘সাংখ্যতত্ত্বের’ চতুর্বিংশতি (২৪) পদার্থ সসীম কলার অন্তর্জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ গণিতীয় উক্ত দশটী সংখ্যার আনুলোমিক ও প্রাতিলোমিক ক্রিয়াগত সংখ্যার অত্যন্ত নিম্নতম পর্য্যায়ে অবস্থিত। কপিলের সাংখ্য সীমাবদ্ধ প্রাকৃত বিশ্বেই আবদ্ধ।

নিরীশ্বর-সাংখ্য সর্বতোভাবে উপেক্ষিত। তাহারা প্রকৃতিতে সর্ব-কর্তৃত্ব আরোপ করিতে গিয়া পুরুষকে নিষ্ক্রিয়, অর্থাৎ কেবল একটী শব্দমাত্ররূপে ও সংখ্যা-পূরণের জন্ত স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্ত ‘সাংখ্য’ দর্শনে চতুর্বিংশতি প্রাকৃত তত্ত্বহলে অথবা আর একটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়া ‘পঞ্চবিংশতি’ তত্ত্ব-সংখ্যা বিচারের অভিনয় হইয়াছে। ‘এক’ হইতে ‘চব্বিশ’ পর্য্যন্ত সংখ্যা গ্রহণ করিয়াও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যদি স্বীকার করিতেই হয় তবে ইহাতে বৌদ্ধযুগীয় ‘০’—শূন্যস্বরূপ একটী পুরুষ-সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্বটিকে ‘পুরুষ’ এই আখ্যা দ্বারা নিরূপণ করিলেও তাহা নিষ্ক্রিয় বিধায় ‘০’—শূন্যেই বিলীন হইয়াছে।

তিনি বলেন,—প্রকৃতির অন্তর্গত তত্ত্বসংখ্যার বিচারের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হইলে সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং তাহাই মোক্ষ। প্রকৃত বিচারে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি এক কথা নহে। এইজন্ত বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, ইতিহাসাদি সকল শাস্ত্রই ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—প্রাকৃতজ্ঞানের দ্বারা অপ্রাকৃত মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গযোগেও পরব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব; কারণ এই যোগদর্শন ঈশ্বর-স্বীকার করিলেও নিরীশ্বর সাংখ্যযোগেরই অনুরূপ বা প্রতীক। এইজন্ত সাংখ্যের সংখ্যাগত বিচারের हेयত্ব ও সদোষত্ব প্রতিপাদনপূর্বক শ্রীল প্রভুপাদ “সাংখ্যবাণী”-রূপ

অপ্রাকৃত দার্শনিক-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়া-ছেন। সকলেই এই “সংখ্যাবানী” আলোচনা করিলে প্রকৃতই মোক্ষ ও ভগবানের সাক্ষাৎ সেবালাভে নিত্যসুখ প্রাপ্ত হইবেন; ইহারই অপর নাম পরম মোক্ষ। পাঠকবর্গ ধীরভাবে আলোচনা করিলে ইহার অতি-মর্ত্যাত্ম অনুভব করিতে পারিবেন।

সাধারণ শিক্ষিত জগতের ধারণা, Mathematical proof is the best proof. (গণিত-শাস্ত্রের প্রমাণই সর্বোত্তম প্রমাণ)। দার্শনিক জগৎ ইহাকে কিন্তু সর্বতোভাবে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, $২ + ২ = ৪$; অর্থাৎ ‘দুই’ এর সহিত ‘দুই’ যোগ দিলে ‘চার’ হইবে বা ‘চার’ এর সমান হইবে। Practical field-এ (ব্যবহারিক বা প্রয়োগ ক্ষেত্রে) ইহা কখনও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে না। ইহার কারণ আমার বাল্যজীবনের একটি লৌকিক উদাহরণের দ্বারা আপনাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি:—

“আমার ছোট ভ্রাতা আগাকে একটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ‘বল্ দেখি, এক মণ লোহ ভারী কিংবা এক মণ তুলা ভারী হইবে?’ আমি একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, ‘উভয়েই সমান’। তখন তিনি বলিলেন, ‘কেন? তুলা অত্যন্ত হাল্কা, লোহা অত্যন্ত ভারী ত্রিনিষ। সুতরাং তুলা ও লোহা সমান হইবে কি করিয়া? ওজন সমান হইলেও উহারা বস্তুতঃ সমান নহে।’ তিনি এই সম্বন্ধে আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে লৌহখণ্ডের উপর Air pressure (বায়ুর চাপ) যত কম পরিমাণ হইবে তুলার আয়তন (Volume) অত্যন্ত অধিক বলিয়া তাহাতে বায়ুর চাপ (air pressure) অধিক পরিমাণে থাকিবে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত কম তুলার দ্বারাই এক মণ ওজন পূর্ণ হইয়া যাইতেছে; অর্থাৎ তুলার সহিত অধিক বায়ুর চাপ থাকার দরুণ পরিমাণে লৌহের তুলনায় তুলা স্বভাবতই একটু কম হইবে, যদিও ওজনে উভয়েই সমান। ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের বিচার অনুসারে দেখিতে গেলেও অল্প পরিমাণ তুলাতেই এক মণ ভারী হইবে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, ‘এক’-এর সহিত ‘এক’-এর সমতা অথবা ‘২+২’ এর সহিত ‘৪’ এর সমতা প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক জগতে কখনই একই প্রকার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং গাণিতিক প্রমাণকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

পাশ্চাত্য গণিতবিদ Euclid (ইউক্লিড) এর Geometrical Identity-ও (জ্যামিতিক অভেদ) উক্ত প্রমাণ, স্থায় ও বিধি অনুসারে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। 'Identical' বলিলে বৈষম্যযুক্ত সমতাব্যতীত একত্ব কখনই প্রতিপাদিত হয় না।

সুতরাং “একমেবাদ্বিতীয়ম্”—এই বেদমন্ত্র সৰ্ব্ববাদিসম্মত হইলেও শঙ্করাচার্য্য-কথিত একত্বের বিচার আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে বলিধাই প্রতিপন্ন হইতেছে; অর্থাৎ, নির্দ্বিগ্ধ ‘এক’ বলিয়া কোন বস্তুই নাই, অথবা ইহা শূন্যের প্রতিযোগীও নহে। ‘এক’ যদি বহুত্বের প্রমাপক অথবা প্রমাণকারী হয় তাহা হইলে সেই ‘এক’-এর ঙ্গীকারে কোন বাধা লক্ষ্য করা যায় না; অর্থাৎ ‘এক’ই ‘বহু’, অথবা দ্বিত্ব, ত্রিত্ব, বহুত্ব হইতেই ‘এক’-এর উৎপত্তি। বহুর চিন্তা, ধারণা বা প্রমাণ-ব্যতীত ‘এক’ বলিয়া কোন বস্তু নাই, এমনকি তাহাকে ‘শূন্য’ও বলা যাইতে পারে না। ‘০’-শূন্যের চিন্তা এবং ‘১’—এক-এর চিন্তা পরস্পর আত্মাশ্রিত তত্ত্ব নহে। অত্যাণ্ড আশ্রয় ব্যতীত ইহাদের সত্তা মিথ্যা ও বঞ্চনামূলক। ইহাকেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু “অচিন্ত্যভেদাভেদ” বলিয়াছেন।

এস্থলে পাঠকগণের নিকট বেদের “একমেবাদ্বিতীয়ম্” বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কিছু নিবেদন করা আবশ্যক মনে হইতেছে। উক্ত বৈদিক মন্ত্রের অর্থ করিলে ‘একম্’, ‘এব’, ‘অদ্বিতীয়ম্’ এই তিনটি পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ‘এক’ শব্দের দ্বারা গণিতের বা অঙ্কের প্রাথমিক বিকাশকে লক্ষ্য করা হয় : ‘অদ্বিতীয়’ বলিলে সংখ্যাগত ‘দুই’কে বুঝায় না। কারণ ‘দুই’ অথবা ‘দ্বিতীয়’ সংখ্যাদ্বয় এক প্রকার নহে। ‘দুই’ (two) দ্বিবচন, ‘দ্বিতীয়’ (second) একবচন। সুতরাং ‘অদ্বিতীয়’ বলিলে নঞ-তৎপুরুষ সমাসের শুদ্ধ ‘দ্বিতীয়’ রহিত বুঝায়, কিন্তু ‘দুই’ সংখ্যা-রহিত বুঝায় না। ‘দ্বিতীয়’-রহিত শব্দে অসমোর্ধ্ব বুঝায়, অর্থাৎ বহু সংখ্যার মধ্যে তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহার সমান বা উর্দ্ধ কেহ নাই। সুতরাং ‘অদ্বিতীয়’ পদের দ্বারা ‘দুই’ সংখ্যাকে নিবারণ বা নিষেধ করা হইতেছে না — ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল। অতএব কেহ যদি উক্ত বৈদিক মন্ত্রের অর্থ করিতে গিয়া ‘এক’ই ‘দুই’ নহে—একরূপ অর্থ করেন তাহা হইলে তাহাকে ভ্রান্ত বলিতে হইবে; ভাষা-ব্যাকরণের জ্ঞানের অভাব বুদ্ধিতে হইবে।

আমরা সর্বত্রই ‘অদ্বিতীয়’ শব্দের প্রয়োগ ও আলোচনা দেখিতে পাই। উহা কৃত্রাপি দ্বি-বচনাত্মক শব্দ বলিয়া ব্যবহৃত হয় নাই, অর্থাৎ ‘দুই’ এই সংখ্যাকে লক্ষ্য করে নাই। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাইতেছে,—যথা, “অদ্বিতীয়” পণ্ডিত। এ স্থলে “অদ্বিতীয়” শব্দের অর্থ দুই জন পণ্ডিত নহে, একজন পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া অগাধ পণ্ডিতদের সহিত তুলনামূলক বিচারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। ‘অদ্বিতীয়’ পণ্ডিত বলিলে বহু পণ্ডিতের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত যাহার সমান বা উর্দ্ধ কেহ নাই,—এইরূপ বুঝায়। তাহার দ্বারা কেবল মাত্র সেই পণ্ডিত ব্যতীত আর কোন পণ্ডিত পৃথিবীতে নাই, ইহা আদৌ প্রতিপন্ন হইতেছে না। তজ্জন্ত ভগবানকে “অসমোর্দ্ধ”—তত্ত্ব বলা হয়। ভগবানের সমান কেহ নাই, তাঁহার উর্দ্ধ বা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। ইহার দ্বারা ভগবত্ত্ব ব্যতীত অণু কিছুরই অবস্থিতি নাই, ইহা কোনক্রমেই সিদ্ধ হয় না। তজ্জন্তই ভগবত্ত্বের উল্লেখমাত্রই ভক্ত, জীব ও বিবিধ তত্ত্বের সমাবেশকেই বুঝায়। সুতরাং “অদ্বয়” বলিলে ‘বহুত্বের বা ‘সর্বত্বের’ আবাহকই বুঝায়। বৈদিক পরিভাষার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরিত্যাগ করিয়া কাল্পনিক অর্থ স্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

যদিও কল্পনামাত্রেরই হেতু, প্রতিজ্ঞা, উদাহরণাদি পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু ‘১’-(এক) সংখ্যাটির হেতু, প্রতিজ্ঞা বা উদাহরণাদির কোন লক্ষণ বিশ্লেষণে পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং নির্বিশেষ ‘এক’-এর কল্পনার হেতু বা লক্ষণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তজ্জন্ত আমরা গাণিতিক ‘১’ (এক)কে মিথ্যা কল্পনাপ্রসূত ‘এক’ বলিয়া থাকি। উহা প্রকৃত প্রস্তাবে ‘ত্রিবিধ অভাবের’ অন্তর্গত। প্রকৃত বৈদিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর পক্ষে সবিশেষ একত্বের বিচার প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় এবং তাহাই সত্য। নির্বিশেষ ‘এক’ মিথ্যা। অশ্ব ডম্বের দ্বারা কাল্পনিক কোন তত্ত্বকেও ইহা লক্ষ্য করে না।

গণিত-শাস্ত্রের অলৌকিক, অস্বাভাবিক ও কাল্পনিক একত্বের ধারণা এবং পারমার্থিক ধর্ম্যতত্ত্বের একত্বের ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক্। দার্শনিক একত্ব নির্বৈশিষ্ট্য নহে—ইহা পূর্বে নিবেদন করিয়াছি। মদীয় গুরুপাদ-পদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ “সাংখ্যবাসী”র প্রথমেই ‘এক’ বলিতে কি বুঝায়, তাহা পারমার্থিক ‘এক’-তত্ত্বের অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন। “একমেবাদ্বিতীয়ম্”—এই বৈদিক মন্ত্রের একায়ণশাখিগণের পক্ষে

যাহা 'এক' বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা সর্বপ্রথমেই মঙ্গলাচরণ, ভূমিকা বা গ্রন্থপ্রারম্ভেই প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠকগণ এই গ্রন্থখানি যত্নের সহিত পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ রাখিলে বহুবিধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

উৎসব-সমাচার

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব

বিগত ৯ই বৈশাখ ১৩৭৩, ১৮ই মধুসূদন ৪৮০ গৌরাদ, অক্ষয়-তৃতীয়া দিবসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব সমিতির সকল শাখা মঠে বিশেষভাবে উদ্‌যাপিত হইয়াছেন। তৃতীয়া-তিথির অক্ষরত্বে শ্রীসমিতির নিত্যস্থ স্থাপিত হইলেও অজ্ঞানতমোজীবীগণের ক্ষয়িষ্ণু-বস্তুতে অত্যধিক আকর্ষণবশে উক্ত বস্তু-বিগতে যে হতাশাবাজক হৃৎখে বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া যায় তাহা নির্দাপণে পরম রূপাময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপন্নের আনুগত্যে প্রতি বৎসরই উক্ত-তিথিতে এই মহোৎসব পালিত হইয়া থাকে। সমস্ত দিবস ধরিয়া স্বরূপভ্রান্ত জীবের লুপ্তস্মৃতি-উদ্ধারে মহাজনগণের বিবিধ পদাবলী-কীর্ত্তন এবং তাঁহাদের লিপিকা পাঠ হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাজ-রাধাবিনোদবিহারীজিউকে বিবিধ বিশেষ ভোগ নিবেদনান্তে উপস্থিত বহু সজ্জন ব্যক্তিকে ঐ মহাপ্রসাদ সেবন করিবার সুযোগ প্রদান করা হয়।

শ্রীশ্রীজ্ঞানযাত্রা ও শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহোৎসব

বিগত ৩০শে ত্রিবিক্রম, ৪৮০গৌরাদ, ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ শুক্রবার শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠে জ্ঞানযাত্রা উপলক্ষ্যে বার্ষিক মহোৎসব পূর্ব পূর্ব বৎসরের ত্রায় সূচাক্রমে তত্রস্থ মঠাধ্যক্ষ ও সেবকবৃন্দের চেষ্টায় সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে পিছলদার বহু দূরবর্তী জ্ঞানসমূহ হইতে বহু জনসমাগম হয়। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রপাঠ, মহাজন গীতি-কীর্ত্তন ও হরিকথার নৈরতর্গ্যে লোককে উদ্ধুদ্ধ করানই এই মহোৎসবের প্রধান অঙ্গ। ঐ দিবস মধ্যাহ্নে মঠস্থ শ্রীবিগ্রহগণকে চতুর্বিধ রস-সংযুক্ত ভোগ নিবেদনান্তে সমাগত ৬০০ শতাধিক দর্শককে উক্ত মহাপ্রসাদদ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে জ্ঞানযাত্রা-উৎসব

বিগত জ্ঞানযাত্রা-তিথিতে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে

রৌপ্য কলসের ১০৮ কলসপূর্ণ গঙ্গোদকে স্নাত করাইয়া (পুরীর শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের বিধি অনুসারে) বিশেষভাবে তাঁহার অর্চনাাদি সমাপন করা হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগরাগান্তে বহু সজ্জনকে তৎপ্রসাদ প্রদান করা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, চুঁচুড়া মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উৎসব একটা বিশেষ পর্ব।

—নিজস্ব সংবাদ

বেষাশ্রয়

বিগত অক্ষয়-তৃতীয়ার পূণ্যতিথিতে শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য-পাদপদ্ম ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুল মুকুটমণি শ্রীশ্রীমন্তক্ৰিপ্রজ্ঞান কেশব গোষামী প্রভুপাদের নিকট শ্রীগোরাচাঁদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী বাবাজী-বেষ গ্রহণ করেন। বেষান্তে তাঁহারা যথাক্রমে শ্রীমদ্ গোরাচাঁদ দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমদ্ মৃত্যঞ্জয়দাস বাবাজী মহারাজ নামে পরিচিত হন।

শ্রীমদ্ গোরাচাঁদদাস বাবাজী মহারাজ সমিতির শ্রীনাম ও দীক্ষাশ্রিত। ১৪১৫ বৎসর পূর্বে তিনি গৃহ পরিত্যাগপূর্বক মঠে যোগদান করেন। মহোৎসবের রন্ধন-বিভাগের অধ্যক্ষরূপে সমিতির সর্বত্রই তিনি সুপরিচিত। এ জীবন ক্ষণস্থায়ী অথবা কিয়ৎ মাসান্তর তাহার পরিসমাপ্তি ঘটবে, এইরূপ চিন্তায় তিনি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট বাবাজী-বেষ প্রার্থনা করিলে বৈদিক সাত্বত-স্মৃতি শ্রীসংক্রিয়াসার দীপিকানুসারে শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেব তাঁহাকে বাবাজী-বেষ প্রদানান্তর শ্রীমদ্ গোরাচাঁদদাস বাবাজী মহারাজ নামে পরিচিত করেন। মেদিনীপুর জিলার ইচ্ছাপুর পল্লীতে এক বৈষ্ণব পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। বর্তমান বয়ঃক্রম ৩৫ বৎসর। তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া পূর্ব দেবার অধিক পরিমাণে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রচুর প্রীতি বিধান করুন,—ভগবচ্চরণে সমিতির সেবকবৃন্দের ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীমদ্ মৃত্যঞ্জয়দাস বাবাজী মহারাজের পূর্বনিবাস ২৪পরগণা জিলার ভাঙ্গড়গ্রাম। পূর্ব নাম শ্রীমাখনচন্দ্র অধিকারী, বর্তমান বয়ঃক্রম ৫০ বৎসর। ইনি শ্রীল প্রভুপাদপদ্মাশ্রিত পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমন্তক্ৰিবিবেক ভারতী মহারাজের নিকট শ্রীনাম ও দীক্ষাশ্রিত হইয়া গৃহধর্ম-যাজন

করিতেন। গৃহ অবিমিশ্র সুখাগার নহে জানিয়া সর্বতোভাবে মুকুন্দ-চরণাঙ্ঘ্র-সেবায় নিযুক্ত থাকিব এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্বক শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের নিকট তিনি বাবাজী-বেষ প্রার্থনা করেন। তদনুসারে পরম দখালু শ্রীল শ্রীমদাচার্য্যপাদপদ্ম বৈদিক সাত্তত-স্মৃতি শ্রীসংক্রিয়াসার দীপিকানুসারে তাঁহাকে শাস্ত্রোক্ত বেষ প্রদানান্তর শ্রীমদ্ মৃত্যুঞ্জয়দাস বাবাজী মহারাজ নামে পরিচিত করেন।

সাত্তত-শ্রাদ্ধ

বিগত ২রা বামন, ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার ২৪পরগণা জেলার বদির-হাট মহকুমার অন্তর্গত আঁধারমানিক গ্রামে শ্রীহিরণ্যগোবর্দ্ধন দাসাধিকারী মহাশয়ের সাত্তত শ্রাদ্ধ তদীয় দেহরক্ষার একাদশাহে বিস্তৃত বৈদিক প্রাচীন-তম স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও শ্রীসংক্রিয়াসার-দীপিকানুসারে তদ্ গৃহে সমিতির সেবকবৃন্দ কর্তৃক সুসম্পন্ন হয়। ইনি সত্বীক সমিতির আশ্রিত। তাঁহার দেহরক্ষার সংবাদ লইয়া তদীয় ভ্রাতা শ্রীকল্যাণকল্পতরু দাসাধিকারী নবদ্বীপে আগমনপূর্বক কুজ্ঞানবৈভব স্মার্ত রঘুনন্দনের অশুদ্ধ মত পরিত্যাগ করিয়া পূর্বোক্ত প্রাচীনতম স্মৃতির বিধানানুসারে তাঁহার ভ্রাতার পারলৌকিকী ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবার জন্ত শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। তত্রস্থ দেশে কৃষ্ণকৃপাবারি-সিঞ্চনে শ্রীহরির সেবানুকূল আবহাওয়া সঞ্চার করিতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম হরিপ্রিয় বাণীমুখর ব্রহ্মচারিবৃন্দের সহিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহাশয়কে উক্ত স্থানে প্রেরণ করেন। বিরাট বৈদিক জুগুপ্সা নির্মাণপূর্বক তদুপরি শ্রীশ্রীবাসুদেবার্চন, শ্রাদ্ধক্রিয়া এবং ভোগরাগ সমাপনান্তে মহাপ্রসাদদ্বারা বিগত আত্মাকে পিণ্ড প্রদানের পর সমাগত প্রায় তিনশত লোককে আকর্ষণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বহু স্মার্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত ছিলেন। শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে শাস্ত্রের এতাদৃশ সুন্দর বিধি দর্শনে সমিতি-প্রদর্শিত সুশাস্ত্রীয় পন্থায় স্ব-স্ব মৃত পিতামাতার ও আত্মীয়-বর্গের পুনরায় শ্রাদ্ধাদি করিতে সমিতির সেবকবৃন্দকে তাঁহারা সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

সমিতি সংগঠিত শ্রীযুক্ত হিরণ্যগোবর্দ্ধন দাসাধিকারী মহাশয়ের নিত্য কল্যাণ কামনা করেন। — শ্রীরাঘবচৈতন্য ভক্তিতিলক, ব্যাকরণ তীর্থ

প্রচার প্রসঙ্গ

প্রবল কলির অনুকূল বাত্যা-বিদলিতগণের নিকট ভাগবত-বাণী

শ্রীগৌড়ীয় পত্রকার সম্পাদক ত্রিগুণস্বামী শ্রী শ্রীমন্তজিবেদান্ত বামন মহারাজ ২৪ পরগণা জিলার একতারা, শ্যামবস্তুরচক, কাকদ্বীপ প্রভৃতি হইয়া মেদিনীপুরে খেজুরী থানাঞ্চলে প্রচারে গমন করেন। তাঁহারা ক্রমশঃ পূর্বশেরখাঁচক, গোকুলনগর, কালীচরণপুৰ, দেখালী, কটারিগ্রাম, মুণ্ডমারী, বামুনাচক, মানসিংহবেড়, ঠাকুরচক, সুব্দী, জাহানাবাদ, আমদাবাদ, বিরুলিয়া, রুংকিনীপুর, কেশবপুর জালপাই, দক্ষিণারোজ প্রভৃতি স্থানে বিপুলভাবে ভাগবতবাণী প্রচারান্তে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় গঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

পূর্বশেরখাঁচকে শ্রীযুত গুরুপদ দাস, শ্রীযুত পুলিনদাস, শ্রীযুত বিষ্ণুহরিকরণ বিশেষ সাহায্য করেন। গোকুলনগরে Higher Secondary School এর প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত ভূতনাথ দাস M. A., B. T. মহোদয়ের চেষ্টায় উক্ত বিদ্যালয়ে দিবাভাগে “বিজ্ঞান, সামাজিক চিত্র ও বর্তমান শিক্ষা” সম্বন্ধে সম্পাদক মহোদয় এক চিন্তাপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। এখানে শ্রীযুত ঈশানদাস অধিকারী মহাশয়ের সেবাচেষ্টাও প্রশংসনীয়। দেখালীতে শ্রীযুত বিহারীলাল দাস, শ্রীযুত অরুণ সামন্ত, কটারিগ্রামে শ্রীযুত পূর্ণদাস, শ্রীযুত অবিলাস দাস, শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী দাস প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দ প্রচারকার্যে বিশেষ সহায়তা করেন। দেখালী ও মুণ্ডমারীতে দেওঘরস্থিত অনুকূল-পন্থিগণ সম্পাদক-স্বামীজী মহারাজের নিকট সংসঙ্গের ধূয়ায় শাস্ত্রবিরুদ্ধ অসংসিদ্ধান্ত প্রচার করিতে আসিলে স্বামীজী মহারাজ তাহাদের নিতান্ত ভ্রম শাস্ত্রীয় বিচার প্রদর্শনমুখে সংশোধন করিয়া দেন।

সুব্দীতে Basic School এর শিক্ষক শ্রীযুত অজিত বাবুর বিশেষ আগ্রহে উক্ত বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-কীর্তন ও ছায়াচিত্র-যোগে প্রহ্লাদ-লীলা প্রদর্শিত হয়। সকলেই স্বামীজী মহারাজের ভাগব-তীয় বাণী শ্রবণে আনন্দ লাভ করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী কুমারী

সবিতারানী জানা মহাশয়ার অত্যন্ত আগ্রহে জাহানাবাদ গ্রামে তাঁহার গৃহে, শিক্ষক শ্রীযুত সত্যচরণ জানা ও শ্রীচিন্তামনি মণ্ডল, শ্রীযুত রমণী দাস এবং অত্যান্ত গ্রামবাসীর নিকট সম্পাদক মহারাজ বিপুলভাবে ভাগবত-বাণী কীর্তন করেন। এখানে ‘সৎসঙ্গে’র (?) কলির অনুকূল বিচারের প্রবলভাবে গর্হণ করা হয়। উহারা অনুকূল ঠাকুরকেই ভগবান সাজাইবার প্রলাপোক্তি সমিতির শাস্ত্রবিৎ সেবকগণের নিকট শুনাইতে থাকে। আরও উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত অসৎসঙ্গবিলাসিগণ ভীকু কাপুরুষের দ্বায় শাস্ত্রবিচারে পরাস্ত হইয়া দুর্নৈতিক অভদ্রপথ অলম্বন করে। সমগ্র শিক্ষিত গ্রামবাসী স্বামীজী মহারাজের অযুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রীয় বিচার শ্রবণ করিয়া ঐ অসৎ-সঙ্গবিলাসিদিগকে প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলে লজ্জিত হইয়া দুর্ভুক্তগণ উপশম হয়। আমদাবাদে বারতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত জগদীশ দাস M. A., B. T. মহাশয়ের সমিতির শিক্ষা প্রসারে সহায়তা প্রদান উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণবরোজে শ্রীযুত সত্যব্রত দাসাদিকারীর নূতন নির্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীমৎ স্বামীজী মহারাজ চুঁচুড়া প্রত্যাবর্তন করেন। ভাগবত-প্রচার-অভিযানে স্বামীজী মহারাজকে সনাতন কৃষ্টিসম্পন্ন বহু ব্যক্তি সাহায্য করেন। স্থানাভাবে সকলের নামোল্লেখ সম্ভবপর হইল না। ইহারা সকলেই সমিতির ধন্যবাদার্থ।

—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

দুর্জয় লিঙ্গে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-বাণী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির তেজস্বী বাগ্মী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্বক্তা-বেদান্ত পর্যটক মহারাজ শিলিগুড়িতে প্রচুর হরিকথা কীর্তনান্তে যুথ-সহ বঙ্গের নিদাম রাজধানী দার্জিলিং শৈলে গমন করেন। তথায় শিক্ষিত-বৃন্দের নিকট শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের মহিমা ব্যাখ্যামুখে স্বামীজী প্রভূত প্রশংসা প্রাপ্ত হন। তৎপরে জিলা-সহর জলপাইগুড়িতে তিনি বেদান্ত-বাণী প্রচারার্থ গমন করেন। এখানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রাচীন শিষ্য শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের বাটীতে তাঁহাদের অবস্থিতি হয়। ছায়াচিত্র, ভাগবতপাঠ ও বক্তৃতা দ্বারা স্বামীজী মহারাজ শ্রোতৃবর্গকে হরিকথায় প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতেছেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

রথযাত্রা আহবান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

চৌমাথা, পোঃ চুঁচুড়া (হুগলী)

৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩ ; ইং ১৭।৫।৬৬

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলতিলক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব ও শ্রীশ্রীগঙ্গাখদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে আগামী ৩রা আষাঢ় ১৩৭৩, ইং ১৮ই জুন ১৯৬৬, শনিবার হইতে ১৩ই আষাঢ় ১৩৭৩, ইং ২৮শে জুন ১৯৬৬, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত একাদশ-দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সংকীৰ্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, ভোগ-রাগ, আরাত্রিক মহাপ্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি বিবিধ তত্ত্বজ্ঞ-যাজন-মুখে বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনমহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ-ভক্তানুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদানুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী স্মৃতি অর্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা প্রদত্ত হইল। ইতি—

শুদ্ধভক্ত কৃপালেশ-প্রার্থী—

সভাবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি


জ্ঞেয়্যঃ—কোনও বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে পরমহংসস্বামী শ্রীমন্তুজিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

দৈনন্দিন বিশেষ উৎসব-তালিকা

- ১। ৩রা আষাঢ়, ১৮ই জুন, শনিবার—অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত
ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব
উপলক্ষে পাঠ, বক্তৃতা ও কীর্তন।
- ২। ৪ঠা আষাঢ়, ১৯শে জুন, রবিবার—পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত
নগর-সংকীৰ্ত্তন-মুখে শ্রীশ্যামসুন্দর মন্দিরে গমন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
পাঠ ও গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন, গঙ্গা-স্নানান্তে মঠে প্রত্যাবর্তন।
- ৩। ৫ই আষাঢ়, ২০শে জুন, সোমবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।
পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত সংকীৰ্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে রথারূঢ়
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-বাড়ী শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে গমন। পরে
শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-
চরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ ও কীর্তন।
- ৪। ৬ই আষাঢ়, ২১শে জুন, মঙ্গলবার হইতে ৮ই আষাঢ়
২৩শে জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত দ্বিবেদ্য—প্রত্যহ্ন অপরাহ্ন ৫টা হইতে
৭টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে রথযাত্রা উপাখ্যান পাঠ ও
সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে
শ্রীগৌরঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৫। ৯ই আষাঢ়, ২৪শে জুন শুক্রবার—হেরাপঞ্চমী দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-
বিভয় উৎসব। পূর্বাহ্ন ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্যামসুন্দর-মন্দিরে
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও নগর সংকীৰ্ত্তন। অপরাহ্ন ৫টা হইতে
৭টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তন।
- ৬। ১০ই আষাঢ়, ২৫শে জুন শনিবার হইতে ১২ই আষাঢ়, ২৭শে
জুন, সোমবার পর্য্যন্ত তিন দিবস—প্রত্যহ্ন অপরাহ্ন ৫টা হইতে ৭টা
পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও আরাত্রিকান্তে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত
ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর
বিবিধ শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা।
- ৭। ১৩ই আষাঢ়, ২৮শে জুন মঙ্গলবার—অপরাহ্ন ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত
সংকীৰ্ত্তন-শোভাযাত্রাযোগে শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা, পরে
শ্রীমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তন; রাত্রে সর্বসাধারণে মহাপ্রসাদ
বিতরণ।

● জ বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্কে । ●

ধর্মঃ বহুভিঃ পুংসাং বিষকূসেন-কথা যঃ ।



নোংপাদরেদেযদি রুতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

● অহৈতুক্যপ্রতিহতা যন্মাত্মা সুপ্রসীদতি ॥ ●

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসর ।
অধোক্কে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যন্ত ॥

অতঃ ধর্ম সুহৃৎপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রুতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

১৮শ বর্ষ } ক্রী.রোদশায়ী, ১৪ শ্রীধর, ৪৮০ গৌরাক্ষ
শমিবার, ৩১ আষাঢ়, ১৩৭৩; ইং ১৬৭৭/১৯৬৬ } ৫ম সংখ্যা

শ্রীমভাগবতে দ্বিতীয়-স্কন্ধে প্রথমেহধ্যায়ঃ পরীক্ষিত-নৃপস্য প্রশ্নে শুকদেবেন মানবানাম্ কর্তব্য-নির্ণয়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ ।

আত্মবিৎসম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাदिষু যঃ পরঃ ॥ ১ ॥

[পূর্বে শ্রীশুকদেবের প্রতি রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন—‘স্বীয়মান পুরুষের সমাক্রুপসিদ্ধ (ভগবচ্চরণ প্রাপ্ত) লাভের জন্য কি কর্তব্য, কোন্ বিষয় শ্রোতব্য, জপ্য, স্মর্তব্য, ভজনীয় এবং কোন্ মনো কার্য্যই বা অকর্তব্য।] তদন্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, আপনি যে শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন করিয়াছেন, সেই প্রশ্নই লোকহিতকর এবং ইহা প্রাকৃত দোষরহিত, কারণ এই প্রশ্ন আপনার সভায় সমুপস্থিত আত্মবিৎ মুক্তকুলেরও সম্মত ॥ ১ ॥

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ ।

অপশ্যতামাত্তত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥ ২ ॥

হে রাজশ্রেষ্ঠ, গৃহেতে আসক্তচিত্ত, গৃহগত পঞ্চস্থনাপর এবং ‘আমরা কে? কি বা করিতেছি, ভবিষ্যতে আমাদের কি হইবে এবং কি প্রকারেই বা নিস্তার লাভ করিব’ ইত্যাদি আত্মতত্ত্ব জ্ঞানালোচনায় উদাসীন ব্যক্তিদিগের অসংখ্য শ্রবণীয়, কীর্তনীয় এবং স্মরণীয় বিষয়সমূহ আছে ॥ ২ ॥

নিদ্রয়া ত্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ ।

দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥ ৩ ॥

উহাদের রাত্ৰিকাল নিদ্রাতে, যুবাকাল রতিক্রিয়াতে এবং দিবাভাগ অর্থচেষ্টা ও তদ্বারা কুটুম্বভরণকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

দেহাপত্য-কলত্রাদিস্বাত্মসৈন্তেষুসংস্রপি ।

তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ৪ ॥

দেহ-স্ত্রী-পুত্রাদি কালের সহিত যুযুৎসু আত্মার সৈন্ত-সদৃশ । উহার। সকলেই অনিত্য বস্তু । পিতৃপিতামহগণ সকলেই কালের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয় । স্ত্রী-পুত্র-দেহাদি অসং বস্তুতে আসক্ত ব্যক্তিগণ পূর্ব পূর্ব আত্মীয়বর্গের দেহাদির বিনাশ দেখিয়াও দেখিতে পায় না অর্থাৎ বিনাশের কারণ অনুসন্ধান করিয়া ভগবদ্বিমুখতা পরিত্যাগ করে না ॥ ৪ ॥

তস্মাদ্ ভারত সৰ্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরেঃ হরিঃ ।

শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মৰ্ত্তব্যশ্চৈচ্ছতাহভয়ম্ ॥ ৫ ॥

হে ভরতবংশাবতংস, যিনি সর্ব ভয়-নিবারক সর্বানন্দময় পুরুষার্থ-লাভরূপ অভয় ইচ্ছা করেন তাহার পক্ষে সকল জীবের পরমাত্মা, অভয়প্রদাতা ভগবান্ শ্রীহরিই শ্রবণীয়, কীর্তনীয় এবং স্মরণীয় ॥ ৫ ॥

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধৰ্ম্মপরিনিষ্ঠয়া ।

জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ॥ ৬ ॥

স্বধৰ্ম্মে বিশেষ নিষ্ঠাপূর্বক সাংখ্যজ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গযোগ, এতদুভয় দ্বারা যে নারায়ণস্মরণ তাবন্মাত্রই পুরুষের লাভ । কিন্তু জন্মের অন্তেও নারায়ণ স্মৃতি, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্যবস্তু । অতএব তাহার মহিমা বলিয়া শেষ করা যায় না ॥ ৬ ॥

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিসেধতঃ ।

নৈগুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ ॥ ৭ ॥

হে রাজন্, যে সকল মুনি-ঋষি বিধি-নিষেধের অতীত হইয়া নিগুণ অবস্থা লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও ভগবানের গুণ কীর্তনেই আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ।

অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্ ॥ ৮ ॥

হে রাজন্, ইহা ভাগবত নামক পুরাণ। ভগবানের বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত আছে অথবা ইহা সাক্ষাৎ ভগবানের শ্রীমুখবিগলিতা বাণী। এইজন্ত ইহার নাম ভাগবত। এই ভাগবত সর্ব উপনিষদাবলীর রস-সার। ইহা অনাদি কাল সিদ্ধ। আমার পিতা ব্যাসদেব ইহা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা পরব্রহ্ম-তুল্য। আমি দ্বাপর যুগের অন্তে পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকট এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি। কারণ, ইহার তাৎপর্য মেধাধারা নিজে নিজে হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব ॥ ৮ ॥

পরিনিষ্ঠিতোহপি নৈগুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া ।

গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ৯ ॥

তদহং তেহভিধাম্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্ ।

যস্য শ্রদ্ধধতামাশু স্ত্যানুকুন্দে মতিঃ সতী ॥ ১০ ॥

হে রাজর্ষে, আমি নিগুণ ব্রহ্মে বিশেষভাবে মগ্ন থাকিলেও উত্তমঃ-শ্লোক শ্রীভগবানের লীলা-দ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে এই আখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছি। হে রাজন্, আপনি মহাপুরুষ; কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার যোগ্যপাত্র। অতএব আপনার নিকট এই ভাগবত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছি। (ইহা সকলের পক্ষেই পরম সাধন ও পরমসাধ্য)। ইহাতে যাহার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, তাঁহার শীঘ্রই ভগবান মুকুন্দে রতি উপস্থিত হয় ॥ ৯-১০ ॥

এতন্নিব্বিণ্ণমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।

যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরেণামানুকীৰ্ত্তনম্ ॥ ১১ ॥

হে রাজন্, যাহারা সংসারে নির্বেদপ্রাপ্ত একান্ত ভক্ত, যাহারা স্বর্গ-মোক্ষাদি কামনা করেন এবং যাহারা আত্মারাম-যোগীপুরুষ, সকলের

পক্ষেই হরির নামগুণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, কীর্তন, ও শ্রবণ—এই তিনটি পরম সাধন ও সাধ্য বলিয়া পূর্ব আচার্য্যগণকর্তৃক নির্ণীত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ ।

বরং মুহূর্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ ॥ ১২ ॥

ভোগে প্রমত্ত ব্যক্তির বহু বহু বৎসর অলক্ষিতভাবে বৃথা অতিবাহিত হইয়া থাকে। মুহূর্ত সময়ের জন্তও যদি কাল বৃথা যাইতেছে—এইরূপ জ্ঞান লাভ হয় তাহাও শ্রেষ্ঠ কারণ তাহা জানিয়া নিত্য মঙ্গল লাভের জন্ত যত্নবান্ হওয়া যায় ॥ ১২ ॥

খট্‌বাস্তো নাম রাজষির্জ্ঞাত্বৈয়ত্তামিহাযুষঃ ।

মুহূর্তাং সর্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিম্ ॥ ১৩ ॥

খট্‌বাস্ত নামক রাজর্ষি আপনার পরমায়ুর মুহূর্তকাল মাত্র অবশিষ্ট আছে জানিয়া ভূতলে আগমন করিলেন এবং মুহূর্তকাল মধ্যেই সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপূর্বক শ্রীহরির অভয়পদে শরণাগত হইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

তবাপ্যেতর্হি কৌরব্য সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ ।

উপকল্পয় তং সর্বং তাবদ্ যৎ সাম্পরায়িকম্ ॥ ১৪ ॥

হে কুরুবংশপ্রদীপ, আপনার ত এখনও সপ্তাহকাল পরমায়ু আছে। অতএব এই সময়ের মধ্যেই আপনার পারলৌকিক সাধন সম্পন্ন করুন ॥ ১৪ ॥

অন্তকালে তু পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ ।

ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেহু য়ে চ তম্ ॥ ১৫ ॥

অন্তকালে পুরুষ মৃত্যুভয় তাগ করিয়া অনাসক্তিরূপ শাস্ত্রের দ্বারা দেহ ও দেহসম্পর্কিত পুত্র, কলত্রাদিতে ভোগাবুদ্ধি ছেদন করিবেন ॥ ১৫ ॥

গৃহাং প্রব্রজিতো ধীরঃ পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ ।

শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎ কলিতাসনে ॥ ১৬ ॥

অভ্যসেন্ননসো শুদ্ধং ত্রিবৃদ্ ব্রহ্মাকরং পরম্ ।

মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্ ॥ ১৭ ॥

গৃহ হইতে নিজ্জান্ত হইয়া ধীর অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যাাদি যম (প্রথম), পুণ্য-তীর্থে স্নানাди নিয়ম (দ্বিতীয়) এবং পবিত্র নির্জন স্থানে কুশ, যুগচন্দ্র ও বস্ত্র এই ক্রমানুসারে আসন (তৃতীয়) রচনা করিয়া তাহাতে উপবেশন

করিবেন । অনন্তর ‘অ’ ‘উ’ ও ‘ম’ এই তিন অক্ষরে এখিত শুদ্ধ ব্রহ্মাক্ষর প্রণব মনে মনে আবৃত্তি করিবেন । তৎপর প্রণবকে বিস্মৃত না হইয়াই শ্বাসকে রোধ করতঃ (কুস্তকদ্বারা) মনকে নিশ্চল করিবেন (প্রাণায়াম চতুর্থ) ॥ ১৬-১৭ ॥

নিষচ্ছেদ বিষয়েভ্যোহক্ষান্ মনসা বুদ্ধিসারথিঃ ।

মনঃ কৰ্ম্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া ॥ ১৮ ॥

অনন্তর দমিত মনের সাহায্য রূপ-রসাদি বিষয় হইতে, চক্ষু, কৰ্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার (পঞ্চম) অর্থাৎ নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়গণকে আহরণ করিয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানে সন্নিবেশিত করিবেন । নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকেই সারথি করিবেন । প্রাক্তন সংস্কারের প্রাবল্য হেতু প্রাণায়ামের দ্বারা যদি মনকে সমাক্রূপ নিশ্চল করা অশক্ত হইয়া পড়ে তবে মনকে শুভ বিষয়ের জ্ঞ বুদ্ধিদ্বারা ভগবানের রূপের প্রতি ধারণা (বষ্ট) করিবেন ॥ ১৮ ॥

তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা ।

মনো নির্বিষয়ং যুক্ত্বা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ ।

পদং তৎ পরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রসীদতি ॥ ১৯ ॥

অনন্তর বিষুক্তচিত্তে ভগবানের অঙ্গধ্যান (সপ্তম) করিবেন । মনকে বিষয়স্পর্শরহিত বস্তুতে সংযুক্ত করিয়া তাহা ব্যতীত অন্য কিছুই স্মরণ করিবেন না । এইরূপে যাহাতে মন উপশমতা (সমাধি, অষ্টম) লাভ করে তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ অর্থাৎ ব্রহ্ম ॥ ১৯ ॥

রজস্তমোভ্যামাক্ষিপ্তং বিমুঢ়ং মন আত্মনঃ ।

যচ্ছেদ্ধারণয়া ধীরো হস্তি যা তৎকৃতং মলম্ ॥ ২০ ॥

পুনরায় যদি মন রজোগুণ দ্বারা বিক্ষিপ্ত ও তমোগুণে বিমুঢ় হয়, তাহা হইলে ধারণা-দ্বারা মনকে নিরোধ করা কর্তব্য, কারণ ধারণাই রজঃ ও তমোগুণোদ্ভূত মল অপনয়ন করিতে পারে ॥ ২০ ॥

যতঃ সন্ধার্যমাণায়াং যোগিনো ভক্তিলক্ষণঃ ।

আশু সম্পত্ততে যোগ আশ্রয়ং ভদ্রমীকৃতঃ ॥ ২১ ॥

এইরূপে ভক্তিলক্ষণাক্রান্ত ধারণা অভ্যাস করিলে ভগবানকে ধারণাযোগে দর্শনকারী যোগীর ভক্তিযোগে শীঘ্রই প্রীতি হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শক্তি-সঞ্চার

ভগবান্ সৰ্বশক্তিমান্। তিনি যে-বস্তুতে তাঁহার যে-শক্তি সঞ্চার করেন, সেই ভগবৎশক্তির কণায় বল লাভ করিয়া সেই বস্তু সেই শক্তিদ্বারা তাঁহারই সেবা করিতে সমর্থ হয়। তিনিই শক্তির প্রস্রবণ, আকর বা মূল আশ্রয়। তিনি শক্তিমান্ হইলেও শক্তির সহিত যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। শক্তিমান্ অলঙ্কার-শাস্ত্রের কথিত ‘বিষয়’ শব্দ-বাচ্য এবং শক্তির ‘আশ্রয়’ শব্দ-বাচ্য। বিষয় ও আশ্রয়ে যে বিশেষ আছে, তাহাতে শক্তিমান্ হইতে শক্তি ভিন্ন। আবার শক্তি-বিচ্যুত শক্তিমান্ শব্দের অধিষ্ঠান জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার বৃত্তিভেদের অগম্য। এই ত্রিবিধ সম্বন্ধে প্রাকৃত দৃশ্যজগৎ বিজ্ঞতার অভাবেই প্রকৃতিতেই বিলীন হয়। আবার, কাহারও মতে উহা পূর্ণজ্ঞানেই নির্বাক লাভ করে; তখন আর কে কাহাকে কোন্ বৃত্তি দ্বারা জানিবে? এই নির্বাকশব্দ তাব কেবলজ্ঞাননিষ্ঠ সম্প্রদায়ে আদর লাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত গোস্বামী প্রভুপাদ বলেন, ব্রহ্ম বিশেষ্যনিষ্ঠ, পরমাত্মা বিশেষণ-নিষ্ঠ এবং ভগবান্ বিশিষ্টনিষ্ঠ। বিশিষ্ট-নিষ্ঠার অন্তরালে আমরা তত্ত্ববস্তুকে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে ‘শক্তিমান্’ এবং বিশেষণগুলিকে ‘শক্তি’ বলি। অপ্রকৃতি বিশেষণগুলি বিশেষ্যেরই বিশেষণ। জড়বিশেষণগুলি পরমাত্মার বাহ্য বিশেষণ, চিদ্বিশেষণ অন্তর্যামিত্ত্ব অন্তর্বিশেষণ। এইরূপ বিশেষণভূষিত হইলেও কেবল মাত্র পূর্ণ চিদ্বিশেষ-বিলাসের পরিচয় না দেওয়ায় তিনি ভগবৎপ্রতীতির শুদ্ধত্ব, পূর্ণত্ব, মুক্তত্ব ও নিত্যত্ব হইতে পৃথক্। ভগবৎশক্তি অখণ্ড ও সম্যগ্। পরমাত্মায় লক্ষিত শক্তি খণ্ডিত ও ব্রহ্মে লক্ষিত শক্তি বর্গলক্ষণ শক্তিধর্ম্মাতিরিক্ত হওয়ায় অসম্যক্ ও কেবল-জ্ঞানগম্য।

বেদে সেই শক্তিকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন,—সম্বিং বা জ্ঞানশক্তি, সন্ধিনী বা বলশক্তি ও হ্লাদিনী বা ক্রিয়াশক্তি। যাহাতে গোলোকে বাস্তববিজ্ঞানে বল ও ক্রিয়াশক্তি স্বভাবক্রমে অপরিলক্ষিত, সেই বিগ্রহই অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন। গোলোকে যে-বিগ্রহে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি অলক্ষিত, সেই বিগ্রহই তত্ত্বপ্রকাশ বলদেব। গোলোকে যে বিগ্রহে স্বয়ংরূপ জ্ঞান ও তত্ত্বপ্রকাশ-বল লক্ষিত হয় না, তথায় ক্রিয়া বা হ্লাদিনী বিরাজমান।

অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনের অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম, অংশবৈভব পরমাত্মা এবং অঙ্গী ভগবান্। অঙ্গী ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি—মায়া, অন্তরঙ্গা শক্তি—তদ্রূপবৈভব ও তটস্থা শক্তি—জীব।

তত্ত্বপ্রকাশ বলদেবের চিৎশক্তি—জীবজগৎ, অচিৎশক্তি—জড়জগৎ এবং স্বয়ংপ্রকাশ—ঈশ্বর।

হ্লাদিনী—মহাভাবস্বরূপিনী বার্ষভাণবী, কায়বুহ,—পরব্যোমস্থ লক্ষ্মীগণ এবং হরিবিমুখিনী শচী উমাদি দেবীগণ।

বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বদ্ধজীবের কৰ্ম্মভূমি রচনা করিয়াছেন। চিৎশক্তি জীব অসংখ্য অণুচিৎ বলিয়া তদ্রূপবৈভব বিস্তৃত হইয়া সেই কৰ্ম্মভূমিতে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণ-যোগ্যতায় অণুচিৎ বা স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মের বিভূচিৎ দয়াময় হইয়াও ব্যাঘাত করেন না। যদি ঈশ্বর-বস্তু অণুচিত্তের স্বতন্ত্রতার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতেন তাহা হইলে তাহাকে আর চিন্ময় বা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম-বিশিষ্ট বলা হইত না—মায়া-প্রসূত নশ্বর জড় নামে অভিধান করাই সম্ভব হইত। এই স্বতন্ত্রতা-বশে তটস্থা-শক্তিসম্পন্ন অণুচিৎ জীব মায়ািক বদ্ধধর্ম্মের আবাহন করিয়া মায়াদ্বারা সম্যকরূপে মূঢ়তা লাভ করিতে সমর্থ। আবার স্বতন্ত্রতা-ক্রমে ঈশোন্মুখী সেবা তাঁহার স্মৃতিপথে উদ্দীপিতা হইলে তিনিই কৃপা-শক্তিবলে নিত্য-স্বভাবে অবস্থিত হন।

ভগবান্ শ্রীগৌরহরি অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও ঈশোন্মুখ শ্রীগুরুদেবের লীলাভিনয় করিতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। তিনি জীবের অলৌকিক যোগ্যতার পুনঃপ্রাপ্তির কথা স্বীয় লীলায় ও ভক্তগণের চরিত্রে প্রতি-ফলিত করিয়াছেন।

প্রয়াগে যে সময়ে শ্রীভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের নিবট শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী সকল ছঃসঙ্গ-পরিহারলীলা প্রদর্শনপূর্বক উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণগোস্বামীতে আমরা দেখিতে পাই,—তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধারী, গৌরকৃষ্ণধারী, মহাবদান্ত-গুণধারী এবং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলাময় কৃষ্ণের নিকট বাহু জগতের সকল অহমিকা ছাড়িয়া দিয়া নমস্কার করিয়া-ছিলেন। সেই চতুর্দশ ভূবনপতি, ব্রহ্মাণ্ডসমূহ ও বৈকুণ্ঠসমূহের পতি, সকল গুরুর গুরু শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া দশ দিবসকাল লোকাভীত শুদ্ধাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তির উপদেশ করেন। অন্তঃবাসী শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামীকে এই উপদেশের মধ্যে ভড়ীয় ভোগময় কুতর্ক আবাহন করিতে দেখা যায় না—তিনি কেবল-নিরন্তকুহক, বাস্তবজ্ঞানময় অবিসংবাদিত সত্য শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ শ্রদ্ধাধান মুনীগণ অবিমিশ্র জ্ঞান ও ভগবদিতর বিষয়ে বীতস্পৃহ হইয়া স্বরূপ, বহিরঙ্গা ও তটস্থা

শক্ত্যাশ্রক পরমাত্মাকে আশ্রয়স্থিদ্ধারা এবং শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত আশ্রয়-বাক্যশ্রবণে তদনুসরণে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত সেবাময়ী দৃষ্টিতে দর্শন করেন, সেইরূপ শ্রীরূপপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট বিষয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

“তচ্ছুদ্ধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।

পশ্যন্ত্যামনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া ॥”

শ্রীভগবানের মায়াশক্তি যেকালে ঈশ-সেবায় উদাসীন জীবের উপর প্রবলতা লাভ করিয়া শক্তি সঞ্চার করেন, সেই সময় জীব আপনাকে ত্রিগুণাত্মক মায়িক বদ্ধজীব মনে করে। অঙ্গী অথবা তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তি যেকালে জীবের তটৎ-ধর্ম্মে সঞ্চারিত হইয়া জীবের কর্ম্মফল ভোগের নশ্বরতা বা ফলুতা উপলব্ধি করাইয়া সেবোন্মুখতা সম্পাদন করে, তখনই মুক্তজীবে ভগবানের নিত্যকৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার জ্ঞান নিরন্তর-কুহক বাস্তব জ্ঞানের উপদেষ্টা গুরুরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ'ন। মায়াশক্তির অল্পকালস্থায়ী অসম্পূর্ণ বললাভ করিয়া জীবের হর্ষবিমুখতা-ধর্ম্ম অভ্যাগত-রূপে প্রকাশমান হইলে জীব গুণত্রয়কেই নিজের শক্তি বলিয়া মনে ভ্রম করে। আবার শ্রীগুরুদেব ও কৃষ্ণের নিকট ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি লাভ করিয়া নিত্য বৈকুণ্ঠ-বস্তুতে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হন। অধোক্ষজ-সেবায় মায়াশক্তির প্রাধান্য নাই। অক্ষজ-জ্ঞানের দ্বারাই বহিরঙ্গা শক্তি বদ্ধজীবকে বিমোহিত করে। জীবের অস্মিতায় ফলভোগ-বুদ্ধি তিরোহিত না হইলে গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদলাভ ঘটে না। চিহ্নিলাস-শক্তি সঞ্চারিত না হইলে বদ্ধজীব ভ্রমক্রমে ব্রহ্মে বিলীন হইবার অসচ্চেষ্টা পোষণ করে।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(প্রচার ও প্রচারক)

১। নির্জ্ঞান-ভজনানন্দী ও হরিকীর্তনকারী প্রচারকের মধ্যে কে জগতের অধিক উপকারক ?

“রুচিক্রমে যে সকল ভক্ত সাধুদিগের ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে যগ্ন হইয়া প্রচার-কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের

অপেক্ষা প্রচার-কর্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন।”

—‘আচার ও প্রচার,’ স: তো: ৪১২

২। কাঁহাদের প্রচারক-যোগ্যতা আছে ?

“শুদ্ধভক্তি যে কি বস্তু, তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া ধাহারা নিরপরাধে নামরস সেবন করেন, তাঁহাদেরই প্রচারক-যোগ্যতা।”

—‘শ্রীমদ্গোরাঙ্গ-সমাজ,’ স: তো: ১০।১১

৩। কেবল বাগ্মিতা থাকিলেই কি প্রচারক হওয়া যায় ?

“প্রচার-কার্য্যটির ভার ভজন-বিভাগের সভ্যগণের প্রতি অর্পণ করিলেই ভাল হয়। কেবল বাগ্মিতা থাকিলেই কেহ গৌর-শিক্ষা-প্রচারক হইতে পারে না।”

—‘শ্রীমদ্গোরাঙ্গ-সমাজ,’ স: তো: ১০।১১

৪। প্রচারকের নামাপরাধ-তত্ত্ব জানা প্রয়োজনীয় কেন ?

“প্রচারকদিগের নামাপরাধগুলি ভালরূপে জানা আবশ্যক। তাহা জানিতে পারিলে তাঁহারা উপযুক্ত নাম-প্রচারক হইবেন। নামপ্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে নামাপরাধ হইতে সর্বদা সতর্ক থাকিতে উপদেশ দিতে হইবে, নতুবা প্রচারকগণ নিজেও নামাপরাধী হইয়া পড়িবেন।”

—‘শ্রীমদ্গোরাঙ্গ-সমাজ স: তো: ১০।১১

৫। শুদ্ধ প্রচার কার্য্যে কি কি প্রয়োজন ?

“শুদ্ধরূপে প্রচার করিতে গেলে প্রথম—নাম-গ্রহণের শুদ্ধতা, দ্বিতীয়—প্রচারকের শুদ্ধতা এবং তৃতীয়—গ্রাহকদিগের শুদ্ধতার প্রয়োজন। নাম-গ্রহণের শুদ্ধতা এই যে, প্রচারিত নাম ভগবল্লীলাসূচক ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি-গন্ধ-শূন্য হইবে।”

—‘শ্রীশ্রীনামহট্ট’, বি: প:, ১ম খণ্ড

৬। প্রচারকের আচারবান্ হইবার আবশ্যকতা কেন ?

“সাধুদিগের ধর্ম্মাচরণের নাম—‘আচার’। সেই ধর্ম্ম জগতে অত্র জীবের নিকট প্রচার করার নামই—‘প্রচার’। আচার বা প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হইতে গেলে প্রথমে সাধুদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা করা আবশ্যক; কিন্তু শিক্ষা করত কেহ কেহ স্বয়ং আচার করিবার পূর্বেই প্রচার-কার্য্য করিতে থাকেন; তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। * * স্বয়ং আচরণ না করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিলে জগতে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হয়।

—‘আচার ও প্রচার,’ স: তো: ৪১২

৭। স্মার্তাচারী ব্যক্তি কি ভক্তি-তত্ত্বের প্রচারক হইতে পারেন না ?

“কোন কোন লোক স্বয়ং শুদ্ধভক্তির আচরণ করেন না, বরং কস্ম-কাণ্ডাদৃত স্মার্ত-সম্মত আচার করিয়া থাকেন; তাঁহারা যে ভক্তি-তত্ত্বের উপদেশ দেন, তাহা সর্বশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। প্রচার করিতে হইলে অগ্রে স্বয়ং আচার করা আবশ্যিক। —‘আচার ও প্রচার’, সং: তো: ৪।২

৮। প্রচারকের শুদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা কেন ?

“প্রচারকের শুদ্ধতায় নিতান্ত প্রয়োজন। নাম-গান সর্বত্রই হইয়া থাকে, কিন্তু নামে আকৃষ্ট হইয়া আমরা তাহা গুনিতে গিয়া প্রচারক-দিগের অশুদ্ধতা দেখিয়া দুঃখ পাই। হয় ত’ গ্রামের পীড়া-নিবৃত্তির জন্ত নাম বাহির হইয়াছে, নয় কতকগুলি লোক শমনের ভয়ে নাম করিতে-ছেন। এরূপ ভুক্তি ও মুক্তি-পিপাসা দূষিত হৃদয় হইতে যে নাম বাহির হয়, তাহা প্রতিবিম্ব-নামাভাস। তাহাতে জীবের নিত্য-মঙ্গল-লাভ সম্ভব নয়। বিপণিপতি ও ব্রাহ্মক-বিপণি মহোদয়গণ যদি সেরূপ স্পৃহা-শূন্য হন, তাঁহাদের দ্বারা শুদ্ধনাম প্রচার হইবে। যদি তাঁহারা অর্থাদি প্রাপ্তির আশায় অথবা নামপ্রচার করিয়া লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় কার্য্য করেন তাহা হাটের উদ্দেশ্য সফল হইবে না।”

—‘শ্রীশ্রীনামহট্ট’, বি: প: ২য় বর্ষ

৯। প্রচারকের উপদেশ ভোগোন্মুখ জীবে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয় বলিয়া কি শুদ্ধ প্রচারক দায়ী ?

“The reformers out of their universal love and anxiety for good work endeavour by some means or other to make the thoughtless drink the cup of salvation, but the latter drink it with wine and fall into the ground under the influence of intoxication; for, imagination has also the power of making a thing what it never was. Thus it is that the evils of nunneries and the corruptions of Akhras proceeded. No, we are not to scandalise the Saviour of Jerusalem or the Saviour of Nadia for these subsequent evils. Luthers, instead of critics, are what we want for the correction of those

evils by the true interpretation of the original precepts".
—The Bhagabat : Its Philosophy, Its Ethics & Theology.

১৬। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভার ইতিবৃত্ত কি ?

“১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসে অর্থাৎ ২রা মাঘ রবিবার ঐ সভাটি হয়। তথায় সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমি ও দ্বারিক বাবু সকল কথা বুঝাইলে একমত হইয়া শ্রীমায়াপুরে সেবা প্রকাশের অনুমতি দিলেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী নামক একটি সভা সংস্থাপিত হইল। তাহাতে নফর বাবু সম্পাদক হইলেন। সভা সাধারণের নিকট টাকা সংগ্রহ করিয়া যথারীতি শ্রীমূর্তি-সেবা সংস্থাপনের অনুমতি করিলেন।

সাধারণের নিকট হইতে ১৫৫১।১০, প্রথম বৎসরের প্রণামীতে ১৭১৥/

১৭৥ এবং ঋণ দ্বারা ৯৫০৥০ একত্রিত হইয়া শ্রীমায়াপুরে ভূমিক্রয়-পূর্বক তৃণাচ্ছাদিত কয়েকখানি গৃহ নির্মাণ-করত তথায় শ্রীগোরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া-শ্রীমূর্তি সংস্থাপিত হইলেন।

৮ই চৈত্র মহামহোৎসবের সহিত শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অসংখ্য যাত্রী আসিয়াছিলেন। মনোহরসাহী কীর্তন, কীর্তনাজের যাত্রা ও নাম-সংকীর্তন বিশেষ আনন্দের সহিত হইল।” —ঠাকুরের আশ্চরিত

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সপ্ততাল-উদ্ধার

ত্রেতাযুগে বালিরাজ আপন ভবনে

কুক্ষণে একদা,

থাবে বলি' সপ্ততাল রাখি' গৃহ কোণে

স্নানে গেলা যদা ;

ভয়ঙ্কর ফণী এক আসি' সেই ক্ষণে

ভঞ্জে তাল যত,

স্নান হ'তে ফিরি' রাজা হেরি' তা' নয়নে

হইলা কুপিত।

শাপিল ফণীরে রাজা,—‘বৃক্ষ যোনি ধরি’
রহ এইখানে ;

প্রার্থনা করিল ফণী রাজ-পদে পড়ি’—
‘ক্ষম এ অধমে ।’

তপস্বী বালির চিত্ত দ্রবিল নাতবু
ফণীর ক্রন্দনে ;
অভিশপ্ত ফণী তাই লভি’ বৃক্ষবপু
রহিল সেস্থানে ।

শোকাতুর সর্পপিত্তা হারায়ে সন্তানে
শাপিল তখনি,—

‘এ বৃক্ষ ছেদিবে যেবা মাত্র এক বাণে
রাজহস্তা তিনি ।’

হেন শাপবার্তা শুনি’ কিক্কিয়ার নৃপ,
কহে উপহাসি’—

‘মোর হস্তা নির্দেশিতে এ বিরাট ক্রম
রহিল কি বৃষ্টি !’

দাশরথি রাম যবে সীতাহারা হ’য়ে
সীতা-অশ্বেষিতে,

পশিলা কিক্কিয়ারাজ্যে লক্ষ্মণেরে ল’য়ে
শোকাহত চিতে ।

তথা বালিরাজ-ভ্রাতা সুগ্রীব স্মৃতি
মিত্র হ’ল তাঁর,

মিত্র সুগ্রীবেরে তিনি দিলা প্রতিশ্রুতি
বালি বধিবার ।

বালিবধ তরে রাম শক্তি যে ধরে
তাহারি প্রমাণে,—

বিক্লিনেন সপ্ততালে একমাত্র শরে
রাম ভগবানে ।

এ যুগেও সেই ঠাই 'সপুতাল'-তরু
 ছিল। বিরাজিত,
 জীবোদ্ধার লাগি' সেথা গৌর মহাগুরু
 হ'লা উপনীত।
 'সপুতাল' হেরি' গৌরা ত্রিভুবন-স্বামী
 আলিঙ্গন দানে,
 গৌরা-করস্পর্শে বৃক্ষ ছাড়ি' মন্ত্যভূমি
 ধায় উর্দ্ধ পানে।
 অগণন লোক সেথা হেরে তা' নয়নে
 আনন্দ-বিস্ময়ে,—
 সশরীরে গেল। বৃক্ষ শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধামে
 গৌর-অনুগ্রহে।
 লোকে কহে,—“গৌরা শ্যামী স্বয়ং শ্রীরাম
 'সপুতাল'-তাতা,
 রাম বিনা নাহি কেহ হেন শক্তিমান্
 জীব গতি-দাতা।”

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-১৭)

শ্রীমদ্ভগবদগীতাতে ভগবদ্ভক্তিরই সর্বোৎকর্ষ দৃষ্ট হয়—

“তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ।

কর্শ্বিত্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন।

যোগীনাংপি সর্বেষাং মদগতেনাত্তরাঙ্গনা।

অঙ্কবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।” (গীতা ৬।৪৬-৪৭)

ভক্তিযোগযুক্ত ব্যক্তি তপস্বী, জ্ঞানী ও কর্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব
 হে অর্জুন, তুমি ভক্তিযোগী হও। যে ব্যক্তি আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া

শ্রদ্ধাপূর্বক আগার ভজন করেন, তিনিই আগার মতে যুক্ততম অর্থাৎ সকলযোগী হইতে শ্রেষ্ঠ।

এইরূপে সর্বত্রই-অভক্তির নিন্দাবাদ শ্রুত হয়। তজ্জন্ত সকল উপায়ের মধ্যে ভগবদ্ভক্তিরই নিত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ হইল। এসম্বন্ধে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উক্তি,—

“ভিক্ষোধর্ম্যঃ শমোহিংসাসা তপ জৈক্ষা বনৌকসঃ।

গৃহিণো ভূতরক্ষ্যেজ্যা দ্বিজস্তাচার্য্যাসেবনম্ ॥

ব্রহ্মচার্য্যং তপঃ শৌচং সন্তোষো ভূতসৌহৃদম্।

গৃহস্থস্তাপ্যাতৌ গন্তঃ সর্কেষাং মহুপাসনম্ ॥ (শ্রীভাঃ ১১।১৮।৪২-৪৩)

সন্ন্যাসীর ধর্ম—শম ও অহিংসা, বানপ্রস্থের ধর্ম—তপস্তা ও আত্মানন্ড-বিবেক, ভূতরক্ষা ও পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান গৃহস্থের ধর্ম এবং গুরুসেবা ব্রহ্মচারীর প্রধান ধর্ম, জানিবে। ভাষ্যার ঋতুকাল ব্যতীত অন্তঃসময়ে ব্রহ্মচার্য্য, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ ও সর্বভূতে মৈত্রীই গৃহস্থের ধর্ম; পরন্তু আমার আরাধনা সকল বর্ণাশ্রমী জীবেরই একমাত্র নিত্যধর্ম। সুতরাং তাহাই সকলের পক্ষে কর্তব্য।

শ্রীনারদও যুধিষ্ঠির মহারাজের নিকট বলিয়াছেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্ত্র স্মরণং মহতাং গতেঃ।

সেবেজ্যাবনতিদাস্ত্রং সখ্যামাত্ম সমর্পণম্ ॥

নৃণাময়ং পরোধর্ম্যঃ সর্কেষাং সমুদাহৃতঃ।

ত্রিংশলক্ষণবান্ রাজন্ সর্ক্সান্না যেন তুষ্যতি ॥ (শ্রীভাঃ ৭।১১।১১-১২)

মহতের (বৈষ্ণবের) আশ্রয়ে ভগবানের গুণকর্ম্মাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, ভগবৎসেবা, পূজা, অবনতি, দাস্ত্র, সখ্য, আত্মসমর্পণাদি মনুষ্য মাত্রেরই পরম ধর্ম। এই সকলের দ্বারাই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। ত্রিশটি গুণের অবশিষ্টগুলি সত্য, দয়া, তপস্তা, শুচিতা, সহনশীলতা, শম, দম, অহিংসা, ব্রহ্মচার্য্য, ত্যাগ, বেদপাঠ, সরলতা, সন্তোষ, সমদর্শন, গ্রাম্যচেষ্টা ত্যাগ অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মত্যাগ, নিষ্ফল, কার্য্য দর্শন, মোন, আত্মজ্ঞান, প্রাণি-দিগকে যথাযোগ্য অন্নাদি বিভাগ, সকল প্রাণীতে ঈশ্বর সম্বন্ধ দর্শন, মনুষ্যসকলেও তদ্রূপ বুদ্ধি এবং মহদগুণের আশ্রয়ে নবধাভক্তি ইত্যাদি।

মহাভারতেও দেখা যায় ; —

“মাতৃবৎ পরিরক্ষন্তং সৃষ্টি-সংহারকারকম্।

যো নার্কয়তি দেবেশং তং বিদ্বাদ্ ব্রহ্মঘাতকম্ ॥”

যিনি মাতার জ্বায় সর্বতোভাবে রক্ষক, যিনি জগতের সৃষ্টি-সংহারকারী সেই সর্বদেবেশ্বর সেই শ্রীহরিকে যে ভজন না করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবদগীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—

“ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদন্তে নরাধমাঃ।

মায়াহপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ (শ্রীগীতা ৭। ১৫)

দুষ্কৃতিপরায়ণ বিবেকহীন মূঢ় নরাধমগণ মায়াদ্বারা নষ্টজ্ঞান হইয়া আসুর স্বভাব আশ্রয়পূর্বক আমার ভজন করে না।

অগ্নিপুরাণ ও বিষ্ণুধর্মের উক্তি,—

“দ্বিবিধো ভূতসর্গোহয়ং দৈব আসুর এব চ।

বিষ্ণুভক্তিপরো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্ধ্যয় ॥”

শ্রীমদ্ভাগবতেও প্রহ্লাদের উক্তি,—

“বিপ্রাদৃদ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ

পাদারবিন্দবিমুখাং শ্বপচং বরিষ্ঠম্। (শ্রীভাঃ ৭। ২। ১০)

দ্বাদশ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ হরিপাদপদ্মনিমুখ হইলে তদপেক্ষা হরিতত্ত্বিযুক্ত শ্বপচই শ্রেষ্ঠ।

গরুড় পুরাণে,—

অন্তং গতৌহপি বেদানাং সর্বশাস্ত্রার্থবেত্তপি।

সো ন সর্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাং পুরুষাধমম্ ॥

সকল বেদে পারদ্ব্যন্ত এবং সর্বশাস্ত্রার্থবিৎ হইয়াও যে ব্যক্তি সর্বেশ্বর শ্রীহরির ভক্ত হয় না, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিতে হইবে।

বৃহন্নারদীয়ে,— হরিপূজাবিহীনশ্চ বেদবিদ্বেষ্টিনস্তথা।

দ্বিজ-গো-দ্বেষ্টিনশ্চাপি রাক্ষসা পরিকীর্তিতাঃ ॥

হরিপূজাবিহীন গো দ্বিজ-বেদ-বিদ্বেষ্টী জনগণ রাক্ষস বলিয়া পরিকীর্তিত।

শ্রীমদ্ভাগবতে দেবগণের উক্তিতে দেখা যায়,

যেহত্রেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-

স্তয়াস্তভাবাদবিশুদ্ধ বুদ্ধয়ঃ।

আরুহ কচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ

পতন্ত্যধোহনাদৃত যুষ্মদজ্বপ্রয়ঃ ॥ (শ্রীভাঃ ১০। ২। ৩২)

হে পদ্মপলাশলোচন, যাহারা আপনার চরণসেবাতে অনাদর করিয়া

আপনাদিগকে ‘মুক্ত’ বলিয়া অভিমান করে, আপনার প্রতি ভক্তির অভাব হেতু তাহাদের বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না। তাহারা বহু জন্ম তপস্তার ফলে জীবমুক্তদশা প্রাপ্ত হইয়াও তাহা হইতে অধঃপতিত হয়। তাহারা আপনার (অর্থাৎ ভগবানের) প্রতি ভক্তির অভাবে অশুদ্ধমতি। স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখের উক্তি,

“ধর্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্নিতা।

মুক্ত্যাপ্যেতমাত্মানং ন সম্যক্ প্রপুণাতি হি ॥” (শ্রীভাঃ ১১।১৪।২২)

সত্য ও দয়াদিসম্বিত দানযজ্ঞাদি বৈরাগ্য বা তপস্তায়ুক্ত বিদ্যা আমার প্রতি প্রীতি বা ভক্তিশূন্য চিন্তকে কখনও সম্যাক্রূপে পবিত্র করিতে পারে না। কেহ কেহ জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করিয়া যে আপনাকে ‘বিমুক্ত’ বলিয়া অভিমান করে সুল-স্বপ্ন দেহবশের অতিরিক্তরূপে আত্মাকে মনে করে। কিন্তু ‘অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের সিদ্ধিলাভে ক্লেশই লাভ হয়’—গীতার এই উক্তি অনুসারে তাহারা অতিকষ্টে জীবমুক্তিরূপ দশা লাভ করিলেও শ্রীভগবদ্ভজন না করায় ভগবদ্ পাদপদ্মকে অগ্রাহ্য করিয়া অধঃপতিত হয়।

ব্রহ্মার উক্তি,—

“যোহনাদূতো নরকভাগ্ভিরসৎ-প্রসঙ্গৈঃ ॥” (শ্রীভাঃ ৩।৯৪)

কেবল নরকগামী নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিই ভগবৎ পাদপদ্মে অনাদর করে।

ভগবৎ প্রীতিপ্রভাবে কর্মবাসনা নিরাকৃত হইলে ভক্তির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।

“যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি

ধাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।

আত্মা চ কস্মীদুশয়ং বিধুয়

মন্তুর্ভ্যোগেন ভজত্যাথো মাম্ ॥” (শ্রীভাঃ ১১।১৪।২৫)

বদ্ধজীবের প্রতি শ্রীভগবদ্বক্তি,—অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত হইয়াই স্তবর্ণ যেমন নিজ অন্তর্মল ত্যাগ করিয়া স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, জীবাত্মাও তদ্রূপ আমার ভক্তিযোগের প্রভাবে কর্মবাসনারূপ মল পরিত্যাগ করিয়া আমার ধামে আমার সেবাধিকার প্রাপ্ত হয়।

স্কন্দ পুরাণে রেবাখণ্ডে,—

“ইন্দ্রো মহেশ্বরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈব হি ।

শ্বপচোহপি ভবত্যেব যদা তুষ্ঠোহসি কেশব ॥

শ্বপচাদপকৃষ্টত্বং ব্রহ্মেশানাদয়ঃ সুরাঃ ।

তদৈবাচ্যুত যান্ত্যেতে যদৈব ত্বং পরাজুখঃ ॥”

“হে কেশব, যখনই তুমি সন্তুষ্ট হও তৎক্ষণাৎ চণ্ডাল ব্যক্তিও ইন্দ্র, মহেশ্বর, ব্রহ্মা বা পরব্রহ্মতুল্য হইতে পারে; আর, হে অচ্যুত! যখনই তুমি বিমুখ হও, তখনই ব্রহ্মা ও ঈশানাди দেবগণ চণ্ডাল হইতেও অপকৃষ্ট লাভ করেন।”

“যচ্ছৌচনিঃসৃত-সরিং প্রবরোদকেন ।

তীর্থেন মূর্ধ্য্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোহভূৎ ॥

ধাতুর্মনঃ শমলশৈল-নিঃসৃষ্টবজ্রং ।

ধ্যায়ৈচ্ছিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ॥” (শ্রীভাঃ ৩২৮।২২)

শ্রীহরির চরণ প্রক্ষালনে নিঃসৃত সরিংশ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিয়াই শিব ‘শিব’ অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই চরণ ধ্যান করেন, বজ্রনিষ্ক্ষেপফলে পর্বতের আয় তাঁহার মনের কল্মষ ধ্বংস হয়; অতএব সেই ভগবানের চরণকমল সর্বদা ধ্যান করিবে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীশ্রী একাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, ষড়্‌বিংশ অধ্যায়]

(পূর্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪৬ পৃষ্ঠার পর)

পুত্রদা একাদশী

যুধিষ্ঠির কহিলেন--“হে কৃষ্ণ! আপনি পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ‘সফলা’ একাদশীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। এখন অনুগ্রহপূর্বক পৌষ শুক্ল-পক্ষীয়া একাদশীর কি নাম, কি বিধি, কোন্ দেবতা ঐ দিনে পূজিত হন এবং কাহার প্রতি তুষ্ট হইয়া আপনি উক্ত ব্রতফল প্রদান করিয়াছিলেন সে সমুদয় বৃত্তান্ত আমার নিকট বর্ণনা করুন।”

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন--“হে মহারাজ! পূর্ব একাদশীর বিধি অনুসারেই এই ব্রত পালনীয় জানিবে। এই একাদশী ‘পুত্রদা’ নামে বিখ্যাত এবং

সর্বপাপ-বিনাশকারিণী। কামদ ও সিদ্ধিদায়ক নারায়ণ ইহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, সচরাচর ত্রিলোক মধ্যে ইহার তুল্য ব্রত নাই। এই ব্রত পালন-কারী মানবকে নারায়ণ বিদ্বান ও যশস্বী করিয়া থাকেন।

“ভদ্রাবতী পুরীতে পুরাকালে স্নকেতুমান্ নামে এক অপুত্রক নৃপতি ছিলেন। তাহার রাণীর নাম ছিল চম্পকা। পুত্রহীন রাজার সহিত সেই রাণী নানাবিধ স্নখে কাল যাপন করিতেছিলেন, কিন্তু বংশরক্ষা-হেতু বহুকাল যাবৎ বহু ধর্মক্রিয়াদি যাজন করা সত্ত্বেও কোন পুত্রলাভে বিফলমনোরথ হইয়া রাজার চিন্তে শান্তি ছিল না। ‘কি করিব? কোথায় যাইব? কি প্রকারে পুত্র লাভ হইতে পারে?’—রাজা স্নকেতুমান্ এইরূপ চিন্তায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

“সেই রাজার পূর্ব-পুরুষগণ অপুত্রক রাজার প্রদত্ত করোঞ্চ জল অতি দুঃখের সহিত গ্রহণ করিতেন। তাহারা ভাবিতেন—‘এই রাজার পরে আমাদিগকে যে একটু জলপিণ্ড দিবে সেরূপ বংশধর দেখিতেছি না’। এইপ্রকার চিন্তায় পরলোকগত পিতৃপুরুষগণও দুঃখিত হইতেন। সেই রাজার মিত্র অমাত্যবর্গও কিছুতেই সুখী হইতেন না। হস্তী, পদাতিক প্রভৃতি রাজোচিত ঐশ্বর্যসমূহ থাকিলেও রাজার মনে নৈরাশ্যই নিত্য বর্তমান ছিল। রাজা ভাবিতেন,—‘পুত্রহীন মনুষ্যের জন্ম বৃথা, অপুত্রকের গৃহ শূন্য। পিতৃলোক, দেবলোক ও মনুষ্যলোকের নিকট যে ঋণত্রয় শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তাহাও পুত্র বিনা পরিশোধ হয় না। সেজন্য মানুষ সর্বচেষ্ঠায় পুত্র উৎপাদন করিয়া থাকে। পুত্রবান্ জনের এ জগতে যশোলাভ ও পরলোকে উত্তমা গতি হয়। যে সকল পুণ্যবান ব্যক্তির গৃহে পুত্র বিद्यমান থাকে তাহাদের গৃহেই আয়, আরোগ্য, সম্পত্তি প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে’। হে যুধিষ্ঠির! আগারও নিশ্চিত ধারণা যে পুণ্যকর্মা মনুষ্যের গৃহেই পুত্র জন্মে, পুণ্যব্যতীত পুত্র বা সম্পত্তি হয় না।

“রাজা স্নকেতুমান্ এই প্রকার নানা দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া আত্মহত্যা দ্বারা শান্তি লাভ করিতে চাহিলেন। আবার আত্মহত্যায় যে দুর্গতি হয় তাহাও চিন্তা করিলেন,—‘অত্মহত্যায় আমার দেহ পতিত হইবে অথচ অপুত্রকত্ব দূরীভূত হইবে না’ স্বহিত-কারণ একরূপ বিচার করিয়া একদিন অশ্বারোহণে সেই স্নকেতুমান্ রাজা এক গহন বনে গমন করিলেন।

“রাজার পুরোহিতাদি কেহই রাজা যে বনে গমন করিয়াছেন তাহা জানিতে পারিলেন না। এদিকে রাজা মৃগ-পক্ষী-নিষেবিত গভীর বনে লতা, বৃক্ষসমূহ অবলোকনপূর্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। বট, অশ্বথ, বিব্র, খজ্জুর, পনস (কাঠাল), বকুল, সপ্তপর্ণ, তিডিক, তিলক, শাল, তাল ও তমাল প্রভৃতি বৃক্ষরাজি দর্শন করিলেন। শৃগাল, শশক, বনমার্জ্জার, মহিষ, শল্লক, ও চমর প্রভৃতি বনজন্তুসকলও দর্শন করিলেন। সেইরূপে বন্যাক হইতে অর্দ্ধ নিষ্ক্রান্ত সর্পগণ, শিশুসহ মত্ত বনহস্তিগণ, হস্তিনীগণ-বেষ্টিত চারিদন্তবিশিষ্ট হস্তিযুথও দেখিতে পাইলেন। সেই হস্তিসমূহ দেখিয়া রাজা স্বীয় হস্তিগণের কথা চিন্তা করিলেন। সেই হস্তিগণের মধ্যে বিচরণপূর্বক রাজা পরম শোভা দর্শন করিয়াছিলেন। মহা আশ্চর্য্যযুক্ত হইয়া রাজা শিবা, পেচকগণের শব্দ শ্রবণ ও ভল্লুক, মৃগাদির নৃত্য দর্শন করিতে করিতে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। রাজা তখন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া ইচ্ছাত গমন করিতে থাকিলেন। কিন্তু জলাদি কিছুই না পাইয়া কণ্ঠতালুবিষ্টক অবস্থায় রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন,—‘আমি এমন কি দুর্কর্ম করিয়াছি, যাহার ফলে এরূপ কষ্ট পাইতেছি। আমি যজ্ঞ ও পূজা প্রভৃতি দ্বারা দেবগণকে তুষ্ট করিয়াছি। মিষ্ট ভোজন ও দানাদি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকেও পরিতুষ্ট করিয়াছি। প্রজাগণকে সর্বদা পুত্রের ন্যায় পালন করিয়া আসিতেছি। এমতাবস্থায় কি জন্ত আমার এই নিদারুণ দুঃখভোগ হইতেছে?’ এইরূপ চিন্তাবিত হইয়া আরও কিয়দূর অগ্রসর হইয়া স্বীয় পুণ্য-প্রভাবে মীন-পদ্মসমূহে স্নশোভিত এবং কারণ্ডব (হংসবিশেষ), চক্রবাক (প্রসিদ্ধ পক্ষী), রাজহংস, মকর, বহুবিধ মৎস্য ও অসংখ্য জলজন্তুতে পরিপূর্ণ একটি অত্যন্তম সরোবর এবং তৎসমীপেই মুনিগণের বহু আশ্রম তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।

“উক্ত শোভা সন্দর্শনকারী রাজা তখন শুভসংস্চক পক্ষিগণ সহ নিজ দক্ষিণ নেত্র ও দক্ষিণ কর স্পন্দনশীল দেখিলেন। এ সকলই শুভ লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই সরোবর-তীরে বেদ-পাঠনিরত মুনিগণকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় হর্ষান্বিত হইয়া রাজা অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক মুনিগণের সন্নিকটবর্তী হইয়া তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ভাবে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। কৃতাজলিপুটে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবদ্যে সেই রাজাকে মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,

‘হে মহারাজ ! আমরা আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। আপনার প্রার্থনা কি বলুন।’

“রাজা কহিলেন—‘এই সরোবরতীরে সমবেত আপনারা কে ? আপনাদের নাম কি এবং কি জন্তই বা সকলে এইস্থলে মিলিত হইয়াছেন তাহা সত্য করিয়া আমার নিকট বর্ণন করুন’। মুনিগণ বলিলেন—‘হে মহারাজ ! আমরা বিশ্বদেব নামে প্রসিদ্ধ, স্নানার্থ এই সরোবরে আগমন করিয়াছি। মাঘ মাস নিকটবর্তী ; অতঃ হইতে পাঁচদিন পরেই মাঘ মাস আরম্ভ হইবে। অতঃ পুত্রদা নামক একাদশী তিথি। মনুষ্যাগণকে পুত্র প্রদান করেন বলিয়াই এই একাদশী-ব্রত ‘পুত্রদা’ নামে বিখ্যাত।’ রাজা কহিলেন ‘হে মুনিবৃন্দ ! আমি অপুত্রক, পুত্র কামনায় অতিশয় চিন্তাস্বিত হইয়াই আমি আপনাদের সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। যদি আপনারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তবে আমাকে একটি পুত্র প্রদান করুন।’

“মুনিগণ কহিলেন—‘হে মহারাজ ! অতঃ সেই ‘পুত্রদা’ নামক প্রসিদ্ধা একাদশী তিথি। সুতরাং অতঃই আপনি এই ব্রত পালন করুন। তদন্তর আমাদের অভিষেক ও শ্রীকেশবের অনুগ্রহে নিশ্চয়ই আপনার পুত্রলাভ হইবে।’

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—“হে যুধিষ্ঠির ! মুনিদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যথাবিধানে কেবল ফলমূলাদি গ্রহণে সেই পুত্রদা-একাদশী-ব্রত পালন করিলেন এবং দ্বাদশীদিনে শম্মাদি দ্বারা পারণবৃক্ষক মুনিগণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া নিজ গৃহে আগমন করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই রানীও গর্ভধারণ করিলেন। পুণ্যকন্মা রাজার যথাকালে একটি তেজস্বী পুত্র জাত হইল। সেই পুত্র পিতার তুষ্টি বিধানকরতঃ প্রজাপালক রাজা হইয়াছিল। হে মহারাজ ! পুত্রদা নামক উত্তম এই একাদশী ব্রত সকলেরই পালন করা কর্তব্য। সকল মানবের হিতকামনায় তোমার নিকট উহা বর্ণনা করিলাম। একাগ্রচিত্তে যে সকল মানব এই ‘পুত্রদা’ একাদশী-ব্রত পালন করিবে, তাহারা ‘পুং’ নরক হইতে ত্রাণলাভ করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গগামী হইবে। আর এই ব্রতকথা পঠন ও শ্রবণ করিলেও অগ্নিষ্টোম যাগের ফলপ্রাপ্তি হয়।”

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে পৌষ-শুক্লপক্ষীয়-‘পুত্রদা’-একাদশী-

মাহাত্ম্য-কথন নামক ষড়্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-বাকরণতীর্থ

মাযানফরের মুক্তি

কোন এক প্রসিদ্ধ মহাজন বলিয়াছেন,

“কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু ।

মিছে মায়াবদ্ধ হ’য়ে বৃক্ষসম হৈনু ॥”

আমাদের সংসারে আসিবার প্রধান এবং প্রথম উদ্দেশ্যই কৃষ্ণভজন করা। ‘ভজ্’ ধাতুর অর্থ সেবা করা। সুতরাং ভগবানের সেবা করাই নিখিল প্রাণিমাত্রেরই একমাত্র কর্তব্য। বর্তমান অবস্থায় আমরা আমাদের সেই কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। তাহার কারণ, বদ্ধজীব ‘কৃষ্ণ বহিস্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।’ ফলে, ‘নিকটস্থ মায়া তা’কে জাপটিয়া ধরে।’ জীব যখনই কৃষ্ণের সেবা না করে, তখনই মায়া তাহার ভোগ করিবার কুসাননা ও কুপ্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া দেয়। এই অবস্থায় আমরা নিজেরাই ভোক্তা সাজিয়া বসি, আর নানাপ্রকার অসতী ইচ্ছা আমাদের হৃদয় দুর্বল করিতে থাকে। যে মুহূর্ত্তে আবার আমাদের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি সেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয়, তখনই মায়া আমাদেরিগকে তাহার নফরত্বের কষ্ট হইতে মুক্তি দেয়।

আমাদের সর্বদাই মনে রাখা প্রয়োজন, স্বরূপেতে জীবমাত্রই কৃষ্ণের দাস অর্থাৎ সেবক। সেই সেবাই আমাদের নিত্যধর্ম, সেই সেবাই আমাদের নিত্যসুখের আকর। বদ্ধজীব রিপুদেবীর স্মিষ্ট (১) পদলাঞ্ছনা ভোগ করিবার বাসনা করিলেই মায়ার কবলে নিপতিত হয়। মায়াদেবী তাহাকে সেই তাৎকালিক সুখ প্রদান করে। ‘নাহি জান বদ্ধ হ’য়ে হবে তুমি চিরদিন’—এই মহাজন বাণীর প্রতি আস্থা হারাইয়া, আর যে কোন দিন আমরা উন্নতি লাভ করিতে পারিব, সেইটুকু দৃঢ়তা এবং প্রত্যয়ও আমরা ধারণ করিতে পারি না। ফলতঃ, হুঃখময় মায়া-নফরত্ব আমাদের একমাত্র কৃত্য হইয়া উঠে, জীবনের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষার অবলুপ্তি হয়। এই দুর্ব্বিসহ লাঞ্ছনাই বদ্ধজীবের ভাগ্যে জুটিয়া থাকে। তরলতাই জলের ধর্ম। কোনও কারণে জল জমিয়া বরফে পরিণত হইলে কাঠিগ্র অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কাঠিগ্র অবস্থা কিন্তু জলের ‘স্বভাব’ নহে, ইহা ‘নিসর্গ’ মাত্র। ‘নিসর্গ’ ‘স্বভাবের’ স্থান দখল করিয়া আপনাকেই ‘স্বভাব’ বলিয়া পরিচয় দেয়। হতভাগ্য জীবও তদ্রূপ মায়াবদ্ধতা-রূপ নৈসর্গিক অবস্থাকে

আপনার নিত্য স্বভাব বলিয়া মনে করে, অনিত্য ধর্মকেই নিত্যধর্ম বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে।

মায়াবদ্ধ অবস্থাটি কিরূপ তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। দৈব-সম্বন্ধ-বিহীন হইয়া স্বতন্ত্রভাবে স্ত্রী-পুত্র-বন্ধুবর্গের প্রতিপালন, দেশের জনগণের ইন্দ্রিয়তোষক কার্যের আদান—এই সকল কার্য জীবের সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। অনেকে আবার মনে করেন, চুরি না করিয়া সহুপায়ে অর্থোপার্জনে কুটুম্বভরণের যোগ্যতাজ্জন করিতে পারিলেই ভগবানকে পাওয়া হইয়া গেল। শিক্ষক ও পিতামাতাকে ফাঁকি না দিয়া ভাল করিয়া A, B, C, D মুখস্ত করিতে পারিলেই বিদ্যালভ হইল, অতএব ভগবানকে পাওয়া হইয়া গেল। ভিত্তারীকে এ্যালুমিনিয়াম ধাতুর চতুষ্কোণী একটি পয়সা প্রদান করিতে পারিলেই, ভগবানের গদিটি দখলে আসিয়া গেল। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই সে পণ্ডিত হইল; স্মরণ্য ভগবানকে পাওয়া হইল। এগুলি সমস্তই সৌখীন ভগবদ্ভক্তি, ভগবৎ বিরোধী ধূর্তের কপটতা মাত্র। ভগবদ্ভক্তির ‘ভ’ ও এগুলির মধ্যে নাই।

আজকাল মার্কিনফেরৎ কোন স্বামীজীর কল্যাণে (?) আমাদের দেশে বহু সৌখীন সন্ন্যাসীর প্রাচুর্য্য হইয়াছে। তাহারা মংস-মুরগী-পাঁঠা-অণ্ড-চুরুট-সিগারেট কোনটাই বাদ রাখেন না, ব্রহ্মজ্ঞানে প্রকাশেই সেগুলি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের স্বামীজীত্ব-এর পরিচয় প্রদান করেন। তাহারা নাকি এতদূর উন্নত হইয়াছেন যে ভগবদ্ভক্তি রাজ্যের এই সকল কণ্টক যাহা সর্বশাস্ত্রে সর্বত্রই বারংবার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিবে না! এইজগৎ এইশ্রেণীর লোককে সৌখীন সন্ন্যাসী বলা অর্থোক্তিক নহে বলিয়াই মনে হয়।

শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস নাই, অথচ সন্ন্যাসী সাজিবার প্রবল ইচ্ছা—ইহা কি প্রকার চিত্তবৃত্তির পরিচয় তাহা সহজে বোধগম্য। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা সরাসরি কোন বস্তুসংগ্রহে অক্ষম হইলে অসং উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে এবং উক্ত অসং উপায়ে কৃতী হইবার জগৎ তাহারা প্রাণপণ চেষ্টা করে, সহুপায়ীতে পারদর্শী হইবার যোগ্যতা থাকিলেও তাহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়। উপরন্তু যাহারা সংপত্তা অবলম্বন করে তাহাদিগকেই অসং বলিয়া আত্মসাত্বনার মনকলা

খাইতে থাকে। চোর, গাঁটকাটা, প্রতারক প্রভৃতি এই শ্রেণীর লোক। পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও এইপ্রকার। তাহারা ধর্ম জগতের চোর, গাঁটকাটা। সনাতন বৈদিক শাস্ত্রবিহিত সংপন্থায় যাহারা কৃষ্ণানুশীলনে বাস্তব তাদৃশ স্বকৃতিমান জনগণের সহিত বিরোধ বাধাইয়া স্বীয় অশাস্ত্রীয় দুষ্কর্ম হাসিল করাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। ইহারা ভিন্ন কলির চর হইবার যোগ্যতা আর কাহাদের আছে? সং পথানুসরণ-কারীর হৃদয়ের সততা হরণ করাই তাহাদের কাম্য।

এইসকল চিন্তাধারাই প্রবলা মায়ার শিকারের মৃত্যুকালীন অশ্রুট আর্তনাদ; ভগবদ্ভক্ত এইগুলি হইতে মুক্ত।

পূর্বপরিচ্ছেদে বর্ণিত ব্যক্তিগণের জগন্নাশজনক উক্তিতে গো-মেষ-মহিষ-মানুষ প্রভৃতি ভগবদিতর প্রাণিগণের অখোৎপাদন-চেষ্টাই ভগবানের সেবা বলিয়া ধ্বনিত হয়। মুরগীর সেবা ভগবানের সেবা, রাম ছাগলের সেবা ভগবানের সেবা আর ভগবানের সেবা ভগবৎ-সেবা নহে, ইহা কি প্রকার যুক্তি? তাহাদের অসং মতে আরও কথিত হয়,—ফুটবলে কৃতী ব্যক্তি ভগবানকে পাঠিয়াছেন, জড়-বিজ্ঞানে কৃতী ব্যক্তি ভগবানকে পাঠিয়াছেন, অন্ততঃ ভগবৎপ্রাপ্তির কয়েক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন! যুক্তির খাতিরে যদি এই সকল মত মানিয়াই লওয়া হয়, তাহা হইলেও একটী প্রশ্ন জাগে যে উহারা ভগবান পাইবার যোগ্যতা অর্জন করিল আর যাহারা ভগবানের জন্ত ত্যক্তসংসারী, সর্বদা ভগবৎকথানুকীর্ণনে রত, তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রীতিবিধানে বাস্তব, ভগবান্মন্দির-প্রতিষ্ঠানাদি গঠনে বাস্তব, ভগবৎশিক্ষা গ্রহণে ও প্রদানে বাস্তব তাঁহাদের ভগবৎ-সেবা হইল না? সকলের দেবাই ভগবানের সেবা আর ভগবানের সেবা ভগবৎ-সেবা নহে? ‘বহুরূপে’র সেবায় ভগবানের সেবা হয় আর ভগবানের সেবায় বহুরূপের সেবা হইবে না কেন? বহুরূপের মধ্যে ভগবানের রূপ তাহারা প্রত্যক্ষ করেন, আর ভগবানের রূপের মধ্যে বহুরূপ প্রত্যক্ষ করিতে তাহাদের চক্ষুতে মনে হয় ছানি পড়ে। এইপ্রকার ছানিরোগগ্রস্ত অন্ধের কথা যে শুধুক না কেন, আমরা গুনিব না; কারণ আমরা মায়ার অন্ধকার হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ভগবদ্ রাজ্যের আলোক পাইতে ইচ্ছা করি। এই কারণেই কি তাহারা ভগবানকে নির্বিশেষ নিরাকার সাজাইতে চায়? তাহা হইলে আর ভগবানের সেবায় সময় ব্যয়িত হইবে না, মায়ার রাজত্বে মজা পুরাভাবে লুঠা যাইবে!

কোন কার্য সাধনে ব্যর্থ হইলে দুই প্রকার সান্ত্বনামূলক চিন্তা হৃদয়ে জগতের লোক পোষণ করিয়া থাকে। প্রথম প্রকার হইল, সাধ্য বস্তু অকিঞ্চিৎকর ; শৃগাল যেমন উক্তি করিয়াছিল, ‘আঙ্গুর ফল টক’। দ্বিতীয় প্রকার হইল, সাধ্য বস্তু যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই তাহা এবং যাহা পূর্ব হইতেই আছে—এই দুইটী বস্তু একই সমান। শেবোক্ত ব্যক্তি ধূর্ত, কেননা তিনি তাঁহার নিজের অক্ষমতা ঢাকিবার জন্ত অথো যাহাতে তাহার অসাধ্য বস্তুতে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে না পারে সেই পথ রুদ্ধ করিয়া দিল। প্রথম ব্যক্তি ক্রোধভরে উক্ত সং কার্য্য হইতে বিরত হইলেও উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিল না। যাহারা ‘সব ধর্ম্মই সমান’ বলিতে চাহে, তাহারা ঐ দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তির ত্রায় ধূর্ত ও শঠ। ঈশ্বরের অস্তিত্বই তাহারা স্বীকার করিল না ; অনীশ্বর বস্তুর সহিত ঈশ্বরের সাম্য-স্থাপন করিল এবং অনীশ্বর বস্তুর সেবাকেই ঈশ্বরের সেবা বলিয়া নির্দেশ করিল। ইহাকেই শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত Suicidal Religion (আত্মহত্যা-জনক ধর্ম্ম) বলিয়াছেন।

প্রাচীনকালে রামায়ণে দেখা যায়, লঙ্কারাজ রাবণ একবার দুঃপ্রবৃত্তি সাধন-মানসে সন্ন্যাসী ভায়া সাজিয়াছিল। যাহারা অন্তর্দর্শনে পরাজুখ তাহারা রাবণের ত্রায় স্বর্গে সিঁড়ি দিবার জন্ত সর্বদাই বাস্তু। কিন্তু রাবণ তাহাতে সফল হ’ন নাই জানিয়া শুদ্ধ ভগবদ্ভজগণ ঐরূপ কার্য্য হইতে বিরত হওয়াকেই ভগবৎ-সেবা বলিয়া জানেন--ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। বর্তমান কাল কলিকাল ; স্তবরাং রাবণ, হিরণ্যাক্ষের চিত্তবৃত্তি-সম্পন্ন লোকের অভাব আর একালে নাই। স্তবরাং ধর্ম্ম কি তাহার একটা Qualitative (গুণগত) Standard হওয়া উচিত—ইহাই বৈদিক সনাতনী চিন্তাধারা। এইজন্ত অকৃত্রিম বেদান্ত-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত বৈদিক বৌদ্ধ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, বৈদিক ‘জবরদস্ত্ মৌলভী’ রাজা রাম-মোহন রায় ও বৈদিক খৃষ্টান স্বামী বিবেকানন্দের Lowest order-এর Quantitative ধর্ম্মগুলির স্বর্গ-নরক তফাৎ। শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা এই সংশিক্ষায় তাঁহার পাঠকবর্গকে সাবালকত্ব প্রদান করিয়াছেন। স্তবরাং শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার পাঠকবর্গ এই প্রকার চিন্তার মাধ্যমে নিজেকে বর্তমানে গঠিত করিলে জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। একটা হরিণ শিশুর সামান্য সেবা করিতে যাইয়া

একটু সংকল্পী সাক্ষিবার বাসনায় ভরত-মুনির কি প্রকার দুর্দশা হইয়াছিল তাহা আর কা'র অজানা আছে? 'মহাজনো যেন গতঃ স পত্না'য় ভগবানের সেবা আর নিজ কুচি-অনুসারে ঈশ্বরের সেবা, এক কথা নহে। শেষোক্ত চেষ্টায় স্থায় খেয়াল-খুসীর চরিতার্থ-সাধনই মুখ্য লক্ষ্য থাকে — ইহা চিন্তাশীল নিরপেক্ষ ব্যক্তি বলিতে বাধ্য।

কিভাবে সেই পরাংপর কৃষ্ণের সেবা সাধিতা হয় বর্তমান পরিচ্ছেদে তাহাই বিচার্য। বেদানুগ সনাতন-শাস্ত্র এ সম্পর্কে যেভাবে নির্দেশ করেন তাহাই গ্রাহ্য। শাস্ত্রের প্রথম নির্দেশই, “আশ্রয় লইয়া ভজে, তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ।” “তদ্ বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভি-গচ্ছেৎ। সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥” (মুণ্ডক উপনিষদ্ ১।২।১২) ‘আশ্রয়’ বলিতে সর্বতোভাবে ভগবানের নাম-গুণ-কীর্তনে রত সদৃগুরু-পাদপদ্মশ্রয়ই বুঝিতে হইবে। কারণ শাস্ত্রে অতুল উল্লিখিত হইয়াছে, “বিনা মহৎপাদরজোহাভিষেকম্”। সদৃগুরু কে? যিনি নিজেকে জীবনের শত ভাগের ভিতর শতভাগই সচ্চিদানন্দ বিভূ বস্তুর সেবায় নিয়োজিত রাখিয়াছেন, তিনিই সদৃগুরু। এই গুরুপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়-বিগ্রহ। আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করাই শাস্ত্র-নির্দেশ। বিষয়-বিগ্রহই হলেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। গুরুরূপে তিনিই বদ্ধজীবকে কৃপা করিয়া থাকেন। সুতরাং সদৃগুরুপাদপদ্মের সেবা-দ্বারাই হৃদয়ে ভগবানের সেবা স্ফুটিলভ করিবে, জীব মায়ার নফরত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

“হইয়াছেন হইবেন প্রভুর যত দাস।

তাঁ সবার চরণ বন্দি দস্তে করি ঘাস ॥”

—এই প্রকার চিন্তাবৃত্তিই মায়াদীশত্বের সেবার লক্ষণ, ইহাই মায়ানফরের মুক্তি। যেথায় ‘প্রভুর’ (স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভুর) দাসের (সেবকের) সেবা, পূজা, বন্দনাদি নাই, সেই স্থান মায়াকুবিকায়ে পীড়িতেরই অন্ধকার গর্ত, বিশুদ্ধ গোড়ীয়গণের মুক্তির স্থান নহে।

—শ্রীস্বরূপদামোদর ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয় প্রজ্ঞান

কৃষ্ণবিমুখতা হইতেই জীবের জড়তা প্রাপ্তি

প্রপঞ্চে উদিত জীবের জাড্য সাধারণে অবিদিত। কারণ, দৈশবিমুখ জীবের স্বাভাবিকী গতিই বৈকুণ্ঠ-বিরোধ-স্থানে অত্যধিক আকর্ষণ, তৎফলেই যাবতীয় কুণ্ঠা আসিয়া তাহার চেতনময়ী বৃত্তির অভিব্যক্তির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিলে তাদৃশী বিমুখ-গতিই বদ্ধ জীবের চরমারাধ্য হইয়া পড়ে। সাধারণ মনস্তাত্ত্বিকগণ ঐ গতিকে মুখ্যগতি জ্ঞান করায় তাদৃশ পন্থায় অরুচিবিশিষ্ট সজ্জনবৃন্দের দৈশসাধনায় আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত পূর্বোক্ত মনোধর্ম্মি-গণের হৃদয়ে কোন আলোক সঞ্চার করিতে পারে না; পরন্তু কৃষ্ণবিদ্বেষ, কাঞ্চবিদ্বেষ, এতৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় পরিহাসাদি বদ্ধজীবের রুচিপ্রদ অভি-লাষের একটি নিত্যসাথী হইয়া পড়ে। কৃষ্ণাধীন থাকা অপেক্ষা মায়াবৃত্ত হইতে তাহাদের অতুঃসাহ দিনে দিনে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের অসীমতা আক্ষমতারই নামান্তর ;

জড়বস্তু মাত্রই সীমাবদ্ধ (finite)

এই গতিশীল মাযিক রাজ্যে তাহাদের নিত্যপরিবর্তিতা জড়বৈচিত্র্য মণী কৰ্ম্মধারা বহুরূপে প্রকাশিত হইয়া বিবিধ প্রলাপ সৃজন করে। ঐ প্রলাপসমূহের কোনটী ভগবদ্বিমুখতা, কোনটী ভগবদ্বিদ্বেষ, কোনটী আবার নিদারুণ জড়ভোগেচ্ছা কোনটী দৈশবৃত্তের আন্তর্য্যে সম্পূর্ণ উপেক্ষা। জড়ভোগ ক্ষণস্থায়ী,—ইহা জ্ঞাতসত্ত্বেও তাহারা জড়ের উন্নতি-দ্বারা চেতন-বৃত্তির উন্নতির নামে হৃদৈববশতঃ ছায়াচেতনের সেবাকেই তৎকালে লব্ধা বিচার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ মনে করিয়া থাকেন। ছায়াচেতন-সমাপ্তিত অনাত্মস্থ ব্যক্তিগণ কৰ্ম্মজগতে পরিভ্রাম্যমাণ অবস্থায় যে জড়বৈচিত্র্য দর্শন ও অনুভব করেন, তাহাকেই তাহারা উচ্চাসন প্রদান করিয়া থাকেন। জড় কখনও চেতন নহে, বা হইতেও পারে না। এজন্য জড়ের স্বীয় কোন স্বাধীনতা না থাকায় তাহার জড় বৈচিত্র্য জড় রাজ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং এতাদৃশ চিন্তাপর ব্যক্তিসকল জড় অসীম বা জড় অনন্ত ও অসংখ্য (Relative Infinite) রাজ্যে বিচরণ করেন মাত্র।

অনাদি কৰ্ম্মফলবাধ্য জীব যুগ যুগ ধরিয়া তাদৃশ জড় অর্থাৎ আপেক্ষিক অনন্ত রাজ্য—ব্রহ্মলোকের অন্তর্গত বিভিন্ন লোকে ধাবমান শশকের গ্রায় ধাবিত হইয়া, শান্তির পূর্ণ-স্বরূপ তাহাদিগের নিকট অবগুষ্ঠিত থাকায়, পরিশেষে চরম অশান্তিই প্রাপ্ত হইলেও লব্ধা অশান্তিকেই শান্তি ও সুখের

আকর—এইরূপ ভ্রম করে। কখনও বা ঐসকল বস্তু-দ্বারা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উক্ত ভ্রান্তিময় বিচারদ্বারাও তাহাদের ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়।

জড় বস্তুর পরমাণু অবিভাজ্য নহে, উহাদের বিয়োজনফলে

জাতা শক্তিতে মহাপ্রলয় ; বস্তু-নির্দেশে কাল-মাত্রার

(Time Dimension) প্রয়োজন—এগুলি

বৈদিক বিজ্ঞানেরই মত, আধুনিক

জড় বিজ্ঞানের কৃতিত্ব নহে

জড়ের গুণ নিত্য নহে। কালের প্রভাবে পার্থিব বস্তুর ভৌতিক ও রাসায়নিক উভয় প্রকার গুণেরই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন বস্তুর অনু-পরমাণুর সংঘাতে বস্তুর আণবিক গঠনেরও পরিবর্তন হয়। তাহাতে বস্তুর গুণাগুণও পরিবর্তিত হয়। পরমাণুই বস্তুর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অংশ। এই পরমাণুরও নিত্যত্ব নাই। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে পরমাণুর গুণের পরিবর্তন হয়। সুতরাং বদ্ধজীব লোকান্তর ভ্রমণ করিয়া সর্বত্রই বিজাতীয় বস্তু দর্শন করে। আবার একই প্রকার বস্তুতেও বিভিন্ন লোকে, বিভিন্ন জন্মে, বিভিন্ন গুণ দর্শন করে। এমতাবস্থায় জড়বস্তুতে মনঃসংযোগের প্রয়াসে বার্থ জীব আরও উন্নততর বিজ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তড়িৎকণ-বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই বিজ্ঞানে সরাসরি বস্তুর পরমাণুর মৌলিক গঠনের আলোচনা আছে। তাহারও পরিণতি স্থায়ী নহে। পরমাণুর ধ্বংস আছে। পরমাণু ধ্বংস হইয়া শক্তিতে পরিণত হয়। কখনও গুণোত্তর-হারে কখনও সমান্তর-হারে তাহাদের ধ্বংস সাধিত হয়। কেহ কেহ পরমাণুর অধিক স্থিতিশীলতার দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে নিত্য-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করেন ; বস্তুতঃ তাহাতে নিত্যত্বের লেশমাত্রও নাই। সারিবদ্ধ সুসজ্জিত বৃক্ষশ্রেণী হইতে ঝঙ্কাপ্রকোপে একটী বৃক্ষ উৎপাটিত হইলে অল্প বৃক্ষগুলির উৎপাটনও যেমন সহজসাধ্য হয় এবং অবশেষে সকল বৃক্ষেরই ধ্বংস হয়, তদ্রূপ সুসজ্জিত ব্রহ্মাণ্ডের পরিণত বস্তুগুলি হইতে একে একে পরমাণুর তড়িৎকণের বিয়োজন ও ধ্বংস হইতে থাকে। এই বিয়োজন ও ধ্বংসফলে জাতা মহাশক্তির প্রভাবে একদিন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে প্রাকৃতিক ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা উপস্থিত হয়। ইহাই মহাপ্রলয়। ঐ সময়ে সমস্ত জড় বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া ঈশ্বরে স্থপ্ত আকারে বিচরমান থাকে। উক্ত মহাপ্রলয় শান্ত হইয়া গেলে পুনরায় নূতন বস্তুর সৃষ্টি হয়, কারণ

পারিপার্শ্বিক অবস্থার এখন পরিবর্তন হইল। সূতরাং ঐ নূতন গঠিত বস্তুকে নির্দেশ দিতে হইলে একটি ‘কাল’ বা ‘সময়ের’ (Time Dimension) ব্যবহার প্রয়োজন হইয়া উঠে। ইহাই চতুর্য়ুগ এবং আরও অধিকতর ব্যাপ্তি বুঝাইতে মনস্তত্ত্বাদি শব্দসকল-দ্বারা সূচিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় বৈদিক দর্শনে এইসকল সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা রহিয়াছে।

ত্রিমাত্রা-বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে (Three Dimensional

universe) সমস্তই Relative, Absolute

বলিয়া কিছুই নাই

গণিতবিজ্ঞানে ঋণাত্মক (Negative) একটি বস্তুর স্বীকার আছে। ঐ প্রকার একটি ঋণাত্মক বস্তু হইতে আর একটি ঋণাত্মক গুণনীয়ক বাহির করিয়া লইলে একটি ধনাত্মক (Positive) বস্তু অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ ঋণাত্মক বস্তুর সহিত ঋণাত্মক বস্তুর গুণনে ধনাত্মক বস্তু হয়। ছায়া-দর্শনে ব্যাপ্তি পঞ্চকে “সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্” নামে একটি ব্যাপ্তি আছে। উহাতে প্রমেয়ের প্রামাণিকতার হানিকর বস্তুগুলির অভাব হইলে প্রমেয় স্থাপিত হয়। ভ্রান্তিময় বিচারে বদ্ধজীবের ভ্রান্তি উপস্থিত হইলে কিন্তু সত্য স্থাপিত হইবে না। কেন না, এই সকল বস্তুই Time dimension লইয়া তথাকথিত Four Dimensional Space-এর মধ্যেই কল্পিত। সূতরাং যদিও কিছু সত্য দৃষ্ট হয় তাহা আপেক্ষিক (Relative), সর্বপ্রকারে সত্য (Absolute) নহে। বিষাক্ত ঔষধদ্বারা অনেক সময় কঠিন ব্যারামের নিরাময় চইয়া থাকে। ঐ ঔষধ যদি রোগগ্রস্ত ব্যক্তি-বাতীত সুস্থ লোকে গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকেও উক্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। সূতরাং ঔষধটির সূক্ষ্মিয়া রোগীর অপেক্ষা রাখিল, ইহার উপকারিতা Absolute নহে অর্থাৎ সকলের উপর প্রযোজ্য নহে। Absolute Knowledge বলিলে দেশ-কাল-পাত্রের (Space, Time, Object) আধিপত্যহীন অপ্রাকৃত জ্ঞানকেই বুঝায়। ‘গৌড়ীয় বেদান্ত’ Relative Knowledge সংগ্রহে ব্যস্ত নহেন। ঐ প্রকার Limited Knowledge (সীমাবদ্ধ জ্ঞান) গৌড়ীয় বেদান্ত দান করেন না।

গৌড়ীয় বিজ্ঞানের বস্তুই প্রকৃত (Absolute) চারিমাত্রা-

বিশিষ্ট; আধুনিক ত্রিমাত্রা ও কল্পিত চতুর্মাত্রা-বিশিষ্ট

দেশের বস্তু একটাই, Isotropic মাত্র

‘গৌড়ীয়’ শব্দে গৌড়-সম্বন্ধীয় বস্তুকে বুঝায়। গৌরের দেশই গৌড়। তিনি অনাদি-অনর্পিত বস্তু দান করিয়াছেন। ইহাই তদীয় দানের বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং গোড়-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ ‘গৌড়ীয়’-শব্দে বিদ্বৎকৃষ্টিগত বৃত্তিতে ভক্তি-ধর্মের সর্বোন্নত-শিক্ষা এবং তাদৃশী শিক্ষায় শিক্ষিত জনগণকেই বুঝাইবে। তাঁহাদের আহত জ্ঞান ‘কেবল জ্ঞান’ নহে, উহা প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা ‘প্রজ্ঞান’। সুতরাং ‘গৌড়ীয় প্রজ্ঞান’ বলিলে গৌরজনানুগগণের অনুপ্রসঙ্গিত, অভীষিত জ্ঞান। এই জ্ঞান বৈজ্ঞানিক বা তথাকথিত Four Dimensional space-এ আবদ্ধ নহে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম”—অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞানই ‘প্রজ্ঞান’, শাস্ত্রান্তরে ইহাকেই পরমগুহ্য জ্ঞান বলিয়াছেন। ইহাই চিন্ময়-ভক্তি।

বৈজ্ঞানিকেরা কীদৃশ জ্ঞান-সংগ্রহে স্ননিপুণ তাহার আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বরং তাহাই পাঠককে গৌড়ীয় প্রজ্ঞানের ধারায় সন্মাত করাইয়া বৈকুণ্ঠ-মিনাদমন্ত কালাক্ষোভ্য গাঙ্গেয়ের সুধা-সরিং উদ্ভাস্তচেতন জীবের কর্ণে প্রবাহিত করিবে।

বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানের বিষয় (Object) দেশ (Space) ও কালে (Time) আবদ্ধ। Einsteinean (আইনষ্টাইন-এর) বিজ্ঞানের দেশ পরিবর্তনশীল, সুতরাং তাহাতে একটি দেশের সমকক্ষ আর একটি দেশের বিঘ্নমানতা অসম্ভব নহে। কালের স্বতন্ত্রতায় স্তিত হইয়া অল্প দেশের উল্লেখও প্রাকৃত বিজ্ঞানে বিচারিত হইয়াছে। কিন্তু সকলই বিভিন্ন অন্ধের হস্তীদর্শনের ছায়, মূল বস্তুর নূতনত্ব তথায় নাই। এইজন্ত ‘গৌড়ীয় প্রজ্ঞান’ উক্ত জ্ঞানকে Real Absolute বলিতে পারেন না, উহাও Relative Absolute. শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকার ১৮শ বর্ষের ২য় সংখ্যায় “গৌড়ীয়-সরস্বতী” প্রবন্ধে কাল সম্বন্ধে অনেক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দ্বিকৃষ্টি বিধায় উহা এখানে আর আলোচিত হইল না।

বৈজ্ঞানিকের Space lower dimension-এ রূপান্তরিত হয়। সুতরাং উচ্চতর দেশ-এর বিশেষত্ব থাকিল কি প্রকারে? বিশেষত্বই dimension-এর মূল্য রক্ষা করে। যাহা পূর্বে দেখা যায় নাই, তাহার আবিষ্কার হইলেই কিছু নূতন আবিষ্কার হইল—ইহা লব্ধ-গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান ব্যক্তি বলেন না, পরন্তু মনোধর্মী জীবের মানসিক জগৎ-বিষয়ক অজ্ঞতারই কিঞ্চিৎ দূরীকরণ হইল—এইটুকু মাত্র বলা যায়। মননশীল চতুষ্টয়-রাজ্য-বহির্ভূত space-এর ধারণা তাহাতে নাই। সুতরাং বস্তু বা জ্ঞান যাহা বৈজ্ঞানিকেরা বিচার করেন, মূলতঃ তাহা Three Dimensions-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের চতুর্ঘাতা-বিশিষ্ট দেশ ত্রিঘাতা-বিশিষ্ট দেশেরই অন্তর্গত, কেবল দিকবিচারে (Direction consideration) তফাৎ আছে মাত্র। অত্যাশ্চর্য্য সকল গুণই উভয়ক্ষেত্রেই সমান অর্থাৎ Isotropic।

দেশ এবং কাল (Space, Time) একটাই বস্তু, পৃথক নহে ;

দেশ কালে এবং কাল দেশে পরিবর্তিত হইতে পারে -

এইগুলি বৈদিক বিজ্ঞানেরই মত, আধুনিক

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ব্যতিক্রম নহে

দেশই কালের ধারক। সুতরাং যে-কাল পর্য্যন্ত চতুর্ঘূর্ণীয় Space এর অতিরিক্ত কোন বস্তু মানব চিন্তা করিতে না পারে, ততকাল পর্য্যন্ত 'দেশ' এবং 'কাল' টাকা ও পয়সার ঝায়ই—মাত্র ইহার উপলব্ধি হইলেই জীবগণের দর্শনের যোগ্যতা অর্জ্জনে 'গৌড়ীয় প্রজ্ঞানের' শ্রেণীতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। Two Dimensional space-এর বস্তু যেমন Three Dimensional space এর বস্তুর চিন্তা করিতে গিয়া বিমূঢ় হয়, গৌড়ীয় প্রজ্ঞানে অপারম্পত জীবের অবস্থাও তদ্রূপ। বৈকুণ্ঠজগতে কালগত অন্তর (Time difference) ব্যতিরেকেই বস্তুপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। দেশ ও কাল পৃথক—এই ভ্রান্ত ধারণা হইতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বর্ত্তমানে মুক্ত হইলেও কালের ব্যবধান ব্যতীতই যে-দেশের অবস্থিতি তাহার সন্ধান অত্যাশ্চর্য্য জানে না। বৈদান্তিক-কুলশেখর শ্রীমৎ বলদেব বিষ্ণুভূষণ প্রভু বেদান্তের আলোচনায় উক্ত দেশের বিজ্ঞান যথেষ্ট প্রদর্শন করিয়াছেন। জগৎ এবম্বিধ বিজ্ঞানের আলোচনায় কৃতী হইবার যত্ন করিলেই গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-সুধীগণ আপনাদিগকে ধৃত্য মনে করিবেন। এই ত' গেল space-এর কথা।

জড় পরমাণুর সক্রিয়তা Relative মাত্র, উহা চেতনতা নহে ;

চিজ্জগতের পরমাণুই প্রকৃত সক্রিয়

বস্তু সম্বন্ধে অত্র প্রবন্ধের প্রথমেই কিছু আলোচনা হইয়াছে। Inert (নিষ্ক্রিয়) বলিতে কোন্ বস্তুকে বুঝাইবে? বহিঃশক্তি যাহাতে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, সেই বস্তুই যদি Inert হয়, তবে উক্ত বস্তুর বিভিন্ন পরমাণু বস্তুতে পরিণত হইল কি প্রকারে? আপেক্ষিক জগতের বস্তু কি Inert নহে? বৈকুণ্ঠ-দর্শনের মূর্ত্ত-বিগ্রহ অত্যাশ্চর্য্য আচার্য্য-ভাস্কর শ্রীগৌড়ীয় সরস্বতীপাদ-বিরচিত 'Relative Worlds' নামক ইংরাজী পুস্তকটী এই প্রবন্ধের পাঠকমাত্রকেই পড়িতে অনুরোধ করি।

গৌড়ীয় বিজ্ঞানই মূলদ (Rational), এবং শান্তির আকর

আমরা এতক্ষণ যাবৎ বৈজ্ঞানিকের যে দেশ-কাল-বস্তুর আলোচনা করিলাম, গোরের দেশ, গোরের বস্তু গোরের কাল তাদৃশ কিছুই তুল্য নহে, এইটুকু লক্ষ্যপ্রজ্ঞান জীবই Rational thought (মূলদ চিন্তা)-এর উপযোগী। ইহাই ‘গৌড়ীয় প্রজ্ঞানে’র মৌলিকত্ব। তাহাতে আপেক্ষিক জগতের ঘূর্ণায়মান space-এর কোন বিষয়ের মধ্যে প্রবেশে অশান্তির আবাহক না হইয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে মনুষ্যত্ব-শিক্ষার প্রচারক শ্রীনারদ ঋষির শান্তির স্থানেরই অন্বেষণ আছে।

গৌড়ীয় বিজ্ঞান অপ্রাকৃত শব্দময়, ইহাই Absolute ; বস্তুদেবীয় বস্তু এই শব্দের বাহক এবং শ্রুতি উহার গ্রাহক

‘গৌড়ীয়-প্রজ্ঞানে’র ইতিহাস কি ? তাহার উৎপত্তি-স্থল কোথায় ? তদুত্তরে এতক্ষণে বলা যায়—Space, Time, Relativity-এর অন্তর্গত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ matter-এর তত্ত্ব বিশ্লেষণরূপ লোকপাল-বিজ্ঞানদক্ষের বিজ্ঞান-বৈচিত্র্যের নিমীলিত, তুষ্ণীক স্থানই শ্রীগৌড়ীয় সরস্বতীর প্রজ্ঞানকোষ। ‘গৌড়ীয় বিজ্ঞানই মূলদ (rational) চিন্তা। তাদৃশ বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসু নারদ মুনি, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডে মনুষ্যত্ব-শিক্ষা-প্রদানের মূল-স্বরূপ, মধ্যে মধ্যে এইপ্রকার Non Relative Science-এর জনক দ্বারকা-ধামে গমন করিতেন। এইস্থান হইতেই উক্ত বিজ্ঞান বস্তুদেব-শক্তি হইয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীনারদের বীণায় শ্রুত হইত। সুতরাং ‘গৌড়ীয়-বাণী’র বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞান শ্রোত বিজ্ঞান, শব্দময় বিজ্ঞান। প্রাকৃত Relative জগতের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় কর্ণদ্বারাই তাহার নিকট কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা যায়, অত ইন্দ্রিয়-দ্বারা নহে।

বেদান্তই গৌড়ীয় প্রজ্ঞান-সম্বন্ধের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। এইজন্ত বেদান্ত-বিজ্ঞানের ‘শব্দবাদ’ বা ‘নামপর’ ব্যাখ্যায় অশ্রুতপূর্ব শব্দবিজ্ঞানের বিকাশ Time-Space-independent বস্তুদেবীয় বস্তু-মাধ্যমে গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-সিন্ধুতে যে আলোড়ন আনয়ন বরিয়াছিল, তাহাতে গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-বিগ্রহ “কৃতী বৈদান্তিক-রত্ন”-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়াছিলেন। গৌড়ীয় অপ্রাকৃত শব্দের প্রবাহক বস্তু (Propagating Medium) ‘বস্তুদেব’ এমনই একটি পাত্র যে-স্থানে কংসের হায প্রাকৃত-বিজ্ঞান-দক্ষ নৃপতিরও পরাজয় হইয়াছিল। বস্তুদেবই অপ্রাকৃত বিজ্ঞান-জগতের ইথার-সদৃশ। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের

অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও কংসাদি লোকপালবিজ্ঞানী আরোহপন্থায় অভিরুচি-সম্পন্ন হওয়ায় চিরকালই বসুদেব-বস্তুর অন্তরালেই অবস্থান করিতেন। সুতরাং তাদৃশ পন্থায় নষ্টরুচি ব্যক্তিই ‘গৌড়ীয় প্রজ্ঞানে’র গ্রাহক হইবার যোগ্য। আমরা ‘বসুদেবীয়’ মাধ্যমে প্রবাহিত বস্তুর বিজ্ঞান ক্রমশঃই আলোচনা করিব।

অপ্রাকৃত গোড়-বস্তুর অণুপরিমাণগুলি স্বয়ং নির্ভরশীল (Self balanced) ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ; উহাদের পরস্পর অনির্ভর-শীলতাহেতু ঐজগৎ সৃষ্টি-ধ্বংস-শূন্য—নিত্য

শাস্ত্র স্থান কি, তাহাই দেখা যাউক। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, পরস্পর সমান আকর্ষণ-বিকর্ষণের ক্ষেত্রই সাম্যস্থান (Equilibrium space)। গৌড়ীয়ের অধিষ্ঠান অপ্রাকৃত গোড় তাদৃশ কোন সাম্যস্থান নহে। তথায় প্রতিটি অণু-পরিমাণই একে অণুর উপর অনির্ভরশীল, কিন্তু নিষ্ক্রিয় (Inert) নহে। ঐ জগতে অণু-পরিমাণগুলি স্বয়ং নির্ভরশীল বলিয়া স্বয়ংসাম্যাবস্থায় সর্বদা বিद्यমান। তজ্জন্ত ঐ জগতের কোন ধ্বংস নাই, কোন সৃষ্টিও নাই। ইহাকেই নিত্য কহে, “ন জায়তে, ম্রিয়তে বা।” গৌড়ীয় বিজ্ঞানে Inert বা নিষ্ক্রিয়-নির্বিশেষ বলিয়া কোন বস্তুই নাই। আধুনিক বিজ্ঞানে নিষ্ক্রিয় বস্তুর বা পরস্পরচ্ছেদী শক্তির সাম্যাবস্থা একটি বিশেষ Relative ক্ষেত্র মাত্র। সূক্ষ্ম বিচারক বালন, উহা প্রকৃত (Absolute) শাস্ত্র নহে। অপ্রাকৃত গোড়ের বর্ণনায় গৌড়ীয়-বিজ্ঞানে পূর্বোক্ত জড়ীয় ধারণার অকিঞ্চিৎকর স্বয়ংসাম্যবস্থাকেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বিজ্ঞান অধিগত হইলেই জীব ‘শ্রীগৌড়ীয়-সরস্বতী’র রূপালাভ করিতে পারে। অপ্রাকৃত গোড়ের প্রতিটি অণু-পরিমাণতেই পূর্ণত্ব বিद्यমান। যে-স্থানের প্রতিটি অণু-পরিমাণতেই পূর্ণত্বের বিকাশ, গৌড়ীয়-বিজ্ঞান তাহারই সন্ধান দেন ; ঐ রাজ্যে দিগ্ভ্রান্তি নাই।

“গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-বিগ্রহ”ই “গৌড়ীয়-সরস্বতী”-প্রের্ত

আমরা ‘শ্রীগৌড়ীয়-সরস্বতী’-প্রের্ত, গৌড়ীয়-বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ চিদ-বিজ্ঞানী ‘গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-বিগ্রহ’ের ক্রিয়ামুদ্রা কিদৃশী বৈশিষ্ট্যময়ী ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিব। তৎপূর্বে গৌড়ীয়ের চিত্তবিনোদক “জড়বিদ্যা যত মায়াব বৈভব” বাক্যটি পুনঃপুনঃ হৃদয়ে নৃত্য করিতে থাকুন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবৃন্দাবনবিহারী ব্রহ্মচারী B. E (Cal)

শ্রীশ্রী গুরুচরণকর্মলৈভ্যোনমো নমঃ

“শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সমীক্ষা”-পুস্তকের

প্রতিবাদ

শ্রীসত্যপদ সাহিত্যাচার্য্য তর্কতীর্থ মহাশয়ের লিখিত “শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব সমীক্ষা” পাঠ করিয়া বিস্মিত ও মগ্ন হইলাম। তিনি উক্ত পুস্তকে শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব খণ্ডনের চেষ্টা করিতে গিয়া, গোড়ীষ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপরও অনেক অশোভন আক্রমণ করিয়াছেন। তজ্জন্তই তর্কতীর্থ মহাশয়ের ঔদ্ধত্যপূর্ণ লেখনীর প্রতিবাদ-স্বরূপ এই প্রবন্ধ লিখিত হইল।

তর্কতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—“যাপরে পীতবর্ণ অবতারবিগ্রহ ছিল। স্বয়ং বলরামই সেই পীতবর্ণ অবতার।” এই উক্তি অসঙ্গত, অযৌক্তিক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শ্রীগর্গ-ঋষি নন্দালায়ে নামকরণ করিতে আসিয়া, প্রথমতঃ শ্রীবলদেবের নামকরণ করিয়াছেন এবং “সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যপি” এই শ্লোক পর্য্যন্তই শ্রীবলদেবের নামকরণ-প্রসঙ্গ। শ্রীবলদেব সম্বন্ধে শ্রীগর্গের যাহা বলিবার অভিপ্রায় ছিল, তাহা তিনি উক্ত শ্লোকেই সম্পূর্ণ করিয়াছেন। শ্রীবলদেবের অঙ্গকান্তির বিষয় তাঁহার নামকরণ-প্রসঙ্গে শ্রীগর্গ কিছুই উল্লেখ করেন নাই। বরং ‘শব্দকল্পদ্রুমে’ বলদেব শব্দের বলরাম অর্থ করিয়া “শঙ্খ-কুন্দেশু সন্নিভং,” “গুহ্যফটিক-সঙ্কাশং” ইত্যাদি রূপে তাঁহার ধ্যান বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত ধ্যানদ্বয়ে শ্রীবলদেবের শ্বেত-বর্ণত্বই সিদ্ধ হয়।

“আসন্ বর্ণাঙ্গয়ো” শ্লোক হইতে শ্রীকৃষ্ণ-নামকরণ-প্রসঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। এই শ্লোকের ‘পীত’ শব্দে শ্রীবলদেবকে বুঝাইতেছে বলিয়া তর্কতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন;—ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। যদি ‘পীত’ শব্দে শ্রীবলদেবের বর্ণকেই বুঝাইবার ইচ্ছা শ্রীগর্গের থাকিত, তবে শ্রীবলদেবের নামকরণ-প্রসঙ্গেই অঙ্গকান্তির কথা তিনি ব্যক্ত করিতেন। আবার যে-শ্লোক-বলে তর্কতীর্থ শ্রীবলদেবের বর্ণ নিরূপণের চেষ্টা করিতেছেন সেই শ্লোকে শ্রীবলদেবের নামগন্ধও নাই। তর্কতীর্থ ‘পীত’ শব্দটিকে বলদেবের উপর আরোপের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই অনুমান সর্ব্বৈব ভ্রান্ত, কারণ শ্রীবলদেবের অঙ্গকান্তি ‘পীত’ নয়—‘শ্বেত’, উহা পরে দেখান হইবে। শাস্ত্রীয় বিচার আলোচনা করিতে গেলে যে বিষয়ে বিচার উত্থাপিত হয়, সেই বিষয়ে নিজ প্রকরণোক্ত বাক্যই বলবান হয়,

ভিন্ন শাস্ত্রের বাক্য তাহাকে দুর্বল করিয়া অত্থা করিতে পারে না ; বরং ভিন্ন শাস্ত্রের বাক্যই তৎপ্রকরণের অনন্যার্থ হইয়া তাহারই অনুগত হয় । তর্কতীর্থ-উদ্ধৃত প্রমাণও ‘পীত’ শব্দের অন্ত্যার্থ হইয়া উক্ত শব্দেরই অনুগত হইবে—ইহা পরে আলোচিত হইবে ।

তর্কতীর্থ মহাশয় যে অপ্রযোজ্য প্রমাণবলে ‘পীত’-শব্দে বলদেবকে স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন তাহার বর্ণবিজ্ঞাস এই—“দ্বাপরে চ যুগে ধর্মো দ্বিভাগোনঃ প্রবর্ততে । বিষ্ণুর্বৈ পীততাং যাতি চতুর্ধা বেদ এব চ ।”—অর্থাৎ দ্বাপরযুগে ধর্মের দুই পাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে এবং বিষ্ণুও পীতবর্ণ প্রাপ্ত হইবেন এবং বেদও চারিভাগে বিভক্ত হইবে । উক্ত প্রসঙ্গটি পঞ্চপাণ্ডবের অন্ততম শ্রীভীম শ্রীহনুমানকে যুগের সংখ্যা এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের আচারাদির সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে শ্রীহনুমান অত্যাশ্রয় যুগের কথা বলিয়া ভাবী দ্বাপর সম্বন্ধে উক্ত শ্লোক বলিয়াছেন । যে দ্বাপরে পঞ্চপাণ্ডব আসেন, সেই দ্বাপরেই শ্রীবলরাম-কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় । অতএব ‘বিষ্ণু পীত্ব প্রাপ্ত হইবেন’—এই বাক্যে ভবিষ্যৎ অর্থবোধ থাকায়, যে দ্বাপরে শ্রীভীম প্রশ্ন করিয়াছেন, সেই দ্বাপরের শ্রীবলরামের পীতবর্ণ বুঝাইতেছে না—ইহা সুস্পষ্টই । ভাবী দ্বাপরে পীতবর্ণ বিষ্ণু আসিবেন, ইহাই বুঝাইতেছে । কোন কোন দ্বাপরে যে পীতবর্ণ বিষ্ণু আসেন, তাহা অস্বীকার্য্য নহে । যদি শ্রীবলদেবের অঙ্গকান্তি পীত বলিয়া স্বীকার করিয়াও লওয়া যায়, তাহা হইলেও তর্কতীর্থের উদ্ধৃত শ্লোক-দ্বারা শ্রীবলদেবকে পাওয়া যাইতেছে না । প্রতি দ্বাপরে শ্রীবলরাম-কৃষ্ণ আবিভূত হন না—ব্রহ্মার একদিনে একবার মাত্র তাহারা আবিভূত হন ।

দ্বিতীয়তঃ—“আসন্ বর্ণাস্তয়ঃ” ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীবলদেবের কথাই আসিতে পারে না । শ্রীগর্গক্ষষি এই শ্লোকে যুগাবতারের কথাই বলিয়াছেন । শ্রীবলদেব যুগাবতার নহেন । সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলির যুগাবতার, যথা—গুরু, বক্র, শ্যাম ও কৃষ্ণ ; প্রত্যেকের নাম-রূপ একই । সত্যাদি যুগক্রমে এই প্রকার যুগাবতার হন । শ্রীবলদেব লীলাবতার মাত্র । শ্রীকৃষ্ণ লীলাবতার হইয়াও যুগাবতার হন । শ্রীগৌর চন্দ্রাবতার হইয়াও যুগাবতার হন ।

সকল দ্বাপরেই শ্রীকৃষ্ণ আসেন না, আবার সকল কলিতেও শ্রীগৌর আসেন না । যে-দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ আবিভূত হন, সেই দ্বাপরের অব্যবহিত কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণই চন্দ্র হইয়া শ্রীগৌররূপে আবিভূত হন । রহস্য এই, স্বয়ংরূপ

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর যে-দ্বাপরে ও যে-কলিতে আসেন সেই সেই যুগের যুগাবতারা-সকলকে আকর্ষণ করিয়া নিজদের অন্তর্ভুক্ত করতঃ তাঁহারা উভয়ে আবিভূত হন বলিয়া, সেই সেই দ্বাপর ও কলির যুগাবতারের নাম পৃথক্ভাবে উল্লিখিত হয় না। “আসন্ বর্ণাঃ” ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের গর্গোক্তি ও উহার ১১শ স্কন্ধের করতাজনোক্ত শ্লোকগুলি দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়।

সত্যদ্রষ্টা ঋষি দুইজন একই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উহা ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র। অতএব ‘পীত’ শব্দে শ্রীবলরামকে স্থাপনের চেষ্টা অশাস্ত্রীয় প্রমাণিত হইল। আবার অন্য কারণেও তর্কতীর্থের উক্তি অশাস্ত্রীয়। “শ্রীবলদেবের অঙ্গকাস্তি পীত”, তর্কতীর্থ মহাশয় উহা কোন্ শাস্ত্রে পাইয়াছেন? শাস্ত্রের কোথায়ও দেখাইতে পারিবেন কি যে, বলদেবের অঙ্গকাস্তি পীত? শ্রীবলদেবের ধ্যানদৃষ্টে এই উক্তি যে ভ্রমাত্মক, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। উক্ত ধ্যানে এইরূপ আছে—“বলদেবং দ্বিবাঙ্কু শঙ্খকুন্ডেন্দু-সন্নিভং” ইত্যাদি। অর্থাৎ বলদেবের দুইবাহু; তিনি শঙ্খ, কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের স্থায় শুভ্রকাস্তিযুক্ত। ভাঃ ১০।৩৮।২৯ শ্লোক “কিশোরৌ শ্যামলশ্বেতৌ” অর্থাৎ দুইজন কিশোর—একজন শ্যামবর্ণ, অপরজন শ্বেতবর্ণ। ভাঃ ১০।৩৮।৩৩ শ্লোক “যথা মরকতঃ শৈলো রৌপ্যশ্চ কনকচিহ্নৌ” অর্থাৎ মরকত-শৈল ও রৌপ্য-শৈল স্বর্ণে ব্যাপ্ত হইলে যদ্রূপ হয়, দুই ভাই-ই অবিকল তদ্রূপ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণকে “সিতকৃষ্ণৌ” অর্থাৎ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ-শব্দে, শ্রীমহাভারতে “গুরুমেকমপরঞ্চাপি কৃষ্ণং” অর্থাৎ একটি গুরুবর্ণ অপরটি কৃষ্ণবর্ণ, এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল প্রমাণে কোথায়ও শ্রীবলদেবের পীতবর্ণ পাওয়া গেলনা। আবার অমরকোষ, শব্দকল্পদ্রুম প্রভৃতি অভিধানেও পীত-শব্দের অর্থ শ্বেত এরূপ নাই। সুতরাং শ্রীবলরাম যে পীতবর্ণ নন—ইহা প্রমাণিত হইল এবং তর্কতীর্থের উক্তি যে সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয়, তাহা সূধীগণের বিচার করিতে কোন কষ্ট হইবে না।

আবার শ্রীগর্গাঋষি ‘আসন্ বর্ণাস্তয়’ শ্লোকে ‘অনুযুগং’ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ‘অনুযুগ’ শব্দের অর্থ প্রতিযুগ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—চারিযুগেই শ্রীকৃষ্ণ তনুগ্রহণ করেন পাওয়া গেল, “গৃহতঃ অনুযুগং তনুঃ”। আবার সত্যযুগে গুরু, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে কৃষ্ণ—এই শ্লোকে এবং ১১স্কন্ধ শ্লোকে উহা স্পষ্টই আছে। এখন বাকী রহিল কলিযুগ ও পীতাবতার। সুতরাং পারিশেষ্য স্থানে কলিযুগেই পীতবর্ণ অবতার হইবেন। যদি দ্বাপরের

অবতার শ্রীবলদেব হন ও ‘পীত’ শব্দে শ্রীবলরামকে লক্ষ্য করিলে, ‘অনুযুগং’ শব্দের তাৎপর্য রক্ষিত হয় কি? সুতরাং এই যুক্তিতেও শ্রীবলরাম পীতবর্ণ হইতে পারেন না। অতএব ‘পীত’ শব্দে উপর তর্কতীর্থ মহাশয় যে শঙ্কাপঙ্ক লেপন করিয়াছেন, তাহা প্রক্ষালিত হওয়ায়—‘পীত’ শব্দে আমাদের শ্রীগৌর তাঁহার নিজ ঔজ্জ্বল্যেই শ্রীভাগবতে বিরাজমান রহিলেন।

এখন ‘বিষ্ণুর্বে পীততাং যাতি’ ইত্যাদি শ্লোকের সঙ্গতি কি করিয়া রক্ষা করা যায়, তাহা দেখান হইতেছে। এই জাতীয় শ্লোক আরও অনেক আছে। যথা—‘কৃতে শ্বেতং হরিং বিন্ধ্যাজ্জেতায়াং রক্তমেব চ। দ্বাপরে গৌরবর্ণস্ত নীলবর্ণং কলৌযুগে’ ॥ (শ্রীস্কন্দপুরাণীয় গীতাসার বচন) আবার ‘দ্বাপরে চ তথা গৌরো নীলবর্ণঃ কলৌযুগে’ (শ্রীমদ্বৈতরগীতাসার-বচন)। এই তিনটি বচনে যে, গৌরবর্ণ অবতার দ্বাপরে পাওয়া যাইতেছে, তাহা শ্বেতবরাহ-কল্লীয় বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুষ্টয়ী দ্বাপরাবতারাতিরিক্ত পর বুঝিতে হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব

অপ্রাকৃত শুদ্ধভক্তির প্রচারের জন্ত যে মহাপুরুষ বঙ্গজীবের হৃদয়-গুণ্ডিচা-শোধনে অর্পিতভার হইয়া শ্রীগৌরানন্দেব কর্তৃক মর্ত্যধামে প্রেরিত হইয়া-ছিলেন, বিগত ১৫ই বামন, ওরা আষাঢ় শনিবার শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-লীলার পূর্বদিবসই তাঁহার তিরোভাবের তিথিতে সমগ্র বিশ্ব পুনরায় অন্ধকার প্রাপ্ত হয়। এইজন্য মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেই তিরোভাব তিথি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে সর্বদা পূজিতা হইয়া “ভক্তিবিনোদ ধারা কখনই রুদ্ধা হইবার নহে”—এই সারথত-বাণী জগৎকে বারংবার জানাইয়া দিয়া অজ্ঞানান্ধকারের আলোকবর্তিকা প্রদর্শন করিতেছেন।

এতদুদ্দেশ্যে উক্তদিবস সন্ধ্যায় শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় গঠে আহূত সজ্জন-সমাকীর্ণ এক মহতী সভায় পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বামন মহারাজ ও শ্রীমৎ উর্দ্ধমহী মহারাজের বক্তৃতান্তে শ্রীল আচার্যদেব এক ভাষণে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের চরণকমলের সেবাতেই হৃদয়ের আবর্জনা মুক্ত হইবে, বুঝাইয়া দেন। এই ভাষণ পাঠকবর্গের জন্ত শ্রীপত্রিকায় আমরা পরবর্তী সংখ্যায় মুদ্রিত করিব। সমিতির মূল কেন্দ্র এবং অন্যান্য শাখামঠসমূহেও এই উৎসব যথাবিহিত গালিত হন। চুঁচুড়ামঠে সভান্তে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রসাদ উপস্থিত জনগণকে প্রদান করা হয়। —নিজস্ব সংবাদ

শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও বার্ষিক মহামহোৎসব

নরজন্মে সতো নবাগতকে নিস্পন্দবাক্ করিয়া গণনাভীত উৎকল-
চিত্তামণি হইতে বঞ্চনামানসে অবর-চিত্তারত মায়াপুষ্ট জনগণের পশ্চিম-
দিগন্তে অন্তায়মান রবিকিরণের স্বর্ণ-সদৃশী প্রলোভনময়ী নির্বিশেষ-ভূমির
সার্বভৌমত্বের বিলোপসাধনে কৃতদারুবিগ্রহ পরম-করুণাময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ-
দেবের রথযাত্রা-মহোৎসব অখিল সুখাকর সচ্চিদানন্দবস্তুর অন্তর্দান-মূহূর্ত্ত
হইতেই শ্রীউদ্ধারণ গোড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবের মাধ্যমে বিগত
১৫ বামন ৪৮০ গৌরাদ, ৩রা আষাঢ় ১৩৭৩, ইং ১৮ই জুন ১৯৬৬ শনিবার
আরম্ভ হইয়া ছুইদলন রুদ্রের প্রতীক-দিবসে পাঞ্চজন্তে মহাজয়ধ্বনি
দিয়াছেন। অবর রাজ্যের অধিগতসর্বার্থ বণিককুলের প্রাকৃত হেমাদি-
খচিত গগনচুম্বী প্রাসাদের মধ্য দিয়া “বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকম্
ন গচ্ছামি”—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের এই উক্তির সার্থকতা সম্পাদনে দিব্য
রত্নাগারে ‘দীব্যং বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুম’-এর অপ্রাকৃত পুষ্পবল্লী-সুশোভিত
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রেমগযান-রথোপবেশনে শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ী গমনলীলায় প্রাকৃত
কামগযানারোহীর দৃষ্টিকেও স্বীয় কক্ষে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সেইকালে
এতজ্জন্তু প্রাকৃত বিধে বিচরণকারী অসংখ্য ব্যক্তির গতি মন্থর করিতে
রাজপ্রেরিত নগররক্ষিগণের প্রবল প্রচেষ্টাও কোনক্রমেই সেই লোকসমুদ্রকে
রথমধ্যে অপ্রাকৃত পুষ্পের ক্ষৌদ্র-আহরণে ব্যর্থ করিতে পারে নাই। নিত্যারাধ্য
সবৃন্দাবনধাম ব্রজেশতনয়ের অহৈতুকী সেবক ত্রিদিগ্ভিপাদবৃন্দের রাক্ষাস্ত-
ভাণ্ডারের উর্দ্ধগতির বিক্রমে সেদিন লক্ষ্মীর সেবকবৃন্দের গতির বামন-রূপও
কেহ কেহ রথমধ্যে দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু রথযানের বৃন্দাবনগতিকে
কেহই রোধ করিতে পারেন নাই। ভাব-বিগলিত মুনিবৃন্দের ধৈর্য্যাহর
বৃন্দাবন-ধামের অদ্ভুত প্রকাশের পূর্ণাভাষে উষালোকের স্থায় প্রকাম-
পূরিতহৃদয়-গুণ্ডিচা-শোধনে উক্ত একাদশ দিবস শ্রীমঠে বহু হরিজনকেই
শ্রীশ্রীবদ্রীনारायणदेवও প্রেরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বৃন্দাবনে মাত্র দিবসত্রয়স্থিতিতে সন্দিগ্ধ হইয়া পঞ্চমদিবসে
লক্ষ্মীর অনুচরবৃন্দ গুণ্ডিচা-গৃহে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যপর নিম্নতর

রসের সেবকবৃন্দের সর্বদাই অপ্রাকৃত জগতের উচ্চতর মাধুর্য্যময় প্রকোষ্ঠে প্রবেশাধিকার ছিল—এই স্বতঃপ্রমায় অবোধ তাঁহাদের উক্ত উত্তম সফল না হইলেও তাঁদৃশ সেবক শ্রীবাস পণ্ডিতের কলহ-নিরসনে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামাভিন্ন শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে নিত্যা-বস্থিতিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ব্রজবিলাসের মহিমাই অপ্রাকৃত বিশ্বে ঘোষিত হইয়াছিল।

প্রাকৃত-দর্শনে গোধূমের প্রাচুর্য্য তগুল-বিরলতার বিশেষরূপে অপ্রাকৃত গোলোক, বৃন্দাবনের ভৌম প্রতিকৃতির শোভা বর্দ্ধন করে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বৃন্দাবন বিহার লীলাকালীন শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে উক্ত দর্শন উৎসব চাতককুলকে কৃপা করিয়াছেন। আবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উৎকল ক্ষেত্রে তগুলের খ্যাতি আছে। বাৎসল্য-রস-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগোপালদেব উৎকল-ক্ষেত্রে সাক্ষ্য দিতে আগমন করিয়া জগন্নাথদেবের ভোগদ্রব্য পূর্ক্যাহ্নেই গ্রহণ করিয়া ফেলিতেন। একারণ তগুল ও গোধূম উভয়ই সমভাবে এই মহামহোৎসবে আত্মপ্রকাশ করে।

বারংবার লক্ষ্মীর গণকে হতাশ না করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব গুণ্ডিচা-গৃহে যাত্রার নবমদিবসে সাথকুলের প্রাকৃত অর্থের সার্থকতাসাধনপূর্ব্বক বিবিধ দুর্লভ ভোগসম্ভার গ্রহণে নগর ভ্রমণ করিতে করিতে পূর্ব্বস্থানে পুনরাগমন-লীলা প্রদর্শন করেন। পুনরায় শ্রীজগন্নাথদেবকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রজগোপীগণের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্মারক-স্বরূপ ঐদিবস রাত্রে লক্ষ্মীর গণের আয়োজিত মহা-মহোৎসবের প্রসাদ শত শত সজ্জনকে নিতা বৈকুণ্ঠ-বিমানের যাত্রীহিসাবে কৃপা করিয়া বিশ্বের ব্রজবধুবর্গের কোনও রম্যা উপাসনার পরতমত্ব স্থাপন করেন।

—শ্রীমুদর্শন ব্রজচারী, ব্যাকরণতীর্থ

পরলোকগত পবিত্রকুমার দত্ত মহাশয়ের সাত্ত-শ্রাদ্ধ

বিশেষ দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে চুঁচুড়া-নিবাসী সমিতির একজন বিশিষ্ট হিতৈষী শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার দত্ত মহাশয় গত ১৪ই মাঘ ১৩৭২, ইং ২৮।১।৬৬ নিজ বাটীতে ৮২ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী স্নাতক (B.A.)। পূর্ব্বজীবনে

তিনি স্বাধীনতা-সংগ্রামে সম্মতবাদী দলের একজন সদস্য ছিলেন এবং বহুবার কারাবরণও করিয়াছেন। কিন্তু ধর্মব্যতীত কোন কর্মেরই মূল্য থাকে না, এই আদর্শ তাঁহার জীবনে প্রকাশ পাইয়াছে। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অদ্ভুত পাণ্ডিত্য এবং ধর্মবিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের অধিষ্ঠান অসমদীয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতি তিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশিষ্ট ছিলেন। তাঁহার ধর্মশীলা পত্নী ও এক শ্যালিকা শ্রীল পরমারাধ্যতম-দেবের নিকট দীক্ষা ও শ্রীহরিনামশ্রিতা। চুঁচুড়া মঠ প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ হইতে তাঁহার স্ত্রী ও শ্যালিকা তত্ত্ব শ্রীবিগ্রহগণের জন্ত স্বহস্তে পুষ্পদ্বারা সুন্দর চূড়া, নিরুপম অলঙ্কার ও মালিকা প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া দেন। পবিত্রবাবু প্রায়ই শ্রীমঠে আসিয়া শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ করিতেন এবং শেষের বৎসর তিনি প্রত্যহ নিয়মিত দুইবেলা পাঠকীর্তনে এবং শ্রীতুলসী পরিক্রমায় যোগদান করিতেন।

পবিত্র বাবুর আত্মার কল্যাণ-কামনায় তদীয় কুটুম্ববর্গ স্মার্ত্ত-শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত শ্রাদ্ধে আত্মার বরং অবনতি এবং অবমাননা হইয়া থাকে জানিয়া তাঁহার ধর্মশীলা পত্নী উক্ত স্মার্ত্তশ্রাদ্ধে যোগদান না করিয়া দৃঢ়তার পরিচয় দেন এবং শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শরণাপন্ন হন। অতঃপর গত ২৮ শে বামন, ৪৮০ গৌরাদ্ধে বহু ব্রহ্মদণ্ডী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্তু-সহ শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে বিগুহ সাত্ত্বত-স্মৃতি ‘শ্রীহরিভক্তিবিলাস’ ও ‘শ্রীসংক্রিয়াসার-দীপিকা’ অনুসারে তাঁহার বাটীতেই পবিত্র বাবুর সাত্ত্বত-শ্রাদ্ধ বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন হয়। এই শ্রাদ্ধেও পরলোকগত পবিত্র বাবুর আত্মীয়বর্গ যোগদান করত সাত্ত্বত-স্মৃতির ক্রিয়াকলাপ-দর্শনে অতীব বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হন, এমনকি তাঁহাদের মৃত আত্মীয়বর্গেরও এই সাত্ত্বতবিধানে পুনরায় শ্রাদ্ধ করিবার বাসনা শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট প্রকাশ করেন। শ্রাদ্ধোৎসব শ্রীমঠেই সম্পন্ন হয়। দুই শতেরও অধিক ব্যক্তি এই উৎসবে প্রসাদ পান।

আজীবন নিরামিষভোজী পবিত্র বাবুর পবিত্র আত্মার উদ্ধলোকেই অবস্থিতি হইবে বলিয়া সর্বসাধারণের বিশ্বাস হইয়াছে।

— নিজস্ব সংবাদ

শ্রী ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ

জেঃ নদীয়া (পঃ বঃ)

৩১শে আষাঢ়, ১৩৭৩; ইং ১৬।৭।৬৬

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি এই বৎসরও শ্রীমথুরাধামস্থ শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রী ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিরাট আয়োজন করিয়াছেন। তজ্জন্ত আগামী ১০ই আশ্বিন, ইং ২৭।৯।৬৬, মঙ্গলবার হাওড়া ষ্টেশনের ৮নং প্লাটফর্ম হইতে সকাল ৮। টায় যাত্রা করা হইবে। পথিমধ্যে প্রয়াগ, কাশী, গয়া প্রভৃতি দর্শন করিবারও ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা ধর্মপ্রাণ সকলকে নিম্নে প্রদত্ত নিয়মানুযায়ী যোগদান করিয়া এই মহান সুযোগ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করি।

ইতি—

নিবেদক—সম্ভ্যবন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

নিয়মাবলী :—

- ১। প্রত্যেক যাত্রীকে দুইবেলা প্রসাদ, হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রারাত ট্রেনভাড়া ও কুলিভাড়া প্রভৃতি খরচের জন্ত ২৭৫/- টাকা ভিক্ষাস্বরূপ দিতে হইবে।
- ২। মোটর বাসে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করা হইবে, তজ্জন্ত পৃথক ব্যয় লাগিবে না।
- ৩। যাত্রীগণ সংক্ষেপে শীতোপযোগী বিছানা, চাদর ও জামা সঙ্গে আনিবেন। সঙ্গে হাক্কা থালা, বাটি ও ঘটি লইবেন।
- ৪। যাত্রীগণ ২০শে ভাদ্রের মধ্যে অগ্রিম ১০০/- টাকা নিম্নোক্ত ঠিকানায় জমা দিয়া নাম তালিকাভুক্ত করিবেন।
- ৫। অগ্রিম ১০০/- টাকা দেওয়া বাদে অবশিষ্ট ১৭৫/- টাকা যাত্রা সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে।
- ৬। টাকা পাঠাইবার ও পত্রব্যবহারের ঠিকানা :—
পরমহংসস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ,
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, পোষ্ট নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঃ)।
- ৭। আশ্বিনের শেষ সপ্তাহে হাওড়ায় প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা।

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য কারণে নিয়ম-পদ্ধতির পরিবর্তনাদি স্বীকার্য।

শ্রী শ্রী চক্রেগোবিন্দে জয়তঃ



১৮শ বর্ষ }

শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৭৩

{ ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা



প্রকাশক—শ্রী শ্রীমদ ভক্তিবিনোদ ঝাংগল

মাসপত্র—ত্রিদিবিশ্রামী শ্রী শ্রীমদ ভক্তিবিনোদ ঝাংগল মহারাজ

কাগ্যালয়—শ্রী দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (মদীয়া)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।

ধর্মঃ স্বস্থিতিঃ পুংসাং বিধকুসেন-কথাহ যঃ ॥



গৌড়ীয়-পট্টিকা

নোংপাদয়েদেবদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়াদ্ভা স্প্রসীদতি ॥

সেই বর্ষ শ্রেষ্ঠ যাতে আশ্ব-পরসম ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥

অত ধর্ম স্মৃতিরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১৮শ বর্ষ { প্রহায়, ২৯ পুরুষোত্তম, ৪৮০ গৌরাক্ষ } ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মঙ্গলবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৩৭৩; ইং ১৬৮১-১৯৬৬

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়-স্কন্ধে প্রথমেহধ্যায়ঃ
পরাক্ষিৎ-নৃপস্য প্রশ্নে তু কদেবেন
মানবানাম্ কর্তব্য-নির্ণয়ঃ
শ্রীরাজোবাচ ।

যথা সন্ধার্যতে ব্রহ্মন্ ধারণা যত্র সম্মতা ।

যাদৃশী বা হরেদাণ্ড পুরুষস্য মনোমলম্ ॥ ২১ ॥

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রহ্মন্, ধারণা যে বিধানের দ্বারা সম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে এবং যাহাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যাদৃশী হইলে পুরুষের মনোমল অতি শীঘ্র শীঘ্র অপনোদিত হইতে পারে, সেই সকল বিষয় আমাকে বলুন ॥ ২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

জিতাসনো জিতশ্বাসো জিতসঙ্কো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

স্থূলে ভগবতো রূপে মনঃ সন্ধারয়েদ্ধিয়া ॥ ২৩ ॥

আসন্ন নিয়মাদি দ্বারা জিতাসন, প্রাণায়াম দ্বারা জিতশ্বাস, জিতেন্দ্রিয় ও সঙ্গরহিত হইয়া প্রথমে বুদ্ধিযোগে ভগবানের স্থলরূপে মনকে ধারণা করিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

বিশেষস্তস্য দেহোহয়ং স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীৰ্য্যসাম্ ।

যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ সৎ ॥২৪॥

ভগবানের বিরাট্ দেহ অতি স্থল হইতেও স্থলতর। ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান কার্য্য মাত্র এই সমগ্র বিশ্ব তাহাতেই প্রকাশিত হইতেছে ॥২৪॥

অণুকোষে শরীরেহস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে ।

বৈরাজঃ পুরুষো যোহসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ ॥২৫॥

এই পঞ্চাশৎকোটি যোজনপ্রমাণ ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট্ দেহ পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার ও মহত্ত্ব এই সপ্ত আবরণে আবৃত। ইহার মধ্যবর্তী জীবনিস্তা ভগবান্ বিরাট্ পুরুষই ধারণার আশ্রয়-স্বরূপ ॥ ২৫ ॥

পাতালমেতস্য হি পাদমূলং

পঠন্তি পার্শ্বপ্রপদে রসাতলম্ ।

মহাতলং বিশ্বম্ভ্রোহথ গুল্ফো

তলাতলং বৈ পুরুষস্য জজ্জ্যে ॥ ২৬ ॥

পাতাল সেই বিরাট্ পুরুষের পাদমূল। রসাতল তাঁহার পদের অগ্র ও পশ্চাত্তাগ, মহাতল তাঁহার পদব্দের গুল্ফপ্রদেশ এবং তলাতল তাঁহার জজ্জ্যদ্বয় ॥ ২৬ ॥

দ্বৈ জানুনী স্মুতলং বিশ্বমূর্ত্তে-

রুরুদ্বয়ং বিতলঞ্চাতলঞ্চ ।

মহীতলং তজ্জঘনং মহীপতে

নভস্তলং নাভিসরো গৃণন্তি ॥ ২৭ ॥

স্মুতল সেই বিশ্বমূর্ত্তি বিরাট্ পুরুষের দুইটী জানু এবং বিতল ও অতল তাঁহার উরুদ্বয়, মহীতল তাঁহার জঘন দেশ, নভস্তল বা ভুবলৌকিক তাঁহার নাভি সরোবর ॥ ২৭ ॥

উরঃস্থলং জ্যোতিরনীকমস্য

গ্রীবা মহর্বদনং বৈ জনোহস্য ।

তপো ররাটীং বিছুরাদিপুংসঃ

সত্যন্ত শীর্ষাণি সহস্রশীর্ষঃ ॥ ২৮ ॥

স্বর্গলোক তাঁহার বক্ষঃস্থল, মহর্লোক তাঁহার গ্রীবাপ্রদেশ, জনলোক তাঁহার বদন, তপোলোক তাঁহার ললাট এবং সত্যলোক সেই সহস্রশীর্ষ বিরাট্ পুরুষের শিরোদেশ বলিয়া অভিজ্ঞাত ॥ ২৮ ॥

ইন্দ্রাদয়ো বাহব আল্লরুশ্রাঃ

কর্ণৌ দিশঃ শ্রোত্রমমুঘা শব্দঃ ।

নাসত্যদশ্রৌ পরমশ্চ নাসে

আণোহশ্চ গন্ধো মুখমগ্নিরিদ্ধঃ ॥ ২৯ ॥

(তেজোময় শরীরহেতু) ইন্দ্রাদি দেবগণ বিরাট্ পুরুষের বাহু, দিক্ সকল তাঁহার কর্ণ, শব্দ তাঁহার কর্ণপুট, অশ্বিনীকুমারদ্বয় সেই পরম-পুরুষের দুইটি নাসারন্ধ্র, দীপ্ত অনল তাঁহার মুখ ॥ ২৯ ॥

দ্যৌরক্ষিণী চক্ষুরভূং পতঙ্গঃ

পক্ষ্মাণি বিষ্ণোরহনী উভে চ ।

তদ্রূপবিজৃম্বঃ পরমেষ্ঠিধিক্ষ্য-

মাপোহশ্চ তালু রস এব জিহ্বা ॥ ৩০ ॥

আকাশ তাঁহার নেত্রগোলক, আকাশস্থিত সূর্য্য তাঁহার নেত্র, রাত্রি ও দিবস উভয়ে তাঁহার চক্ষুর পক্ষ্ম, ব্রহ্মপদ তাঁহার ক্রতঙ্গ, জল তাঁহার তালুর অধিষ্ঠান এবং রস তাঁহার জিহ্বা ॥ ৩০ ॥

ছন্দাংশুনন্তশ্চ শিরো গুণন্তি

দংষ্ট্রা যমঃ স্নেহকলা দ্বিজানি ।

হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া

হ্রস্বনর্গো যদপাঙ্গমোক্ষঃ ॥ ৩১ ॥

বেদ সমূহ সেই অনন্ত বিরাট্ পুরুষের ব্রহ্মরন্ধ্র, যম তাঁহার দন্তপঙ্ক্তি, পুত্রাদি স্নেহলেশ তাঁহার দন্ত, লোকসমূহের উন্মাদকরী মায়া তাঁহার হাস্য, অপার সংসার তাঁহার কটাক্ষপাত ॥ ৩১ ॥

ব্রীড়োত্তরৌষ্ঠোহধর এব লোভো

ধর্ম্মঃ স্তনোহধর্ম্মপথোহশ্চ পৃষ্ঠম্ ।

কন্তশ্চ মেঢ়ং বৃষণৌ চ মিত্রৌ

কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োহস্থিসজ্ঘাঃ ॥ ৩২ ॥

লজ্জা তাঁহার উত্তর ওষ্ঠ, লোভ তাঁহার অধর, ধর্ম তাঁহার স্তন,
অধর্মপথ তাঁহার পৃষ্ঠভাগ, প্রজাপতি তাঁহার শিশু, মিত্রাবরুণ তাঁহার অণু-
কোষদ্বয়, সমুদ্র সকল তাঁহার কুক্ষি এবং পর্বতসমূহ তাঁহার অস্থিরাক্তি ॥ ৩২ ॥

নত্বোহস্থ নাভ্যোহথ তনুরুহানি

মহীরুহা বিশ্বতনোন্মপৈন্দ্র ।

অনন্তবীৰ্য্যঃ শ্বসিতং মাতরিশ্বা

গতির্বয়ঃ কৰ্ম্ম গুণপ্রবাহঃ ॥ ৩৩ ॥

হে রাজশ্রেষ্ঠ, নদী সকল সেই বিপতনু বিরাট্ পুরুষের নাড়ী, বৃক্ষ
সকল তাঁহার লোম, অনন্তবিক্রম বায়ু তাঁহার নিঃশ্বাস, কাল তাঁহার
গমন এবং প্রাণীসমূহের সংসার তাঁহার ক্রীড়া ॥ ৩৩ ॥

ঈশস্য কেশান্ বিছুরম্বাহান্

বাসন্ত সন্ধ্যাং কুরুবৰ্য্য ভূয়ঃ ।

অব্যক্তমাল্লহৃদয়ং মনশ্চ

স চন্দ্রমাঃ সর্ববিকারকোষঃ ॥ ৩৪ ॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, মেঘসমূহ সেই বিরাট্ পুরুষের কেশদাম, সন্ধ্যা
তাঁহার বসন, অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান তাঁহার হৃদয় এবং প্রসিক্ত চন্দ্রমা
সকল বিকারের আশ্রয়-স্বরূপ মন বলিয়া কথিত ॥ ৩৪ ॥

বিজ্ঞানশক্তিং মহিমামনান্তি

সর্বাত্মনোহন্তঃকরণং গিরিত্রম্ ।

অশ্বাশ্বতযুঁষ্ট্রগজা নথানি

সর্বৈব যুগাঃ পশবঃ শ্রোণিদেশে ॥ ৩৫ ॥

অভিজগণ বিজ্ঞানশক্তি চিত্তকেই তাঁহার মহত্ত্ব বলেন ; শ্রীরুদ্র সেই
সর্বাত্মার অহঙ্কার, অশ্ব, খচ্চর, উষ্ট্র, হস্তী প্রভৃতি তাঁহার নথ, সমস্ত
যুগ পশু তাঁহার নিতম্ব ॥ ৩৫ ॥

বয়াংসি তদ্ব্যাকরণং বিচিত্রং

মনুর্মনীষা মনুজো নিবাসঃ ।

গন্ধর্ববিত্যাধরচারণাস্রঃ-

স্বরস্মৃতীরসুরানীকবীৰ্য্যঃ ॥ ৩৬ ॥

পক্ষিসকল তাঁহার বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্য, (যাহার দ্বারা হংসসমূহের গুরু
বর্ণ, গুরুপক্ষিগণের হরিদ্বর্ণ, এবং ময়ূরনিকরের বিচিত্র বর্ণ বিধান হইয়াছে) ।

স্বায়ত্ত্ব মনু তাঁহার বিচারবতী বুদ্ধি। পুরুষ তাঁহার আশ্রয় স্থান, গন্ধৰ্ব্ব, বিদ্যধর, চারণ, অঙ্গরাগণ তাঁহার ষড়জাদি স্বরস্বতি, অহুরনিকর তাঁহার বীর্য্য ॥ ৩৬ ॥

ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভূজো মহাত্মা
বিভূরুরজিষ্ম শ্রিতকৃষ্ণবর্ণঃ ।
নানাভিধাতীজ্যগণোপপন্নো
দ্রব্যাত্মকঃ কৰ্ম্ম বিতানযোগঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্রাহ্মণ তাঁহার বদন, ক্ষত্রিয় তাঁহার ভুজদ্বয়, বৈশ্য তাঁহার উরুযুগল কৃষ্ণবর্ণ শূদ্র তাঁহার পদাশ্রিত। তিনি বহুরুদ্রাদি বিবিধ নামধারী দেববৃন্দ-যুক্ত এবং হবিঃসাধ্য যজ্ঞপ্রয়োগ তাঁহার অভিপ্রেত কৰ্ম্ম ॥ ৩৭ ॥

ইয়ানসাবীশ্বরবিগ্রহস্য
যঃ সন্নিবেশঃ কথিতো ময়া তে ।
সন্ধার্য্যতেহস্মিন্ বপুষি স্থবিষ্ঠে
মনঃ স্ববুদ্ধ্যা ন যতোহস্তি কিঞ্চিৎ ॥ ৩৮ ॥

হে মহারাজ, এই বিরাট বিগ্রহের যে সকল অবয়ব সংস্থান আপনার নিকট আমি বর্ণন করিলাম যোগিগণ স্ব-স্ব বুদ্ধিযোগে ভগবানের উক্ত স্থূল শরীরে মন ধারণা করিয়া থাকেন। এই কারণ এতদ্ব্যতীত অত্ন কিছু নাই ॥ ৩৮ ॥

স সৰ্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূতসৰ্ব্ব
আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ ।

তং সত্যমানন্দনিধিঃ ভজেত
নান্যত্র সজ্জেদ্ যত আত্মপাতঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে মহাপুরুষ-সংস্থানুবর্ণনং নাম প্রথমোধ্যায়ঃ ।

স্বপ্নকালে যেক্রপ পাত্রমিত্রসৈন্যাদি জনসমূহের অনুভবকারী জীব নিজস্বষ্ট এবং উপলক্ষিত রাজ্যাদি ভোগসমূহ উপলব্ধি করেন তক্রপ সেই যোগী সৰ্ব্ববুদ্ধিবৃত্তিধারা পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব বহু জন্মে দেবেন্দ্রত্ব, নরেন্দ্রত্ব প্রভৃতি ভোগৈশ্বর্য্যপ্রভাবসকল অনুভব করেন। সুতরাং সেই সত্য আনন্দ-নিধি বিরাটঅস্তুর্যামী শ্রীনারায়ণকে ভজন করিবে। অত্নবুদ্ধি করিয়া স্থূল বিরাটের অত্ন ধারণায় আসক্ত হইবে না, যেহেতু তাহাতে সংসারে প্রবৃত্তি ঘটবে ॥ ৩৯ ॥

স্মার্তের কাণ্ড

ভক্তিয়োগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং ।
যয়া সন্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং
পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিয়োগমধোক্ষজে ॥

ভুবনমঞ্জলাবতার শ্রীব্যাসদেব মহাভারতাদি বহুশাস্ত্র-প্রণয়নে এবং বিবিধ উপায়ে নিজ চেষ্টায় যখন চিত্তে প্রসন্নতা অর্থাৎ শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না, তখন গুরু শ্রীনারদের উপদেশানুসারে ভক্তিয়োগ অবলম্বনে সমাধিস্থ হইয়া স্বরূপশক্তি-সমন্বিত পূর্ণ পুরুষকে দর্শন করিলেন এবং তদুদ্ভিন্ন আরও দুইটি শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিলেন,—একটি জীব বা তটস্থা শক্তি, অপরটি বহিরঙ্গ বা মায়া শক্তি । এই অপর মায়াশক্তি সেই পূর্ণ পুরুষের পরাগ-ভাবে নিত্য আশ্রিত হইয়া অবস্থিতা ; আর, তটস্থ জীব স্বরূপতঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণাতীত শুদ্ধ অণুচেতনময়ী পরাশক্তি হইয়াও স্বীয় দুর্লব-ক্রমে অর্থাৎ স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যশক্তির অপব্যবহারক্রমে মায়ার ভোক্তা হওয়ায় তৎকর্তৃক সন্মোহিত হইয়া আপনাকে সত্ত্ব-রজস্তমোগুণাত্মক জড়-সম্বন্ধি মনে করিয়া অনর্থগ্রস্ত হইতেছে । এই প্রকার জীব ‘বদ্ধ’-নামে অভিহিত । অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাদ্ভক্তিয়োগ-প্রভাবেই জীবের এই অনর্থ নিবৃত্ত হয় ।

এই বদ্ধজীব ব্যতীত অপর এক প্রকার জীব আছেন । তাঁহার স্বীয় স্বাতন্ত্র্যশক্তির সদ্যবহারহেতু নিজ নিজ স্বভাবে অর্থাৎ স্বরূপবৃত্তিতে অবস্থান-পূর্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবায় তৎপর হইয়া শুদ্ধ পূর্ণ নিত্যানন্দসাগরে মগ্ন আছেন । তাঁহার ‘নিত্যমুক্ত’ নামে অভিহিত । পূর্বোক্ত নিতান্ত ভাগ্যহীন জীবগণ, অনাদি কাল হইতে সেব্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবা পরিত্যাগ করিয়া—তাঁহাকে আনন্দ-সুখ না দিয়া, আপনাদিগকে একমাত্র অধোক্ষজ কৃষ্ণদাস জানিবার পরিবর্তে ঐ কুহকিনী মায়ার মোহকরী ছলনায় ভুলিয়া নিতান্ত তুচ্ছ অক্ষজ-জ্ঞানকে সম্বল করতঃ অহঙ্কার-বিমূঢ় অর্থাৎ আপনাদিগকে ‘অচিৎ’, ‘জড়’ বলিয়া অভিমান করিতেছে । ফলে, এই ভগবৎসেবাবিমুখ ভোগময় ‘সংসারে আসিয়া প্রকৃতি ভজিয়া পুরুষাভিমান’ে ত্রিতাপজালায় জলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে । এই বিরূপাভিমानी অর্থাৎ অনাত্ম দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধিকারী,

অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণ-সেবাহীন জড়ভোক্তা জীবগণই ‘প্রকৃতিজন’, ‘স্মার্ত্ত’ বা ‘কর্ম্মী’ নামে অভিহিত। ইহারা কৃষ্ণকে অর্থাৎ কৃষ্ণ-স্বরূপ, স্ব-স্বরূপ এবং ভক্তি-স্বরূপ বিস্মৃত হইলেও পরমকারুণিক কৃষ্ণ ইহাদিগকে ভুলেন না। তাঁহার দাসী এই সংসার-দুর্গাধিষ্ঠাত্রী মহামায়া স্বীয় প্রভুর বিদ্রোহী এই সকল জীবকে ত্রিতাপানলে দগ্ধ করাইয়া পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করিতে থাকেন।

দুঃখের সেই ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায় ভবদাবদগ্ধ জীবের বুদ্ধি ক্রমশঃ আতিযুক্ত হইলে সে নিরতিশয় নির্বেদগন্ত হইয়া অতি আর্তস্বরে “তাহি মাং মধুসূদন” বলিয়া আকুল ক্রন্দন করিতে করিতে একটু শান্তিলাভের আশায় স্মৃথ পাইবার উদ্দেশে যদি অজ্ঞানক্রমেও হঠাৎ পরম সত্য বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবা করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তৎকালে তাহার স্মৃতির উদয় হয়। এইরূপ বহু স্মৃতিবশে কোন কোন সৌভাগ্যবান্ জীব একমাত্র সাধু, শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সন্ধান পাঠিয়া তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন করিলে পর তাঁহার নিঃশূল-সঙ্গপ্রভাবে ক্রমশঃ বিধৃতকল্মষ হইয়া অনর্থ-নিবৃত্তিক্রমে শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভজনের অধিকার লাভ করে। এইস্থলে আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত, বদ্ধজীব স্বীয় ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগে মগ্ন থাকিয়া অক্ষজ-জ্ঞানের মাপকাঠিতে হরি-গুরু-বৈষ্ণব চিনিতে পারে না বা সন্ধান লাভ করে না; কেন না হরি গুরু-বৈষ্ণব নিত্য, প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠ; তাঁহারা জড়-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ বা গোচরীভূত নহেন। এইরূপ মাপিতে বা চিনিতে যাওয়ার নাম অর্থাৎ অচিন্ত্য বস্তুকে তর্কের গোচরীভূত করিবার চেষ্টাকেই ‘আরোহ’ বা ‘অধিরোহ’-বাদ বলে। বাস্তবিক পক্ষে, আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন করিলেই অর্থাৎ একান্তভাবে শরণাগত হইলেই সেই প্রপঞ্চাতীত অদ্বয়জ্ঞান বস্তু বদ্ধজীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া প্রপঞ্চে প্রকটিত বা আবির্ভূত হন। এই যে নিত্য সেবকের শরণাগত-প্রযুক্ত নিত্য সেব্যের কৃপা-আবির্ভাব—ইহার নাম ‘অবতার’-বাদ বা ‘আরোহ’-বাদ।

এই প্রকার বদ্ধজীবকে স্বীয় নিত্য অতুল প্রেমসুখসাগরে ভাসাইবার জন্য পরম দয়াল কৃষ্ণচন্দ্র কখনও স্বয়ংরূপ অবতারী হইয়া, কখনও অংশাবতার-রূপে, অথবা কখনও প্রিয়তম নিজজনকে প্রপঞ্চে প্রেরণ করিয়া শিক্ষাগুরু মহান্তস্বরূপে অবতীর্ণ হ’ন। শুধু তাহাই নহে, জীবের প্রতি অসীম দয়ার্দ্র হইয়া সাক্ষাৎ অভিন্ন চৈতন্যরসবিগ্রহ সর্বশক্তিমান্ শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ

হইয়া তাঁহার শুদ্ধ নিম্নল প্রেমসেবারত-চিত্তে স্থায়ী রূপ-গুণ-লীলা উদয় করাইয়া কৃতার্থ করেন। অতএব আমরা দেখিতে পাই যে, বদ্ধজীব শরণাগত হইলেই অদ্বয়জ্ঞান অধোক্ষত হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাপ্রভাবে মায়ামুক্ত হইয়া পুনরায় স্বস্থান বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া বৈকুণ্ঠপতির নিত্য সেবা করিতে সমর্থ হয়। যেমন মেঘের জল স্বভাবতঃ নিম্নল হইলেও পৃথিবীস্থ নানা দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া অব্যবহার্য্য হইয়া উঠে এবং নানা দৈহিক রোগের আকর হয়, পরে রসায়ণ-তত্ত্ববিদের দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশুদ্ধ হইলে পুনরায় স্বাভাবিক নিম্নলতা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ সজ্জন শুদ্ধ কৃষ্ণভক্গণ বদ্ধজীবকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করিয়া তাহার নিখিল পাপ-কলুষরাশির সংক্ষয়-সাধনপূর্বক জীবাত্মার স্বাভাবিক শুদ্ধ নিম্নলরূপকে নিত্য কৃষ্ণপ্রেমাস্বাদনে মত্ত করাইয়া কৃত-কৃতার্থ করেন। আর যাহারা সেই অদ্বয়জ্ঞানের কৃপালাভে ব্যাকুল না হইয়া স্থায়ী সংকীর্ণ পরিচ্ছিন্ন বাহ্যজ্ঞানদ্বারা হরি গুরু বৈষ্ণবকে বা তাঁহাদের বৈকুণ্ঠ-চেষ্টাকে বুঝিতে যান, তাহারা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য ফল-ভোগকামী হইয়া কখনও স্বর্গ, কখনও নরক ভ্রমণ করিয়া অনাদি দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে। এতাদৃশ স্মার্ত্তগণের বিকল-বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণ-সেবাবিহীন অসদাচার হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করিব, আর হরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য আন্তরিক আবেদন করিব।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(বিত্তান)

১। উত্তাপের মূল কারণ কি ?

“গন্ধক-লৌহাদি ধাতুর সংযোগের দ্বারা পর্বত-সকল উৎপন্ন হয়, পৃথিবী কম্পিতা হয় এবং বন্দুক হইতে অস্ত্র-সকল নির্গত হইয়া বৃহদ্ বৃহদ্ ব্যাপার সম্পাদন করে। এই সকল কার্য্যে চেতনের প্রেরণা কোথায় ? * * * যদিও উত্তাপকেই সমস্ত সঞ্চালনের কারণ বলিয়া লক্ষ্য হয়, তথাপি চেতনের প্রেরণা-ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না। উত্তাপ কি পদার্থ ? বিশেষ বিচার করিলে উত্তাপকে ‘গুণ’ বলা যায়। যখন অন্তঃকরণে কোন বৃত্তির বিশেষ

সঞ্চালন হয়, তখনই উত্তাপ দেহে প্রকাশ হয়। কামের আধিক্যে জ্বর হইয়া গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, ইহা প্রসিদ্ধ। সমস্ত প্রকার প্রাকৃত-পদার্থে যে উত্তাপের উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল চেতন-পদার্থের ক্রিয়ার ফল বলিলেই হইতে পারে।”

—তঃ সূঃ, ২২ সূঃ

২। যুক্তিই কি জড়-বিজ্ঞানাবিস্কারের মূল নহে? মানব-প্রকৃতি কি ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিয়া তৃপ্ত হয়?

“যুক্তিদ্বারাই সমস্ত মানস ও জড়-বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়। জড়-বিজ্ঞান অনেক প্রকার। যথা—জড়গুণ-বিজ্ঞান (Science of matter and motion), চৌম্বক বিজ্ঞান (Magnetism), বৈদ্যুতিক-বিজ্ঞান (Electricity), আয়ুর্কেদ-বিজ্ঞান (Medicine), দেহ-বিজ্ঞান (Physiology), দৃষ্টি-বিজ্ঞান (Optics), সঙ্গীত-বিজ্ঞান (Music), তর্কশাস্ত্র (Logic), মনস্তত্ত্ব (Mental Philosophy) ইত্যাদি। দ্রব্যগুণ ও দ্রব্যশক্তির বিজ্ঞান হইতে যতপ্রকার শিল্প ও কারু (Art and manufacture) আবিষ্কৃত হয়। বিজ্ঞান ও শিল্প পরস্পর সাহায্য করিয়া বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করিতে থাকে। ধূম্রযান (Railway), তড়িদ-বার্তাবহ (Electrical wire), অণবপোত (Ships) এবং মন্দির ও গৃহনির্মাণ (Architecture)--এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ-জ্ঞান ও তৎপ্রেরিত কর্ম্ম। দেশ-জ্ঞান অর্থাৎ ভূগোল-সমাচার ও কাল-জ্ঞান অর্থাৎ অকবোধ (Geography & Chronology), জ্যোতিষ (Astronomy) প্রভৃতি সমুদয়ই ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান। পশুবৃত্তান্ত-জ্ঞান (Zoology) এবং পার্থিব বিজ্ঞান (Minerology), তথা অস্ত্র-চিকিৎসা (Surgery) এই সমুদয়ই ইন্দ্রিয়ার্থ-জ্ঞান। যাহারা এই জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চান, তাহারা এইরূপ জ্ঞানকে সাক্ষাৎ জ্ঞান বা Positive knowledge বলেন। মানব-প্রকৃতি কেবল ইন্দ্রিয়জ সাক্ষাৎ জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না বলিয়া উচ্চ উচ্চ জ্ঞানের অধিকার লাভ করে।”

—চৈঃ শিঃ ৫।৩

৩। সারগাহিগণ কাহাকে বিজ্ঞান বলেন?

“বৈষ্ণবগণ বিষয়-জ্ঞানকে যথাযথ সংস্থাপন করাকে ‘বিজ্ঞান’ বলেন।

* * যাহারা জড়-প্রবৃত্তি-অমুসারে জড়জ্ঞানের উন্নতি-সাধনে রত, * *
তাহারা জড়োন্নতির যত্ন করিয়া বৈষ্ণবের চিত্তোন্নতির কিয়ৎপরিমাণে পরোক্ষভাবে উপকার করেন।”

—জৈঃ ধঃ ৯ম অঃ

৪। কোন্ ধর্মের চিদ্বিজ্ঞানের পূর্ণ অনুশীলন হয় ?

“আধুনিক ধর্মনিষ্ঠে ভক্তির বিজ্ঞান দেখা যায় না। আর্য্যবুদ্ধি হইতে যে সনাতন-ধর্মের উদয় হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণব-তত্ত্ব সর্বোৎকৃষ্ট। অতএব বৈষ্ণব-ধর্মেই কেবল ভক্তি-বিজ্ঞানের সম্ভাবনা। শ্রীজীব গোস্বামীর (মট) সন্দর্ভে ও শ্রীকৃষ্ণগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে ভক্তিবিজ্ঞান বিশেষরূপে বিবেচিত হইয়াছে।” — প্রঃ প্রঃ ৬ষ্ঠ প্রঃ

৫। বিজ্ঞান কোন্ বস্তুর সেবায় নিযুক্ত হইলে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার হয় ?

“শিল্পবিদ্যা ও বিজ্ঞান-বিদ্যাকে উন্নত করিয়া তত্ত্ববিদগণের সেবা করাই শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকগণের কর্তব্য। আত্মতত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়, যাঁহারা উহার আলোচনায় নিযুক্ত তাঁহাদের সামান্য শিল্প-বিজ্ঞানাদিতে আবদ্ধ হওয়ার অবসর নাই। এতদ্বিবাক্তন তাঁহাদের শরীর-নির্লব্ধি ব্যাপার-সকলের সাধনের জন্ত অত্যাশ্রিত লোকের চেষ্টা করা উচিত। হে ভ্রাতঃ ক্রমোন্নতি-বাদিন্! তোমরা আপনাপন কার্য্য কর, তাহাতে তোমাদের ও জগতের উভয়ের মঙ্গল হইবে। তোমরা অনধিকার-চর্চা-পূর্বক আত্মতত্ত্বের দোষ গুণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিও না। তোমরা ভালমানুষ হইয়া কার্য্য করিলে আমরা তোমাদিগকে নিরন্তর আশীর্বাদ করিব।”

— ‘ধর্ম ও বিজ্ঞান’, সং তোঃ ৭।৭

৬। বিজ্ঞান, সমাজ ও শিল্প কোন্ সময়ে সর্বোন্নত হয় ?

“কর্ম যখন ভক্তির স্বার্থ অনুগত হয়, তখন আপনাকে ‘কর্ম’ বলিয়া পরিচয় দেয় না, ‘ভক্তি’ বলিয়াই পরিচয় দেয়। যে-কাল পর্য্যন্ত কর্ম নিজ-নামে পরিচিত, ততদিন সে ভক্তির সমস্পর্ধি-তত্ত্বরূপে আপনারই গৌরব অন্বেষণ করে। বিজ্ঞান, সমাজ, শিল্প—ইহাদের উন্নতি-চেষ্টাকে কর্ম নিজ-তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু যখন কর্ম ভক্তি-স্বরূপে পরিণত হইয়া যায়, তখন বিজ্ঞান, সমাজ ও শিল্প আরও উজ্জ্বল হইয়া উন্নত হয়।” — তঃ বিঃ, ১ম অনু ২-১২

৭। সারগ্রাহি-বৈষ্ণবগণ কিরূপ ধনবিজ্ঞান-শাস্ত্রে পারদর্শী ?

“শারীরিক ও মানসিক যতপ্রকার বিজ্ঞান-শাস্ত্র আছে এবং শিল্প-শাস্ত্র ও ভাষা-বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র প্রভৃতি, সেই সকলই ‘অর্থ-শাস্ত্র’। ঐ সকল শাস্ত্রদ্বারা কোন-না-কোন শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক

বা সামাজিক উপকার উৎপন্ন হয় ; ঐ উপকারের নাম—অর্থ । ইহার উদাহরণ এই যে. চিকিৎসা-শাস্ত্রদ্বারা আরোগ্যরূপ অর্থ পাওয়া যায় ; গীত-শাস্ত্রদ্বারা কর্ণ ও মনঃসুখরূপ অর্থ পাওয়া যায় ; প্রাকৃত-তত্ত্ব (পদার্থ) বিজ্ঞানদ্বারা অনেকানেক অদ্ভুত যন্ত্র নির্মিত হয় ; জ্যোতিষ-শাস্ত্রদ্বারা কালাদি নির্ণয়রূপ অর্থ-সংগ্রহ হয় ; এই প্রকার অর্থশাস্ত্র যাঁহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা অর্থবিৎ পণ্ডিত । বর্ণাশ্রমাত্মক ধর্মের ব্যবস্থাপক স্মৃতি-শাস্ত্রকেও ‘অর্থশাস্ত্র’ বলা যায় এবং স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণকে অর্থবিৎ পণ্ডিত বলা যায়, যেহেতু সমাজরক্ষারূপ অর্থই তাঁহাদের ধর্মের একমাত্র সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য । কিন্তু পারমার্থিক পণ্ডিতেরা ঐ অর্থ হইতে সাক্ষাদ্রূপে পরমার্থ সাধন করেন । সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ অর্থশাস্ত্রের যথোচিত আদরকরত তাহার সম্যক আলোচনা করিতে কখনই বিরত হন না । ঐ সমস্ত অর্থ-শাস্ত্রের চরম-গতিরূপ পরমার্থ অনুসন্ধানকরত তিনি সকল অর্থবিৎ পণ্ডিতের মধ্যে বিশিষ্টরূপে পূজিত হয়েন । পরমার্থ-নির্ণয়ে অর্থবিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহার সহকারিত্বে পরিশ্রম করিতেছেন । যুদ্ধক্ষেত্রে শান্তিসংস্থাপকরূপে সারগ্রাহী বৈষ্ণব বিরাজ করেন, নানাবিধ পাপীদিগকে ঘৃণা করিয়া তিনি পরিত্যাগ করেন না—কখনও গোপনীয় উপদেশ, কখনও প্রকাশ্য বক্তৃতা করত, কখনও বন্ধুভাবে, কখনও বিরোধভাবে, কখনও স্বীয় চরিত্র দেখাইয়া, কখনও বা পাপের দণ্ড বিধানকরত সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ পাপীদিগের চিত্ত-শোধনে বিশেষ তৎপর থাকেন ।”

—কৃঃ সং ১০।১৪

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রেষ্ঠ পথ

গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতাদি ঋতুর ঘূর্ণন,
 শশী-সূর্য্য-তারাদির স্বকক্ষে ভ্রমণ,
 দিবারাত্র জ্যোতিষ্কের অস্তোদয়-রীতি-
 বিচার হইতে জন্মে বস্তুর প্রতীতি ।
 জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি, হর্ষ-শোক-গুণ
 স্মরণ করায় সেই বিধাতৃ-চরণ ।

কুশলীর সে কোশল ধরিবার তরে
 অত্যাধি নানা মুনি নানা চেষ্টা করে ।
 কপিল, কণাদ, আর গৌতম, জৈমিনী,
 পতঞ্জলি আদি সব বড় বড় মুনি
 বেদধর্ম ত্যজি 'জ্ঞান'-'কর্ম'-'যোগ' ধরে'
 সৃষ্টি-তত্ত্ব বুঝাইতে বৃথা চেষ্টা করে ।
 'কার্য্য-কারণ অসৎ', বলে বৌদ্ধগণ ।
 কপিলের 'সাংখ্য' দেখি 'প্রকৃতি' কারণ ॥
 কণাদের জড়-বিশেষ আপাতঃকারণ,
 মুখ্য কারণ কিন্তু নাহি স্পর্শে তাঁর মন ।
 গৌতম স্থাপিলা 'ন্যায়' পরমাণু-বাদ,
 বেদানুগত্য নাহি তায় কেবল জড়-বাদ ।
 জৈমিনীর 'মীমাংসা'য় ঈশ্বর কর্ম্মাধীন,
 পতঞ্জলির মোক্ষ চরমে চিদ্‌বিশেষ-হীন ।
 এইরূপ নানা জন স্থাপিলা স্বমতে,
 চরম প্রতীতি কিন্তু কেবলা ভক্তিতে ।
 সেইহেতু অবশেষে ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম
 যত যত যোগী, ঋষি পালে ভক্তিধর্ম্ম ।
 শাস্ত্রে দেখি,—সনকাদি শুকদেব জ্ঞানী
 নিজমুখে ভক্তি' শ্রেষ্ঠ কহয়ে বাখানি ।
 ভক্তি ত্যজি' ভক্ত কিন্তু আন নাহি ধায় ।
 এ কারণ ভক্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ সর্ব্বথায় ॥

শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণ-ভীর্থ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-১৮)

এইরূপে অবান্তর তাৎপর্য বিচারে (উপক্রম-উপসংহারাদি তাৎপর্য নির্ণায়ক) ষড়্‌বিধ লক্ষণ দ্বারাও ভক্তির অভিধেয়ত্ব জানা যায়। উপক্রম ও উপসংহারের একত্বনিবন্ধন ভাগবতের “জন্মান্তশ্চ যতঃ” ইত্যাদি উপক্রম শ্লোকে ‘সত্যং পরং ধীমহি’ এই ভগবদ্ধ্যানসূচক বাক্য ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব সূচনা করিতেছে। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বলিতেছেন—“এবং সতত-যুক্তা য়ে ভক্তাস্থাং পয্যুপাসতে” (১২।১); তোমাতে এইরূপ সততযুক্ত হইয়া যাঁহার। তোমার উপাসনা করেন এবং যাঁহার। নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানমার্গাপেক্ষা ভগবদ্ধ্যানেরই অনায়াসত্ব অর্থাৎ সহজসাধ্যত্ব নিবন্ধন ভগবৎ ধ্যানকারিগণকেই শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়াছেন। “কস্মৈ যেন বিভাসিতোহ-য়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা” (ভাঃ ১২।১৩।১৯) শ্লোকে উপসংহার বাক্যেও পরম সত্য পদার্থের ধ্যান করার কথাই উক্ত হইয়াছে।

‘অভ্যাস’ দ্বারা ভগবদ্ভক্তিরই অভিধেয়ত্বের উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ‘অপূরিতা ফল’ দ্বারাও “অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিয়োগমধোক্ষজে” (ভাঃ ১।৭।৬) শ্লোকে ব্যাস-সমাধিতে ‘ভগবান অধোক্ষজের প্রতি সাক্ষাৎ ভক্তিয়োগ দ্বারাই অনর্থের উপশম হয়’ ইত্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। পঞ্চম লক্ষণ ‘অর্থবাদ’ (প্রশংসাত্মক) বাক্যদ্বারাও ভক্তির অভিধেয়ত্ব সম্বন্ধে বহু-বিধ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ষষ্ঠ লক্ষণ ‘উপপত্তি’ দ্বারাও “ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্তাদীশাদপেতশ্চ বিপর্যায়োহস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ত্তৈক্যকয়েশং গুরুদেবতাত্মা” (ভাঃ ১।১।২।৩৭) শ্লোকে ভগবদ্বিমুখ জীবের মায়ার প্রতি অভিনিবেশবশতঃ ভয় হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি গুরুদেবকে ‘পরম দেবতা’ ও ‘হরিপ্রিয়’-জ্ঞানে অব্যভিচারী ভক্তিয়োগেই সম্যক্ ভজন করিবেন—এই সকল উদাহরণ দ্বারা ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব ও সর্বসাধন-শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

‘গতিসাম্যাত্রে’ও অর্থাৎ যাবতীয় ক্রিয়ার সাধারণ ফলস্বরূপেও “ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতশ্চ বা” (ভাঃ ১।৫।২২) ইত্যাদিতে ভগবান্ হরির যে গুণকীর্তন তাহাই পুরুষের তপশ্চা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, যজ্ঞোচ্চারণ, জ্ঞান ও দানের সর্ব-শ্রেষ্ঠ অচ্যুত (অমোঘ) ফল,—এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

“ধর্মঃ প্রোজ্জিতকৈতবোহত্র পরমো নির্মৎসরাণাং সতাং” (ভাঃ ১।১।২)
শ্লোকে এবং “অত্র সর্গোবিসর্গশ্চ” (ভাঃ ২।১০।১) শ্লোকে সর্গ বিসর্গ ইত্যাদি
দশ লক্ষণের মধ্যেও সদ্ধর্মের লক্ষণ স্বরূপে ভক্তিই বর্ণিত হইয়াছে।

ভাগবতের বীজস্বরূপ চতুঃশ্লোকীতেও ভক্তির অভিধেয়ত্ব বর্ণিত—
“এতাবদেব জিজ্ঞাস্তুং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। অবয়ঃ ব্যক্তিরেকাত্যাং যৎ স্যাৎ
সর্বত্র সর্বদা ॥” আত্মার (শ্রীহরির) তত্ত্ব বা স্থায়ী শ্রেয়ঃ সাধনতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু
ব্যক্তি শ্রীগুরুচরণে যাহা অবয় ব্যতিরেকভাবে বা বিধি ও নিষেধক্রমে সর্বত্র
ও সর্বদা (দেশকালাবচ্ছিন্ন না হইয়া) বিদ্যমান, সেই শুদ্ধভক্তির কথা
জিজ্ঞাসা করিবেন। এই চতুঃশ্লোকীর প্রারম্ভেই জ্ঞান ও বিজ্ঞান—‘সম্বন্ধ’,
রহস্য—‘প্রয়োজন’ ও তদঙ্গ—‘অভিধেয়’ সাধন ভক্তি—এই চারিটি বিষয়কে
বক্তব্যরূপে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। সেই চতুঃশ্লোকীর মধ্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান
ও রহস্য প্রথমোক্ত তিন শ্লোকেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রহস্য-শব্দে প্রেম-
ভক্তি এবং তদঙ্গ-শব্দে সাধন ভক্তি। এইগুলি পর্যায়েক্রমে প্রাপ্ত বলিয়া
“কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীযং বেদাসংজিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো
যশ্চাং মদাত্মকঃ” ॥ ভগবান বলিতেছেন “হে উদ্ধব যাহাতে আমার সাক্ষাৎ
স্বরূপভূত ধর্ম বর্তমান, সেই বেদনায়ী ভগবদ্বাণী প্রলয়ে বিলুপ্ত হইয়াছিল,
পরে ব্রাহ্ম-কল্পাদিতে আমি ব্রহ্মাকে উহা কীর্তন করিয়াছিলাম।
এই বাক্যে চতুঃশ্লোকীর অন্তর্গত সর্বশেষ চতুর্থ পদ্যে সাধন ভক্তিই
ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্বোক্ত বাক্যের অহম্ভাবে উদাহরণ,—“মনমনা ভব
মন্তুক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু” অর্থাৎ আমার প্রতি মনোনিবেশ কর,
আমার পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর।

ব্যতিরেক উদাহরণ—

মুখবাহুরুপাদেভ্যঃ পুরুষশ্চাশ্রমৈঃ সহ।

চত্বারো জজিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।

ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

(ভাঃ ১।১।৫২-৩)

ন মাং ছস্কৃতিনো মুঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।

মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আস্থরং ভাবমাপ্রিতাঃ। (গীতা ৭।১৫)

যাবজ্জনো ভজতি ন ভুবি বিষ্ণুভক্তি-

বার্তা-সুধারসমশেষরসৈকসারম্ ।

তাবজ্জরামরণ-জন্মশতাতিঘাত-

দুঃখানি তানি লভতে বহুদেহজানি ॥ (পদ্ম পুরাণ)

বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে চারি আশ্রমের সহিত বিপ্রাদি চারিবর্ণ পৃথক পৃথক গুণান্বিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সাক্ষাৎ আত্মকারণস্বরূপ সেই পরম পুরুষ ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা করে, তাহারা স্বস্তানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়।

পাপপরায়ণ, নিত্যানিত্যবিবেকহীন, মাযার বশে সচ্ছাত্তোপদেশজনিত জ্ঞানহীন, দস্তাদি আসুর ভাবান্বিত জনগণ কখনও আমাকে পায় না। যে পর্য্যন্ত মানব পৃথিবীতে অনন্তরসের মধ্যে একমাত্র সারপদার্থ হরিভক্তি-কথারূপ সুধারস সেবন না করে, সে পর্য্যন্ত সে বহু দেহ ধারণজনিত জরা, মরণ, জন্ম যাতনাদি দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন—কোথায় কোথায় এই ভক্তি প্রতিপন্ন হয়? তদ্বত্তরে বলা হইতেছে—সর্বত্রই অর্থাৎ কি শাস্ত্র, কি কৰ্ত্তা, কি দেশ, কি ইন্দ্রিয়, কি দ্রব্য, কি ক্রিয়া, কি কার্য্য, কি ফল—সমস্ত ব্যাপারেই ভক্তি অধিষ্ঠিত।

সর্বশাস্ত্রের মধ্যে—

সংসারেহস্মিন্ মহাঘোরে জন্ম-মৃত্যু-সমাকুলে ।

পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্মৃতম্ ॥ (স্কান্দে)

তন্মধ্যে অব্যভাভে—

ভগবান্ ব্রহ্ম কাংশ্চেনে ত্রিরসীক্ষ্য মনীষয়া ।

তদধাবন্ত্য কূটস্থো রতিরাস্মিন্ যতো ভবেৎ ॥ (ভাঃ ২।৩।৩৪)

অ'লে ভাঃ সর্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ।

ইদমেবং স্তুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥

(স্কন্দ, পদ্ম ও লিঙ্গপুরাণ)

এই জন্ম মৃত্যু-সমাকুল ভয়ঙ্কর সংসারে বাসুদেবের পূজাই শাস্ত্র-বিচারক-গণ কর্তৃক একমাত্র পরিত্রাণের উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ব্রহ্মা নির্বিকার অর্থাৎ একাগ্রচিত্ত হইয়া তিনবার সমগ্র বেদ বিচার করিবার পর, যাহা হইতে ভগবানে রতি হয়, সেই সাধনভক্তি বুদ্ধিদ্বারা নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন।

সর্বশাস্ত্র আলোড়ন ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া ইহাই নিরূপিত হইয়াছে যে একমাত্র ভগবান শ্রীনারায়ণই সর্বদা ধোয় ।

ব্যতিরেকভাবে গুরু পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে— বেদে পারঙ্গত ও সর্বশাস্ত্রবিৎ হইয়া যে ব্যক্তি সর্বেশ্বর দিগুতে ভক্তিহীন, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিতে হইবে ।

সর্বকর্তার মধ্যে—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং

স্ত্রী-শূদ্র-হুন-শবরা অপি পাপজীবাঃ ।

যতদুত-ক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-

স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ (ভাঃ ২।৭।৪৬)

কীট-পক্ষ-মৃগাণাঞ্চ হরৌ সন্নাস্তচেতসাম্ ।

উর্দ্ধমেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জানিনাং নৃণাম্ ॥ (গারুড়ে)

যাঁহারা তাঁহার নামরূপগুণলীলায় মনোনিবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের ত কথাই নাই ; এমন কি, স্ত্রী, শূদ্র, হুন, শবর ও অন্যান্য পাপজীবগণ এবং পশুপক্ষী আদি তির্য্যকযোনি জীবগণও যদি ভগবান উরুক্রমে সেবাপরায়ণ ভক্তগণের চরিত্র কেবলমাত্র অনুসরণ করে, তাহা হইলে তাহারাও বৈষ্ণবী মায়াতে জানিয়া তাহা উত্তীর্ণ হইতে পারে ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীশ্রী একাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, সপ্তবিংশ অধ্যায়]

(পূর্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৮০ পৃষ্ঠার পর)

ষট্‌তীলা একাদশী

“যুধিষ্ঠির বলিলেন—‘হে আদিদেব জগন্নাথ কৃষ্ণ ! আমার প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া একাদশী কি নামে খ্যাতা এবং তাহার বিধি ও ফল প্রভৃতি কিরূপ তাহা সবিস্তারে বর্ণন করুন ।’ অনন্তর ভগবান্ কহিলেন—‘হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! আমি সেই মাঘী কৃষ্ণা একাদশীর কথা বর্ণন করিতেছি । এই একাদশী ষট্‌তীলা নামে বিখ্যাতা এবং সর্বপাপবিনাশিনী ।’ মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যকে একদা দালভ্য ঋষি জিজ্ঞাসা করেন, মর্ত্যলোকে মানবগণ ব্রহ্মহত্যা ও গোবধাদি পাপ, পরদ্রব্যহরণ ও পরদ্বংস উৎপাদনাদি কার্য্য

নিয়তই করিয়া থাকে, সে কারণ নরকই তাহাদের লভ্য হয়। হে ব্রহ্মন্! এ অবস্থায় কি করিলে তাহারা নরকগমন হইতে রক্ষা পায় তাহা যথাযথভাবে আমাকে উপদেশ করুন। অনায়াসসাধ্য কোনও কার্য বা অল্প কিছু বিস্তাদিদানে যদি তাহাদের এই সকল পাপ দূর হইবার কোন উপায় থাকে তবে তাহা বলিবেন।

পুলস্ত্য কহিলেন—হে মহাভাগ! তুমি একটি গোপনীয় উত্তম বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছ। ইহার উত্তর ব্রহ্মা ইন্দ্র কেহই কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। একমাত্র আমিই তোমার প্রশ্নের উত্তরে তাহা ব্যক্ত করিতেছি। মাঘ মাস উপস্থিত হইলে শুচি, জিতেন্দ্রিয়, কাম-ক্রোধাহঙ্কার-লোভ-পৈশুণ্যাদি (খলতা) বর্জিত ব্যক্তি দেবদেব শ্রীহরিকে স্মরণপূর্বক স্নানান্তর জল দ্বারা পাদ প্রক্ষালন করতঃ মাটিতে পতিত হওয়ার পূর্বেই গোময় গ্রহণ করিবে। তৎপর ঐ গোময়ে তিল মিশ্রিত করিয়া কার্পাস বীজের মত হোমার্থ একশত আটটি পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া শুকাইতে দিবে। ইহাতে কোনও বিচার বা মতভেদ নাই। অনন্তর মাঘ মাসের কৃষ্ণা একাদশী আদ্র্ণ বা মূলা নক্ষত্র-যুক্তই হউক তাহাতে ব্রতনিয়ম গ্রহণ করিবে। ঐ ব্রতের পুণ্যফলদায়ক নিয়ম বলিতেছি শ্রবণ কর।

জিতেন্দ্রিয় ও শুচি অবস্থার বিধানানুসারে স্নানপূর্বক দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের পূজা সমাপন করিবে। পূজাদিতে কোনও বিঘ্নাদি ঘটিলে তজ্জন্তু কৃষ্ণনাম স্মরণ করিবে। রাত্রিকালে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের অর্চনপূর্বক হোম করিবে। চন্দন, অগুরু, কপূর ও শর্করা প্রভৃতি দ্বারা নৈবেদ্য প্রস্তুতপূর্বক কৃষ্ণ-নামে পুনঃ পুনঃ উহা নিবেদন করিয়া কুস্মাণ্ড, নারিকেল বা বীজপূরক, তদভাবে একশত গুবাক দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃপালুত্তম-গতীনাং গতির্ভব’ ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্য দান করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা কবিত্তে হয়। ‘কৃষ্ণ আমার প্রতি প্রীত হউন’ বলিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে জলকুণ্ড, ছত্র, উপানহ (পাদুকা), বস্ত্র ও কৃষ্ণ ধেনু প্রভৃতি সহ তিলপূর্ণ পাত্রও প্রদান করিবে। স্নান ও দানাদি কার্যে কৃষ্ণ তিলই প্রশস্ত জানিবে।

হে দ্বিজোত্তম! ঐ দানীয় তিল হইতে যে সকল তিল বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তাহাদের শাখা গণনায় যত হইবে তত সহস্র বৎসর দানীর স্বর্গলোকে বাস হইয়া থাকে। তিলদ্বারা স্নান, পেশা তিল গাত্রে লেপন, তিল দ্বারা হোম,

পিত্তাদিকে তিলযুক্ত জল প্রদান, তিল দান ও তিল ভোজন—তিলযুক্ত এই ছয়টি কার্যকে পাপনাশিনী ‘ষট্‌তিলা’ বলে।

হে যুধিষ্ঠির ! এক সময়ে নারদও আমাকে এই ষট্‌তিলা একাদশীর ফল ও উপাখ্যান কথনের জন্ত প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আমি তদুত্তরে নারদকে যাঁহা বলিয়াছিলাম তাহাই আজ তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি।

পুরাকালে মর্ত্যলোকে এক ব্রাহ্মণী বাস করিত। সে নিত্যই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্রতচরণে তৎপর। ও দেবপূজা-পরায়ণা ছিল। উপবাস দ্বারা তাহার শরীর অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছিল। সেই মহাসতী ব্রাহ্মণী দেবতা, ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণের প্রতি ভক্তিবশতঃ অন্ন হইতে দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া আবার ঐ সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণাদিকে দান করিত। সব সময় সে অতিশয় তৃষ্ণায়ুক্ত ছিল। ব্রাহ্মণী কখনও ভিক্ষুক ব্যক্তিকে ভিক্ষা দান এবং ব্রাহ্মণগণকে (অন্ন প্রদানে) তৃপ্ত করে নাই।

এইভাবে বহু বৎসর গত হইলে আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে কষ্টসাধ্য ব্রতাদি দ্বারা এই ব্রাহ্মণীর শরীরটি শুষ্ক হইয়াছে ইহাতে সংশয় নাই, কায়ক্লেশ সহকারে যথাযথভাবে বৈষ্ণবগণের অর্চনও করিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের পরমতৃপ্তির জন্ত কখনও অন্নদান করে নাই। আমি ইহা অবগত হইয়া কপিল-রূপ ধারণপূর্বক তাম্রনির্মিত পাত্র হস্তে লইয়া সেই পাত্রে তাহার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলাম। ব্রাহ্মণী বলিল—হে ব্রাহ্মণ ! তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, কোথায় যাইবে তাহা আমার কাছে বল। তাহার এই প্রশ্নের উত্তরে আমি পুনরায় তাহাকে ‘হে সুন্দরি ! আমাকে ভিক্ষা দাও’ বলিলাম। সেই ব্রাহ্মণী তখন মহাকোপ-সহকারে আমার তাম্রপাত্রের উপর একখণ্ড মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করিল। হে নারদ ! যখন সেই ব্রাহ্মণী আমাকে এই মাটির ঢেলা দিল তখন আমি নিজ স্থানে গমন করিলাম।

অনন্তর বহু কাল পরে মহাব্রতধারিণী সেই ব্রাহ্মণী ব্রতচরণ-প্রভাবে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়া পূর্বকৃত মৃৎপিণ্ড দানের প্রভাবে তথায় মনোরম একটি গৃহ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু হে নারদ ! সেই গৃহটি পূর্বে অন্নদান-ফলাভাবে ধাতু-তণ্ডুল বিবর্জিত ছিল। সেই ব্রাহ্মণী উক্ত গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্বক চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। তখন সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আমার নিকট আগমনপূর্বক মহাক্রোধ-ভরে বলিল,—‘আমি ব্রত, কষ্টসাধন ও বহু উপবাসাদি দ্বারা সর্বলোকের

শ্রীগুরুপদে বিজ্ঞপ্তি

নমো নমো প্রভু মোর শ্রীকেশব স্বামী ।

সর্ব্বাণ্ডে বন্দোঁ মুই চরণ দু'খানি ॥

শুনিয়াছি সাধুমুখে তুমি দয়াবান্ ।

শতশত বন্ধ জীবে করিয়াছ ত্রাণ ॥

দুষ্টের দমন শিষ্টে পালনের তরে ।

গুরুরূপে আসিয়াছ এ ধরার প'রে ॥

তোমার গুণের প্রভু, নাহি কোন শেষ !

তোমায় দিয়েছি আমি কত না যে ক্লেশ ॥

ভক্তের অধীন তুমি অসীম দয়াবান্ ।

যে তোমার কৃপা পায় সেই ভাগ্যবান্ ॥

তুমি ত' জীবেরে প্রভু ভক্তি কর দান ।

তোমা' না ভজিলে জীবের নাহি পরিত্রাণ ॥

মায়া হ'তে ত্রাণ লাভে করিগো কামনা ।

হৃদয়ে না থাকে যেন বিষয়-বাসনা ॥

সর্ব্বশাস্ত্রে গায় শুধু গুরু-কৃপা সার ।

আর কোন আশা নাই হৃদয়ে আমার ॥

তোমার চরণ-তরী একমাত্র সার ।

তুমিই কেবল নাথ ভরসা আমার ॥

অভাগিনী এ অধমা হরিদাসী কয় ।

জন্মে জন্মে তব পদে যেন ভক্তি রয় ।

শ্রীমতি হরিদাসী রায়

গোলকগঞ্জ (আসাম)

টাকা দিয়ে মোড়া

[উঃ, কি প্রকাণ্ড ধূর্ত ! দেখে বুঝবার উপায় নেই যে কি বিরাট একটা ভোগের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করছে। সর্বদাই কি যেন একটা চিন্তায় মশগুল ।...]

বলি হোল কি হে ? ছিলে ত বেশ সুখে—খট্টাঙ্গে শয়ন, দুগ্ধফেননিভ শয্যা, চৰ্ক-চূষ্য-লেখ-পেয় ভোজন, নিক্তি-ধরা ঘড়ির কাঁটার একচুল এদিক ওদিক হবার যো ছিল না, দুই তিন জন সর্বদা হুকুম তামিলে বাস্ত, পোষাক-পরিচ্ছদের বাহাদুরী, কত সুখেই ত ছিলে হে ; তথাপি তুমি চিন্তা কর কিসের, আবার কি চাও, বলই না খুলে। আমি শ্রাকাবোকা লোক, আমাকে আর ভয় কেন ?

—নাঃ, আমার আর কিছু ভাল লাগছে না, ঐগুলো আমাকে সুখ দিচ্ছে না, আমাকে নিষ্পেষিত করে মারছে। আমি ঐসব ছাড়বো, আমি বৈরাগী হব।

—বৈরাগী ? এঁ্যা, এ আবার তুমি কি বলছ হে ; তুমি আবার কত রঙ্গই যে করতে পার, এ-ও তোমার রঙ্গ মন্দ নয় যে, তোমার মুখে ত্যাগের বাহাদুরী ! তোমার ঐসব কথা আর বিশ্বাস হচ্ছে না। রাজ-সিংহাসন, রাজভোগ ছাড়বে কেন এই বয়সে ?

—কি যে তুমি বল ছাই, মাথা মুণ্ড কিছু নাই। তুমি আমার এ্যাদিনের প্রাণের দোস্ত হ'য়ে এখনও আমার মনের কথা বোঝ না। আমাকে বেশী ঘাঁটিও না বলছি। আমি সব জানি, শুধু কিছু বলি না ; আমি এক্ষুনি রেগে যাব কিন্তু, তখন সব বুঝতে পারবে।

—অল্প কথায় চটো কেন ! তুমি দেশ ছেড়ে চলে যাবে, আমার একটা বন্ধু কম পড়বে, আমি বলব না তা ? তোমাকে নিয়ে আমি কত সুখ-দুঃখের গল্প করতুম, সেই বাদলা দিনে জানালার পাশে বসে প্রকৃতির রূপ উপলব্ধি করতুম, আর তোমার বাড়ীর লোকেরা টাটকা ভাজা ডালমুট, চানাচুর দিয়ে যেত. তুমিও তার থেকে কিছু ভাগও আমাকে দিতে ; ব্যাং-গুলো পেট ফুলিয়ে কত আওয়াজ করত—তা'গুনে তুমি কত কাব্য কন্তে, সেদিন কি সহজে ভোলা যায় ভাই ?

—নাঃ, ভোলা যায় না, বল্লই হল। আমি কত উঁচুতে উঠব, সেটা তোমার আর ভাল লাগছে না।

—কি করে ভাল হবে বল, তুমি ছিলে খোকন বাবু, বয়স তোমার অনেকই হয়েছিল; তথাপি বাপ-মায়ের আদরে নামটীও তুমি অনেক দিন ভোগ করেছ। এই সেদিনও তোমার মায়ের “ও খোকন, ও খোকন” বলে চীৎকার আমি শুনেছিলুম।

—তুমি যে কত কি শুনে থাক।

—আমি যা’ করি সব ভুল, আর তুমি যা’ কর সব ঠিক। বেশ, বেশ, তাই হোক, তাই হোক।

—এঁা কি বল্লে, আবার বল শুনি। কবে ঐ ডাক শুনেছিলে, ওঃ, তাহলে ত মুস্কিল হ’য়ে গেল!

—মুস্কিল আর কি, হ্যাঁ, আমি তোমার বুদ্ধি এবার ধরতে পেরেছি।

—হঁ-উ, তুমি আবার আমার বুদ্ধি ধরতে পারবে। কি ধরতে পেরেছ, বল। তুমি চিরকাল আমার কুটবুদ্ধির কাছে হার মেনে এসেছে, এটা কি তোমার মনে নেই?

—কি করে মনে থাকবে? তুমি চিরকালই খুব বেশী বুঝে থাক বল। স্মরণে এখন আবার ধন্ম-কন্ম কত্তে যাবে কেন? ধান্নিকরা কত কষ্ট-সেষ্ট করে, তুমি পারবে অত কত্তে? আমি বোকা-সোকা মুখ্যা-সুখ্যা লোক কিকরে তোমার বিচার-বুদ্ধি বুজ্ব বল।

—তোমাকে এক্ষুনি আমি বুঝিয়ে দিতে পারতাম, শুধু একটু ধৈর্য্য ধরে থাক। সবুরে মেওয়া ফলে, সব বুঝিয়ে জল করে দেবো।

—সে নয় সব তুমি বুঝিয়ে দেবে, এখন কি করে আমি থাকি বল। ঐ যে গো কিছু আগে ছেলেবেলার কত কথা বলছিলুম না, তুমি ত সে সব শুনতেই চাইলে না—কেবল চিন্তা, কেবল চিন্তা, উঁ।

—আচ্ছা বল, তোমার মনের কথা সব না হয় খুলেই বল। যখন তোমাদের ছেড়ে চলেই যাব, তখন আর কোন ক্ষোভ কেন তোমার মনে থাকে। তুমি যা’ বলবে সব আমি বুঝতে পারছি। তুমি বুঝতে পারছ না কেন, কেবল বসে বসেই দিনগুলো কাটাব?

—তোমার এরম মনের ভাব আবার কবে থেকে হল বল দেখি। এরম তো আগে ছিলে না। এটার সঙ্গে ওটা কেমন খেতে লাগে, এই কাপড়ের সঙ্গে ঐ চাদরটা কেমন মানায়—এসব তো একবারে বাঁধা বুলি ছিল।

—হঠাৎ একদিন কেমন খেয়াল হল, পাশের বাড়ীর ঐ যে কী

কীর্তনের সুর কাণে এল, আর সেই থেকে না আমার মন চঞ্চল হল। কেবল ভাবতে থাকি, ওরা ঐ যে কি গায়, সেটা কোথায় আছে। একদিন শুনি কিনা ঐ যে দাস গোস্বামীর কথা ওরা পরস্পর বলছে আর বিলাপ করছে। দাস গোস্বামীর নাকি অতুল ঐশ্বর্য ছিল, “ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, স্ত্রী অম্বর-সম”। এ সবও নাকি তাঁর মন হরণ করতে পারে নি। শুধু আমরাই বুঝা আমাদের জীবন কাটাব, এটা কি সম্ভব হয়? তুমিও নয় আমার সাথে চলো না। দুজনেই বেশ সুখে কাটাবো।

—না, না, তা হয় না। আমি এখন ছঁ-পোষার যোগাড় করছি। তোমার সঙ্গে অত বৈরাগ্য কত্তে পারব কি করে?

—আমারও ত তোমার মত অনেক দায়িত্ব আছে, পিতা-মাতা-ভাই-কাকা-ভগ্নী কত আর বলব।

—তুমি ত তাদের পাল না, বরং তা'রাই তোমাকে সন্তোষ দেয়। তা'রা ত তোমাকেই নিয়ে ব্যস্ত থাকত যে, খোকন কেমন আছে, কি করে, কি খায়, কি গায়, কি চায়...ইত্যাদি।

—ঐ জন্তুই ত কিছু আগে বলছিলাম না যে তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে না। আমি কি ছিলাম, কি হ'তে চাই, তুমি তা'র ধার দিয়েও যেতে পারছ না।

—তোমাকে ত আমি কোন দিনও বুঝতে পারিনি, আজও পারব না।

—তুমি ত সব জান না। ধর্ম বলতে তুমি বোঝা লাল কাপড় আর বোকা সাজা, এ ছাড়া আর কি ধর্ম আছে পৃথিবীতে!

—যাক্গে, যাক্গে, আর তোমায় কিছু বলতে হবে না। বুজিচি তুমি কপটতা করার জন্তু ধাত্মিক হবে। ও সব করে কি লাভ বাপু, আমি ছোট বুদ্ধির লোক কিছু বুজি-সুজি না, তাই অ্যাৎক্ষণ তোমাকে বকালুম। তুমি একটা ধৃতু লোক, সকলে তা জানে খালি আমি জানতুম না। আজ সেইটে জানলুম।

—তবে আর কি, তুমি ত সব বুঝে ফেলো, আর কিছুটা বলবে না। দেখ না আমি কি করি, সব দেশটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কত হৈ-চৈ পড়বে আমাকে নিয়ে তা জান? লোকে বলবে, “অমকের ছেলেটা রাজহুলাল ছিল, সমাজের কত উঁচু স্থানে ছিল। এই সব লোক না হ'লে কি আর এই রকম উচ্চ মার্গে আকৃষ্ট হয়?” তোমারও তখন দেখবে কত দাম বেড়ে

যাবে। লোকে বলবে, “তুমি অমুকের বন্ধু ছিলে।” একটু শুধু দেবী কর না, হৈ-হৈ-কাণ্ড, রৈ-রৈ-ব্যাপার।

—যাক, তোমার মনের কথাটা বে-এ-শ বুজতে পারলুম। তুমি ত চিরকাল তোমার মনের কথা আমাকে বল বলেই আর একটা আদ্যার আমি করব কিন্তু। সেই আদ্যারটা তোমার মেটান চাই-ই, নয়ত আমি এখানে থেকে আজ আর উঠছি না, দেখ।

—কি জানতে চাও বল। আমি সব কিছু বলতে রাজী আছি। তবে এ সব কথা খুব গোপনীয় ব্যাপার, জেনে রাখবে। স্ত্রহরাং শুনে হজম করার মত Capacity চাই, নতুবা তুমি আমি দুইজনেই বিপদে পড়ব।

—হুঁঃ, তোমার মতন বুদ্ধিমান থাকতে আবার বিপদে পড়ব কেন? অত্যাচার করব আবার চোখও রাঙ্গাব—এই যদি না হলো তবে তুমি বুদ্ধিমান কেন?

—নাঃ তা নয়, তোমাকে আমি সব কথা বলতাম। তবে কি জান আরও একটু ভাবছি, তোমার মত একটা পেট-পাতলা লোককে নিয়ে সত্যিই কোন বিপদ হতে পারে কিনা।

—তুমি দেখছি আমাকে সত্যিই ছাকা ঠাওরেচ, আমি কিন্তু অত ছাকা না বাবা। তোমার মতন অত ছাকাপড়া আমি না শিখলে কি হবে, তোমার মত বোকা আমি না। আমি সাধুকে বলি, ‘আমি অধম, আমায় কৃপা কর,’ সেটা বলা আমার চাতুরী মাত্র।

—ঐ জন্তু ত তোমাকে সব কথা বলব না ভাবছি, আমি একটা রাজা-উজীর মারার ফন্দী-ফিকির স্থির করার চিন্তা করছি, মধ্যস্থান থেকে তুমি কেবল আমার সেই চিন্তায় বাধা প্রদান করছ। বলছি, তোমাকে সব কথা খুলে বলব, না সেই এক কথা, “যখন তুমি বুদ্ধিমান অতএব এখুনি আমাকে গোপন কথাগুলি সব বল।”

—তা নয় হে, তুমি দেখছি আমাকে আজও বুজতে পারিনি। এখন রাত হ’য়ে এল কিনা তাই মাথাটা ঠিক নেই, ঘুমে চোখ ঢুলঢুল কচ্ছে। অত কাব্য করার নেশা তো আমার ছিল না, কিন্তু তন্দ্রার ঘোরে অনেক কথা বলে ফেলেছি, দেখছি। তা তুমি ভাবো, ভেবে-চিন্তে আমাকে সব বোলো কিন্তু। (ক্রমশঃ)

—শ্রীবিষ্ণুরূপ ব্রহ্মচারী, B. A.

গৌড়ীয় প্রজ্ঞান

(পূর্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯২ পৃষ্ঠার পর)

গৌড়ীয়-বস্তু-বিচার

পূর্ব প্রবন্ধে স্থান ও কাল (Space, Time) সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। জড়বিজ্ঞানের চিন্তাধারা কিরূপ ভ্রান্তিমূলক, এবং কি প্রকার আপেক্ষিক-তায় বিচরণ করে, উদিত-গৌড়ীয়-প্রজ্ঞানের নিকট তাহার পূর্ণ-স্বরূপ চিরকালই বিকচিত। এক্ষণে বস্তু কি, কাহাকে ‘বস্তু’ বলা হইবে, শক্তি বস্তু কিনা—এই সকল বিষয় বর্তমানের আলোচনার প্রধান অঙ্গ।

ত্ৰায়-দর্শনের বস্তু বিচার ভ্রান্ত

গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-বিগ্রহের সাক্ষাৎ উপদেশে সুধীগণ জানিয়াছেন—

“ঘট-পট-গুণজ্ঞানে জড়দ্রব্যবিচারণে।

তার্কিকাণাং মহামোক্ষমত্ৰায়েন কথং ভবেৎ ॥”

জড়বস্তুর স্বরূপ ও গুণাগুণ-নির্ণয়ে ‘ত্ৰায়’-দর্শনে যে বিচার আছে তাহা প্রকৃতই অত্ৰায়। যাহারা এবস্থিধ আলোচনায় ত্রুতী তাহাদের মহা-মোক্ষ কি প্রকারে হইতে পারে?

পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে বস্তুর বিচার নাই; জড় জগৎ বস্তু নহে

আধুনিক পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানে বস্তুর বিচার নাই, থাকিতেও পারে না। কারণ তাহারা এতদূর জড়বাদী যে জড়াতীত প্রতীতিতে তাহাদের চিত্ত অগ্রসর হয় নাই। কাহাকে বস্তু বলা হইবে? জড় জগতে (Relative-world) বস্তু বলিয়া কোন কিছু আছে কিনা তাহাই আলোচ্য হইলে বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে।

“বস্তু” শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয় করিলে ‘বস্ + ত্বন্’ পাওয়া যায়। বস্-শব্দে নিত্য স্থিতিই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ততগৎ যাহার নিত্যস্থিতি নাই তাহা কিরূপে বস্তু হইতে পারে? জড় জগৎ যে নিত্য নহে, ধ্বংসশীল তাহার পুনরুক্তি করিয়া আর কোন লাভ নাই। এইজন্ত গৌড়ীয়-বিজ্ঞান বিচার করেন, বস্তু (Matter) একমাত্র কৃষ্ণ, আর সকলই তাঁহার শক্তি (Energy) এবং তাঁহাতে নিত্যযুক্ত। এই সকল শক্তিরই মূল-ঘনীভূতধার শ্রীমতী রাধারাগী ‘হ্লাদিনী শক্তি’ নামে পরিচিত। গৌড়ীয়-বিজ্ঞানের এই বিচারের ছায়া আধুনিক বিজ্ঞান-জগতে প্রবেশ করিয়াছে।

বস্তু ও শক্তি সম্পূর্ণ পৃথক না হইলেও সমান নহে, শক্তি
বস্তুরই আশ্রিত, জড় জগৎ শক্তিরই একটা বিশেষ
অবস্থা মাত্র ; জড়ের mass (ভর) ও energy
(শক্তি) একই তাৎপর্যময়— এই সকলই বৈদিক
দর্শনের সিদ্ধান্ত, আধুনিক বিজ্ঞানের নহে

কোন কোন বৈজ্ঞানিক বস্তু ও শক্তি দুইটা সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া বিচার
করিতেন ; কিন্তু ঐ ধারণা যে নিছক ভ্রান্ত তাহা বর্তমানে স্বীকৃত হইয়াছে।
জড় বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে, হয়ও। বিচারটা এই, যাহা
শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহাকে বস্তু (Matter) বলা হইবে, না শক্তি
(Energy) বলা হইবে ? শেত বস্তুকে যে রঙের কাঁচ দিয়া দেখা যায়
উহা সেইরূপই প্রতীত হয়। এতদ্বারা আমরা জানিতে পারি যে মৌলিক
সাতটা বর্ণেরই সমষ্টি লইয়া শুভ্র বর্ণের গঠন। এই যুক্তিতে যাহা শক্তিতে
রূপান্তরিত হয় তাহাকে যাবতীয় শক্তির সমষ্টি বলা যাইতে পারে।
সুতরাং বস্তু বলিয়া কিছু দৃশ্যমান Relative জগতে থাকিতে পারে না।

কোন আশ্রয় অর্থাৎ শক্তিমান ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে শক্তির অবস্থান
সম্পূর্ণ অসম্ভব—ইহা একটা অবিসংবাদিত, অপ্রাস্ত সত্য বলিয়া
বিজ্ঞানে স্বীকৃত হইয়াছে। চোরে কোন দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে,
ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে অথচ চোরকে দেখিতে পাওয়া
যাইতেছে না। তখন অজ্ঞ অনুসন্ধানী সম্মুখে যাহাকে দেখে তাহাকেই
চোর বলিয়া সাব্যস্ত করে। বৈজ্ঞানিকের বিচারও তদ্রূপ হান্তাম্পদ। বস্তু
ব্যতীত শক্তির অবস্থিতি নাই—এই অপ্রাস্ত সত্য ধারণা তাহাদের উপলব্ধি
হইলেও বস্তুর সন্ধান না পাইয়া জড়কেই বস্তু বলিয়া নির্দেশ করেন ;
উহা বস্তুই নহে, শক্তির একটা বিশেষ অবস্থা মাত্র। ভারতীয়
বিজ্ঞানের চিন্তাশ্রোত পাশ্চাত্য জগৎ প্রাবিত করিলে এই সত্য ধারণাটি
উহার কক্ষিৎ ধরিতে পারিয়াছে। ওজ্জ্বল আজকাল “Mass and
energy are therefore essentially alike” বলিয়া প্রতিধ্বনিত
হইয়াছে।

জড়ানুসন্ধানীর পূর্বকথিত উক্তিটা কিঞ্চিৎ পরিমাণে শুদ্ধ হইলেও এই
প্রাকৃত-বিজ্ঞানেও বিশুদ্ধ গৌড়ীয়গণ ভ্রম দর্শন করেন। শক্তি ও শক্তিমান
একই বস্তু কিভাবে হয় ? তাহা হইলে শুধু শক্তি বা কেবল শক্তিমান এইরূপ

বলিলেই হইত। স্বীয় নিরুদ্ভিতাকে ঢাকিবার জন্ত কেহ কেহ যেমন মূর্খতা-এর দাঁড়ি লম্বা করিয়া দিয়া দন্ত্য-এর স্থায় মাথা কাটিয়া দেয়, শক্তি ও শক্তিমান সমান বলিলে এইরূপ অজ্ঞানতারই পরিচয় পাওয়া যায়। শক্তি ও শক্তিমান অঙ্গাদ্বীভাবে জড়িত, কিন্তু একই নহে। বস্তু ও শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ধারণা বৈজ্ঞানিকদিগের না থাকায় কোন বস্তুর ভর সর্বদা সমান থাকে না—এইরূপ অসংলগ্ন উক্তি তাহারা বলিতে বাধ্য হইয়াছে। কারণ বৈজ্ঞানিকের ‘ভর’ ও ‘শক্তি’ একই বস্তু হওয়ায় একটীর গণনার ভ্রান্তিতে অপরটীতেও ভ্রান্তি আসিয়া যায়। উক্ত ভ্রান্তি অপনোদনের জন্ত ‘ভর’ সর্বদা সমান থাকে না—এইরূপ অসত্য উক্ত হইয়াছে।

সুতরাং জড়বাদী যাহাকে বস্তু বলিয়া থাকেন তাহা প্রকৃতপক্ষে শক্তিই। জড় জগতে যাহা দৃশ্য হয় তাহা কখনই বস্তু নহে। সূক্ষ্ম-বিজ্ঞান-রহিত এরূপ চিন্তা কখনও গৌড়ীয়ের মানসে স্থান লাভ করে নাই।

শক্তি ও বস্তু এক না হইলেও অভিন্ন ; জড়ের

দ্রব্যও পরিবর্তনশীল

বিশুদ্ধ বৈদান্তিকগণ কাহাকে বস্তু বলিয়াছেন তাহার আলোচনায় জড়-বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তির নিরসন হইবে। বৈদিক বিজ্ঞান বলেন, “শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ” অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, কিন্তু উহারা একটীই বস্তু এইরূপ বুঝাইতেছে না। শক্তি শক্তিমানের বহিঃ প্রকাশ, স্বয়ং শক্তিমান নহে। কোন কোন দার্শনিক বলিয়া থাকেন—বস্তু দ্রব্য ও গুণ লইয়া গঠিত, তন্মধ্যে দ্রব্য অপরিবর্তনীয়, গুণ পরিবর্তনশীল ; বিশুদ্ধভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, যেহেতু বিভিন্ন বস্তু ঐ দ্রব্য দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে, অতএব ঐ দ্রব্যও একটী গুণ বা শক্তিবিশেষ।

একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু ; জড় বৈজ্ঞানিকের বস্তু-পরিণাম-বাদ

অযৌক্তিক, বস্তু অপরিবর্তনীয়

“একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ প্রকৃতি আর সব”—এই মহাজন-বাণী হইতে জানা যায়, ঈশ্বরের উদ্দিষ্ট ঈশ্বরই বস্তু, আর সকলই প্রকৃতি অর্থাৎ শক্তি। শক্তি তিন প্রকার,—চিৎ, মায়া ও জড়। জড় একটী শক্তি বলিয়া বর্তমান জগতের ‘শক্তি’ এবং সাধারণ ভাষায় কথিত ‘বস্তু’ একই। আধুনিক বিজ্ঞানের জড়বস্তু ও শক্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ভারতীয় দর্শনে নূতন নহে। বহুকাল পাশ্চাত্যের অধীন থাকায় এই সকল বিজ্ঞানের আলোচনা এই দেশ

হইতে পাশ্চাত্যদেশে চলিয়া গিয়াছে। বৈদিক দর্শন আরও বিচার করিতেছেন, সমগ্র বিশ্ব ও এই জড় জগৎ ঈশ্বরের জড় শক্তিরই রূপান্তর মাত্র। বিজ্ঞানে যেমন শব্দশক্তি বৈদ্যুতিক-শক্তিতে, বৈদ্যুতিক-শক্তি তাপ-শক্তি ইত্যাদিতে পরিণত হয় এবং বিবিধ শক্তির Sum total এক থাকে বলিয়া ধারণা হইয়াছে,—ভারতীয় বিজ্ঞানের চিন্তায় ইহা পূর্বেই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকেই শক্তি-পরিণামবাদ কহে। অপ্রাকৃত বিজ্ঞান 'বেদান্তে'র আলোচনায় শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ও শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু এই সকলের প্রচুর আলোচনা করিয়াছেন। কোন কোন দার্শনিক শক্তি-পরিণাম স্বীকার করিতে চান না—ইহা তাঁহাদের অজ্ঞতার প্রাচুর্য্য এবং বিজ্ঞানোচিত চিন্তের অভাবই ভিন্ন অণু কিছু হইতে পারে না। সুতরাং জড় পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বস্তু-পরিণাম যে নিতান্ত অজ্ঞতাপ্রসূত তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। বস্তু কখনই অণুতে পরিণত হয় না, ইহা অবিকৃত থাকে। বস্তু space time-এর অতীত।

প্রত্যেকটি জড়ের মৌলিক সত্ত্বাগুলি এক,

তফাৎ কেবল পরিমাণগতভেদে

জড় জগতে শক্তি ও শক্তির ধারক একই স্বভাবের, কারণ শক্তিমান বলিতে এখানে কিছুই নাই। আবার এক শক্তি আর এক শক্তিতেও রূপান্তরিত হইতে পারে, জানা গেল। ইহা আর কিছুই নহে, এক জড় হইতে অণু জড় কখনই পৃথক নহে বলিয়াই এইরূপ সম্ভবপর হইয়া থাকে। প্রত্যেক জড়বস্তু গঠনের গুণগত-বিচারে একই, তফাৎ পরিমাণগত-ভেদে। জড়ের প্রচারকগণ অতাপি ইহা বুঝিতে সমর্থ হয়েন নাই। ব্যাস-লেখনীতে এতাদৃশ বিজ্ঞান প্রচুর পরিমাণে বিধে বর্ণিত হইয়াছে। জড়ের কোন গুণগত-ভেদ না থাকায় জড়বস্তু মাত্রেরই নির্বিশেষ। যাহারা অত্যন্ত জড়বাদী তাহারা এইজন্ত জ্ঞাত ও অজ্ঞাত তত্ত্ব-মাত্রকেই নির্বিশেষ স্থির করিয়া ঈশ্বরকেও তদধীন করিয়া ফেলেন। ইহা কিরূপ দুঃখময় তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিবেন। শাস্ত্র বলেন,

পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব শ্রীতে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

ঈশ্বরের শক্তিরই বৈচিত্র্য এই জগতে লক্ষিত হয় মাত্র।

চিৎ ও মায়াশক্তি নির্বিশেষ নহে

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, কোন্ বিশেষত্ব থাকার দরুণ শক্তি ও বস্তুর মধ্যে ভেদ ও নিত্য পার্থক্য স্থাপিত হইয়াছে? বেদান্ত-দর্শন বলেন, “আল্লকৃতে পরিণামাৎ” অর্থাৎ পরব্রহ্মের বিবিধ শক্তির পরিণামে এই বিশ্বাদির সৃষ্টি। চিৎ ও মায়া শক্তিদ্বয় অচেতন নহে বলিয়া তাহাদের মধ্যে কোন নির্বিশেষ সূত্র নাই, কিন্তু জড়-শক্তি নির্বিশেষ।

পূর্বের বিষয়টী অনুধাবন করিতে হইলে শক্তিমত্ত্বের পূর্ণস্বরূপ যাহা আগাদের শাস্ত্রে বর্ণিত আছে তাহার কিঞ্চিৎ দিগদর্শনের প্রয়োজন হইবে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসই সমগ্র সনাতন শাস্ত্রের আবিষ্কর্তা। শ্রীমদ্ভাগবতই ঐ সকল গ্রন্থবিস্তারের মূল মধ্যমণি। সূতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-বলম্বনে বিষয়টীর বিচার হওয়া সুসঙ্গত।

বৈদিক পূর্ণত্বের ধারণায় কখনও ক্ষরতা নাই

ইহজগতে আপন আপন অক্ষমতাহেতু অগম্য বিষয়গুলিকে ‘পূর্ণ’ আখ্যা দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাজনৈতিক, চিকিৎসা, ঐতিহাসিক প্রভৃতি সমস্ত বিভাগেই এই নীতির ন্যূনাধিক অনুসরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যে পূর্ণ নহে তাহা সহজেই অনুমেয়। এসম্বন্ধে পূর্ব প্রবন্ধেও সামান্য আলোকপাত হইয়াছে, আরও অধিকতর বিস্তৃতির জন্ত বর্ণনা করিতেছি। বেদশাস্ত্র কাহাকে পূর্ণ বলেন দেখা যাউক,—

“পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।”

পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

ইহা পূর্ণ, উহা পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলেও পূর্ণ, পূর্ণে পূর্ণবস্তু যোগ দিলেও পূর্ণ। ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর সে-সম্বন্ধে কৃষ্ণলীলায় একটী চমৎকার উদাহরণ পাওয়া যায়।

একবার বালকৃষ্ণ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে অমল যশোপ্রদায়িনী নন্দ-মহারানী কৃষ্ণকে রজ্জুদ্বারা বন্ধনের চেষ্টা করেন। দেখা গেল, যতই রজ্জু আনা হউক না কেন, কৃষ্ণকে বাঁধিতে ছুই আঙ্গুল রজ্জু কম পড়িয়া যাইতেছে। যশোদা মাতা চিন্তা করিলেন, বোধ হয় তিনিই ভুল করিতেছেন; সূতরাং তিনি উল্টাভাবে রজ্জু টানিতে লাগিলেন। তাহাতেও পূর্ববৎ ফল লাভ করিয়া যশোদাদেবী বিমূঢ় হইয়া বিষয়টী ভাবিতে লাগিলেন।

ইহাই ভারতীয় বৈদিক-দর্শনের পূর্ণত্বের বিষয়; গাণিতিক ক্ষেত্রে

Infinite Series-এর যোগ হইয়া থাকে। যদি উহা অনন্তই হইবে তবে উহার যোগফল যে সম্ভবপর হইত না, ইহা কি স্পষ্ট নহে?

জড়পূর্ণত্বের নিকট বৈদিক পূর্ণত্বের চিন্তা কত বড় তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে চিন্তা করিয়া উঠা যায় না। রজ্জুতে যত রজ্জুই যোগ করা বা বিযুক্ত হইতেছে মূল বস্তু কৃষ্ণের কোন পরিবর্তন হইতেছে না। তাহার স্বরূপ অবিকৃত থাকে বলিয়া উক্ত স্বরূপের বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন হইতেছে না। একবার তাহাকে যে পন্থায় বাঁধা যাইল না সেই পন্থার ঈষৎ পরিবর্তনেও কোন ফল ফলিল না। সেজন্ত যশোদা দেবী সর্বাবস্থাতেই একই ভাব দেখিয়া হতাশ হইয়া গিয়াছেন। তিনি দড়ি উল্টা, সোজা, কম, বেশী সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়া কৃষ্ণের কোনও পরিবর্তন করিতে পারেন নাই। অনন্তর ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তা করিলে স্বয়ং কৃষ্ণ কৃপাপূর্বক যশোদা মাতার ভক্তিপ্রভাবে রজ্জুতে আবদ্ধ হন, যশোদা দেবীও আনন্দ অনুভব করিলেন। সচ্চিদানন্দ পূর্ণবস্তুকে লাভ করিতে হইলে ঐ প্রকার পূর্ণ পন্থারই প্রয়োজন, “কৃষ্ণভক্তি চিরকাল উপায়, উপেয়” —এই গৌড়ীয়-বাণীই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। এইপ্রকার বিজ্ঞান অদ্বাপি জড়জগতে দেখা যায় নাই, যাইবেও না। (ক্রমশঃ)

—শ্রীকৃষ্ণাবনবিহারী ব্রহ্মচারী B. E. (Cal.)

অপ্রাকৃত-বাণী

ধরমের গ্রানি উঠে, হাহাকার চারিদিকে,

তারি মাঝে নিভাঁক কে তুমি?

নিবিবকার নিবিবকল্প ধৈর্য্য স্থৈর্য্য নহে স্বল্প

ভুলুপ্তিত তোমা প্রণমামি ॥ ১ ॥

অন্ধমত বাহিরায় মদমত্ত এ ধরায়,

কাঁপাইল ত্রিভুবন এবে।

জেগে উঠে মহারণ, নারিবারে নিবারণ

ভক্তের এ ভবের কি হবে?? ॥ ২ ॥

বেগে ধায় মূঢ় অন্ধ, হরিকথা হ'ল বন্ধ

কাঁদি উঠে ভকত-হৃদয়।

অন্তরের গলাবাজি চরমে উঠিছে আজি
সংহারিবে এ ভব নিশ্চয় ॥ ৩ ॥

বেড়িয়াছে দাবানল, ভক্তবৃন্দ সুবিহ্বল,
দশদিকে মহা সোরগোল ।

মায়ার নফর-ঘোরে কালরূপী সর্প ফিরে
ধ্বনি উঠে শুধু “হরিবোল” ॥ ৪ ॥

এ কা’দের শবযাত্রা ? গরলের অল্লমাত্রা
শ্মশানিল অজনাভবর্ষ ।

শুদ্ধভক্তি-কথা যত মারণের মুখে হত
সুরাসুরে বাধিল সংঘর্ষ ॥ ৫ ॥

রণারণি, হাতাহাতি— তাণ্ডব-নৃত্যেতে মাতি’
অধোমস্থী পাষণ্ডী সমাজ,
ভোগাভাবে ক্ষীণদেহ জর্জরিত বলে কেহ,
“দুর্য্যোধন, অন্তরে বিরাজ” ॥ ৬ ॥

তোমার অমৃত (?) বাণী- ‘ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই জানি
ধর্ম্মে কিন্তু নাহিক প্রবৃত্তি ।

অধর্ম্মে নিবৃত্তি নাই যা’ করাও করি তাই
হৃদি মোর হ্রদীকেশ-স্থিতি’ ॥ ৭ ॥

‘মুক্তি-ইচ্ছা নাহি চিতে বৈরাগ্যের সাধনেতে
বন্ধনেই মুক্তি মোর আশ” ।

পরিহাসি’ স্ব-অন্তরে দৈবমায়া বলাৎকারে
জীবগলে দিলা কর্ম্মফাঁস ॥ ৮ ॥

“যত মত তত পথ, সবধর্ম্ম একমত,
গীতা ছাড়ি’ বল খেলা ধর ।

অনেক পেলেছ ধর্ম্ম, পেয়েছ কি কোন শর্ম্ম (?)
ক্ষুধাবশে শুধুই কাতর ॥ ৯ ॥

রুটি-জল দেয় যেই ভগবান জান সেই
সেই 'ভগবানে' কর রতি ।"

কাকবিষ্ঠা আরো কত রহিয়াছে শত শত
ভোগাভাবে মতিচ্ছন্নগতি ॥ ১০ ॥

অশুরের শাস্ত্রচুরি প্রাদেশিক বাক্যতরী
নারিলা বুঝিতে অজ্ঞগণ ।

অবিद्या-সাগর-তীরে তূর্ণ-গতি ধাই, ধীরে
লাফ দিয়া মরে অনুক্ষণ ॥ ১১ ॥

অস্মিতা, রাগ, ঘেঘ, দ্বিতীয়াভিনিবেশ-
সমুদ্রের রুদ্রমূর্ত্তি হেরি' ।

উঠিছে প্রবল ঢেউ পারাবারে নাই কেউ
ডুবিয়াছে দাঁড়ি, মাঝি, তরী ॥ ১২ ॥

ছয়বেগ-ঘন কাল ছয় দোষে নিভে আল
অটুহাস্য করে সৌদামিনী ।

কালের করাল দংষ্ট্রা নানামদোনন্দ-নক্সাঃ
ভক্ত ল'য়ে খেলে ছিনিমিনি ॥ ১৩ ॥

'স্বাধীনতা স্বাধীনতা' চীৎকারে ধরায় মাথা
নাহি জানে কেন ইহা চায় ।

ভোগ-সমুদ্রোন্মিফেন উন্মত্ত হইয়া আজ
মায়ামুক্ত জীবেরে নাচায় ॥ ১৪ ॥

সহসা এ কা'র বাণী বিনোদ ধরিল আনি,
ঝাপ দিলা কে এই সাগরে ?

সুগম্ভীর বাক্য-দ্বারে বেত্র মারি' এ গোথরে
ভক্তে রক্ষে অকূল পাথারে ॥ ১৫ ॥

কে এই বৈকুণ্ঠদূত সাথে গৌরজনায়ুত
সিংহরবে চৌদিকে বেড়ায় ।

হুহুকারি' বজ্রনাদে, চূর্ণ করি ভোগবাদে,
নাস্তিকের রুধির বহায় ॥ ১৬ ॥

বজ্রকণ্ঠে হেন বাণী শ্রবণে প্রমাদ গনি'
অমুরেরা পলায় ফুকারি ।
সাসোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদে জড়সাম্যে দলি' পদে
হরিভক্তে তুলে রথোপরি ॥ ১৭ ॥

উল্কাবৎ দ্রুতগতি কৃষ্ণমদে স্ফীত অতি
কে পাতিলা অমুরমারণ-ফাঁস ?
কাঁহার কেশরীমূর্ত্তি পাষণ্ডী জড়াক্ত ব্যক্তি
হেরি' মনে উপজিলা ত্রাস ? ১৮ ॥

বরিশালে সভাস্থলে কোন্ বাণী গর্জে বলে—
“হরিসেবা আমার বিচার ।
ভোগীসেবা ধ্বংসিবারে পারি আমি করিবারে
লক্ষ লক্ষ প্রাণের সংহার” ॥ ১৯ ॥

কলিচর বাড়ি' যবে কৃষ্ণরাজ্য লুঠি' লবে
অশ্লীলতা ভরিখে এ দেশ ।
নগদেহে বাত-গীত, স্ত্রীনৃত্যে ভোগীর প্রীত,
কলিচরে কে করিবে শেষ ? ২০ ॥

কৃষ্ণ অতি দয়াবান্, ‘বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্,’
জগজ্জীবে কৈলা উপদেশ—
“স্তুক্ হবে উৎপাত হুংকলে পুরুষোত্তমাং,”
লিখিলেন মহামুনি ব্যাস ॥ ২১ ॥

শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যকার বলদেব, খ্যাতি য়ার
অপ্রাকৃত বিচার ভূষণ ।

কূট তত্ত্ব বিচারিতে ‘প্রমেয় রত্নাবলী’তে
ধরিলেন পাদ্মের বচন ॥ ২২ ॥

কাঁর তরে এই বাণী বিতরেন কোন্ বাণী
কোন্ 'বাণী' স্মুরান লেখনী ?

কোন্ 'বাণী' রাজ্যসুখ ছাড়ি' সদা কৃষ্ণোন্মুখ-
শিক্ষা দেন আচরি' আপনি ॥ ২৩ ॥

কুলিয়ার পাষণ্ডীরা কাঁর ভয়ে হ'ল সারা
হিংসি' ভক্তশ্রেষ্ঠ সজ্জনেরে ।

বর্ষমধ্যে গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত লোকচক্ষে,
ডাক ছাড়ে, "বাবারে, বাঁচারে" ॥ ২৪ ॥

কোন্ 'বাণী' গুণ্ডা দলে, ফুৎকারে অবহেলে
সজ্জনের বাড়াতে উল্লাস,

নাস্তিক 'ষণ্ড সমাজ সংশিক্ষা পেয়ে আজ
(অপ্রাকৃত)-'বাণী' তরে ছাড়ে ভোগবাস ॥ ২৫ ॥

অশ্বরের ষড়যন্ত্র— সাম্যবাদ, ভোগতন্ত্র
কাঁহা হ'তে হৈল খানখান ?

গৌড়ীয়-নিশান উড়ে সবাকার ঘরে ঘরে
গোলোকেতে বাজিল বিষাগ ॥ ২৬ ॥

পিতা হবে কে তাঁহার, সেই শক্তি আছে কাঁর
হরিজনে যে দিবে প্রমোদ ।

এত চিন্তি' গৌরচন্দ্র— বৈকুণ্ঠ-ধামরথীন্দ্র
প্রেরিলেন শ্রীভক্তিবিনোদ ॥ ২৭ ॥

ভকতিবিনোদ ধন্য যাঁরে কৃপা শ্রীচৈতন্য
করিলেন আপনি স্বয়ং ।

উদ্ধারিলা লুপ্ততীর্থ, ধামভোগী হল ব্যর্থ
অনার্যের কপট উত্তম ॥ ২৮ ॥ (ক্রমশঃ)

—শ্রীরসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী, B. A.

অমূল্য কণ্ঠের কয়েকটি ধ্বনি গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-বিগ্রহ শ্রীমদ্ কেশব গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতার চুসক

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-নিবৃত্তে
(শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ায় মঠ, ৩রা আষাঢ় ১৩৭৩)

শোক আর বিরহ—এই দুটোর একটা পার্থক্য নিবেদন করি। শোক বন্ধনের কারণ, আর বিরহ-ব্যথা মোক্ষের কারণ। লোকে মহাপুরুষগণের বিরহ অনুভব করলে মুক্তিলাভ করবে। ইহলোকে স্বজনগণের মৃত্যুতে যে শোকগ্রস্ত হওয়া তা'তে বন্ধন বেড়ে যাবে। এই শোক মানুষকে বদ্ধদশায় নিয়ে যায়। পিতা মারা গেলে পুত্র যদি চীৎকার ক'রে কান্নাকাটি করে, তবে পুত্রকে নরকে যেতে হবে। স্বামী, স্ত্রী, মাতা প্রভৃতির বিয়োগেও এই প্রকার। এইগুলি বন্ধনের কারণ। এইপ্রকার শোকাতুরগণকে মায়া একটা নরককুণ্ডে ফেলে দেবে।

মহাজনগণের বিরহতে যদি কেহ চীৎকার ক'রে কান্নাকাটি করে তবে সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভ করবে, মায়া সেখান থেকে পলায়ন করবে। * * ঠাকুরের শতবার্ষিকী, সহস্রবার্ষিকী যা' করা হোক না কেন এগুলো নরকে যাবার রাস্তা—এটা খোলসা করেই বলছি, ঢাকঢাক গুড়্গুড়্ করার কিছু এতে নেই। এই সকল জাগতিক ব্যক্তির বার্ষিক উৎসবও তাই। পৃথিবীর লোক নরক পছন্দ করে, সেইজন্ত নরকস্থ হবার লোকগুলি এইভাবে নরকের রাস্তাগুলি পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে। এই সকল নরকের মধ্যে যে পচা তুর্গন্ধ-গুলো ছিল, হিন্দুবিরোধী ব্রাহ্মকবি সেইগুলো দাড়ি-চুল দিয়ে ঢেকে রাখত যা'তে সেই পচা তুর্গন্ধ অণ্ডে কেহ না পায়; * *লাল ও তা'র দল আজকাল যেমন হ'য়েছে। এরা নরককুণ্ডে যাবার রাস্তা পরিষ্কার করেছে। আমরা সেরূপ নরককুণ্ডে যাবার ব্যবস্থা করিনি। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নরক থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছেন, মাসিক কার্য থেকে উদ্ধারলাভ করানই তাঁর চেষ্টা।

সারা জন্ম মাসিক কার্যকে আমরা জীবনের সার ক'রে নিয়েছি। আজ-কাল ধর্মের ঢাক পিটিয়ে এক একটা পয়সা রোজকারের কারখানা হ'য়েছে,

এক একজন L. I. C. খুলে বসেছে। এই সমস্ত ধর্মভাণ্ডারিগণ বেশ ভাল ভাবেই বুঝে নিয়েছে যে কলির লোক ভোগপিপাসু, স্ত্রতরাং ভোগকে ধর্ম বলে জানালে লোক পাওয়া যাবে। নাম করে বলতে দোষ নেই, * * ঠাকুর এইরূপ একটা অপদার্থ। সত্যকথা বলতে আমি defama-
tion-এর ভয় করি না, এর জন্ত যদি জেল হয় সেটা বৈকুণ্ঠ হবে, জেল হবে না।

তা'র মূলমন্ত্রই হ'ল, 'বাঁচাবাড়া'। ছাগল, কুকুর ভেড়া সকলেই ত বাঁচে ও বাড়ে; স্ত্রতরাং এতে আর নূতনত্ব কি? তবে ভগবানের ইচ্ছায় কয়েকটা সত্য কথা সে বলেছে—“আমি কুকুর হয়ে বিষ্ঠা খাই, ছাগল হ'য়ে পাতা খাই.....ইত্যাদি।”

‘জীবই শিব’—এইরূপ একটা ভণ্ড মতও আজকাল চলছে। এগুলো বদমাইসি করার বুদ্ধি, মাতৃগমন করার সাধনা। এইসব মত যদি সত্য হ'ত তবে বাংলা-দেশটা মুক্ত পুরুষের দেশ হ'য়ে যেত।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর খুব নরমভাবে এগুলি থেকে সাবধান হওয়ার কথা বলেছেন—মরাটা বাঁচা নয়। কেহ কেহ ছুঃখ থেকে বাঁচতে আত্মহত্যা করে, সেটা Criminal offence (ফৌজদারী অপরাধ)।

বিরহ আর শোক—উভয় ক্ষেত্রেই চোখ দিয়ে জল পড়ে। বাহ্যত দুটো একই রকম দেখালেও সম্পূর্ণ পৃথক, বিরহ ও শোকের মধ্যে স্বর্গ-নরক তফাৎ বিদ্যমান। একবার বিরহ-বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীল প্রভুপাদের চোখ দিয়ে বিরহাশ্রু পড়ে। সেটা দেখে একজন নির্বোধ শ্রোত্রী মেয়েছেলে বললে কিনা, “দেখেছিস্, মায়া কি সহজে যায়”! আমি তখন বলি—“হারাম-জাদী, মায়া কা'কে বলে তুই জানিস্, মায়া তোর্ হ'য়েছে।”

‘ভগবান মন্দিরে নেই, তিনি মাঠে আছেন’ যেখানে নাকি পায়খানা করা হয়। কেউ বলে, মহাপ্রভু মাথায় তেল মাখতেন, কারণ তিনি পাগল ছিলেন। এগুলি যা'রা বলে তা'রা কিসের বাচ্চা বুঝে উঠতে পারছি না।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইসব ছঃসঙ্গ থেকে উদ্ধার পাবার পথ বাংলা দিয়েছেন। আমরা কঠিন কথা বলব, সহজ কথায় কাজ হয় না। Spare the rod and spoil the child. হাজারের মধ্যে নয় শত নিরানব্বই জন মরুক একজন ভাল হোক, তাহলেই চলবে। সকলেই মায়া'র মধ্যে যায়, তাই বলে আমরা যাব কেন?

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন দিনসে

কোন বৈষয়িক উন্নতি, কোন সাংসারিক উন্নতি থাকলে আমরা সকলেই গুণ্ডিচাবাড়ী যেতাম। অনেক মেয়েদের ব্যাঙ্কে টাকা থাকে, সেখানে টাকা তুলতে যেতে কোন বাধা নেই, বাধা শুধু গুণ্ডিচাবাড়ী যেতে। একটা চলতি কথা আছে, “লজ্জা ঘৃণা ভয়, এ তিন থাকতে নয়।” ভয়—আজকালকার দৈত্য-দানবগুলির, লজ্জা—তিলক-মালা ধারণ করা, ঘৃণা—লোকে ঘৃণা করবে ধর্ম্য করার জন্ত।

অমূল্য বস্তু ভগবানকে লাভ করার জন্ত একটু কষ্ট করতে আমরা রাজী নই। শ্রীমদ্ভাগবতে যাজ্ঞিক পত্নীদের উপাখ্যান আমরা জানি—স্বয়ং ভগবান এসে গিয়েছেন, ভগবানদ্বয় এসে গেছেন; স্মতরাং যাজ্ঞিক পত্নীরা ‘থাক, তোমরা কর’, এই বলে যজ্ঞ ছেড়ে চলে গেল।

নানা দেবদেবীর পূজা-পার্বণে লোকে বহু পয়সা খরচ করে। ঐ সকল পূজা ছেড়ে দিয়ে যাজ্ঞিক পত্নীদের কথা যে পুস্তকগুলিতে লেখা আছে সেই সকল পুস্তকের একটা পড়ে দেখুন না কেন কি লেখা আছে তা’তে। যাজ্ঞিক পত্নীরা বলেছিল, “কৃষ্ণ-বলরামের দর্শন লাভ করলে এক পলকে আমরা অনন্ত কোটী যজ্ঞের ফল পেয়ে যাব।” কৃষ্ণ গোয়ালার ঘরের ছেলে আর যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; এঁরা সকলেই অবস্থাপন্ন। ঐ প্রকার উচ্চ ব্রাহ্মণকুলের মেয়েরা যাচ্ছে কিনা গোয়ালী দেখতে। এতে তা’রা কোন লজ্জা করেনি, একটু ভয়ও করেনি যে স্বামীরা কিছু বলবে। বিষয়টা আমাদের চিন্তা করতে হবে,—আমরা কি কাজ করব, কি জন্ত আমরা বেঁচে আছি। জীবনের ৪০।৫০ বছর কেটে গেল, কিন্তু এখনও মায়া কাটছে না।

আজ ঝাঁটা বইবার দিন গিয়েছে, ঐ ঝাঁটা নাস্তিকের মুখে মারার জন্ত। বিচার, আচার সব ছেড়ে দিয়েছি, গল্ফায় গা ভাসিয়ে দিলাম, যেখানে লাগি সেখানে থাকব—এটা কি ধরনের চিন্তা? সেজন্ত ভগবান আমাদের এমন করে শিক্ষা দিয়েছেন যে আজকাল ঐ খাওয়া-দাওয়া-থাকাটাও খুব কণ্ঠের কথা হ’য়েছে।

হিন্দু-ইসলামের প্রভেদ কোথায়?

অনেক স্থানে আমি বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাকিস্থানের হিন্দুদের অবস্থা বলেছি। যে-মুসলমানরা হিন্দুদের অত্যন্ত ভয় করত, তা’রাই এখন

হিন্দুদের ধরে মার লাগাচ্ছে। একরূপ করছে কেন?—তা'রা দেখছে হিন্দুদের এখন কোন বিশেষত্ব নেই; হিন্দুরাও লুন্ডি, মুরগী, পেঁয়াজ, রসুন সবটাই ধরেছে। তা সত্ত্বেও হিন্দুরা পাকিস্থান ছেড়ে চলে আসছে। তা'রা বলছে, “আমরা ধর্মের জন্ত প্রাণ দেব, তাই পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছি।” যে ধর্মের জন্ত মানুষ প্রাণ দিতে রাজী আছে, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব পরিত্যাগ করতে রাজী আছে এখানে সেইটাই ফাঁকা। গীতায় আছে, “পরধর্মো ভয়াবহঃ”। আগে আমরা ছিলাম অমুসলমান, এখন হ'য়েছি ভারতীয়, হিন্দু বলার যো নাই। এই যে বাড়ীর পাশের লোক, যা'দের অসভ্য জানোয়ার বললেও ক্ষতি হয় না, দেখছে মন্দিরে আরতি হয়, তথাপি মুরগী পুষছে; লজ্জাও করে না। এই সকল কুকর্ম ঘণিত কার্য্য করতেও লজ্জা-ঘৃণা-ভয় পরিত্যাগ করতে হয়।

দৈত্য-দানবগুলো পেঁয়াজ, রসুন খেয়ে মরছে। ওরা ভাবছে, ওতেই ওরা বাঁচতে পারবে। তা' কিছুতেই হবে না। তমোগুণকে সত্ত্বগুণের কাছে মাথা নোয়াতেই হবে। আজকাল অনেক রাক্ষস ডাক্তার হ'য়েছে। তা'রা বলে, “ও! তুমি বৈরাগী হ'য়েছ; এখনিই শূ্যোর-ভেড়া খাও তাহলেই জ্বর সেরে যাবে”। ঐ সব ডাক্তাররা বাড়ী আসলে ওদের সামনেই স্থান গোবর দিয়ে লেপে দিতে হয়। আমি এরকম একটা করেছি। পূর্বাশ্রমে আমার বাল্যকালে একরূপ একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমার সাধনে একজন ডাক্তার একটা বিধবা রোগীকে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে পথ্যের ব্যবস্থা করেছিল। আমি সেই ডাক্তারটিকে ডেকে বললাম, “আপনি দেখলেন না যে এই মেয়েটি বিধবা? বিধবারা মাছ খায় না, তথাপি একে মাছের ঝোল খেতে দিলেন কেন?” ডাক্তারটি বললে, “ভুল হ'য়েছে।” আমি বললাম, “ভুলই যখন হ'য়েছে তাহলে কাণটা মলে দিই?” ডাক্তারটির বয়স আমার থেকে প্রায় ত্রিশ বছরের বড় ছিল।

রাজার পাশে রাজ্যনাশ

এখন খাবার চিন্তা করতেই সারা দিন যায়। প্রফুল্ল সেনের মাধ্যমে ভগবানের মার প্রকাশ পাচ্ছে। সারাটা দিন চাল-ডাল যোগাড় করতেই কেটে যাবে। আমরা একাদশী করতে পারি না, সেন মশাই কিন্তু

বলেছেন, “সপ্তাহে একদিন উপবাস দাও”। এগুলো ভগবান জোর করে শিক্ষা দিচ্ছেন। আমাদের ধর্মজীবন নষ্ট হ’য়ে গেলে দুঃখের সীমা থাকবে না। হ’য়েছেও তাই, রাজার পাপে রাজ্যনাশ। রাজাকে অত্যাচারী করলে সমস্ত দেশ ধ্বংস হ’য়ে যাবে, ঈশ্বর তা’ই করেছেন। রাজা বিদ্রোহী হ’লেও ভগবত্তত্ত্বের কেউ কিছু করতে পারবে না।

গুণ্ডিচা-মার্জনের অর্থ

গুণ্ডিচামার্জনের অর্থ—মন্দির মার্জ্জন করা। রূপক হিসাবে বলা হ’য়েছে হৃদয়ে যে ময়লা আছে তা’ কাঁটিয়ে বের করে দিতে হবে, তবেই জগন্নাথদেব তথায় বসবেন। জগন্নাথদেব এই লীলা প্রকাশ ক’রে আমাদের ভগবান্দির পরিষ্কার করা ও ভগবৎসেবা শিক্ষা দিচ্ছেন। জগন্নাথদেব মথুরা থেকে বৃন্দাবনে যাচ্ছেন। গোপীরা কি করবে, গয়লানীরা গরীব লোক; তাই তা’রা কাঁটা দিয়ে জগন্নাথের স্থান সাফ্ করছে। গুণ্ডিচা-মার্জ্জন বললে মোটামুটি এই বুঝাবে। আগামী কাল সকালে জগন্নাথদেব গুণ্ডিচাবাড়ী যাবেন। আপনারা সেখানে অভিমান ত্যাগ করে যাবেন।

রথযাত্রায় গোড়ীয়-বৈষ্ণবদের ভাবধারা

বর্তমানে পুরীর রথযাত্রা-পদ্ধতি মহাপ্রভুই প্রচলন করেন। মধ্বাচার্য্য বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ, শঙ্কর প্রভৃতি সকল আচার্য্যই জগন্নাথের সেবা করেছেন; সেই সেবায় ষোল আনা বা কিছু কম ঐশ্বর্য্যভাব আছে। মহাপ্রভুর সেবা-পদ্ধতি সম্পূর্ণ মাধুর্য্যারসের বিচারে প্রতিষ্ঠিত। গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ আমরা সেই পদ্ধতি-অনুসারেই জগন্নাথদেবের সেবা করি। এটা ভজনের একটা প্রধান অঙ্গ যে কৃষ্ণকে রাধারানীর, গোপীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কৃষ্ণ রাধারানীর কাছে থাকলেই সবচেয়ে বেশী সুবিধা ভোগ করবেন। পাহাণ্ডীরা জগন্নাথদেবকে বধে তুলে নিলে লক্ষ্মীর দল প্রবল হ’য়ে জগন্নাথদেবের অলঙ্কারাদি খুলে নেয়; গোপীদের দল তখন ফুলসজ্জায় জগন্নাথদেবকে সজ্জিত করেন। (ক্রমশঃ)

—সংগ্রাহক, শ্রীনবযোগেন্দ্র ব্রহ্মচারী

প্রচার-পত্র


কুচবিহারীর বৈকুণ্ঠবাণীতে পর্যটন

ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থান হইয়া হরিকথা প্রচারার্থ জিলাসহর কুচবিহারে সসজ্জ উপস্থিত হইয়া স্থানীয় 'পাহনিবাসে' অবস্থান করেন। স্বামীজী মহারাজের ওজস্বিনী ভাষায় ধর্মবক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কুচবিহার-নিবন্ধ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি অপ্ৰাকৃত-বৈকুণ্ঠবাণীর রসাস্বাদনে তৃপ্ত হইয়াছেন। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ হলে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। এস্থলে বিখ্যাত 'মদনমোহন বাড়ী' হইতেও স্বামীজী মহারাজের ভাগবত পাঠের আহ্বান আসে। কুচবিহার জিলার প্রায় সর্বত্র একলা মদনমোহন সেবিত হন। শক্তি ব্যতীত কেবল শক্তিমানের পূজা অবৈধ—স্বামীজী মহারাজ শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। এতৎ সহরের বহু সজ্জন স্বামীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া প্রচারকার্যে সাহায্য করেন। অতঃপর স্বামীজী মহারাজ আসাম প্রদেশের ধুবড়ীতে গমন করেন। এইস্থানের বিখ্যাত 'হরিসভা'-ভবনে বহুজন-সমক্ষে ভাগবত পাঠ, বহুস্থানে ছায়াচিত্রযোগেও হরিকথা পরিবেশনান্তর ক্রমশঃ মঠেরঝাড়, বাসুগাঁও প্রভৃতি হইয়া স্বামীজী শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে অবস্থান করিতেছেন

সাত্ত্বত-শ্রাদ্ধ

গত ৮ই শ্রাবণ বিহারে ছুমকা জিলার ধাদিকা গ্রামনিবাসী সমিতির আশ্রিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাস ব্রহ্মচারী মহাশয়ের লৌকিক পিতৃদেব পরলোকগমন করিয়াছেন। বিগতাত্মার অত্মাত্ম পুত্রগণ স্মার্ত্ত-সমাজে আবদ্ধ হইলেও শ্রীযুক্ত রসিকরঞ্জন প্রভুর নিকট তাঁহার স্মার্ত্ত-বিচারে পরাস্ত হইয়া সাত্ত্বত-শ্রাদ্ধের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং তদনুসারেই পিতৃদেবের শ্রাদ্ধনির্বাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির আচার্য্যাদেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের আদেশে পূজ্যপাদ ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ শ্রীপাদ ত্রিদিগ্বী মহারাজ এবং কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ উক্ত সাত্ত্বত-শ্রাদ্ধকার্য সম্পাদনে ধাদিকা গমন করেন। নানাবর্ণে রঞ্জিত বৈদিক শৃঙিল নির্মাণপূর্বক তদুপরি বাসুদেবার্চন, ভোগ-রাগ ও হোম-যাগাদি সুসম্পন্ন হয়। এই শ্রাদ্ধবাসরে জিলাসহর ছুমকা হইতে বহু উচ্চপদস্থ অফিসার উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সকলেই এই সাত্ত্বত-শ্রাদ্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া এতই বিস্মিত হন যে 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস' ও 'শ্রীসংক্রিয়াসার দীপিকা'র বিচারে শ্রদ্ধাবান হইয়া উক্ত স্মৃতিদ্বয়ের বিপুল-প্রচারে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং স্মার্ত্তের প্রেতশ্রাদ্ধে বীতস্পৃহ হন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

ধর্মঃ সমুদ্ভিতঃ পুংসাং বিশ্বকুসেন-কথাস্থ যঃ ॥	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।</p>  <p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা যন্মাদ্ভাঃ সুপ্রসীদতি ॥</p>	নোংপাদরেদযদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥
সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আশ্রম-পরসম । অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যশূন্য ॥	অত ধর্ম মুহূরুপে পালে যেই জন । হরি-কথার বক্তি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥	

১৮শ বর্ষ } ক্ষীরোদশায়ী, ১৮ হনীকেশ, ৪৮০ গৌরাক্ষর { ৭ম সংখ্যা
 শনিবার, ৩১ ভাদ্র, ১৩৭৩; ইং ১৭৯১-১৯৬৬

শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে একাদশোহধ্যায়ঃ

মানবানাম্ বর্ণধর্মো-নির্ণয়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

শ্রদ্ধেহিতং সাধুসভা-সভাজিতং

মহত্তমাগ্রণ্য উরুক্রমাত্মনঃ ।

যুধিষ্ঠিরো দৈত্যপতেমুদাঘিতঃ

পপ্রচ্ছ ত্বয়ন্তনয়ং স্বয়ন্তুতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন.—মহত্তমদিগের অগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির ভগবদাশ্রয় দৈত্য-পতির সাধুসভায় আদরনীয় চরিত্র শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্ম-তনয় নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি নৃণাং ধর্ম্যং সনাতনম্ ।

বর্ণাশ্রমাচারযুতং যৎ পুমান্ বিন্দতে পরম্ ॥ ২ ॥

শ্রীযুগিষ্ঠির কহিলেন,—হে ভগবন্ য়ে ধর্ম হইতে পুরুষ ভগবদ্ভক্তি প্রাপ্ত হয়, আমি আপনার নিকট মনুষ্যদিগের সেই বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত সনাতন ধর্ম গুণিতে ইচ্ছা করি ॥ ২ ॥

ভবান্ প্রজাপতেঃ সাক্ষাদাত্মজঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।

সুতানাং সম্মতো ব্রহ্মংস্তপোযোগসমাধিভিঃ ॥ ৩ ॥

হে ব্রহ্মন্, আপনি পরমেষ্ঠী প্রজাপতির সাক্ষাৎ আত্মজ এবং তপস্শ্রা, যোগ ও সমাধি দ্বারা তাঁহার অত্মপুত্রগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ৩ ॥

নারায়ণপরা বিপ্রা ধর্ম্যং গুহ্যং পরং বিদুঃ ।

করুণাঃ সাধবঃ শাস্ত্রাস্তদ্বিধা ন তথাপরে ॥ ৪ ॥

আপনার ছায় শাস্ত্রস্বভাব, দয়াবান্ এবং নারায়ণপরায়ণ সাধু ব্রাহ্মণগণই যেক্রপ গুহ্য পরম ধর্ম অবগত আছেন, সেক্রপ অপরে নাই ॥ ৪ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

নহা ভগবতেহজায় লোকানাং ধর্ম্যসেতবে ।

বন্ধে সনাতনং ধর্ম্যং নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন,—লোকসকলের ধর্ম-রক্ষক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া নারায়ণ প্রমুখাৎ শ্রুত সনাতন-ধর্ম কহিতেছি (শ্রবণ কর) । ৫ ॥

যোহবতীর্ঘ্যাত্মনোহংশেন দাক্ষায়ণ্যাস্ত ধর্ম্যতঃ ।

লোকানাং স্বস্তয়েহধ্যাস্তে তপো বদরিকাশ্রমে ॥ ৬ ॥

তিনি স্বীয় অংশের সহিত ধর্মের ঔরসে দক্ষ-কন্যা মৃতির গর্ভে আবির্ভূত হইয়া, নিখিল প্রাণিগণের মঙ্গলের জন্ত অতাপি বদরিকাশ্রমে তপস্শ্রা করিতেছেন ॥ ৬ ॥

ধর্ম্যমূলং হি ভগবান্ সর্ববেদময়ো হরিঃ ।

স্বতঞ্চ তদ্বিদাং রাজন্ যেন চাত্মা প্রসীদতি ॥ ৭ ॥

হে রাজন্, সর্ববেদময় ভগবান্ হরিই ধর্মের মূল ও বেদবেত্তাদিগের স্মৃতি ও প্রমাণস্বরূপ; যে ধর্ম দ্বারা মন প্রসন্ন হয় ॥ ৭ ॥

সতং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ ।

অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জবম্ ॥ ৮ ॥

সন্তোষঃ সমদৃক্ সেবা গ্রাম্যোহোপরমঃ শনৈঃ ।

নৃণাং বিপর্য্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনম্ ॥ ৯ ॥

অন্নাত্মাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্থতঃ ।

তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ স্মৃতরাং নৃষু পাণ্ডব ॥ ১০ ॥

শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্ত্য স্মরণং মহতাং গতেঃ ।

সেবেজ্যাবনতির্দাস্ত্যং সখ্যমাত্মসমর্পণম্ ॥ ১১ ॥

নৃণাময়ং পরো ধর্মঃ সর্বেষাং সমুদাহৃতঃ ।

ত্রিংশল্লক্ষণবান্ রাজন্ সর্বাত্মা যেন তুষ্যতি ॥ ১২ ॥

(মনুষ্য মাত্রের সাধারণ ধর্ম কথন) সত্য, দয়া, তপস্যা (একাদশী প্রভৃতিতে উপবাস), শৌচ (স্নান), তিতিক্ষা, ঈক্ষা (যুক্তাযুক্ত বিবেক), শম (মনের সংযম), দম (বাহুন্দ্রিয়ার দমন), অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগ, দান, স্বাধ্যায় (যথোচিত জপ),—আর্জ্জব (সরলতা), সন্তোষ, সমদর্শী মহতের সেবা, ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তক কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি, মানবগণের নিষ্ফল কার্যাদর্শন, মৌন (বৃথা আলাপ পরিত্যাগ), আত্ম বিবেক, প্রাগী-দিগকে যথাযোগ্য অন্নাদি-বিভাগ, সকল ভূতে আত্ম ও দেবতা-জ্ঞান ও মনুষ্যগণকে তদ্রূপ বুদ্ধি, মহদ্বগণের আশ্রয় ভগবানের গুণকর্ম্ম-শ্রবণ-কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, ইজ্যা (পূজা), অবনতি (নমস্কার), দাস্ত্য, সখ্য, আত্মসমর্পণ; হে রাজন্, এই ত্রিশটী মনুষ্য মাত্রেরই পরম ধর্ম্মরূপে ঋষিগণ কর্ত্তক নিরূপিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা সর্বাত্মা ভগবান্ সন্তোষ প্রাপ্ত হন ॥ ৮-১২ ॥

সংস্কারা যত্রাবিচ্ছিন্নাঃ স দ্বিজোহজো জগাদ যম্ ।

ইজ্যাধ্যয়নদানানি বিহিতানি দ্বিজন্মনাম্ ।

জন্মকর্ম্মাবদাতানাং ক্রিয়াশ্চাশ্রমচোদিতাঃ ॥ ১৩ ॥

যাঁহার সমস্তক গর্ভধানাদি সংস্কারসকল অবিচ্ছিন্ন এবং ব্রহ্মা যাঁহাকে অনুমোদন করেন, তিনিই দ্বিজ। কুল এবং আচারে পরিপুষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্ম যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-বিহিত ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

বিপ্রস্তাধ্যয়নাদীনি ষড়্‌শ্চাস্ত্রাপ্রতিগ্রহঃ ।

রাজ্ঞো বৃত্তিঃ প্রজাগোপূরবিপ্রাদ্বা করাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রাহ্মণের অধ্যয়নাদি ষট্‌ কর্ম্ম, ক্ষত্রিয়-জাতির প্রতিগ্রহ ব্যতীত অন্য

পঞ্চকর্ম ও প্রজাপালক, রাজার ব্রাহ্মণ ভিন্ন অশ্বের নিকট হইতে করগ্রহণ প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা বিহিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

বৈশ্যস্ত বার্তা-বৃত্তিঃ স্যান্নিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ ।

শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা বৃত্তিষ্ঠ স্বামিনো ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

বৈশ্য জাতি সর্বদাই ব্রাহ্মণকুলের অনুগত থাকিয়া কৃষি-বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা অর্জন করিবে; শূদ্রজাতির দ্বিজ-সেবা এবং তাহাই তাহার জীবিকা ॥ ১৫ ॥

বার্তা বিচিত্রা শালীন-যাযাবর-শিলোজ্ঞনম্ ।

বিপ্রবৃত্তিষ্ঠতুর্দ্ধেয়ং শ্রেয়সী চোত্তরোত্তরা ॥ ১৬ ॥

কৃষি, গো-রক্ষা প্রভৃতি অযাচিত প্রাপ্তি এবং প্রত্যহ ধাত্ত-যাজ্ঞা ধাত্ত-ক্ষেত্রাদিতে ক্ষেত্রস্বামিপরিত্যক্ত শস্তশীর্ষ-গ্রহণ এবং আপণাদিতে পতিত-শস্তকণা-সংগ্রহ—এই চারিপ্রকার বিপ্রবৃত্তি। ইহাদের পূর্ব পূর্ব বৃত্তি অপেক্ষা পর পর বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ ॥ ১৬ ॥

জঘন্তো নোত্তমাং বৃত্তিমনাপদি ভজেন্নরঃ ।

ঋতে রাজন্যমাপৎসু সর্বেষামপি সর্বশঃ ॥ ১৭ ॥

বিপদ উপস্থিত না হইলে নীচ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ বৃত্তি অবলম্বন করিবে না, আপৎকালে ক্ষত্রিয় ভিন্ন সকলের সকল বৃত্তি বিহিত আছে ॥ ১৭ ॥

ঋতামৃতভ্যাং জীবত মৃতেন প্রমৃতেন বা ।

সত্যানৃতভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন ॥ ১৮ ॥

ঋতমুঞ্জশিলং প্রোক্তমমৃতং যদযাচিতম্ ।

মৃতং তু ন্যিত্যচাঞা স্যাৎ প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্ ।

সত্যানৃতঞ্চ বাণিজ্যং শ্ববৃত্তির্নীচসেবনম্ ॥ ১৯ ॥

বর্জয়েত্তাং সদা বিপ্রো রাজন্যশ্চ জুগুপ্সিতাম্ ।

সর্ববেদময়ো বিপ্রঃ সর্বদেবময়ো নৃপঃ ॥ ২০ ॥

ঋত ও অমৃতদ্বারা অথবা মৃত ও প্রমৃত দ্বারা কিংবা সত্যানৃত দ্বারাও জীবনধারণ করিবে; কিন্তু কখনও শ্ব-বৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিবে না। উজ্জ-শীল ঋতঃ; অযাচিত প্রাপ্তি অমৃত; প্রত্যহ যাজ্ঞা মৃত; কৃষিকার্য্য প্রমৃত; বাণিজ্য সত্যানৃত ও নীচসেবাকে শ্ববৃত্তি বলে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই নিম্নিত সেবা-কর্ম সর্বদা পরিত্যাগ করিবে। কারণ ব্রাহ্মণ সর্ববেদময় এবং ক্ষত্রিয় সর্বদেবময় ॥ ১৮-২০ ॥

এক জাতি

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকালে 'হংস' নামে একমাত্র জাতির বাস ছিল। তাঁহারা স্বাধ্যায়-নিরত ব্রহ্মজ্ঞ, যোগী ও ভগবদ্ভক্ত ছিলেন। হংসগণের মধ্যে যাঁহারা ভজনবলে, যোগবলে, ব্রহ্মজ্ঞান-প্রভাবে অপরাপর স্বগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতেন, তাঁহারাই হংসগণের দ্বারা 'পরমহংস' শব্দে গৃহীত হইতেন। সাধারণ ব্রহ্মজ্ঞ ও যোগনিরত ভারতীয়গণের মধ্যে ভাগবত পরম-হংসগণের কথা কয়েকস্থানে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়। ভাগবত পরমহংসগণের সহিত ব্রহ্মজ্ঞ ও যোগী পরমহংসের যে ভেদ আছে তাহা শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের 'ব্রহ্ম', 'পরমাত্মা' ও 'ভগবৎ' শব্দে উদ্দিষ্ট অদ্বয়জ্ঞান-বস্তু-তত্ত্ব-আলোচনায় ব্যাপারটী পরিস্ফুট হইয়াছে। 'ব্রহ্ম' শব্দে অখণ্ড জ্ঞান বা পূর্ণ-চেতন, কেবল-চেতন, শুদ্ধ-চেতন, নিত্য-চেতনের পরিমাণগত বৃহত্ত্ব-বাচক ও পুষ্টিকারক বুঝায়। 'ব্রহ্ম' শব্দ 'জীব' শব্দ হইতে যে পার্থক্য নির্দেশ করেন তাহা শ্রীমদানন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধব ভগবান্ স্বীয় অনুগত-জনের হৃদয়ে পূর্ণ বিকশিত করিয়াছেন। জীবের স্বরূপে তিনি অখণ্ড জ্ঞান নির্দেশ করেন নাই। জীব স্বরূপে খণ্ডজ্ঞানময় বস্তু বলিয়া তাহার কোন সময় অখণ্ডজ্ঞানের অন্তর্গত পরিচয়, কখনও বা খণ্ডজ্ঞাত্বত্রে ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রান্তি এবং কখনও বা অব্রহ্ম বলিয়া ব্রহ্মের বিপরীত ধর্মাবলম্বী জড়াভিমান। জড়াভিমানের আনুগত্য পরিহার করিলেই জীবের বৈষ্ণব বলিয়া অনুভূতি। তখন চিন্ময় স্বভাবক্রমে জড়াকাজ্ঞা জড়ভাব তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। জীবের ব্রহ্মজ্ঞানাত্মকতা তাঁহাকে অব্রহ্মজ্ঞ করিয়া তোলে। তিনি ব্রহ্মের বস্তু গ্রহণ করিয়া কোন সময়ে আপনাকে ব্রহ্মত্বে স্থাপন করিতে ব্যস্ত, কখনও বা দৃশ্যজগতের বিবর্তনময় অনুভূতিতে ব্রহ্ম বলিতে উদ্বেগ, কখনও বা কামকামী হইয়া বিবর্ত পরিহারপূর্বক ভগবানের মায়াশক্তিকে ব্রহ্ম দর্শন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্পবিশিষ্ট। অতাত্ত্বিকগণ নিজ নিজ গুরু প্রতি অবজ্ঞা করিয়াই নিজ অক্ষজ-জ্ঞানবিকাশফলে অধিরোহ-বাদ অবলম্বন করেন ও দৃশ্যজগতে বিচরণ করিয়াও আপনাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া অযথা গ্লাঘা করেন। ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়াও হংস, অপ্রকটিত-বৈশিষ্ট্যাকার-বিশেষ ব্রহ্মকে ভগবানের অসম্যগ আবির্ভাব বলিয়া স্পষ্টভাবে জানেন।

কতিপয় হংস মায়াশক্তি প্রচুর চিহ্নজ্ঞির অন্তর্ধ্যামিত্বময় বিশেষকে পরমাত্মা বলিয়া জানিয়া মায়াশক্তি-পরিণত দৃশ্যজগতের অনুশীলন হইতে বিযুক্ত হন। সেই বিয়োগ-সিদ্ধিই তাঁহাকে পরমাত্ম-যোগনিরত যোগী

করিয়া তোলে। ব্রহ্মজ্ঞ স্বসিদ্ধিতে এবং যোগী নিজ সিদ্ধিকালে যে অবস্থা লাভ করেন, তাহা হইতে ভগবজ্জ্ঞান-লাভ ও ভগবানে ভক্তিয়োগ তাঁহার পক্ষে স্নহুক্রহ নহে, বরং তাঁহাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিমাত্র। ভগবদ্বক্ত বা ভাগবত-পরমহংস ব্রহ্মজ্ঞ হংস ও যোগী হংসের উৎকৃষ্ট উন্নতির স্তর মাত্র। ভক্ত বা ভাগবত-পরমহংস নিয়ে অবতরণ করিলে বা তত্ত্বস্থানস্থিত দ্রষ্টার নিকট অব্রহ্মজ্ঞ বা কুযোগী নহেন। ভাগবত-পরমহংস উৎকৃষ্ট যোগী ও পরমোন্নত ব্রহ্মজ্ঞ। তাঁহাকে যোগী বা ব্রহ্মজ্ঞ অপেক্ষা নূন জ্ঞান করা উচিত নহে।

হংস ব্রহ্মজ্ঞ যেকালে নিজের হংসত্ব, ব্রহ্মজ্ঞান বা সমত্ব পরিহার করিয়া নিজের ব্যক্তিগত গৃহোক্ত ব্যবহার গ্রহণ করেন এবং অপর হংসগণের মধ্যে স্বীয় পার্থক্য-স্থাপনে যত্নবান হন, সেইকালেই গুণ কর্মবিভাগক্রমে চারিটি ধর্ম ও আশ্রম পরিলক্ষিত হয়। সত্যযুগে হংস বর্ণ বা একবর্ণ মাত্র অবস্থিত ছিল; পরে ১৭২৮০০০ সৌরবর্ষ অতীত হইলে হংসজাতির মধ্যে বর্ণবিভাগ প্রবর্তিত হয়। বৃত্ত, স্বভাব ও লক্ষণ এবং ভাবি উপযোগিতার সম্ভাবনা প্রভৃতির বিচারমুখেই এই বিভাগ কার্য্যে পরিণত হয়। সাধ্য ও সিদ্ধ বা বিবিৎসা ও বিদ্বৎ প্রণালীতে যে কার্য্যগত ভেদ আছে, তদ্বারা দুই প্রকার বর্ণ ও আশ্রম নিরূপিত হইয়া থাকে। ভাবি উপযোগিতার সম্ভাবনা-বিচারে শৌক্রেপদ্ধতিতে বর্ণনিরূপণ-প্রথা দেশাচারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; আবার বৃত্ত, স্বভাব ও লক্ষণ শৌক্রেপদ্ধতিকে চিরদিনই পুষ্ট করিয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ-লিখিত কবষের কথা, ছান্দোগ্য উপনিষৎ-লিখিত জাবালের কথা অনুশীলন করিলে আমাদের কেবল শৌক্রেপদ্ধতির বিচার স্মৃতি লাভ করে। শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ, অষ্টাদশ পুরাণ প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে উভয় প্রকার প্রণালীমতেই বর্ণ ও আশ্রমের বিভাগ উল্লিখিত করিয়াছেন। উহা যে একবার মাত্র ত্রেতা-প্রারম্ভে নিরূপিত হইয়া শৌক্রেপদ্ধতিমতে চিরদিন চলিবে এবং মূল প্রয়োজন বিনষ্ট হইয়া মাছিমাঝে কেরণীগিরিই অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে—এরূপ কথা সত্যপ্রিয় ভারতীয় হংস জাতি স্বীকার করেন না। কল্পশাস্ত্র, গোভিল-কাত্যায়নাদি গৃহসূত্র-সংকলিত বেদবাণীতে যে অষ্টবর্ষেই ব্রাহ্মণের উপনয়ন-বিধি নির্দিষ্ট আছে, তাহা সাধ্য, বিবিৎসোথ বা প্রস্তাব মাত্র। হংসজাতি সকলেই সমান হইলেও যখন গৃহোক্ত নির্দিষ্ট প্রণালীর বিধিগ্রহণ করিতে যাহারা প্রস্তুত, তাহারা তাঁহাদের অধস্তন ভাবী ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা বিশিষ্ট বলিয়া প্রস্তাবিত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ বা বিজজাতিরই গৃহোক্ত

সংস্কার আবশ্যক। যাঁহারা সংস্কার গ্রহণে অযোগ্য ও অসম্মত, ব্রহ্মজ্ঞ হইতে যাঁহাদের কোন প্রবৃত্তিই দেখা যায় না, তাঁহারা হংসজাতির মধ্যে সংস্কার-বর্জিত অদ্বিজ বা শৌক্রে অধস্তন মাত্র। দ্বিজেরই গৃহোক্ত বিধি পালনীয়। যাঁহারা পালন করিলেন, তাঁহাদের কুলগত প্রথানুসারে দ্বিজত্ব চলিতেছিল। যে হংস, দ্বিজগণ-কর্তৃক ‘শূদ্র’ শব্দে সংজ্ঞিত হইলেন, তাঁহারা নিজ নিজ আলম্ব্যক্রমেই হউক বা বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়াই হউক, স্ব-স্ব-স্বভাবে অবস্থিত হওয়ায় তাহাদের দ্বিজত্ব ঘটে নাই। তাঁহাদের বংশধরগণ যেকালে গৃহোক্ত সংস্কারের পক্ষপাতী হইবেন, তখন তাঁহারা নিজ নিজ বৃত্ত স্বভাব বা লক্ষণ পুনরায় পরিদৃষ্ট হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

হংস জাতির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ, যোগী ও উপাসকের বৃত্ত স্বভাব ও লক্ষণ চিরদিনই বর্তমান আছে, থাকিবে এবং ছিল। সনাতনপ্রথা-মতে যখন বর্ণাশ্রম-বিভাগ প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল না, সেইকালে হংসগণই ভাগবত পরমহংসতা লাভ করিতেন। নিম্নস্তরে কিঞ্চিদ্ ভগবদনুশীলনরত যোগনিরত সম্প্রদায়ে ও তন্নিম্নস্তরে জ্ঞাননিরত ব্রহ্মজ্ঞ সম্প্রদায়েও পবমহংস দেখা যাইত। কিন্তু বিশ্বব্যাপী হংসজাতির মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞ-ধর্ম্য ও যখন ক্রমশঃ বিস্মৃতির অতল জলধি-গর্ভে ভাদিয়া যাইতে আরম্ভ করিল, তখন নিরীশ্বর নাস্তিক্য-বাদের প্রসার আরম্ভ হইল--শ্রীগুরুদেবের বাক্য বিপর্যাস্ত হইল, আম্মায়ের বেদের নিরস্তকূহক সত্যের অমর্যাদা হংসজাতির কতিপয়ের হৃদয়ে কুজ্বাটিকার ছায়া আচ্ছাদন করিল। তাঁহারা নিজ নিজ অক্ষজ্ঞানে প্রতারিত হইয়া সত্যের অনাদর করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপ একমাত্র হংসজাতি চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন।

—জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(দর্শন)

১। প্রাকৃত, আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-দর্শনের বিভাগ কিরূপ ?

“জগতে যত জীব আছেন, তাঁহারা অধিকারানুসারে প্রাকৃত, আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত-ভেদে ত্রিবিধ। লোকে বলেন যে, দর্শন ছয় প্রকার; কিন্তু আমরা সেই সমস্ত দর্শনকে তিন প্রকারে বিভাগ করি অর্থাৎ প্রাকৃত-দর্শন, আধ্যাত্মিক-দর্শন ও অপ্রাকৃত-দর্শন। ছায়া, বৈশেষিক ও পূর্বক-মীমাংসা—ইহারা প্রাকৃত-দর্শন। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্তের মায়াবাদী ভাষ্য—এই তিনটি আধ্যাত্মিক দর্শন। বেদান্ত স্বয়ং অপ্রাকৃত দর্শন।” — ‘বিজ্ঞপ্তি’ কৃ: ক:

২। বিভিন্ন আচার্য্য-প্রচারিত বিভিন্ন দার্শনিক মতের সমন্বয় কোথায় ?

“কেবলাদ্বৈতবাদ, কেবল-দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং শুদ্ধাদ্বৈতবাদ—এই সকল নামের বিবাদ-মাত্র। সমস্ত বাদের বাদত্ব দূর হইলে যে পরম সত্য থাকে, তাহা আমার অচিন্ত্য-শক্তি-পরিণামরূপ নিত্য-ভেদাভেদ-জ্ঞান। ইহাই সর্ববেদ-বাক্য ও মহাবাক্য-সম্মত।”

—‘ভাগ্যবজ্জীবলক্ষণং’, শ্রীভাঃ মাঃ ১০।৪

৩। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ কেন ?

“শ্রীজীব গোস্বামী ‘সর্বসম্বাদিনী’ গ্রন্থে এই মত-সিদ্ধান্তকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক বলিয়া লিখিয়াছেন। নিম্নার্কে-মতে যে ভেদাভেদ অর্থাৎ দ্বৈতাদ্বৈত-মত, তাহা পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা লাভ করিয়া বৈষ্ণব-জগৎ সেই মতের পূর্ণতাকে পাইয়াছেন। শ্রীমধ্ব-মতে যে সচ্চিদানন্দ নিত্য-বিগ্রহের স্বীকার আছে, তাহাই এই অচিন্ত্যভেদাভেদেব মূল বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু মধ্ব সম্প্রদায় স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্তিত মত-সকলে একটু একটু বৈজ্ঞানিক অভাব থাকায় তাঁহাদের পরস্পর বৈজ্ঞানিক-ভেদে সম্প্রদায়-ভেদ হইয়াছে। সাক্ষাৎ পরতত্ত্ব শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বীয় সর্বজ্ঞতা-পলে সেই সমস্ত মতের অভাব পূরণ করত শ্রীমধ্বের—‘সচ্চিদানন্দ-নিত্যবিগ্রহ’, শ্রীরামানুজের—‘শক্তি-সিদ্ধান্ত’, শ্রীবিষ্ণুস্বামীর—‘শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত’, তদীয়-সর্বস্বয়’ এ ৩ শ্রীনিষর্কের—‘নিত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত’কে নির্দেশ ও সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় অচিন্ত্য ভেদাভেদাত্মক অতি বিগুহমত (সিদ্ধান্ত) জগৎকে কৃপা করিয়া অর্পণ করিয়াছেন।”

— শ্রীমঃ শিঃ ৯ম পঃ

৪। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত কি প্রতি সম্মত সার্বদেশিক দার্শনিক সিদ্ধান্ত ?

“কেবল ভেদ বা কেবল অভেদবাদ তথা শুদ্ধাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—এ সকলই প্রতি-শাস্ত্রের একদেশ-সম্মত হওয়ায় অন্তর্দেশ-বিরুদ্ধ ; কিন্তু অচিন্ত্যভেদাভেদ-মত (সিদ্ধান্ত) বেদের সর্বদেশ-সম্মত-সিদ্ধান্ত। গীর্বের স্বতঃসিদ্ধ প্রকার আত্মদ এবং সাধুযুক্তি-সম্মত ”

— শ্রীমঃ শিঃ ৯ম পঃ

৫। অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত স্বরূপতঃ সর্ববাদি সম্মত কেন ?

“অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্ম্য সিদ্ধান্তই সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রের সম্মত। ইহাতে যত যুক্তি করা যায়, ততই এই সিদ্ধান্তের সর্বোৎকৃষ্ট নিশ্চয়রূপে বিগুহ বলিয়া

প্রতীতি হয়। যুক্তি দুই প্রকার—স্বপক্ষ ও প্রতিপক্ষ। বেদ, পুরাণ ও সমস্ত মহাজন-কৃত সিদ্ধান্ত ইহার পোষক; তাহারাই স্বপক্ষ। শ্রীশঙ্করা-চার্য্যাদি গুরু জ্ঞানবাদাচার্য্যগণ ইহার প্রতিপক্ষ। শ্রীশঙ্কর বলিয়াছেন, ‘হে নাথ, তোমার ও আমার ভেদ অপগত হইলে আমি তোমার থাকিব, কিন্তু তোমাকে আমার বলিতে পারিব না।’ এইরূপ প্রতিপক্ষ-যুক্তিও ভেদাভেদ-বাদের পোষক। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত সর্ববাদিসম্মত।”

— বৃঃ ভাঃ, তাৎপর্যানুবাদ

৬। অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে ‘অচিন্ত্য’ শব্দ বলা হইল কেন ?

“কৃষ্ণের সহিত জীবের ভেদ ও অভেদ এবং কৃষ্ণের সহিত জগতের ভেদ ও অভেদ যুগপৎ সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সসীম মানব-যুক্তিতে ইহার সামঞ্জস্য হয় না বলিয়া, এই নিত্য ভেদাভেদ-তত্ত্বকে ‘অচিন্ত্য’ বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।”

—চৈঃ শিঃ ১।৫

৭। কেবলাদ্বৈতবাদই কি অদ্বয়-জ্ঞান ও বেদ-সম্মত ?

“অনেকে মনে করেন যে, কেবল অভেদবাদকে অদ্বয়জ্ঞান বলে; তাহা নয়। কেবল অভেদবাদ—সমস্ত বেদ-বিরুদ্ধ। বেদ অনেকস্থলে অভেদবাদ এবং অনেক স্থলে নিত্য-ভেদ উপদেশ করেন। বস্তুতঃ বেদশাস্ত্র স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, অতএব কোন বিশেষ মতবাদ তাহাতে নাই। বেদের সিদ্ধান্ত এই যে, পরব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ। এতন্নিবন্ধন এই বিশ্ব ও জীবসকল পরব্রহ্ম হইতে যুগপৎ পৃথক্ হইয়াও তাঁহা হইতে অভেদ। দ্বৈত ও অদ্বৈত একই কালে সত্য; অতএব অদ্বৈত-তত্ত্বে জড় হইতে আত্মতত্ত্বের পার্থক্য আছে এবং আত্মতত্ত্বে অণুচৈতন্য জীব হইতে পরমেশ্বরের নিত্য পার্থক্য আছে। ভেদাভেদ-তত্ত্ব যিনি জানিতে পারেন, তাঁহার আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকে না। যখন অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই তত্ত্বের অদ্বয়জ্ঞান-সিদ্ধি হইয়া থাকে। দ্রষ্ট-স্বরূপ জীব সেই পরমতত্ত্ব হইতে কিছুই পৃথক্ দেখিতে পান না। যখন তিনি প্রাকৃত-দৃষ্টির বশীভূত তখনই তাঁহার কেবল ভেদ দৃষ্টি হয়। জড় একটি নিত্যসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া চৈতন্য হইতে পৃথগ্-রূপে ভাসমান হয়, —ইহারই নাম দ্বৈতজ্ঞান।” —‘বস্তুনির্দেশ’, সংঃ তোঃ ২।৬

৮। সাংসৃত আচার্য্যগণের প্রচারিত বিভিন্ন দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও

তজ্জনিত অসম্প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক বিচার-বৈচিত্র্যের পরিপূর্ণতা কে বিধান করিয়াছেন ?

“শ্রীরামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাঐত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য শুদ্ধাঐত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। শ্রীনিষাদিত্যাচার্য্য দ্বৈতাঐত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাঐত-মতে ভক্তি প্রচার করেন। চারিজনই শুদ্ধভক্তির প্রচারক। রামানুজ-মতে—চিৎ ও অচিৎ, এই দুই বিশেষণে বিশিষ্ট হইয়া একমাত্র ঈশ্বরই বস্তু। মধ্ব-মতে—জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ তত্ত্ব, কিন্তু ঈশ-ভক্তিই তাহার স্বভাব। নিষাদিত্য-মতে—জীব ঈশ্বর হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ ; অতএব ভেদেরও নিত্যতা স্বীকৃত। বিষ্ণু-স্বামী-মতে—বস্তু এক হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মতা ও জীবতা নিত্য পৃথক্। এরূপ পরস্পরের ভেদ থাকিলেও তাঁহারা সকলেই ভক্তির নিত্যত্ব, জীবের নিত্যদাস্ত ও চরমে প্রেমগতি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব সকলেই মূল-তত্ত্বে বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের বিজ্ঞান একটু একটু পৃথক্ থাকায় অসম্পূর্ণ ছিল। সাক্ষাৎ ভগবান্ ঈশৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া সেই বৈজ্ঞানিক অসম্পূর্ণতা দূর করত বিজ্ঞান-শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন।”

—শ্রীমঃ শিঃ ৯ম পঃ

৯। শ্রীরামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্ত কি গৌড়ীয়-মত-বিরুদ্ধ নহে ?

“শ্রীমদ্রামানুজস্বামীর সিদ্ধান্ত-সমূহ আমাদের গৌড়ীয়-প্রেম-মন্দিরের ভিত্তি-স্বরূপ।”

—‘শ্রীঅর্থ-পঞ্চক’, সং তোঃ ৭।৩

১০। শ্রীনিষাদিত্যের মত ও অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত কি এক ?

“অনেকে বলেন যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মত নিষাদিত্যের মতের সহিত সর্ব-বিষয়ে এক ; তাহা নয়। নিষাদিত্যের মত দ্বৈতাঐত বাদ ; কিন্তু গৌড়ীয়-মত—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ।” —শ্রীনিষাদিত্যাচার্য্য, সং তোঃ ৭ম বর্ষ

১১। বৌদ্ধ-দর্শনে অসং সিদ্ধান্তগুলি কি কি ?

“বৌদ্ধ-মতে ‘হীনাযন’ ও ‘মহাযন’ দুইপ্রকার পন্থা। সে পন্থা-গমনের প্রস্থান-স্বরূপ নয়টী সিদ্ধান্ত ; যথা—(১) বিশ্ব অনাদি, অতএব ঈশ্বরশূন্য ; (২) জগৎ অসত্য, (৩) অহংতত্ত্ব, (৪) জন্ম-জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, (৫) বুদ্ধই তত্ত্ব-লাভের উপায়, (৬) নির্বাণই পরমতত্ত্ব, (৭) বৌদ্ধ-দর্শনই দর্শন, (৮) বেদ—মানব-রচিত, (৯) দয়াদি সদ্ধর্ম্মাচরণই বৌদ্ধজীবন।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ, ম ৯।৪২

১২। ভারতীয় ষড়্‌দর্শনের পাশ্চাত্যদেশীয় প্রসিদ্ধ শিষ্য কে কে ?

“দর্শন-শাস্ত্র যে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। দর্শন বস্তুতঃ বহুবিধ হইলেও স্থূল স্থূল বিষয়ের বিচার-দ্বারা ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। ভারতে ষড়্‌দর্শন বলিয়া সেই ছয়টি শ্রেণী দেদীপ্যমান। গ্রীসদেশেও সেই ছয়টি দর্শন সম্মানিত হইয়াছে। সম্প্রতি বিশেষ গবেষণা-দ্বারা প্রতীয়াদেশীয় অধ্যাপক গার্বের নির্ণয় করিয়াছেন যে এরিষ্টটল্ গোতমের ত্রায়-শাস্ত্রের শিষ্য, থেলিস্ কণাদের বৈশেষিক-শাস্ত্রের শিষ্য, সক্রেটীস্ মীমাংসা-শাস্ত্রে জৈমিনির শিষ্য, প্লেটো বেদান্তশাস্ত্রে ব্যাসের শিষ্য, পিথাগোরাস্ সাংখ্যশাস্ত্রে কপিলের শিষ্য এবং জিনো যোগ-শাস্ত্রে পতঞ্জলির শিষ্য।”

— ‘দর্শনশাস্ত্র’, সঃ তোঃ ৭।১

১৩। পাতঞ্জল-দর্শনে কি শুদ্ধ চিত্তত্বের আলোচনা আছে ?

“পাতঞ্জল-শাস্ত্রে কৈবল্যাবস্থা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্থূল ও লিঙ্গের কোন বিপরীত ভাব মাত্র, কিন্তু কোন চিত্তত্বের আলোচনা তাহাতে লক্ষিত হয় না।”

—তঃ বিঃ ১ম অনুঃ ২৩

১৪। যোগশাস্ত্র কোন্ পদের যোগ্য ?

“নিতান্ত জড় হইতে বিশুদ্ধ চিত্তত্ব পর্য্যন্ত যে-সকল অবান্তর অবস্থা আছে, যোগ-শাস্ত্র তন্মধ্যে একটি অবান্তর পদ।”

—তঃ বিঃ ১ম অনুঃ ২৩

১৫। ‘তত্ত্বমসি’ বাক্যের ভক্তিপর ব্যাখ্যা কিরূপ ?

“মায়াবাদি-ভাষ্যকার বলিতে পারেন যে, ‘তত্ত্বমসি’রূপ মহাবাক্য দ্বারা জীব ও ব্রহ্মে সাক্ষাৎ অভেদত্ব স্থির হইতেছে। ‘তৎ’-শব্দে তিনি ‘ত্বং’-শব্দে তুমি, ‘অসি’-শব্দে হও ; —এই অর্থক্রমে তৎ ব্রহ্ম, তাহা তুমিই হও, অতএব তোমাতে ও তাঁহাতে অভেদ। কিন্তু স্বীয় ভক্ত-সম্প্রদায়ের মতবিৎ ভাষ্যকার ভেদ-নিরূপণার্থ ‘তত্ত্বমসি’—এই বাক্যের অন্য প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। ‘তৎ’-শব্দ—অব্যয়, ‘তস্ত’ শব্দের ষষ্ঠী লোপ করিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। ‘তস্ত ত্বম্ অসি’—এই শব্দের অর্থ তাঁহার তুমি। ‘তস্ত’-শব্দে ভেদ-প্রতীতি হয়। ‘তুমি’ তদ্বস্ত হইতে পৃথক্কৃত হইতেছে। সুতরাং তুমি সেই ব্রহ্ম নও—এইরূপ বাক্যার্থ সিদ্ধ হইতেছে।”

—তঃ যুঃ ৬

১৬। ষড়্‌দর্শনকার সর্বোৎকৃষ্ট বিমুক্তকে স্বীকার করেন কি ? বিমুক্তত্ব কি শুদ্ধ সত্ত্ব ?

“জৈমিনীাদি মীমাংসকগণ বেদের মূল তাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা ত্যাগ

করিয়া ঈশ্বরকে ‘কর্মের অঙ্গ’ করিয়া ফেলিয়াছেন। কপিলাদি নিরীশ্বর সাংখ্যকার প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগ-পূর্বক প্রকৃতিকে জগৎকারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। গৌতম ও কণাদাদি জ্ঞায় ও বৈশেষিকশাস্ত্রে পরমাণুকেই বিশ্ব-কারণ বলিয়াছেন। সেইরূপ অষ্টাবক্রাদি মায়াবাদী নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলিয়া দেখাইয়াছেন। পতঞ্জলি প্রভৃতি রাজযোগী তাঁহাদের যোগ-শাস্ত্রোক্ত কল্পনাময় ঈশ্বরকে ‘স্বরূপতত্ত্ব’ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। এই সকল মতবাদ-পরায়ণ আচার্য্যগণ বেদসিদ্ধ স্বয়ং ভগবান্কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার খণ্ড-ভাবে (খণ্ড প্রতীতিময়) একটী একটী ‘মত’ স্থাপন করিয়াছেন। ষড়্‌দর্শনের ছয় মত উত্তমরূপে আলোচনা-পূর্বক তত্ত্বমত খণ্ডন করিয়া শ্রীব্যাসদেব ভগবৎপ্রতি পাদক বেদসূত্র-সকল অবলম্বন-পূর্বক বেদান্ত-সূত্র নির্মাণ করিয়াছেন। বেদান্ত-মতে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ সাকার। নির্বিশেষবাদিগণ ব্রহ্মকে নিগুণ এবং বিশেষ-স্থলে ভগবান্কে ‘সগুণ’ (ত্রিগুণময়) বলিয়া প্রতিপাদন করেন, বস্তুতঃ তত্ত্ববস্তু কেবল নিগুণ বা ত্রিগুণাতীত নহেন ; পরন্তু তিনি—অনন্ত চিৎগুণ-রাশির আধার ‘সগুণ’ বিগ্রহ। বিভিন্ন মতবাদিগণের মতে, পরম কারণ ঈশ্বর (বিষ্ণু) পাওয়া যায় না অর্থাৎ কেহই সর্বৈশ্বরেশ্বর সর্বকারণ-কারণ বিষ্ণুকে মানেন না, অথচ পরমত-খণ্ডন-পূর্বক নিজ নিজ মতবাদ স্থাপন করিতে প্রয়াস করিয়াছেন।”

—অঃ প্রঃ ভাঃ ম ২৫।৪৫।৫৫

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কৃষ্ণাবিভাবে ব্যাজস্তুতি

তুর্ঘ্যোগ রজনীযোগে তস্ককের প্রায়
কি হেতু অবনী-মাঝে এলে নটরায় ?
কি হেতু বা সঙ্গোপন শ্রীনন্দ-আলয়ে
বস্তুদেবে মিথ্যাবাদী মুষক সাজায়ে ?
নন্দালায়ে নবনীর ছিল কি অভাব ?
তবে কেন প্রকাশিলে তস্কর-স্বভাব ??
সত্যমুক্তি তবু কেন মিথ্যা বাক্য বল,
মৃত্তিকা ভক্ষণ করি’ কেন কর ছল ?

সত্যধর্ম সদৃশের হইয়া আশ্রয়,
 লাম্পট্য-লীলার প্রভু কি হেতু প্রশ্রয় ?
 কি হেতু বাজাও বংশী গোপীচিত্ত হরি' ?
 বসন, যৌবন, প্রাণ, কেন কর চুরি ??
 সর্বযজ্ঞ-ভোক্তা তুমি পুরুষ উত্তম—
 তবু কেন ভাগ্যে তব অসীম দূষণ !!
 সর্বত্রীড়া ত্যজি' কেন গোচারণ-লীলা ?
 বিপ্র, ক্ষত্র-কুল ত্যজি' গোপাল হইলা ??
 অনন্তা, অচিন্ত্যা শক্তি যদি তব হয়,
 অপবাদ কেন তবে জরাসন্ধ-ভয় ?
 কি হেতু সমুদ্র-মাঝে স্থাপিলেক পুরী
 ব্রজপুর শ্রীমথুরা ত্যজিয়া, শ্রীহরি !
 প্রাণাধিকা হয় যদি গোপীকা তোমার,
 কেন তবে মধুপুরী দ্বারকা-বিহার ?
 ব্রজভূম, রাধাকুণ্ড-তট, গিরিরাজ
 মান যদি সর্বোত্তম, ছাড় কিবা লাজ ?
 এত রূপ ছাড়ি' কেন কৃষ্ণরূপ ধর—
 তোমার মহিমা প্রভু, অনন্ত অপার ।
 তব কৃপা একমাত্র তোমা' বুঝিবারে ।
 তবজন-কৃপাবলে তোমা' রুচি ধরে ॥

—শ্রীমদুদর্শন ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ—১৯)

জ্ঞানী মানবগণের ত কথাই, শ্রীহরির প্রতি সম্যকভাবে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে কীট-পক্ষী-পশুগণেরও উদ্ধগতি লাভ হয় ।

এই কর্তৃগণের মধ্যেই আবার আচারবান ও ছরাচার, জ্ঞানী ও অজ্ঞান, বিরক্ত ও আসক্ত, মুমুকু ও মুক্ত, সাধক ও সিদ্ধ, ভগবৎপার্ষদতা-প্রাপ্ত ও তাহাতে নিত্য অবস্থিত প্রভৃতি পাত্র-নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই সাধারণ-ভাবে ভক্তির অবস্থান দর্শন করিয়া ভক্তির সার্বত্রিকতা জানা যায় ।

বহির্দৃষ্টিতে ছুরাচার-মধ্যে ভক্তির অবস্থান—

অপি চেৎ স্খুরাচারো ভজতে মামনন্তভাক্ ।

সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ (গীঃ ৯।৩০)

বাহ্যদর্শনে অত্যন্ত ছুরাচার থাকিলেও আমাতে অনন্তভাবে ভজন-কারীকে ‘সাধু’ বলিয়া মনে করিতে হইবে। যেহেতু তিনি মদর্শে সম্যক্ অধ্যবসায়-বিশিষ্ট ।

বহির্দুরাচার থাকিলেও যখন ভক্তির ব্যাঘাত হয় না, তখন সদাচার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? ইহাই ‘অপি’ শব্দের অর্থ। জ্ঞানী ও অজ্ঞানের মধ্যে—

জ্ঞাত্বাজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যচ্চান্মি যাদৃশঃ ।

ভজন্ত্যনন্তভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥ (ভাঃ ১১।১১।৩০)

আমার যে বৈকুণ্ঠ্যভাব আমার যে স্বরূপ, আমার যে সচ্চিদানন্দময়তা,— তাহা জানিয়াই হউক আর না জানিয়াই হউক, যাহারা অনন্তভাবে আমাকে ভজন করে, তাহারা আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ।

বিষুধার্থে,—

হরিহরতি পাপানি ছুষ্টচিঁতৈরপি স্মৃতঃ ।

অনিচ্ছয়াপি সংস্পৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ ।

অগ্নি যেমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও সংস্পৃষ্ট হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ দ্রব্যাদি দগ্ধ করে, তদ্রূপ ছুষ্টচিত্ত ব্যক্তিও শ্রীহরিকে স্মরণ করিলে শ্রীহরি তাহাদের পাপাদি হরণ করেন ।

বিরক্ত ও আসক্ত মধ্যে,—

বাধ্যমানোহপি মন্তকো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥

(ভাঃ ১১।১৪।১৮)

উত্তম ভক্তের কথা দূরে থাকুক, প্রাকৃত-ভক্তও ইন্দ্রিয় জয় করিতে অসমর্থ হইয়া বিষয়সমূহে আকৃষ্ট হইলেও বীর্য্যবতী ভক্তির প্রভাবে বিষয়ে অভিভূত হন না ।

মুমুক্শু ও মুক্ত-মধ্যে—

মুমুক্শবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ ।

নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হনস্বয়বঃ ॥ (ভাঃ ১।২।২৬)

মুক্তিকামী ব্যক্তিগণ ঘোররূপ ভূতপতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া

তাহাদের প্রতি অস্থায়ী হইয়া শান্তমূর্তি নারায়ণ বা তদংশসকলের ভজন করেন।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপ্যরুক্রমে।

কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিথভূতগুণো হরিঃ ॥ (ভাঃ ১।৭।১০)

শ্রীহরি এক্রপ গুণবিশিষ্ট যে আত্মারাম মুনীগণ সর্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য হইয়া উরুক্রমের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

সিদ্ধ ও অসিদ্ধ মধ্যে —

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।

অথং ধুষন্তি কাংস্মেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥ (ভাঃ ৬।১।১৫)

স্বর্ঘ্য যেমন হিমরাশিকে নাশ করে, তদ্রূপ বাসুদেব-পরায়ণ কোন কোন ব্যক্তি কেবল ভক্তিদ্বারা অনর্থসকল বিনাশ করেন।

ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাং

লবনিমিষাঙ্কমপি স বৈষ্ণবাগ্রাঃ ॥ (ভাঃ ১।১।২।৫৩)

যিনি অতিসামান্য নিমিষাঙ্ককালও ভগবৎপাদপদ্ম হইতে বিচলিত হন না, তিনিই বৈষ্ণবপ্রধান।

ভগবৎপার্বদত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে --

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।

নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহত্মকালবিপ্লুতম্ ॥

(ভাঃ ৯।৪।৬৭)

আমার সেবায় পরিপূর্ণকাম ভক্তগণ কালক্ষোভা, অনিত্য, নশ্বর, ইতর বিষয়ের কথা কি, আমার সেবাপ্রভাবে স্বয়ং আগত বা যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিকেও বাঞ্ছা করেন না।

নিত্যপার্বদ মধ্যে—

বাপীষু বিক্রমতটাম্বমলামৃতাম্পু

প্রেম্যাবিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্।

অভ্যর্চতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্ত্রম্

উচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাম্প যচ্ছ্রীঃ ॥ (ভাঃ ৩।১৫।২২)

বৈকুণ্ঠলোকে লক্ষ্মীদেবী পরিচারিকাগণের সহিত মিলিত হইয়া বিক্রম-মণিময় তটযুক্ত ও অমৃতময় নির্মলতোয় বাপীসমূহের তীরে নিজপ্রমোদো-পবনে তুলসী দ্বারা শ্রীনারায়ণের পূজা করিতে করিতে বাপীজলে প্রতি-

বিস্তৃত নিজ সুন্দর অলকাবলী ও নাসিকা-শোভিত বদনকমল দর্শন করিয়া মনে করিলেন যে পতি যেন তাঁহাকে চুম্বন করিতেছেন।

সকল বর্ষে, সকল ভুবনে, সর্বত্র সকল অবস্থাতেই ভক্তগণ যে ভগবানের উপাসনা করিতেছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। এতদ্বারা সর্বদেশেই ভক্তির অবস্থান আছে, বুঝিতে হইবে।

সকল ইন্দ্রিয়ে ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—

মানসেনোপচায়েণ পরিচর্য্য হরিং মুদা।

পরেংবান্ননসাগম্যঃ তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণও মানসোপচার দ্বারা পরমানন্দে শ্রীহরির পরিচর্য্যা করিয়া বাক্যমনের অগোচর সেই শ্রীহরির সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন।

সকল দ্রব্যে ভক্তির অধিষ্ঠান, যথা—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্লামি প্রযতান্ননঃ ॥ (গীতা ৯।২৬)

প্রযতান্না ভক্ত ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল যাহা সমর্পণ করে, আমি সেই ভক্তিদত্ত বস্তু বাৎসল্যভরে ভোজন করিয়া থাকি।

সর্বক্রিয়ায় ভক্তির অধিষ্ঠান—

শ্রুতোহনুপঠিতো ধ্যাতে আদৃতোবানুমোদিতঃ।

সত্ত্বঃ পুনাতি সন্ধর্ম্মো দেব-বিশ্বজ্জহোহপি হি ॥ (ভাঃ ১১।২।১২)

যং করোষি যদশ্লামি যজ্জুহোষি দদাসি যং।

যং তপস্তসি কৌন্তেয় তং কুরুষ যদর্পণম্ ॥ (গীতা ৯।২৭)

এই সন্ধর্ম্ম (ভাগবত ধর্ম্মের কথা) একবার শ্রবণ, পাঠ, ধ্যান, আদর বা অনুমোদন করিলে তাহা কি দেবদ্রোহী কি বিশ্বদ্রোহী, সকলকেই সত্ত্ব পবিত্র করিয়া থাকে। হে অর্জুন, তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্তা কর, সে সমস্তই আমাকে অর্পণ কর। একরূপ ভক্ত্যাভাস ও ভক্ত্যাভাসা-পরাদি ব্যাপারে অজ্ঞামিল এবং ঘৃষিকের দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে।

সকল কার্য্যে ভক্তির অধিষ্ঠান—

যশ্চ স্মৃত্য চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিযু।

ন্যূনং সম্পূর্ণতাং যাতি সচ্ছো বন্দে তমচ্যুতম্ ॥

যাঁহার স্মরণ ও কীর্ত্তন-প্রভাবে তপস্তা, যজ্ঞ ও ক্রিয়াদিতে যাহা কিছু

ন্যূন অর্থাৎ অসম্পূর্ণ, তাহা সত্ত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করে; সেই অচ্যুতকে আমি বন্দনা করি।

সকল ফলে ভক্তির অধিষ্ঠান—

অকাম সৰ্বকামো বা মোক্ষকামো উদারধীঃ ।

তীব্রেন ভক্তিয়োগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

উদারবুদ্ধি ব্যক্তি নিষ্কাম, সৰ্বপ্রকার কামনাযুক্ত, এমন কি মোক্ষকামী হইয়াও তীব্র ভক্তিয়োগে পরমপুরুষ শ্রীহরিকেই ভজন করিবেন।

যথা তরোমূল-নিষেচনেন

তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখা ।

প্রাণোপহারাস্ত যথেন্দ্রিয়াণাং

তথৈব সৰ্ব্বাঙ্গমচ্যুতেজ্যা ॥ (ভাঃ ৪।৩।১৪)

বৃক্ষের মূলে জলসেচনদ্বারা যেমন তাহার স্কন্ধ, শাখাদি তৃপ্তি লাভ করে, প্রাণে আহার দিলে যেমন সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, তদ্রূপ অচ্যুতের পূজা-দ্বারা সকলেরই পূজা হইয়া যায়।

অর্চিতে দেবদেবেশে শঙ্খচক্রগদাধরে ।

অর্চিতাঃ সৰ্বদেবাঃ সূর্যতঃ সৰ্বগতো হরিঃ ॥ (স্কন্দ)

দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর শ্রীহরি অর্চিত হইলে সৰ্বদেবতার অর্চন হইয়া যায়, যেহেতু যিনি সৰ্বাস্তর্ধ্যামী।

যিনি এই প্রকার ভজন করেন (কর্তৃকারক), ভগবদ্ভূতদেবে যাহা কিছু দান করেন (কৰ্ম্মকারক), যে উপায় দ্বারা ভক্তি করা যায় (করণকারক), ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত যাহা কিছু সমর্পণ বা সম্প্রদান করা যায় (সম্প্রদান-কারক), যে সকল গবাদি হইতে দুগ্ধাদি লইয়া শ্রীভগবানকে নিবেদন করা যায় (অপাদান), যে-দেশে যে-কূলে কেহ ভক্তির অনুষ্ঠান করেন (অধিকরণ), পুরাণসমূহে তাঁহাদের সকলেরই কৃতার্থতা দেখা যায়। এতদ্বারা সকল কারকের মধ্যেও ভক্তির বিद्यমানতা জানা যায়। এইরূপে ভক্তির সার্বত্রিকতা অর্থাৎ সৰ্বদেশে ও সৰ্বপাত্রে বিद्यমানতা সাধিতা হইল।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীশ্রী একাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড, সপ্তবিংশ অধ্যায়]

(পূর্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৯ পৃষ্ঠার পর)

জয়া একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে কৃষ্ণ আদিদেব, আপনি উত্তম কথা বর্ণন করিলেন। শ্বেদজাদি চতুর্বিধ প্রাণীর আপনি সৃজন, পালন ও সংহারকারী। সম্প্রতি অনুগ্রহপূর্বক মাঘ-মাসীয়া শুক্লা-একাদশীর সবিশেষ বর্ণন করুন।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে মহারাজ! মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয়া একাদশী ‘জয়া’ বলিয়াই বিখ্যাত। ঐ একাদশী সর্বপাপবিনাশিনী, সর্বশ্রেষ্ঠা পবিত্রা, মনুষ্যের সর্বপাপহন্ত্রী, কামদা ও মোক্ষদায়িনী। তিনি ব্রহ্মহত্যা-পাপ ও পিশাচত্ব-বিনাশ করেন। এই একাদশী ব্রত পালন করিলে মানবগণের কখনও প্রেতত্বপ্রাপ্তি হয় না। ইহা হইতে পরতরা পাপঘ্নী ও মোক্ষদায়িনী কোনও একাদশী নাই। এই একাদশীর মাহাত্ম্যাদি নিয়ে বর্ণনা করিতেছি,—

এক সময়ে স্বর্গলোকে ইন্দ্র রাজত্ব করিতেছিলেন। তথায় দেবগণও স্নেহে বাস করিতেছিলেন। অমৃতপানে রত দেবগণ পারিজাত পুষ্পসেবিত সেই স্বর্গস্থ নন্দন বনে অমরাগণের সহিত রমণ করেন, তাহাদিগকেও রমণ করান। একদিন পঞ্চাশকোটি অমরা-নায়ক রমণরত দেবেন্দ্র নিজ ইচ্ছায় হর্ষবশতঃ সেই পঞ্চাশকোটি অমরাকে নৃত্যে প্রবৃত্ত করিলেন। তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিলে গন্ধর্ভগণ গান করিতে লাগিল। পুষ্পদন্ত, চিত্রসেন ও তৎপুত্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান গন্ধর্ভও তন্মধ্যে ছিলেন। চিত্রসেনের পত্নীর নাম মালিনী, সেই মালিনী হইতে জাতা কণ্ঠার নাম পুষ্পবন্তী। পুষ্পদন্তের পুত্রের নাম মাল্যবান। এই মাল্যবান পুষ্পবন্তীর রূপে অতিশয় মোহিত হইয়াছিল। সেই পুষ্পবন্তীও পুনঃপুনঃ কটাক্ষদ্বারা মাল্যবানকে বশীভূত করিয়াছিল। ইন্দের তুষ্টিবিধানার্থ তাহারা উভয়েই নৃত্যের জন্ত সমাগত হইয়া গান গাহিতে লাগিল। কিন্তু কামাসক্ত হওয়ায় চিত্তভ্রমহেতু তাহারা শুদ্ধরূপে গান করিতে অক্ষম হইয়া পরস্পর কেবল বহুদৃষ্টি অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিত। তাহাদের এইরূপ ভাব, তালমানভঙ্গ ও গীতবর্জন দেখিয়া তাহারা যে পরস্পর কামাসক্ত হইয়াছে, দেবরাজ ইন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাহাদের এই কার্য্য নিজেরই (দেবরাজের) অবজ্ঞাসূচক,—ইহা

চিন্তা করিয়া কোপবশতঃ তাহাদিগকে শাপ দিবার উদ্দেশে ইন্দ্র বলিলেন,

“আমার আজ্ঞাভঙ্গকারী মূঢ় ও পতিত তোমাদিগকে ধিক্ । তোমরা দুই জন দম্পতিরূপে পিশাচযোনি লাভ করত মর্ত্যলোকে গমন করিয়া নিজ কুকর্মের ফল ভোগ কর ।”

এইরূপে ইন্দ্র শাপ প্রদান করিলে তাহারা দুই জন অত্যন্ত দুঃখিত মনে হিমালয় পর্বতে পতিত হইল এবং ইন্দ্রশাপে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়া দারুণ দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল । হিমালয়ে হিমকণ্ঠে তাহারা সন্তপ্ত-চিন্ত হইয়া নিজেদের সেই গন্ধর্ব্ব ও অম্বরাত্ত প্রভৃতি পূর্ব পরিচয় সকল ভুলিয়া গেল । আবার গ্রীষ্মের দারুণ তাপে দেহগত পাপবশতঃ পীড়িত হইতেছিল । কৰ্মবিপাকগ্রস্ত তাহারা রাত্রিতেও সুখশান্তি পাইত না । পরস্পর নিজ দুঃখ কখনপূর্বক গিরি গহ্বরে বিচরণ করিত । শাপপীড়িত তাহারা তুষারের শীতে রোমাঙ্কিত কলেবরে দিন কাটাইত ।

একদিন সেই পিশাচ নিজ পত্নী পিশাচীকে বলিল—আমি অল্প পাপ করি নাই, রোমহর্ষণকর দারুণ পাপই করিয়াছি ; যে দারুণ পাপের ফলে নিজে নরক-যন্ত্রণাতুল্য পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি । অতএব এখন হইতে দর্ব্ব প্রকার চেষ্টার দ্বারা পাতক যাহাতে আর উপস্থিত না হয় তাহাই আচরণ করিব । এই প্রকার চিন্তা করিয়া তাহারা সেই পর্বতে দুঃখে মৃতপ্রায় অবস্থায় বাস করিতে লাগিল ।

সেই মাল্যবান্ ও পুষ্পবন্তীর কোনও সৌভাগ্যবশে এই সময় মাঘী শুক্লপক্ষীয়া ‘জয়া’ নামক বিখ্যাতা একাদশী-তিথি উপস্থিত হইল । ঐ জয়া-একাদশী প্রাপ্ত হইয়া তাহারা উভয়েই নিরাহারে থাকিল, এমন কি জল পর্য্যন্তও পান করিল না । দুঃখে আচ্ছন্ন হইয়া তাহারা একটি অশ্বখ বৃক্ষের সমীপে ঐদিন পড়িয়া রহিল । এদিকে সূর্য্যদেব অন্তঃগমন করিলেন, ঘোর নিশাকাল উপস্থিত হইল । তাহারা মাঘী রাত্রির দারুণ শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে শয়ন করিল । শীত হইতে রক্ষা পাইতে তাহারা পরস্পর গাত্রসংলগ্ন অবস্থায় থাকিয়াও নিদ্রায় সুখ পাইল না ।

ইন্দ্রশাপে পীড়িত তাহাদের সমস্ত রাত্রি এইভাবে কাটিয়া গেল । সূর্য্য উদিত হইলে দ্বাদশী-তিথি উপস্থিত হইল । জয়া একাদশীতে তাহাদের ঐ অনাহার ও রাত্রি-জাগরণ-কার্য্য ভক্তির অঙ্গস্বরূপ হইল ।

জয়া-একাদশীর মাহাত্ম্য

হে মহারাজ ! দ্বাদশী-দিনে তাহাদের জয়া-ব্রত সম্পূর্ণ হওয়াতে শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় তাহাদের পিশাচত্ব দূর হইল। পুষ্পবন্তী ও মাল্যবান উভয়েই তাহাদের পূর্বরূপ ফিরিয়া পাইল। পূর্ব অলঙ্কারাদি পুনরায় লাভ করিয়া উত্তম বেশে ভূষিত হইয়া রথে আরোহণ করিয়া তাহারা স্বর্গে গমন করিল। তারপর ইন্দ্রের সম্মুখে গমন করিয়া আনন্দে তাঁহাকে প্রণাম করিল। ইন্দ্র তাহাদিগকে উত্তমরূপ-লাবণ্যযুক্ত দেখিয়া বিস্ময়-সহকারে বলিলেন—কোন্ পুণ্যফলে আমার শাপগ্রস্ত তোমাদের পিশাচত্ব-দূর হইল, কে আমার শাপ হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিলেন ?

মাল্যবান বলিল—হে প্রভো ! ভগবান বাসুদেবের অনুগ্রহে ‘জয়া’-ব্রতের পুণ্যফলে আমাদের পিশাচত্ব বিদূরিত হইয়াছে। তাহার এই উক্তি শুনিয়া ইন্দ্র পুনরায় বলিলেন—হে মাল্যবান ! তোমরা এখন হইতে আমাদের বাক্যে আবার স্বেচ্ছা পান কর। হরিন্যাসর-ব্রতে যাঁহার। আসক্ত এবং যাঁহার। কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ মর্ত্যালোকের তাদৃশ মানবগণ আমাদেরও পূজ্য জানিবে, ইহাতে কোনও সংশয় নাই। এই দেবলোকে তুমি পুষ্পবন্তীর সহিত ইচ্ছানুরূপ বিহার কর।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে যুধিষ্ঠির মহারাজ ! এই জয়া-ব্রত ব্রহ্মহত্যা-রূপ পাপ বিনাশ করে। এই ব্রতের দ্বারা সর্বপ্রকার দানের ফল লাভ হয় এবং সম্পূর্ণরূপে সমস্ত যজ্ঞ কৃত হইয়া থাকে। এই জয়া-ব্রত কৃত হইলে কল্প কোটীকাল বৈকুণ্ঠে বাস হয় এবং ব্রতকারী নিশ্চিতই আনন্দ উপভোগ করেন। হে মহারাজ ! এই জয়া-ব্রতকথার পঠন বা শ্রবণ হইতেও অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে।

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে মাঘ-স্কন্ধপঞ্চমীয়া জয়া-একাদশীর

মাহাত্ম্য-কথন নামক সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অহুবাদ সমাপ্ত।

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাकरणতীর্থ

সমাজের বোঝা

দামোদর মাসের এক মধ্যাহ্নে বজ্রের পল্লীগ্রামের একটা মেঠো পথ দিয়া একজন তরুণ সন্ন্যাসী চলিয়াছেন। সন্ন্যাসীর কাণ্ডি তপ্তহেম-সম, শরীর প্রকাণ্ড, কণ্ঠধ্বনি নবমেঘের ত্রায় গম্ভীর, তনু হৃৎপ্রোধপরিমণ্ডল অর্থাৎ স্বীয় হস্তের চারিহস্ত-প্রমাণ দীর্ঘ, ভুজ আজাহুলঘিত, কমললোচন, তিল-ফুলের ত্রায় নাসিকা, সুষাংগু বদন। তাঁহার হস্তযুগলে বৈদিক ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলু পরণে কোপীন ও চতুর্হস্ত-পরিমিত কাষায় বহির্দ্বাস, উজ্জল-কাণ্ডি অঙ্গোপরি গৈরিক উত্তরীয় ও ভক্তিবিজ্ঞান-শিক্ষণকেন্দ্রের স্মারকস্বরূপ ব্রাহ্মণত্ব-জ্ঞাপক উপবীত, সু-উচ্চ ললাটোপরি নিত্যানন্দপরিবার-সূচক মনোরম উর্দ্ধপুণ্ড্র-তিলক, গলদেশে তুলসীমালা, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে দোহুপ্যমান তীক্ষ্ণাগ্র শিখা—এই সকল মিলিয়া সন্ন্যাসীর এক অপক্লপ শোভা বর্ধন করিয়াছিল। সন্ন্যাসীর বদনে অহর্নিশ কলিপাবন হরিনাম মহামন্ত্র, বজ্রের ত্রায় তাঁহার কঠোর দৃঢ়তা,—জগৎকে কলির হস্ত হইতে নিষ্কৃত করিয়া তাহার ভার কমাইতে হইবে। ভারতীয় মুনি-ঋষিবর্গের নিত্যাকল্যাণময়ী শিক্ষার অলন্তু প্রতিচ্ছবি উক্ত সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডলে প্রস্ফুটিত ছিল। সন্ন্যাসীর সেই জ্যোতির নিকট জাগতিক কোন বস্তুর উপমা দেওয়া সহজ নহে। ধ্যানগম্ভীর সন্ন্যাসীর চলনের ভঙ্গী তাঁহার চলার পথের প্রত্যেক লোককে আকর্ষণ করিয়াছিল। এ এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী, দুনিয়ার নিকট অতিনব ভাবের সেবক।

গণতন্ত্রের দেশে কোন ব্যক্তির ছাপ দিয়া কোন মুদ্রা বাহির করা চলে কিনা, সেন মহাশয় পুনরায় বুদ্ধিজীবী বঙ্গবাসীর আত্মভাজন হইবেন কিনা, পাকিস্তান-চীন প্রভৃতি দেশকে ভারতবর্ষ জয় করিতে পারিবেন কিনা, আমেরিকা চন্দ্রলোক-বিজয়ে সফল হইতে পারিবে কিনা প্রভৃতি জাগতিক চিন্তার পোতসমূহ সন্ন্যাসীর অতলস্পর্শী মানস-সমুদ্রে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইত। কৃষ্ণসেবার সুবিশাল গিরিসমূহের পাদদেশে উক্ত সমুদ্র বিরাজ করিত।

দামোদর মাসে বঙ্গদেশের ক্ষেত্রসমূহ ধাতুযুগ্মে পরিপূর্ণ থাকে, পুষ্করিণী ও জলাশয়সমূহ নানাবিধ পুষ্পে শোভমান থাকে। এই সকল প্রাকৃতিক শোভারাপি কিন্তু তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কলিভার হইতে

জগৎকে কিভাবে মুক্ত করা যায়, সেই চিন্তায় বিভোর হইয়া উর্দ্ধদৃষ্টে উন্নতগ্রীব সন্ন্যাসী দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন।

চলিতে চলিতে একটি গ্রাম্য নদীর কূলে তিনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইতোমধ্যে একটি নৌকা আসিয়া কূলে ভিড়িল। নৌকা হইতে কয়েকজন আরোহীও কূলে অবতরণ করিলেন। উক্ত আরোহিবৃন্দের নায়করূপে একটি যুবককে দেখা গেল। যুবকটির বেশভূষায় এবং চলনে ভারতীয়ত্বের ছাপ দেখিতে পাওয়া গেল না। এই যুবকের হস্তে ত্রিদণ্ড এবং কমণ্ডলু না থাকিলেও মাদকতাপূর্ণ উৎকট ধূমনির্যাসী একটি শ্বেতদণ্ড এবং কলির ফিরিস্তির উদ্গারক একটি ক্ষুদ্র বেতারযন্ত্র ছিল। যুবকটির গলদেশে তুলসীমালা না থাকিলেও একটি সরু রেশমী কাপড়ের ফাঁস লাগান ছিল।

যুবকটিকে দেখিয়া সন্ন্যাসী ভাবিলেন, ইহারাই সাফাং কলি বটে; গলদেশে কাপড়ের ফাঁসটি মায়ারই ফাঁস।

সন্ন্যাসীর অতুলনীয় তেজোপ্রভাবে যুবকটি একদৃষ্টে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিল। এরূপ অদ্ভুত জ্যোতিঃ কোনদিন কোন মানুষে সে প্রত্যক্ষ করে নাই। মনে মনে ভাবিতে লাগিল, বোধ হয় কোনদিন সন্ন্যাসীর সহিত তাহার পূর্ব পরিচয় ছিল। ইত্যবসরে সন্ন্যাসীর দৃষ্টিও যুবকটির প্রতি পতিত হইল। উভয়েই উভয়ের প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, যেন মনে হয় উভয়ের মধ্যে এককালে খুব ঘনিষ্ঠ প্রীতি ছিল। যুবকটির চালচলনে উদ্ধত ভাব থাকিলেও সন্ন্যাসীর নিকট নতমস্তকে প্রথমেই মুখ খুলিল। উভয়ের পরিচয়ে জানা গেল সন্ন্যাসীর পূর্ব নাম সুদর্শন, যুবকটির নাম মলোতোষ।

উভয়ের মধ্যে কথোপকথন আরম্ভ হইল। যদিও যুবকটি সন্ন্যাসীর প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তথাপি কলির রাজত্ব স্থাপন করিয়া ইন্দ্রিয়সাধনার লোলুপ-বাসনা তাহার হৃদয়ে জ্বলিতেছিল। তাঁহাদের পরস্পরকে চিনিতে বিলম্ব হইল না। যুবক ও সন্ন্যাসী উভয়েই সমপাঠী ছিলেন। বয়স উভয়েরই ত্রিশের কাছাকাছি। যদিও তাঁহারা সমপাঠী তথাপি যুবকটি সন্ন্যাসীর প্রভাবে ‘আপনি’ বলিয়া সম্বোধন করিয়া কথা বলিতে লাগিল।

যুবকটি কহিল,—আপনি যে সন্ন্যাসী হইবেন, তাহা আপনার বাল্য-কালের ক্রিয়াদি হইতে বুঝিয়াছিলাম। বাহা ইউক্, কতদিন সন্ন্যাসী হইয়াছেন?

সন্ন্যাসী—তোমার সহিত যতদিন দেখা হয় নাই ততদিন।

মনোতোষ—আপনার ছায়া যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির সন্ন্যাসী হওয়া উচিত হয় নাই। আপনাদের দ্বারা সমাজের কি উপকার হইবে? আপনারা স্বার্থপর। নিজের মঙ্গলের জন্ত সন্ন্যাসী হইয়াছেন। জগতের লোকের ভাল করিবার চিন্তা আপনাদের নাই। আমরা জগতের কত উপকার করিয়া থাকি।

এতক্ষণে সন্ন্যাসী যেন হৃদয়ের ব্রহ্মবহিতে কলিদহনের স্মরণ পাইলেন।

সন্ন্যাসী—ভায়াসারামের এখন কি হয়? অনেকক্ষণ ধরিয়া মনের অনেক ভাবই ত ব্যক্ত করিলে। তোমার পিতামাতা মনে হয় ধার্মিক ছিলেন, তোমার নামকরণের মধ্যে যে অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তাঁহারা দিয়াছেন তাহাতেই বুঝা যায়। তোমার নাম তাঁহারা ঠিকই ‘মনোতোষ’ রাখিয়াছেন। জীবের মঙ্গলের অনেক বড় বড় বুলিই ত বলিলে, কিন্তু তাহাতে জীবের ত দূরের কথা, তোমারই যে কোন মঙ্গল হইয়াছে তাহা তোমার বেশ-ভূষায় ও কথাবার্তায় বুঝিতে পারিতেছি না।

মনোতোষ—আপনার প্রত্যেকটি কথাই মধ্যে যেন কি একটি ধ্বনি লুকাইয়া আছে। শব্দগুলি কানে শুনিলাম, এইমাত্র; তাহার ধ্বনি ভেদ করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমি ঐগুলির উত্তর দিব। আমি কারিগরী বিভাগে স্নাতক উপাধি লাভ করিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আমার ফলও খুব ভাল হইয়াছিল। বর্তমানে জনসাধারণের কল্যাণার্থে-বিভাগে চাকুরী করি। উহারই একটি কার্যের জন্ত এখানে স্থান পরিদর্শনে আসিয়াছি। আপনার কথাগুলি অত্যন্ত জালাময়ী হইলেও আমি তদপেক্ষা অধিক জালাময় বাক্য আপনাকে শুনাইব। আপনি আমার একজন প্রতিভাবান বন্ধু ছিলেন। তজ্জ্বই আপনার সহিত কথা বলিতেছি, নতুবা সন্ন্যাসীর সহিত কথা বলা আমরা সময়ের অপব্যবহারই মনে করি। ঐ সময়ে বরং কিছু কর্ম করিতে পারিলে দেশের অন্ত-রোগ-কষ্ট দূর হইবে। তাহা হইলেই জনগণ দেহগত যন্ত্রণামুক্ত হইয়া আপনারা যাহাকে ভগবান বলিয়া চীৎকার করেন, তাঁহার সেবা করিতে পারিবে। অল্পপ্রকারে তাহা সম্ভব হইবে,—ইহা আমরা নিঃস্বার্থ অলস চিন্তা বলিয়াই মনে করি। আপনারা কর্মের কোন ধার ধারেন না, কেবল ‘ভগবান ভগবান’ করিয়া চীৎকার করেন। তাহাতে কি ফল হইবে?

সন্ন্যাসী—তোমরা বর্তমানের যুবক। আমি জানি, তোমরা পিতা-মাতাকেও মর্যাদা দান কর না। সুতরাং সেই দোষ ঢাকিবার জন্ত দেশের সেবার ছলনায়, তোমাদের পক্ষে লক্ষ লোক সংগ্রহ-বাসনায় তাহাদিগের বন্ধরুচির ইন্ধন যোগাইয়া কৰ্ম্মবীর সাজিতে চাহ। তোমাদের এই কপটতা আমি পূর্ণমাত্রায় জানি। আমিও তোমার বয়স্ক, ছাত্র হিসাবে তোমাপেক্ষা আমি আরও অনেক ভাল ছিলাম। সুতরাং তোমার ঐ মেয়েলি চিন্তার জবাব আমার দিতে কোন অসুবিধা হইবে না। আমিও বর্তমানের উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ জানি। আমার বন্ধু হইয়া আজ তুমিও সেই গড্ডালিকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া খুঁটানী স্লেচ্ছাচারে রুচিবান হইয়াছ, ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা। আমরাও তোমাদিগকে অত্যন্ত নিম্নস্তরের লোক বলিয়াই জানি। যদি তুমি নিরপেক্ষ হও, তাহা হইলে আমি বুঝাইয়া দিব যে, যদি ‘মানুষ’ বলিয়া কাহাকেও বলিতে হয় তবে সেই দাবী ধার্মিক ব্যক্তিগণেরই। তোমার মধ্যে ধর্ম্মভাব দূরে থাকুক, ভারতীয় রীতিনীতিরও কোন লক্ষণ দেখিতেছি না, কেবল পাশ্চাত্যের মোহে পড়িয়া তাহার অনুকরণে ব্যস্ত হইয়া আজ সমগ্র ভারতবর্ষকে তোমরা ডুবাইতে বসিয়াছ।

মনোতোষ—বাদানুবাদ করিয়া কোন লাভ নাই। যদি তর্ক ও বিচার আমি কিছু প্রদর্শন করি তাহা আপনি মানিতে রাজী কি?

সন্ন্যাসী—তোমরা! আবার যুক্তি-তর্ক মান নাকি? আমিই ত তোমাকে প্রথমে বলিলাম যে যুক্তি-তর্কে তুমি আস্থাশীল কিনা? সেই কথাটাই আবার তুমি আমাকেই ঘুরাইয়া বলিতেছ। বুঝিলাম, ভারত-বাসীর আর কিছুই নাই, সে কেবল পাশ্চাত্যের অনুকরণের মোহে পড়িয়া গিয়াছে; কথা বলাতেও সেই ভাব। আচ্ছা দেখি, বরাহভোজীদের ভাব-প্রকাশিকা ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া তোমরা কতদূর মানুষ হইয়াছ।

মনোতোষ—আমরা, যাহারা এই জগতের উন্নতির জন্ত জীবন বিসর্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প, আপনাদের স্থায় সন্ন্যাসীর সহিত ব্যবহারগত বৈষম্যও অনেক লক্ষ্য করিয়া থাকি। আপনারা যে সমাজের বোঝা, এতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা কত কষ্ট করিয়া অর্থ উপার্জন করিয়া থাকি, আপনারা বিনা পরিশ্রমে সেইগুলি আমাদের নিকট হইতে লইয়া যান।

পরের মাথায় কাঁঠাল-ভাজিয়া খাওয়া যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আপনারা অতিশয় চতুর ও বুদ্ধিমান।

সন্ন্যাসী—তোমরা যাহাকে তোমাদের বড় সাহিত্যিক বলিয়া থাক তাহারই লিপিকার একস্থলে রামকানাই নামীয় একটি সচ্চরিত্র ব্যক্তি অত্যন্ত নির্যোধ বলিয়া জগতের নিকট প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাহার দ্বারা কি জগতের মনের চিত্র প্রকাশিত হয় নাই? সুতরাং লৌকিকানো-বৃত্তির মধ্যে যে বুদ্ধিমত্তা তাহাতে জগতের লৌকিক অধিক পরিমাণে কৃতিত্বসম্পন্ন। আমরা জগতের মধ্যে নহি, ভিক্ষার দ্বারাও জীবিকানির্ব্বাহ করি না। ঈশ্বরের বস্তু তাঁহাকে সমর্পণ না করিয়া তোমরাই গ্রহণ করিয়া থাক। ভগবানের পুণ্য কড়ি তাঁহাকে না দেওয়ায় তোমাদের চৌর্য্যবৃত্তি হইয়া থাকে। সন্ন্যাসীরা সেই মহাদণ্ডনীল্য অপরাধ হইতে জগৎকে মুক্ত করিয়া থাকেন। সুতরাং সন্ন্যাসীরা সমাজের বোঝা নহেন, উপরন্তু সমাজের ভার অপহরণই করেন—ইহা বুদ্ধি। স্থাখিলে তোমরা ঐ যে ‘দেশসেবা দেশসেবা’ বলিয়া চীৎকার করিয়া স্বার্থসাধন করিবার একটি চমৎকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছ তাহাতে লাভবান হইতে পারিতে। বৃথা সন্ন্যাসীদের পশ্চাতে লাগিয়া তোমরা খাল কাটিয়া কুমীরই আনয়ন করিতেছ। (ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি B. A.

শ্রীগৌরসুন্দরের গুণচামার্জন-লীলা

জয় জয় গুরুদেব পতিতপাবন।
 ‘কৃপা করি’ কর মোরে শুদ্ধভক্তি দান।
 তব পাদপদ্মে মোর অসংখ্য প্রণতি।
 জন্মে জন্মে থাকে যেন তব পদে মতি॥
 নমঃ নমঃ শ্রীরাধিকা-মদনমোহন।
 জন্মে জন্মে পাই যেন ওরাক্ষা চরণ।
 জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
 জয়দ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ।
 “তাদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস।
 জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ”॥

সবার চরণ বন্দি অতি সাবধানে ।
 কৃপা করি' রাখ মোরে তব ভক্তস্থানে ॥
 দারুবন্ধ-রূপে আসি' প্রভু ভগবান
 নীলাচলে বৈসে জীবে করিবারে ত্রাণ ।
 জীবের উদ্ধার তরে অর্চামুত্তি ধরি'
 কত লীলা প্রকাশিলা প্রভু গৌরহরি ।
 কত ভাবে কত ভক্ত সেবা করে তাঁর ।
 ব্যক্তাব্যক্ত তাঁর লীলা মহিমা অপার ॥
 রথযাত্রা হয় তাঁর বিখ্যাত ভুবন,
 সে সময়ে আসে লক্ষ লক্ষ ভক্তগণ ।
 রথে চড়ি' প্রভু চলে গুণ্ডিচা-ভবন
 শ্রীমতীরামিকা সাথে হইতে মিলন ।
 কৃষ্ণে স্তম্ভ দিতে সদা রাধাপক্ষ চায়,
 তাই তাঁরে' রথে করে সবে নিয়ে যায় ।
 গুণ্ডিচা-বাড়ীতে হ'বে যুগল মিলন,
 যাহা দেখি' ভক্তগণ জুড়াবেন প্রাণ ।
 ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার পত্নী গুণ্ডিচা নাম
 যাঁর নামে খ্যাত হৈল গুণ্ডিচা-ভবন ।
 আহা ! তাঁর কত ভাগ্য কথা নাহি যায়—
 জগন্নাথের মাসী বলি লোকে যাঁরে গায় ।
 কত যে সৌভাগ্য তাঁর কহিতে অক্ষম ।
 অদ্যাপিহ যাঁর নামে বিখ্যাত ভুবন ॥
 যাঁর শুদ্ধভক্তিবশে প্রভু দয়াময়
 চির বাঁধা গৃহে তাঁর হইয়া সদয় ।
 তাঁর শ্রীচরণে মোর এই যে মিনতি—
 তাঁর কৃপাবলে যেন পাই শুদ্ধভক্তি ।
 নীলাচলচন্দ্র হ'ন 'অচল জগন্নাথ' ।
 শ্রীগৌরসুন্দর হ'ন 'সচল জগন্নাথ' ॥

‘সচল’ ‘অচল’ দুই নাথে দরশনে
 রথযাত্রায় গৌড় হ’তে আসে ভক্তগণে ।
 আজি গৌরাক্ষের মনে কি ভাব উদিল !
 ভক্তগণে ডাকি প্রভু কহিতে লাগিল—
 “সবে মিলি করি’ চল গুণ্ডিচা-মার্জন,
 কালি জগন্নাথ তথা করিবে গমন ।
 তাঁহার মন্দির তথা করিয়া মার্জন
 হৃদয়ের মল সবে করিব স্থালন ॥”
 প্রভুর আজ্ঞায় চলে সর্ব ভক্তগণ ।
 কত রঙ্গে করে প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জন !!
 কত শত ঘট লয়ে কত সম্মার্জনী
 ভক্তগণসাথে চলে গৌরা গুণমণি ॥
 প্রথমে প্রকোষ্ঠ করি’ যত্নে সংমার্জন,
 কত শত ঘটজলে করে প্রক্ষালন ।
 ভক্তে শিক্ষা দিতে এবে গৌরা গুণমণি
 নিজ বস্ত্রে সিংহাসন মোছেন আপনি ।
 তারপর বাহিরের দালান, প্রাঙ্গণ
 ভক্তগণসঙ্গে প্রভু করেন মার্জন ।
 রঙ্গ করি’ কহে প্রভু সব ভক্তগণে—
 “যার যত ধূলিরাশি রাখ স্থানে স্থানে ।
 সংমার্জনে যার যত ধূলিরাশি হবে,
 তার তত হৃদিমল বিদূরিত হবে ॥”
 প্রভুবাক্য শুনি’ হর্ষে সব ভক্তগণে
 নিজ নিজ ধূলিরাশি রাখে স্থানে স্থানে ।
 সবার ঝাঁটান বোঝা হইলেই জড়,
 দেখা গেল প্রভুর রাশি তাহা হ’তে বড় ।
 ভক্তগণ লজ্জা পেয়ে হৈলা অতি দঢ় ॥ (ক্রমশঃ)
 —শ্রীমতী উষালতা দেবী, ভক্তিপ্রভা

শ্রীশ্রী গুরুচরণকমলেভ্যো নমোনমঃ

“শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব-সমীক্ষা”-পুস্তকের

প্রতিবাদ

(পূর্ব প্রকাশিত ১৮শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ১২৬ পৃষ্ঠার পর)

“ইদানীং”-শব্দের কলিকাল অর্থ তুষ্টকল্পনা

তর্কতীর্থ মহাশয় বলিতেছেন—“ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ—এই চতুর্থপাদের অর্থ কি হইবে?.....“ইদানীং” শব্দের দ্বাপর যুগই অর্থ হওয়া উচিত; কারণ গর্গমুনি যখন ঐ কথাটি নন্দকে বলিতেছিলেন তখন দ্বাপর যুগই ছিল। কলি-যুগের আরম্ভ তখনও হয় নাই।” তর্কতীর্থ মহাশয়ের উক্তির এই অংশই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং “ইদানীং” শব্দে বাচালের ছায়া কষ্টকল্পনাদ্বারা কলিযুগ অর্থ করিয়া কল্কি-অবতারকে টানিয়া আনিবার কি প্রয়োজনীয়তা ছিল? ইহার মধ্যে আমরা তর্কতীর্থ মহাশয়ের দূরগত কোন ছুরভিসন্ধি লক্ষ্য করিতেছি। দ্বাপর-যুগের অবতার শ্রীকৃষ্ণ এই শ্লোকে যেমন আছেন, ১১শ স্বন্ধের শ্লোকেও তেমনি। শ্রীগর্গমুনি “শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্বকে নন্দের নিকট গোপন” করিবার জন্ত “কল্কি অবতারকে হৃদয়স্থ রাখিয়াই” শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করিয়াছেন—এই প্রকার উক্তি অসঙ্গত। শ্রীগর্গমুনি এমন ভাবে শ্লোকটি বলিয়াছেন তাহাতে প্রকটার্থ ও গুঢ়ার্থ এই উভয় অর্থই ব্যক্ত হইয়াছে। প্রকটার্থ এইরূপ—

শ্রীগর্গের বাক্য-শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ মনে করিলেন আমার এই পুত্রটি কোন যুগে শুক্লবর্ণ, কোন যুগে রক্তবর্ণ এবং কোন যুগে পীতবর্ণ ছিল। বোধ হয়, সত্যযুগের যুগাবতার শুক্লবর্ণ, ত্রেতার যুগাবতার রক্তবর্ণ এবং কোন কলি-যুগের অবতার পীতবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবার এই দ্বাপরে আমাদের আরাধ্য দেবতা নারায়ণের সমবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুত্রটির কোনও যোগ-প্রভাব আছে—শ্লোকের “গৃহতঃ” এই শব্দ হইতে শ্রীনন্দমহারাজ ঐরূপ বুঝিয়াছিলেন। শ্রীনন্দেই মনেই ভাবি বুঝিয়াই তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্ত পরে শ্রীগর্গ বলিলেন—“নারায়ণসমো গুণৈঃ” ইত্যাদি (ভাঃ ১০।৮।১২)। এই প্রকার অর্থই শ্রীগর্গোক্তির তাৎপর্য। সুতরাং তর্কতীর্থ মহাশয়ের সিদ্ধান্ত তুষ্টকল্পনা ও অসমীচীন বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

“তামসং যুগমাসাচ্চ কৃষ্ণো ভবতি কেশবঃ” মহাভারতের এই শ্লোকের অর্থ

কলিযুগের যুগাবতারকেই বুঝাইবে, অন্তরে তিনি কৃষ্ণই। ‘কঙ্কি’ লীলাবতার, তাঁহার কথা এখানে বলা হয় নাই। যুগাবতারের কথাই এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

অবতারগণের আলোচনায় তর্কতীর্থের বিভ্রান্তি

তৎপরে তর্কতীর্থ বলিয়াছেন—“শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী একবিংশ অবতারই যে বুদ্ধ এবং বুদ্ধের পরবর্তী দ্বাবিংশ অবতারই যে কঙ্কি ইহা বোধ হয় বালকেও বুঝে। ...উক্ত দ্বাবিংশতি অবতারসমূহ প্রত্যেকেই ব্যক্তিভেদে অসংখ্য।” তর্কতীর্থ মহাশয়ের এই উক্তি বিচার করিলে বলিতে হয়, অবতার সম্বন্ধে তর্কতীর্থ মহাশয়ের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত বলিয়াই এই প্রকার উক্তি করিতে তিনি সাহসী হইয়াছেন। ‘বালকেও যাহা বুঝে’ সঙ্গীভাস্তা হইয়াও তিনি কিন্তু তাহা বুঝেন নাই।

প্রথমতঃ, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সেই গৌরুষ-রূপের প্রথম অবতার বলিয়াছেন। ইহা ভ্রমগ্রস্তা উক্তি। শ্লোকে আছে,—প্রথম অবতার চতুঃসন, ব্রহ্মা নহেন। শ্লোকের তাৎপর্য—সেই দেব বিষ্ণু প্রথমতঃ চতুঃসনরূপে ব্রাহ্মণ হইয়া দুষ্চর অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাহুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শ্লোকের “ব্রহ্মা” পদের অর্থ ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয় ভ্রম, তিনি শ্লোকের প্রথম দ্বিতীয়াদি শব্দের উল্লেখ দেখিয়াই মনে করিয়াছেন, ক্রমানুযায়ী অবতারের কথা শ্রীহৃত গৌস্বামী বলিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। শ্রীস্বামীর টীকায় দেখি—‘প্রথম-দ্বিতীয়াদিশব্দ নির্দেশমাত্রবিবক্ষয়া’ অর্থাৎ প্রথম দ্বিতীয়াদি শব্দগুলি অবতারের নির্দেশমাত্র অভিপ্রায়ে, ক্রমিক নহে।

আবার, তর্কতীর্থের অবতার-সম্বন্ধে জ্ঞান দর্শাবতারে সীমাবদ্ধ বলিয়া এবং স্মৃতি ক্রিয়াকাণ্ডে সর্বদা “মৎস্তাদিদশাবতারেষু নমঃ” বলিয়া অভ্যাস হইয়া পড়ায়, দ্বাবিংশতি অবতারের সংখ্যা দেখিয়া বিস্ময় ও সংশয় আসিয়াছে। সর্বশক্তিসার বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রকার সংশয় অবাঞ্ছনীয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধ যেমন প্রমাণ অস্তিত্ত্ব স্বকণ্ডলিও তেমনি প্রমাণ। ১২য় স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়, ১৩ অঃ পাঠ করিলে আরও অনেক অবতারের নাম পাইবেন এবং অবতার অসংখ্য বলিয়া যে শ্রীহৃত গৌস্বামী বলিয়াছেন তাহার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। ক্রমানুযায়ী অবতারের কথা বলেন শ্রীমদ্ভাগবতের ১২য় স্কন্ধ ১৩ অঃ পাঠ করিলে আরও অনেক অবতারের নাম পাইবেন এবং অবতার অসংখ্য বলিয়া যে শ্রীহৃত গৌস্বামী বলিয়াছেন তাহার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। ক্রমানুযায়ী অবতারের কথা বলেন শ্রীমদ্ভাগবতের ১২য় স্কন্ধ ১৩ অঃ পাঠ করিলে আরও অনেক অবতারের নাম পাইবেন এবং অবতার অসংখ্য বলিয়া যে শ্রীহৃত গৌস্বামী বলিয়াছেন তাহার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীব্যাসাবতারের বর্ণনা আছে। অতএব ১ম স্কন্ধে বর্ণিত অবতারগণ যে ক্রমিক নন তাহা প্রমাণিত হইল এবং এই ব্যাসাবতার নিয়া তর্কতীর্থ যে অসঙ্গত উক্তি করিয়াছেন তাহা কতদূর সমীচীন হইয়াছে তাহাও সুধীগণ চিন্তা করুন।

অবতারের সংখ্যা অনন্ত। যেমন মন্বন্তরাবতার ১৪টি, তন্মধ্যে মাত্র তিনটির নাম চতুঃসনাদি উক্ত লীলাবতারের গণনার মধ্যে ধরা হইয়াছে— অবশিষ্ট একাদশটি মন্বন্তরাবতারের নামের উল্লেখ তন্মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না; গুরু, রক্ত, শ্যাম, কৃষ্ণ—এই সকল যুগাবতারের নামও উল্লিখিত হয় নাই; আবার, হয়গ্রীব, হংস, পৃথ্বীগর্ভ প্রভৃতি দ্বিতীয় পুরুষের অবতার। এই সকলের অবতারত্ব প্রকাশ করিবার জন্তই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—‘অবতারা হসংখ্যেয়া হরে: সত্ত্বনিধের্ধিজা:। যথা বিদাসিন: কুল্যা: সরস: স্যু: সহস্রশ:’ (ভা: ১।৩।২৬)। তাৎপর্য—শ্রীহরি যে অসংখ্য অবতারের হেতু তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? এই আশঙ্কা নিরসনের জন্ত বলিতেছেন—শ্রীহরি সত্ত্বনিধি; সত্ত্ব—অসংখ্য অবতারের প্রাচুর্য্যব শক্তির নিধি অর্থাৎ আশ্রয়। দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন—অক্ষয় সরোবর হইতে সহস্র সহস্র প্রবাহ নির্গত হইলেও যেমন তাহার ক্ষয় হয় না তদ্রূপ শ্রীহরি হইতে অসংখ্য অবতার আবির্ভূত হইলেও তিনি পূর্ণ থাকেন।

“পূজিত হন” এর অবতার অর্থ ই যুক্তিযুক্ত

আবার তর্কতীর্থ বলিয়াছেন—“চারিযুগে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর কিরূপ বর্ণ, নাম ও আকৃতিবিশিষ্ট বিগ্রহ ভক্তগণের দ্বারা বিশেষভাবে উপাসিত হইয়া থাকেন—ইহা জানাই মিথিলেশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল, ভগবানের চারিযুগের অবতারবিগ্রহ কি কি—ইহা জানা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাহা হইলে ‘পূজিত হন’ না বলিয়া ‘অবতীর্ণ হন’ ইহাই বলিতেন।” তর্কতীর্থ মহাশয়ের এই উক্তি সমীচীন নহে। নিমি রাজা ‘কস্মিন্ কালে স ভগবান্’ (ভা: ১।১।১৯) শ্লোকে যাহা জানিতে চাহিয়াছেন তাহা বুঝিতে হইলে ঐ শ্লোকের পূর্ববর্তী শ্লোক কয়েকটির তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে হইবে। নবযোগেন্দ্রের অগ্রতম চমস তাঁহার বক্তব্য উপসংহার করিতে গিয়া ভগবদ্ভক্তিহীন জনগণের দুর্গতির কথা বলিয়াছেন—‘যাহারা মোক্ষলাভে বিরত হইয়া ত্রিবর্গ সাধনে রত, তাহারা আত্মঘাতী। অকর্ম্মে কন্মবুদ্ধিবিশিষ্ট অশাস্ত ব্যক্তিগণ আত্ম-ঘাতী। ইহাদের কোনও কার্য্য সিদ্ধ হয় না। বাসুদেববিমুখ এই সকল

লোক অতি আয়াসের সহিত উপার্জিত গৃহ, অপত্য, স্ত্রী প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে পারে না এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও নরকে প্রবেশ করে।’

উপরি উক্ত জনগণের উদ্ধারের উপায় ভগবদবতার বিনা সম্ভব হইবে না—মনোমধ্যে এই চিন্তা রাখিয়াই, ‘কস্মিন্ কালে স ভগবান্’ ইত্যাদি শ্লোকে রাজা প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন এবং শ্রীকরভাজনও রাজার আকাজ্জা জানিয়া চারি যুগের অবতারের নাম-বর্ণাদি বর্ণন করিতে গিয়া উপক্রম করিতেছেন “কৃতং ত্রেতাঽদ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেযু কেশবঃ। নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে” (ভাঃ ১১।৫।২০) ; অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে ভগবান কেশব নানাবর্ণ, নানা নাম ও নানা আকারে অবতীর্ণ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিধি দ্বারা উপাসিত হন। এই উপক্রম শ্লোকে শ্রীকরভাজন সত্যাদি চারিযুগের অবতারাди সম্বন্ধে যাহা বলিবার জন্ম অঙ্গীকার করিলেন, তাহাই যুগাদিক্রমে স্থাপন করিতেছেন। আবার, ‘পূজিত হন’ এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য এই প্রকার—যাঁহাকে ভক্তি করা কর্তব্য তিনিই ভগবান্, তিনিই জগতে পূজিত হন এবং তিনিই অবতার বলিয়া কথিত হন। অতএব “পূজিত হন” শব্দদ্বয় দ্বারাও অবতার অর্থই পাওয়া গেল। এখানেও শ্রীকরভাজন যুগাবতারের কথাই বলিয়াছেন, ঠিক যেমন শ্রীগর্গ শ্রীকৃষ্ণ নামকরণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন।

কৃষ্ণাবির্ভাবের দ্বাপরের অব্যবহিত কলিতে

শ্রীগৌরই প্রচ্ছন্নযুগাবতার

একই সত্য উভয় স্থানে দুই জন ঋষি পৃথক পৃথক প্রসঙ্গে ও পৃথক পৃথক যুগে বলিয়াছেন মাত্র। শ্রীকরভাজন. সত্যযুগে, গুরুবর্ণ, গুরুনাম ; ত্রেতায় রক্তবর্ণ, রক্তনাম যুগাবতার বলিয়াছেন। এখানে ত্রেতায় শ্রীরামাবতারের কথাই বলেন নাই। দ্বাপরের যুগাবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণকে বর্ণনা করিলেন, দ্বাপরের যুগাবতার ‘শ্যাম’ শ্রীকৃষ্ণেতে অন্তর্ভূত আছেন এই হেতু। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন সেই দ্বাপরের অব্যবহিত কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি দ্বারা নিজ স্বরূপ আচ্ছাদন করত শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হন, ইহাই অব্যভিচারী নিয়ম, ইহার কোন সময় অগ্রথা হয় না। যেমন শ্রীগর্গ দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতারের কথা বলিয়া কলির পীতাবতারের কথা বলিয়াছেন সেই প্রকার এখানেও শ্রীকৃষ্ণের পরবর্ত্তী অবতাররূপে

কলিতে শ্রীগৌরই আসিবেন, অথ কেহ নহে—ইহা যুক্তিসিদ্ধ হইল। কলির অবতারের ছন্দ রক্ষার জন্য ঋষি স্পষ্ট নামাদি উল্লেখ করেন নাই।

শ্রীগৌরতত্ত্ব অতীত রহস্যপূর্ণ

শ্রীভগবত্তত্ত্বের মধ্যে শ্রীগৌর-তত্ত্ব অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আছে— “নিজ গুঢ়কার্য্য তোমার প্রেম আশ্বাদন।

অনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥”

শ্রীমন্নহাপ্রভু নিজের প্রকৃত স্বরূপ শ্রীরামানন্দ রায়ের কাছে প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—“গুপ্তে রাখিও কাঁহা না করিও প্রকাশ”। এখানেও শ্রীকর-ভাজন কলির গৌর-অবতারের কথা বলিতে গিয়া বলিতেছেন—“কলাবপ্তি তথা শূণ্ণ” (ভাঃ ১১৫৩১) অর্থাৎ বিশেষ কলিতে সেই প্রকার অবতারের কথা শুনুন। এখানে ‘অপি’ শব্দ বিশেষ কলি স্মৃতি করিতেছে। আর ‘শূণ্ণ’ শব্দে রাজাকে বিশেষভাবে অবহিত হইবার জন্য বিশেষ রহস্যপূর্ণ কথা বলিয়া তন্ত্রাখ্যাত্যয়ে অর্থদ্বয়বোধক শব্দের দ্বারা “কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাকৃষ্ণং”, ইত্যাদি শ্লোকটি বলিতেছেন।

শ্রীগৌরই “কৃষ্ণবর্ণং” শ্লোকের নিগূঢ় তাৎপর্য্য

তর্কতীর্থ মহাশয়ের এই শ্লোকের শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরামপুর ব্যাখ্যা সঙ্গীতময় হয় নাই। উপক্রম শ্লোকে প্রতিযুগের অবতারের কথা বলিতেই শ্রীকর-ভাজন অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুতরাং এখন কলিযুগের অবতারের কথা না বলিলে উপক্রম শ্লোকের তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। কলিযুগের প্রসঙ্গে কলিযুগের কথাই থাকিবে। দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণের ও ত্রেতার শ্রীরামের কথা কলিকালের প্রসঙ্গে আসিতেই পারে না। তবে ‘ধ্যোয়ং’ ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে যে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিপর বাক্য দেখা যায় তাহার তাৎপর্য্য শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ নয়, তাৎপর্য্য—নিগূঢ় ও রহস্যপূর্ণ বস্তুকে রহস্তারূপে রাখা। শ্লোক-দ্বয়ে দ্ব্যর্থক বাক্যে শ্রীমন্নহাপ্রভুকে প্রকাশ করিয়াও শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতিপর বাক্যবিশ্বাসদ্বারা শ্রীমন্নহাপ্রভুর নিগূঢ় স্বরূপ আবরণ করিয়া রাখিলেন। নতুবা কলির প্রসঙ্গে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের ব্যাখ্যায়—“অনুদ্ভুতমুদ্রাদান্তং” অর্থাৎ এক খাইয়া অল্প বমি করারূপ দৌর্ভাগ্যের বাক্যে আপত্তি হইবে। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅচ্যুতানন্দ

বেদার-বদ্রী-দর্শনান্তে প্রত্যাবর্তন

বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ৩১শে মে মঙ্গলবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজের পরিচালনায় এক দল যাত্রী সমিতির প্রদর্শিত নিয়মানুসারে শ্রীকেদার-বদ্রী প্রভৃতি সর্বোত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থানসমূহ কীর্তনমুখে পরিদর্শনান্তর ২৬শে জুন রবিবার পুনরায় বঙ্গদেশে নির্বিঘ্নে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

প্রথমে তাঁহারা হরিদ্বার যাত্রা করেন। তথায় দুই রাত্রি যাপন করিয়া ট্রেনযোগে হৃষীকেশ মনময়িরী ধর্মশালায় দুই রাত্রি বাস হয়। হৃষীকেশে লছমনঝোলা গঙ্গার উপরে একটি মনোরম দোহুল্যমান সেতু। এইস্থান হইতে বাসযোগে শ্রীবদরিকাশ্রমের পথে দেবপ্রয়াগ দর্শন করিয়া পিপুল-কুঠিতে এক রাত্রি এবং যোশীমঠে দুই রাত্রি অবস্থান হয়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য চারিধামের প্রকাশ করিয়া হরিদ্বারে এই যোশীমঠ স্থাপন করেন। বদ্রীনারায়ণে বাস ষ্ঠ্যাও হইতে ২ মাইল দূরে শ্রীমন্দিরে মন্দাকিনীতটে শ্রীশ্রীচতুর্ভুজ-নারায়ণ বিরাজিত। ইহারই দেড় ক্রোশ ব্যবধানে সরস্বতী নদীতটে শ্রীব্যাশাশ্রম; নিকটে গণেশ-গুহা, বসুধারা (সহস্র ফুট উচ্চ হইতে গঙ্গার ধারা), ভীমপুল প্রভৃতি মনোরম দর্শনীয় বিদ্যমান। স্বাপর যুগে শ্রীমতী দ্রৌপদী সরস্বতী নদী অতিক্রম করিতে না পারিলে মধ্যম পাণ্ডব ভীম একখানি মাত্র প্রস্তর দিয়া ‘ভীমপুল’ সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন। যাত্রিবৃন্দ শ্রীব্যাশাশ্রমে সাক্ষাৎ হরিজনমুখে ভক্তিবাদান্ত শ্রবণ করিয়া অতীব উল্লসিত হন। বদরিকাশ্রমে ত্রিরাত্রি বাসান্তে রুদ্র প্রয়াগ হইয়া গুপ্তকাশী (সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৭৫০০ ফুট উচ্চ) পৌঁছান হয়। এই স্থানে শিব গুপ্তভাবে পঞ্চপাণ্ডবকে দর্শন দিয়াছিলেন। অনন্তর যাত্রিবৃন্দ পদব্রজে শ্রীরামপুরে আসিয়া তথায় ৮টিতে একরাত্রি বিশ্রাম করেন। এইস্থান হইতে পঞ্চক্রোশ পথ পশ্চাতে রাখিয়া ত্রিযুগী নারায়ণে আসিয়া সকলে তৃপ্তিলাভ করিলেন। সত্যযুগ হইতে একটি যজ্ঞকুণ্ড অद्याপি এই স্থানে প্রজ্জ্বালিত আছে। ত্রিযুগী নারায়ণের দক্ষিণে সরস্বতী ও বামে লক্ষ্মীদেবী। ইনিই শিব-পার্বতীর বিবাহ সম্পাদন করেন। ইহার আড়াই মাইল তলদেশে শোনপ্রয়াগ—মন্দাকিনী ও বাসুকীর সঙ্গমক্ষেত্র। এস্থান হইতে যাত্রিগণ গৌরীকুণ্ড হইয়া শ্রীকেদারনাথে (সমুদ্রতল হইতে ১১৭৫০ ফুট উচ্চ) উপনীত

হন। গৌরীকুণ্ডে তপ্তকুণ্ড নামক উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করিয়া যাত্রীগণ বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। শ্রীকেদারনাথের শৈত্য-কুপায় যাত্রিবৃন্দ উগ্রতাপ-বিদূরিত হইয়া স্নানীতল হন। এই স্থানে দুই রাত্রি যাপনান্তে পুনরায় পদব্রজে গুপ্তকাশী এবং তৎপর বাসে হৃষীকেশ আগমন করা হয়। যাত্রীগণের কেহ কেহ স্বাস্থ্য-নিবাস মুসৌরীও ভ্রমণ করেন। অতঃপর ট্রেনযোগে হাওড়ায় প্রত্যাবর্তন হয়। সেবকবৃন্দের স্মধুর ব্যবহারে প্রতিটি যাত্রীই আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

—নিজস্ব সংবাদ

রথযাত্রায় শ্রীপুরীধাম-দর্শন

বহুদিন হইতে সমিতি তীর্থ-দর্শনে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণকে বিশেষ সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। এই বৎসরও অনেকে রথযাত্রায় শ্রীপুরীধাম দর্শন করিবার বাসনা জানাইয়া সেই প্রকার আয়োজন করিতে সমিতিকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদের নির্দেশে শ্রীপুরীধাম-সহ ক্ষেত্রমণ্ডলের কয়েকটি তীর্থ-পরিক্রমার ব্যবস্থা হয়। উক্ত পরিক্রমা-সঙ্ঘ গত ১০ই বামন, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ সোমবার হাওড়া হইতে রাত্রি ১০টা ৪০মিঃ-এর গাড়ীতে যাত্রা করিয়া শ্রীরেমনা (ক্ষীরচোরা গোপীনাথ), যাজপুর (বৈতরনী-তীরে সত্যযুগ হইতে সেবিত শ্রীশ্রীশ্বেতবরাহদেব, ব্রহ্মার স্থাপিত গরুড়-স্তম্ভ, চারিকল্পের বরাহদেব, বিরজা মন্দির), ভুবনেশ্বর (ভুবনেশ্বর শিব, অনন্ত বাসুদেব, বিন্দু সরোবর), সাক্ষীগোপাল প্রভৃতি দর্শন করিয়া গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-দিবসে শ্রীপুরীধামে উপনীত হন। যাত্রীগণ সূর্য্যরূপে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন দর্শন করেন এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাদেবীর রথত্রয়ও রজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করিয়াছেন। পুরীধামে অবস্থান কালে আলাল-নাথ (গোপীনাথ) এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কোণারকের সূর্য্যমন্দিরেও যাওয়া হয়। পরিক্রমা-সঙ্ঘ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা দর্শন করিয়া ২৯ শে বামন শনিবার নির্বিঘ্নে হাওড়া প্রত্যাবর্তন করেন। —নিজস্ব সংবাদদাতা

সাত্ত-শ্রাদ্ধ

বিশেষ ছুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত ৩১ শে শ্রাবণ মঙ্গলবার মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত পূর্বচক গ্রাম-নিবাসী সমিতির আশ্রিত ও বিশিষ্ট হিতৈষী স্বধামগত শ্রীপাদ গিরিধারী দাসাদিকারী মহাশয়ের ধর্মপ্রাণা পত্নী শ্রীযুক্তা চারুবালা দেবী পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনিও সমিতির আশ্রিতা ছিলেন। ১০ই ভাদ্র সাত্ত-বিধানমতে তদীয়া পারলৌকিক-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে শ্রীশ্রীল পরমারাধ্যতমদেবের নিকট অনুরোধ আসিলে বৃন্দাবনচন্দ্রাভিন্ন গৌরচন্দ্রের চরণে সমর্পিতচিত্ত ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসী, বেষাশ্রয়ী ও ব্রহ্মচারিবর্গ উক্ত গ্রামে প্রেরিত হন। সমিতির সেবকবর্গ নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধের অশাস্ত্রীয়ত্ব জ্ঞাপনমুখে বিচিত্রবর্ণশোভিত বৈদিক স্বণ্ডিল নিম্মাণ-পূর্বক বহু স্মার্ত-ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শিক্ষিত জনসমাজ, ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরহিত সহজিয়া বোষ্টম-প্রায়, ও স্মার্তাচারে আবদ্ধ গ্রামবাসিবর্গের সম্মুখে প্রেতশ্রাদ্ধের অকর্মণ্যতা ও হেয়ত্ব স্থাপনপূর্বক বাস্তবদেবার্চন, ভোগরাগ, বৈষ্ণবহোম, শান্তি হোমাদি স্তম্পন করিয়া মহাপ্রসাদ দ্বারা পরলোকগতার পিণ্ড প্রদান করান। এই শ্রাদ্ধ-সম্বন্ধে অনেকেই সমিতির সেবকগণের নিকট কুতর্ক করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া সম্পাদনকালে এবং ঐ দিবস রাত্রে এক জনসভায় এতৎ সম্পর্কীয়া বিচারধারা শ্রবণ করিয়া ঐ সকল ব্যক্তি কোন প্রশ্ন করিতে সাহস পান নাই। সকলেই এই ক্রিয়ায় বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা চারুবালাদেবীর ধার্মিক জ্যেষ্ঠ সন্তান শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দাস সাত্ত-শ্রাদ্ধক্রিয়ায় আস্থাভাজন হইয়া সমিতির আচার্য্য-পাদপদ্মের নিকট শ্রাদ্ধের তিন দিন পূর্বে শ্রীনাম গ্রহণ করেন। সমিতি শ্রীপাদ গিরিধারী প্রভুর কুলরক্ষকগণের মধ্যে ধর্মভাব দর্শনে প্রীত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই ঐ প্রকার ধর্মযুক্ত থাকিয়া স্বধামগত পিতৃদেবের মনোভীষ্ট পূরণের চেষ্টা করিলেই শ্রীপাদ গিরিধারী প্রভুর প্রচুর আশীর্বাদ লাভ করিবেন। পরলোকগতার পুত্রগণ প্রায় তিন সহস্র ব্যক্তির জন্ম মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

—শ্রীহরিশ্রিয় ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীঝুলনযাত্রা-মহোৎসব

বিগত ২৬শে শ্রীধর ৪৮০ গৌরান্দ, ৯ই ভাদ্র একাদশী-দিবসে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির সর্বত্র শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীর ঝুলনযাত্রা আরম্ভ হইয়া ৩০শে শ্রীধর শ্রীঝলদেব-পূর্ণিমা-দিবসে সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

ব্রহ্মচারী ও সেবকবৃন্দ স্মৃদু্য দোলনা নিৰ্ম্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দকে উহাতে আরোহণ করিয়া দেন। উক্ত দোলনা এবং তাহার চতুস্পার্শ্ব তৃণ-গুলা-সতা ও মৃৎনির্ম্মিত মূর্ত্তি দ্বারা সজ্জিত করিয়া বৃন্দাবনের অনুরূপ করা হয়। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র—শ্রীকোলবীপ। শাস্ত্র এইস্থানকে শুণ্ড গোবর্দ্ধনক্ষেত্র বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীঝুলনের এই দর্শন বহু লোককে শ্রীমঠে আকর্ষণ করিয়াছে। ঝুলন-যাত্রার পরিপূর্ণ দিবস শ্রীঝলদেবাধির্ভাব-তিথি সমিতির সকল সেবক উপবাস-সহযোগে পালন করেন।

শ্রীঝলদেব সঙ্কর্ষণ-তত্ত্ব। তাঁহার কৃপা প্রভাবেই জীবের মায়িকাকর্ষণ নষ্ট হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে রতি হয়। এতজ্জন্ম পরদিবস পারায়ণ-তিথিতে বহু লোককে শ্রীমঠে শ্রীঝলদেবের প্রসাদ প্রচুরভাবে বিতরণ করা হয়।

শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ

চুঁচুড়ার মঠেও ঝুলন-যাত্রা-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। অত্রস্থ সেবক-বৃন্দ কর্তৃক বিবিধভাবে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ নিজেচ্ছায় অদ্বুতভাবে সজ্জিত হইয়া রসিক ভক্তবৃন্দের নিকট হিন্দোল-লীলা প্রকাশ করেন।

শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ

পূর্ব পূর্ব বৎসরের স্থায় এ বৎসরও মথুরার মঠে ঝুলন-উৎসব আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে বহু লোক তত্রস্থ শ্রীমঠে যোগদান করিয়াছিলেন। সেবকগণ বিবিধভাবে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-বিহারীর হিন্দোল-সজ্জা ভূষিত করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ নারায়ণ মহারাজ উৎসবের কয়-দিবসই শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীহিন্দোল-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে বুলনযাত্রা ও বার্ষিক মহামহোৎসব

বিগত বর্ষসমূহের জায় এই বৎসরও আসাম প্রদেশে শ্রীগোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব ২৬শে শ্রীধর, ৯ই তাদ্র শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের বুলন-যাত্রার তিথি হইতে আরম্ভ হইয়া ষষ্ঠ দিবসান্তে (শ্রীবলদেব-পূর্ণিমার পরদিবস) সমাপ্ত হইয়াছে। সংবাদ আসিয়াছে যে উক্ত কয় দিবসই শ্রীমঠে প্রত্যহই দুইবেলা হরি-সঙ্কীৰ্তন, ভাগবত-পাঠ, ইষ্টগোষ্ঠী ও ধর্মসভার মাধ্যমে নবকল্বেবরে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত-বাণীর প্রচার হইয়াছে। সুসজ্জিত হিন্দোলে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারীর অপূৰ্ণ বুলন-যাত্রা দর্শনমানসে গোলোকগঞ্জ মঠে ধুবড়ী, গৌরীপুর, বঙ্গাইগাঁও, গৌসাইগাঁও, কোকরাঝাড় প্রভৃতি বহু দূরবর্তী স্থানসমূহ হইতেও বহু শিক্ষিত ও ভদ্র জনসমাজ আগমন করেন।

প্রতিদিন স্থানীয় Ex. M. L. A. শ্রীযুত ভুবন প্রধানী, B. T. Centre-এর Principal শ্রীযুত গুণনাথ শর্মা, B. D. O., উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত কামিনী কুমার রায়, S. D. O. (P. W. D.) প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে ও ধর্ম-সম্মেলনে যোগদান করিয়া উৎসবের গাভীৰ্য্য বর্ধন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত উর্দ্ধমস্থী মহারাজ প্রতিদিন ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন।

উৎসবের সাফল্য সম্পাদনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজের নাম সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য। শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারীও দর্শকের স্মৃতিপথে স্মরণীয় থাকিবেন। সমিতির মাথাভাঙ্গা আশ্রম হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তক্ৰিবেদান্ত উর্দ্ধমস্থী মহারাজ শ্রীপাদ পর্য্যটক মহারাজের আস্থানেই গোলোকগঞ্জ মঠে উৎসবের কয় দিবস অবস্থান করেন। আসাম প্রদেশের সমিতির আশ্রিত এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মাশ্রিত ভক্তগণও এই মহামহোৎসবের মহত্ব উপলব্ধি করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দের সঙ্গ-লাভে শ্রীমঠে আসিয়াছিলেন। বলদেব-পূর্ণিমার পরদিবস সর্বসাধারণের মহোৎসবে সহস্রাধিক ব্যক্তিকে আকর্ষণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়, কোন আগন্তুকই মহাপ্রসাদলাভে বঞ্চিত হন নাই। অহরহ হরিকীৰ্তন-ধ্বনির মাধ্যমে এই মহামহোৎসবের দিনগুলিতে গোলকগঞ্জের বক্ষে যেন গোলোকধাম নামিয়া আসিয়াছিলেন। —নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রচার-পত্র

ছুমকা জিলায় প্রচার

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুভিবেদান্ত বামন মহারাজ শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডী মহারাজ এবং কএকমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী-সহ বৃষভানুরাজনন্দিনীর পরিসেবা বস্তুর অমল-গাথা কীর্ত্তন-প্রয়াসে বিহার প্রদেশের ছুমকা জিলার বিভিন্ন স্থানে গুভগমন করেন। তাঁহারা আসনবনি, সারসাজোল, রাজবন্ধ, ধাদিকা প্রভৃতি স্থানে বিপুলভাবে কলিযুগপাবন, ভব-ভয়নাশন শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের বিগুহ-ভক্তিধারা প্রবাহিত করিয়া জিলা সদর ছুমকায় উপস্থিত হন। এইস্থানে পুরাতন মাড়োয়ারী ধর্মশালাতে তাঁহারা অবস্থান করিতেন। D. E. O. (জিলা-শিক্ষা-সমাহর্ত্তা) এবং Civil Surgeon (জিলা চিকিৎসালয়াধ্যক্ষ)-এর বাটীতে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বামন মহারাজ ভাগবত-ব্যাখ্যা-মুখে বর্ত্তমান সমাজের ভিত্তিহীন অবস্থা, ধর্মব্যতীত শান্তি পরাহত, কৃষ্ণসেবাই সকল সুখের আধার, বুঝাইয়া দিলে শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। স্থানীয় উকীলগণ, উচ্চতর বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকবৃন্দ, স্থানীয় কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ, শহরের বিভিন্ন অফিসের বহু উচ্চতর অফিসার, শহরের বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি, বহু ধর্ম-প্রাণ মাড়োয়ারীগণ স্বামীজী মহারাজের ভাগবত-পাঠ শ্রবণ করিতে আসিতেন। ছায়াচিত্রযোগে শ্রীপাদ ত্রিদণ্ডী মহারাজ শ্রীপ্রহ্লাদলীলা, শ্রীগৌরলীলা, শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রভৃতি প্রদর্শনমুখেও বিবিধ শাস্ত্রীয় বিচার প্রকাশ করিতেন। ইহাও শ্রোতৃ-দর্শকমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ দান করিত। ছুমকা নগরী হইতে তাঁহারা জারমুণ্ডিতে গুভগমন করেন। এই স্থানেও বহু শিক্ষিত, ধনী ব্যক্তি প্রচারকবৃন্দের বাণীতে আকৃষ্ট হন। এই গ্রামের শ্রীযুক্ত অমূল্য গণ প্রচারে বিশেষ সাহায্য করেন। সর্ব্বত্রই লীলাপুরুষোত্তম অপ্রাকৃত নবীনমদনের বৃন্দাবন-লীলার মধুক্ষরা কাহিনী শ্রবণে নিত্যানন্দ-লাভে ভাবী ও ভাবুক রসিককুল উরুগতিতে বৈকুণ্ঠ-রসসাগরে নিমগ্ন হইতেছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বামন মহারাজ বড়রগবহাল ও দেওদাঁড়—ছুমকা জিলার এই বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামদ্বয়ে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া পুনরায় ছুমকা নগরীতে বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের আহ্বানে গুভাগমন করিয়াছেন। বড়রগবহালে

শ্রীযুত বিমল চন্দ্র মণ্ডল, শ্রীযুত নিবারণ চন্দ্র বিশ্বাস এবং দেওদাঁড়ে শ্রীযুত বৈষ্ণনাথ পাল ও ডাক্তার বিজয় কুমার দত্ত মহোদয়গণ প্রচারক-মণ্ডলীকে প্রচারকার্যে সহায়তা করায় ধন্যবাদার্থ।

সিউড়ীতে প্রচার

জারমুণ্ডিতে প্রচারান্তে পূজ্যপাদ শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ কএকমুণ্ডি ব্রহ্মচারী-সহ বীরভূম জেলার সদর সিউড়ীতে আগমন করিয়া পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিশ্বামী শ্রীমন্ত্তিবিবেক ভারতী মহারাজের জনৈক শিষ্য শ্রীপাদ উরুক্রম দাসাধিকারী (শ্রীউমাপদ সাধু) মহাশয়ের বাণীতে অবস্থান করেন। এতৎ নগরের সাধারণ-স্থান—রাধাবল্লভ-তলা ও শিবমন্দিরে, এবং অত্রস্থ স্থানে স্বামীজী মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলাদি-প্রদর্শন ও ভাগবত-ব্যাখ্যামুখে গোড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণা বাণী বর্ণনা করেন। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এইস্থানে তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছেন। মাননীয় উকীল শ্রীযুক্ত বিজয় দে স্বামীজী মহারাজের বাণীতে চমৎকৃত হইয়া শ্রীগোড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির শিক্ষা প্রচারে যথেষ্ট উদ্যোগী হন। অনন্তর স্বামীজী মহারাজ সিউড়ী হইতে ২ মাইল দূরে করিধ্যা নামক এক উন্নত পল্লীতে শ্রীশ্রীদামোদর জীউ মন্দিরে আহুত মহতী জন-সভায় ভাগবত-কথা কীর্তন করিয়া নবদীপ প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

আসাম প্রদেশে প্রচার

শ্রীগোড়ীয় বেদান্তের প্রচার-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিশ্বামী শ্রীমন্ত্তিবেদান্ত পর্যটক মহারাজ আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জিলার গৌরীপুরে প্রবলভাবে শ্রীহরিকথা কীর্তন করিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজের শাস্ত্র-তাৎপর্য ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্যের প্রকাশ পাইলে বহু শিক্ষিত লোক তাঁহার আকৃষ্ট হন। কয়েক বৎসর পূর্বে সংস্কৃত ভাষার বর্তমানে স্থায়িত্ব-সহজে দেশে তুমুল আলোড়ন উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম স্বয়ং এস্থলে গুণবিজয় করিয়া বাধাতামূলকভাবে সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বক্তৃতামুখে জ্ঞাপন করেন। দারগর্ভ যুক্তিসমূহ শ্রবণ করিয়া তাঁহারই পস্থানুসরণে কেবল স্ত্রী-শিক্ষার জন্ত এতৎস্থানে শিক্ষিত অধিবাসিগণ কর্তৃক একটী সংস্কৃত-টোলও নির্মিত হয়। স্থানটী পণ্ডিতমণ্ডলীতে অধুষিত।

অতঃপর স্বামীজী মহারাজ গোলোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে বুলন যাত্রা-

মহোৎসব সম্পন্ন করিয়া বঙ্গাইগাঁও-তে গমন করেন এবং পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-
স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীব্রহ্ম-মাধব-গৌড়ীয়
মঠে অবস্থান করতঃ এই বৃহৎ রেলওয়ে কলোনীর বিভিন্নস্থানে হরিকীর্তন
করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত গৌড়ীয়-প্রজ্ঞান-সিদ্ধুর ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-
মুক্তা-বিতরণের দীর্ঘ মাসপঞ্চকান্তে ২৮শে ভাদ্র নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয়
মঠে সসজ্জ প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। — নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠীর ছাত্রবৃন্দের সাফল্য

অত্যন্ত আনন্দের সহিত শ্রীপত্রিকার পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে, “বঙ্গীয়
সংস্কৃত-শিক্ষা-পরিষদ” কর্তৃক গৃহীতা গত-পরীক্ষায় শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির
পরিচালিত নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-চতুষ্পাঠীর ছাত্রবৃন্দ প্রভূত সাফল্য ও
কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত উর্দ্ধমহী
মহারাজ বৈষ্ণবদর্শনের উপাধিতে দ্বিতীয় বিভাগে ও শ্রীহরি-
নামামৃত-ব্যাকরণের মধ্য-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে, পণ্ডিত শ্রীপাদ
রাঘবচৈতন্য ব্যাকরণতীর্থ কাব্যের মধ্য-পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে এবং
শ্রীপাদ বৃষভানু ব্রহ্মচারী শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণের আত্ম-পরীক্ষায়
দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া চতুষ্পাঠীর সুনাম বৃদ্ধি করিয়াছেন। প্রসঙ্গত
উল্লেখযোগ্য, “বঙ্গীয় সংস্কৃত-শিক্ষা-পরিষদ” হইতে যে তিনজন ছাত্র মাত্র এই
বৎসর “বৈষ্ণবদর্শনে” উপাধি লাভ করেন, শ্রীসমিতির চতুষ্পাঠীর ছাত্র
তাঁহাদের অন্তর্গত। এই প্রকার পরীক্ষা-ফল বিশেষ সন্তোষজনক।

পূর্বে পূর্বে জানাইলেও পুনরায় নিবেদন করিতেছি যে, যে-সমস্ত ছাত্র
সমিতির চতুষ্পাঠী হইতে “শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ” ও “বৈষ্ণব-দর্শন”
অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক হইবেন, সমিতি তাঁহাদের আহা-বাসস্থানের ব্যয়
বহন করিবেন। — নিজস্ব

শ্রীশ্রীভক্তসৌরভো নমঃ



১৮শ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৭৩ { ৮ম সংখ্যা



প্রিন্টার্স-শ্রীমদেবানন্দ মিশ্র, কলিকতা-১

সম্পাদক—ব্রহ্মপুত্রস্বামী শ্রীশ্রীমদ ভক্তিবিনোদ বসু মহারাজ

কাৰ্যালয়-শ্রীদেবানন্দ পোড়ায় মঠ, তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ (মদীয়া)

শ্রী শ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ

*	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্কেজে ।</p> <div style="text-align: center;">  <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">০ গোদীয়-পট্টিকা</p> </div>	*		
ধর্মঃ স্বহৃদিতঃ পুংসাং বিশ্বকূসেন-কথাস্থ যঃ ॥		নোংপাদমোদয়দি রুতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥		
*	<p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা বয়ান্নাঃ সুপ্রসীদতি ॥</p>	*		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্কেজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥</p> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <p>অন্ত ধর্ম মুহূরুপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রুতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥</p> </td> </tr> </table>			<p>সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্কেজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥</p>	<p>অন্ত ধর্ম মুহূরুপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রুতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥</p>
<p>সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন । অধোক্কেজে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥</p>	<p>অন্ত ধর্ম মুহূরুপে পালে যেই জন । হরি-কথায় রুতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥</p>			

১৮শ বর্ষ	<p>সকর্ষণ, ১৮ পদ্মনাভ, ৪৮০ গৌরাক সোমবার, ৩০ আশ্বিন, ১৩৭৩; ইং ১৭/১০/১৯৬৬</p>	৮ম সংখ্যা
----------	---	-----------

শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম-স্কন্ধে একাদশোহধ্যায়ে

যুধিষ্ঠির-মহারাজস্য প্রশ্নে শ্রীনারদ-ঋষিণা
মানবানাম্ সদাচার-নির্ণয়ঃ

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরাজ্জবম্ ।

জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ২১ ॥

শম, দম, তপস্বা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, শ্রীভগবানে
একান্তভাবে আত্মসমর্পণ এবং সত্যভাষণ—এই সকল ব্রাহ্মণের লক্ষণ ॥ ২১ ॥

শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা ।

ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্ ॥ ২২ ॥

শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজ, ত্যাগ আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রাহ্মণপরায়ণতা,
প্রসন্নতা এবং সত্যভাষণ,—এই সকল ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ ॥ ২২ ॥

দেব-গুরুর্চ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্ ।

আস্তিক্যমুত্তমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যালক্ষণম্ ॥ ২৩ ॥

দেবতা, গুরু এবং অচ্যুতে (বিষ্ণুর প্রতি) ভক্তি, ধর্ম-অর্থ-কাম—এই ত্রিবর্গের অনুষ্ঠান, বেদ ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস, অর্থোপার্জনের জন্তু নিত্য উত্তম ও নিপুণতা,—এই সকল বৈশেষ্যের লক্ষণ ॥ ২৩ ॥

শূদ্রস্ত সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যুমায়ায়া ।

অমন্ত্রযজ্ঞো হৃন্তেয়ং সত্যং গো-বিপ্ররক্ষণম্ ॥ ২৪ ॥

ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্গের প্রণাম ও তাঁহাদের অকপটভাবে সেবা, শৌচ (শুদ্ধতা), অমন্ত্রযজ্ঞ (কেবল নমস্কারের দ্বারা পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান), অচৌর্য, সত্যভাষণ, গো-ব্রাহ্মণ রক্ষা,—এই সকল শূদ্রের লক্ষণ ॥ ২৪ ॥

শ্রীণাঞ্চ পতিদেবানাং তচ্ছুশ্রষাতুকূলতা ।

তদ্বন্ধুঘনুবৃতিশ্চ নিত্যং তদব্রতধারণম্ ॥ ২৫ ॥

পতির শুশ্রূষা ও তাঁহার অনুকূলতা, পতির বন্ধুগণের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সর্বদা তাঁহার ব্রতধারণ,—এই চারিটি পতিব্রতা শ্রীদিগের লক্ষণ ॥ ২৫ ॥

সম্মার্জনোপলেপাভ্যাং গৃহমণ্ডনবর্তনৈঃ ।

স্বয়ঞ্চ মণ্ডিতা নিত্যং পরিমৃষ্ট-পরিচ্ছদা ॥ ২৬ ॥

কামৈরুচ্চাবচৈঃ সাধ্বী প্রত্নয়েণ দমেন চ ॥

বাক্যৈঃ সত্যৈঃ প্রিয়ৈঃ প্রেম্ণা কালে কালে

ভজেৎ পতিম্ ॥ ২৭ ॥

সাধ্বী শ্রী নিত্য স্বয়ং অলঙ্কৃত ও শুদ্ধপরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া এবং সম্মার্জন, উপলেপন প্রভৃতি দ্বারা গৃহোপকরণের শুকিসম্পাদন, গৃহমণ্ডন ও স্নানকীরণ করিয়া অবসরকালে পত্যহকূলা নানাবিধা ইচ্ছা, বিনয়, দম, সত্য, শ্রীতিজনক বাক্য এবং প্রেমদ্বারা যথোচিত পতির সেবা করিবে ॥ ২৬-২৭ ॥

সন্তুষ্টালোলুপা দক্ষা ধর্মজ্ঞা প্রিয়সত্যবাক্ ।

অপ্রমত্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ ॥ ২৮ ॥

যথালোভে সন্তুষ্টা, অলুকা, নিপুণা, ধর্মজ্ঞা, প্রিয়সত্যবাদিনী, সাবধান, শুচি ও স্নেহযুক্তা হইয়া মহাপাতকশূন্য পতির ভজনা করিবে ॥ ২৮ ॥

যা পতিং হরিভাবেন ভজেৎ শ্রীরিব তৎপরা ।

হর্য্যাঅনা হরেলোকে পত্যা শ্রীরিব মোদতে ॥ ২৯ ॥

যে নারী লক্ষ্মীর ত্রায় পতিপরায়ণা হইয়া হরিভক্ত-বুদ্ধিতে পতির সেবা করে, সে তদ্বৎ হরি-পরায়ণ পতির সহিত বৈকুণ্ঠে স্নখলাভ করে ॥ ২৯ ॥

বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃতা ভবেৎ ।

অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তেবসায়িনাম্ ॥ ৩০ ॥

অচৌর ও নিষ্পাপ অন্ত্যজ এবং অন্তেবসায়ী চণ্ডাল প্রভৃতি স্ব-স্ব-কুল-পরম্পরা-প্রাপ্তা বৃত্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

প্রায়ঃ স্বভাববিহিতো নৃণাং ধর্মো যুগে যুগে ।

বেদদৃগ্ভিঃ স্মৃতো রাজন্ প্রেত্য চেহ চ শর্ম্যকৃৎ ॥ ৩১ ॥

হে রাজন্, বেদজ্ঞগণ যুগে যুগে স্বভাব-বিহিত ধর্মকেই ইহলোকে ও পরলোকে মঙ্গলজনক বলেন ॥ ৩১ ॥

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্তমানঃ স্বকর্ম্যকৃৎ ।

হিত্বা স্বভাবজং কর্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ ॥ ৩২ ॥

যিনি স্বধর্ম্যাচারী এবং স্বভাবকৃত বৃত্তির সহিত বর্তমান, তিনিই ধীরে ধীরে আপনার স্বভাবজাত কর্ম পরিত্যাগপূর্বক নিষ্কামভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

উপ্যমানং মুহুঃ ক্ষেত্রং স্বয়ং নির্বীৰ্য্যতামিয়াৎ ।

ন কল্পতে পুনঃ স্মৃত্যে উপ্তং বীজঞ্চ নশ্যতি ॥ ৩৩ ॥

এবং কামাশয়ং চিত্তং কামানামতিসেবয়া ।

বিরজ্যেত যথা রাজন্নাগ্নিবৎ কামবিন্দুভিঃ ॥ ৩৪ ॥

হে রাজন্, বারম্বার বীজবপনে ক্ষেত্র নির্বীৰ্য্য হইয়া পড়ে এবং পুনরায় শস্তোৎপাদনে অসমর্থ হয়; কখনও উপ্ত বীজও নষ্ট হইয়া যায়। ঘৃতবিন্দুসমূহ দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত না হইলেও প্রচুর ঘৃতনিক্ষেপফলেই উহা যেমন নির্বাপিত হয়, তদ্রূপ কামসকলের অতিশয় সেবান্বারা কামাশয় চিত্ত অবশেষে বিরক্ত হয় ॥ ৩৩-৩৪ ॥

যস্ত বল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যজকম্ ।

যদন্ত্যাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥ ৩৫ ॥

যে লক্ষণ যে পুরুষের বর্ণ-প্রকাশক উক্ত হইল, যদি অন্তবর্ণেও তাহা দৃষ্ট হয়, তবে তাহার বর্ণও সেই লক্ষণ দ্বারা বিনির্দিষ্ট হইবে ॥ ৩৫ ॥

আছে অধিকার

আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষবাদের যুক্তি লইয়া অধোক্ষজ সেবাকে বিপন্ন করি। আমি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করুণাপাটেবে গঠিত একটি গন্ধিত অধম তর্কনিষ্ঠ ক্ষুদ্রজীব। শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত অধোক্ষজে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি-বিশিষ্ট ভক্তগণকে গুরু বলিয়া স্বীকার করি না। পাপিষ্ঠ-শোষণে ভগবদ্ভক্তের অধিকার নাই, দুর্বৃত্তগণের যথেষ্টাচারিতায় ভক্তবিদ্বেষির অধিকার আছে—এরূপ বলিতে গেলেই আমরাগকে ভক্তিরাজ্য হইতে নিতান্ত শিশুতেও তাড়াইয়া দিবে। অক্ষজবাদের দুশ্চরিত্রমূলে শ্রীগৌরভক্তের চলনায় ভক্ত নামে যে ১৩টী গৌর-বিদ্বেষী দল গৌরভক্ত বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করেন, তাহাদের সহিত কোন মহুষ্যের, কোন ভক্তের, কোন সাধুর সঙ্গ করা কর্তব্য নহে,—এ কথা সকল শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ কীর্তন করিয়াছেন। হাম্‌বড়া হইয়া আমার ইন্দ্రిয়ের দ্বারা আমি সাধুকে নদীয়া-নাগরী বলিয়া বুঝিয়া লইব—ইহাই প্রণিপাতের অভাব, সেবার অভাব ও ভক্তির অভাব মাত্র। সেব্যবস্তুর শ্রীগৌরভক্তের ভজন করাকেই গৌর ভজন বলে। সেব্যবস্তুর সহিত কলহ করিয়া স্বেচ্ছাচারীয়ায় তাঁহাকে ব্যাভিচারী-নাগর প্রতাপন করিয়া তাঁহার অপ্ৰীতি উৎপন্ন করাকে ভক্তির পরিবর্তে ভোগ বলে। যেখানে ভক্তি নাই, ভক্তির নামে কন্মীর ইন্দ্ৰিয়-জ্ঞানের চলনা আছে, সেখানেই ভোগের আবাহন ও শ্রীগৌরভক্তের সহিত সংগ্রাম। ভোগী দলের যে তালিকা পূর্ব মহাজনগণ দিয়াছেন, তাহাতেও আমরা জানিতে পারি যে গৌরভক্তের গৌর-বিদ্বেষির সহিত প্রণয় করিতে নাই ও তাহাদের দুঃসঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্তব্য। যে সকল ব্যক্তি লোক-প্রতারণার জন্ত গৌরভক্তির নামে ব্যাভিচারের প্রশয় দেয় তাহাদিগকে কোন গৌরভক্ত ভক্তিমান বলিয়া স্বীকার করেন না, পরন্তু গৌর-বিদ্বেষী বলিয়াই জানেন। শ্রীগৌরভক্তগণের কথা দূরে যাক্, সাধারণ নীতি-পরায়ণ সামাজিকগণও চরিত্রহীন সম্প্রদায়গুলিকে আদৌ আদর করেন না। ইহারা শ্রীগৌরের কলঙ্ক ও গৌরভক্তগণের বিদ্বেষী মাত্র। ইহাদের বুদ্ধির দোষে শ্রীগৌরসুন্দর চরিত্রহীন প্রচারক বলিয়া জগতের নিকট তাহারা যে গৌরভক্তির ঘণিত চিত্র প্রদর্শন করিতেছে তাহাতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই তাহাদিগকে নীতিরহিত অতদ্র ভাবের প্রশয়-দাতা বলিয়া জানেন। এমন কি ভাটকু-

জীবী, মন্ত্রজীবী, ভূতক অধ্যাপক, দেবলগণও কৃষ্ণভক্তির চলনায় এই অপ-
সম্প্রদায়গুলিকে গৌরভক্তশ্রেণী হইতে বিতাড়িত করেন। “আউল, বাউল,
কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই। সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাঞি ॥
অতিবাড়ী, গোপীছাড়ি, গৌরাঙ্গনাগরী। তোতা কহে ত্রয়োদশের সঙ্গ
নাহি করি ॥” পাঠান্তরে “এ দশেরও” আছে।

এই তেরটি অপসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ যদি গৌরভজন বলিয়া নিজ নিজ
গৌর-বিদ্বেষ চালাইতে চান, তাহা হইলে শ্রীগৌরারের নিজজনগণ
তাহাদিগের ভ্রমচতুষ্টয় মঙ্গলের জন্ত তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া দেন।
আউল, বাউল, নদীয়া-নাগরীগণ যদি নিজ নিজ ব্যভিচারের পুতিগন্ধ শ্রীগৌর-
সুন্দরের সৌগন্ধযুক্ত অঙ্গে মাখাইবার ধৃষ্টতা করেন, সেইরূপ বেয়াদবি
কখনই গৌরভক্ত গোড়ীয় আদর করেন না। গোড়ীয় গৌরভক্তের দাস,
সুতরাং যাহারা ভক্তনের নামে নদীয়া-নাগরী হইয়া গৌর-বিদ্বেষ করিবেন
তাহাদিগকেই অস্বেচ্ছা হইতে নিষ্পুক্ত করিবেন। গৌরারের ভক্তসম্ভার
মায়াবাদী বঙ্গদেশীয় কবি যখন অতাত্ত্বিক প্রত্যক্ষবাদকে অধোক্ষজ-সেবা
বলিয়াই চালাইবার চাতুরী করিয়াছিল তখনই গোড়ীয়ের ঈশ্বর শ্রীদামোদর-
স্বরূপ তাহাকে বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।
আজ যদি নদীয়া-নাগরী বা গৌর-নাগরীগণ স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ বা কামজ
ব্যভিচারকে ভক্তনের প্রণালী বলিয়া চালাইতে চান তাহা হইলে সেই
গোড়ীয়ের ঈশ্বর শ্রীদামোদর-স্বরূপের ছত্ৰাবর্গ তাহাদিগকে বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত ও
রসাতাস দোষ-দুষ্ট জানিয়া বৈষ্ণব-সভা হইতে তাড়াইয়া দিবেন।

ভোগ ও মোক্ষকামিগণকে নিরুৎসাহিত করিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী
ভক্তিরসায়তনসিদ্ধিতে ভুক্তি ও মুক্তি-স্পৃহাকে শিশাচী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।
তাহাতে আচার্য্যের গৌরব-বৃদ্ধি হইয়াছে। ভোগী ও ত্যাগীদলের শ্রীম্নাহাপ্রভু
ও শ্রীকৃষ্ণগোস্বামী প্রভুর এই কথায় অসম্বদিত হওয়া উচিত নহে। ভগবানের
আচার্য্যদাসের বা আচার্য্যের অধিকার নাই—ইহা বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা
মাত্র। নদীয়া-নাগরী দল একটু ভক্তিয়ুক্ত হইয়া অধিকার কাহার আছে
যদি দেখিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলেই তাহারা জানিতে পারিবেন যে,
শ্রীগৌরের চরিত্রবান্ নিজজনগণেরই নদীয়া-নাগরীর চেষ্টায় দোষ আছে,
—দেখাইবার নিত্য অধিকার আছে। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়
লিখিয়াছেন :—

এতক ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কোতুকে ।
 হেন নাহি যারে না চালয়ে নানারূপে ॥
 সবে পরজীর প্রতি নাহি পরিহাস ।
 স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ ॥
 এই মত চাপল্য করেন সব সনে ।
 সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে ॥
 ‘স্ত্রী’ হেন নাম প্রভু এই অবতারে ।
 শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে ॥
 অতএব যত মহামহিম সকলে ।
 ‘গৌরাজ নাগর’ হেন স্তব নাহি বলে ॥

(চৈঃ ভাঃ আদি ১৫।২৬-৩০)

শ্রীগৌরসুন্দরের পবিত্র ভক্তগণ যদি গৌরাজকে চরিত্রহীন সাজাইতে
 কাহাকেও দেখেন তবে নিশ্চয়ই সভাসমিতি ও সাময়িক পত্রে তাহাদের
 অবৈধ আচরণের কথা ও গৌর-বিদ্বেষের কথার ঢাক-ঢোল বাজাইয়া
 দিবেন, এইরূপে প্রচ্ছন্ন গৌর-শত্রুগণকে গৌরভক্ত বলিয়া কপটতা করিতে
 বাধা দিবেন ; নতুবা ব্যভিচার আসিয়া গৌড়ীয় ভাগবত-সমাজকে নরকের
 পথে লইয়া যাইবে। নরকে পথকে দুর্নীতির ছায়ায় স্নানীতল গৌরভক্তন
 বলিয়া নির্কোষ ঠকাইবার প্রয়াস শায়ের আলোকে উদ্ঘাটিত করিলে সত্য-
 লোক-বিরোধী কপটিগণের ক্লেশের কারণ হয় সত্য কিন্তু তাই বলিয়াই ভক্তন-
 শব্দের চলনায় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়া সংসমাজকে কলঙ্কিত করা কাহারও
 কর্তব্য নহে। গৌর-নাগরীর কুভজন-দৌরাত্ম্য অন্তের আলোচ্য বিষয় নহে
 বলিয়া নির্কোষ ঠকাইতে গেলে কি আমাদের মত শঠকে লোকে তৃণাদপি
 স্নানীচ জানিবে ? কখনই নয়। আউল বাউলগণ গৌরনাগরী-ভজনপ্রণালীকে
 তাহাদের নিজের বলিতে পারেন, তাহাদের নিজস্ব বলি বলাতে পারেন,
 তাহাতে গৌরাজের কোন অধিকার নাই ; কিন্তু গৌরভক্তগণ কি এতই
 নির্দয় যে জীবে দয়ারহিত পাপ-পঙ্কে ক্ষীরবোধে গ্রহণকারী নির্কোষ
 জনগণের মঙ্গল বিধান করিতে তাহারা পরাঙ্মুখ থাকিবেন। আত্মহত্যা-
 কারী নিমজ্জমান ব্যক্তি যদি বলেন,— জলে ডুবিয়া মরিতে বাধা দিতে
 কাহারও অধিকার নাই, তাহা হইলে কি জীবে দয়াময় গৌড়ীয় তাহার
 আত্মহত্যাপরাধ হইতে রক্ষা করিবেন না ? শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু
 “বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি”তে লিখিয়াছেন, —

বৈরাগ্যযুগ্ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মানমভীপ্সুমক্ষম্ ।

কৃপাসুধিৰ্যঃ পরহুঃখহুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥

আমি দৃষ্টিশক্তিহীন ছিলাম, দর্শনভাবে জড়সঙ্গে প্রবৃত্ত থাকার তাহা হইতে বিরত হইয়া ভক্তিব্রসপানে বিমুখ ছিলাম ; পরহুঃখকাতর, দয়ার সাগর শ্রীসনাতন গোস্থানী আমাকে বিশেষ যত্নের সহিত কৃষ্ণেতর বস্তুতে বিরাগবিশিষ্ট হরিভক্তিরস পান করাইয়াছিলেন, সেই প্রভুরই আমি আশ্রয় গ্রহণ করি। আর আজকালকার বাউল, আউল-মত বহুমানন করিয়া নদীয়ানাগরী “তৃণাদপি সুনীচতা”র আদেশে ভ্রান্ত হইয়া বলিতেছেন,—

“পরহুঃখহুঃখী সনাতনাশ্রিত শ্রীকৃপাহুগ সম্প্রদায়! তোমরা রঘুনাথের ত্রায় আমাদিগকে ভাবিও না ; আমরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য গৌরাজকে পারকীয় রসের নাগর সাজাইয়া তৃণাদপি সুনীচতাবের পোষণ করিব, তোমাদের কথা সহ্য করিতে পারিব না, তোমাদিগকে গালিগালাজ দিয়াও ‘তরোরপি সহিষ্ণুতা’ দেখাইব, তোমাদিগের অসম্মান করিব, অবৈষ্ণব বলিব, নিকোঁধ বলিব ; তোমরা আমাদের কলঙ্কের কথা, ইন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টা লোকের নিকট প্রদর্শন করিয়া আমাদের লজ্জা দিও না ; আমরা কামোপহত বলিব জীব। কৃষ্ণভক্তনের বিক্রতি—আউল বাউলদিগের সন্তোষবাদই আমাদের গৌরকৃষ্ণভজন। গৌরাজের বিপ্রলভরসাশ্রয়ে হরিসুখ-তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট ভক্তনের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। বাউল সহজিয়ারা যে ধারায় কৃষ্ণভক্তনের নামে নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণকে হরিভজন বলিয়া চালাইয়া কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা-গর্ত্তে মজিয়া আছে আমরাও সেই সেই বিচার অবলম্বন করিয়া কামকে প্রেম বলিয়া চালাইব। তোমরা বাধা দিতে আসিলে তোমাদিগকে গালিগালাজ করিয়া আমরা প্রেমিক বলিয়া পরিচিত থাকিব। ভোগী হইয়া আমরা গৌরভক্ত-নামে প্রচারিত হইতে চাহি। তোমরা আমাদের শিক্ষক নও। শ্রীগৌরপার্বদগণ কেহই আমাদের শিক্ষক হইবার উপযুক্ত নহেন। আমরা আমাদের কার্য্য চালাইবার উপযোগী করিয়া ঠাকুর নরহরিকে, সিদ্ধচৈতন্যদাসকে এবং শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজীকে নাগরী-ভজার মহাজন বলিয়া দাঁড় করাইয়াছি, সুতরাং শ্রীগৌরভক্তগণকে গালা-গালি দিতে আমরা পশ্চাৎপদ হইব না।

“আমাদের প্রপঞ্চে সখীর ভেকই ধর্ম্মের সাধন, গৌরনাগরী কল্লনা করিয়া গৌরকে ব্যভিচারী প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে আমাদের আনন্দ হয় না,

আবার শুদ্ধভক্ত তোমরা যদি সভা-সমিতি করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বল তাহা হইলে আমাদের ভোগময় নির্জ্ঞান সাধন ভজনের আলোচনা করিবার তোমাদের অধিকার নাই, আমরা উচ্চৈঃস্বরে বলিব। তোমরা যখন গৌরদাস বা বৈষ্ণবদাস বলিয়া দাও তখন আমাদের শিক্ষা দিতে যাওয়া তোমাদের উচিত নয়। আমরা গৌরেরও উপাস্ত্র দেবাপ্রভু। তোমাদের মত গৌরদাসানুদাসকে আমরা আদৌ গণনা করি না। গৌরকে ভোগ করাই আমাদের কার্য্য। তোমাদের গৌরসেবা করা কার্য্য হইলে গৌরের প্রভু আমরা আমাদেরও সেবা করিতে তোমরা বাধা। পরচর্চা তোমাদের একটী ভজনের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অস্ত্রের সাধন-ভজন লইয়া চর্চা করা কাহারও উচিত নহে। যদি বল, তোমরা গৌরের নিজের স্মৃতিতরং তোমাদের গৌরকে আমাদের স্থায় বিরোধী সম্প্রদায় ভৃত্য, বশ্য কামপরিতৃপ্তির যন্ত্র করিয়া তুলিতেছে এবং সেজন্ত জগতের লোককে গৌরের সহিত শত্রুতা করিতে তোমাদের বাধা দিবার অধিকার আছে, আমরা তাহা স্বীকার করিব না। আমরা যাহা করি না কেন তোমরা গৌরভক্ত হইলেই বা তোমরা বলিবার কে? ইনি শুদ্ধ, উনি অশুদ্ধ, ইনি পতিত, উনি পাষণ্ড, এ সকল কথা বৈষ্ণবের মুখে শোভা পায় না। বৈষ্ণব যাবতীয় পাষণ্ড, অশুদ্ধ, পতিত জীবকে নিত্যকাল নিজ নিজ ভোগের বস্তুকে ভজন বলিয়া চালাইতে দেন এবং যাবতীয় পাষণ্ড, অশুদ্ধ, পতিত জীবের মঙ্গল বিধান করা বৈষ্ণবের কোষ্ঠীতে লেখে না। তবে কেন তোমরা বুদ্ধিমান হইয়া নাগরীদলের ভোগময়ী অভক্তিকে ভক্তি নামে চালাইতে বাধা দিতেছ?

“বৈষ্ণব আপনাকে নীচ, পতিত ও অধম সর্বদা মনে করিবেন; তাহা হইলেই গৌরনাগরীদল কুরুচির পথে অবাধে বিচরণ করিবার সাহিত্য প্রবলভাবে প্রচার করিতে পারিবেন। স্বয়ং নিত্যানন্দ যখন বলিয়াছেন,—

“পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।

শুনিয়া আইনু মূই পাতকী হেথায়”।

এবং আমরা নদীয়া-নাগরী যখন নিতাইচাঁদকে তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া নিত্যকাল পাতকী বলিয়াই জানিয়াছি তখন আর তাঁহার সেবকানু-সেবক সজ্জায় তোমরা বৈষ্ণবগণ আমাদের চক্ষে কোন্ হার? খবরদার

নদীয়া-নাগরীর দুষ্কর্মের কথা তোমরা মুখে আনিতে পারিবে না। তোমরা যখন বলিতেছ শ্রীকৃষ্ণ, সনাতন, রঘুনাথ, নরহরি প্রভৃতি তোমাদের গুরুবর্গ শুদ্ধভক্ত এবং নদীয়া-নাগরীর কল্লনাকারী জনগণ অশুদ্ধভক্ত তাহা হইলে কি করিয়া তোমরা ভক্ত-শব্দবাচ্য হইবে, তোমাদের মনে যখন শুদ্ধ ভক্তের প্রতিই আদর এবং তদনুগমনই ধর্ম তখন আমরা নাগরীদল জীবাধম আমরা আমাদের বুদ্ধির অগম্য গৌরভক্তগণ।

কতকগুলি অভক্ত কতিপয় জাল গান ও কবিতা লিখিয়া কিছুদিন হইল নাগরীবাদ উদ্ভাবনা করিয়াছে। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণদাস ও শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজীর স্থায় মহাজনকে নদীয়া-নাগরীর উদ্ভাবনাকারী মহাজন দাঁড় করাইয়াছে বলিয়া কি তাদৃশ ভক্তিবিরোধী রুচির বশবর্তী হইয়া কোন গৌরভক্ত সঙ্কল্প ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইবেন? দুই চারিটি ধর্মবিরোধী কপটী ভক্তির স্বরূপ নিরূপণে অসমর্থ হইয়া মহতের নামে স্বীয় অভক্তির তাণ্ডবলাশ্র প্রচার করিয়াছে দেখিয়া কোন গৌরভক্ত যেন কোনক্রমেই অত্যায পথ গ্রহণ না করেন, ইহা সহৃদয় ভ্রাতৃপ্রেমবহনকারী ভক্তের স্বাভাবিক অনুরোধ। তাহাতে অসতের ব্যবসা নষ্ট হইয়া যায়, অসতের ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেলে নিজের জেদ বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় ভক্তিবিরোধী মতকে গৌরভক্তি বলিয়া প্রচলন-প্রয়াস আমরা আদর করি না। সত্য কথা বলায় শ্রীবন্দাবন দাস ঠাকুর শুদ্ধভক্ত নহেন আর মিথ্যা কাল্পনিক কথা প্রচারে ভক্ত হইলেন নদীয়া-নাগরী বা গৌর নাগরী। বলি সাক্ষাৎ আসিলেও এরূপ দুঃসাহসিক বাক্য মুখে আনিতে পারে না। —জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(ইতিহাস)

১। ইতিহাস ও কালজ্ঞানের আবশ্যকতা কি?

“ইতিহাস ও কালজ্ঞান, ইহারা অর্থশাস্ত্র বিশেষ। যুক্তিদ্বারা ইতিহাস ও কালের বিচার করিলে ভারতের অনেক উপকার হইবে। তদ্বারা ক্রমশঃ পরমার্থ-সম্বন্ধেও অনেক উন্নতির আশা করা যায়। প্রাচীন বিশ্বাস-নদীতে যুক্তিস্রোতঃ সংযোগ করিলে ভ্রমরূপ বদ্ধ শৈবাল-সকল দূরীভূত

হইয়া পড়িবে ও কালক্রমে অযশোরূপ পুতিগন্ধ নিঃশেষিত হইলে ভারত-বাসীদিগের বিজ্ঞানটী স্বাস্থ্য লাভ করিবে।”—‘বিজ্ঞাপন’, কৃঃ সং বাং ১২৮৬

২। কোন্ সময়ে বেদ গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত হয় ?

“প্রাজাপত্যাদিকারে কোন গ্রন্থ রচনা হয় নাই। তখন কেবল কতিপয় সুশ্রাব্য শব্দের সৃষ্টি হইয়াছিল। সর্বাদৌ প্রণবের উৎপত্তি। লিখিত অক্ষরের তৎকালে সৃষ্টি হয় নাই। একাক্ষরে অনুস্বার-যোগমাত্রই তখনকার শব্দ ছিল। মানবাধিকার আরম্ভ হইলে অক্ষরদ্বয়-সংযোগ-পূর্বক ‘তৎ সং’ প্রভৃতি শব্দের প্রাদুর্ভাব হইল। দৈবাধিকারে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শব্দ-যোজন পূর্বক প্রাচীন মন্ত্র-সকল রচিত হয়। ঐ সময়ে যজ্ঞ সৃষ্টি হয়। ক্রমশঃ গায়ত্রী প্রভৃতি প্রাচীন ছন্দের আবির্ভাব হইতে লাগিল। স্বায়ত্ত্ব মনুর অষ্টম পুরুষে চাক্ষুষ মনু; তাঁহার সময়ে মংস্ত্রাবতার হইয়া ভগবান্ বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন—এরূপ আখ্যায়িকা আছে। বোধ হয়, ঐ সময়েই বেদের ছন্দঃসকলও অনেক মন্ত্রে রচিত হয়; কিন্তু সে-সমুদয়ই শ্রুতিরূপে বর্ণ হইতে কর্ণে ভ্রমণ করিত, লিখিত হয় নাই। এইরূপ বেদ-সকল অনেক দিন পর্য্যন্ত অলিখিত অবস্থায় থাকায় এবং ক্রমশঃ মন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় অনায়ত্ত্ব হইয়া উঠিল। তৎকালে কাত্যায়ন, আশ্বলায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ বিষয়-বিচার-পূর্বক শ্রুতি-সকলের সূত্র রচনা করিয়া কণ্ঠস্থ করিতে সহজ করিয়া দিলেন। তাঁহাদের পরেও অনেক মন্ত্রাদির রচনা হইল। যখন বেদ অতি বিপুল হইয়া উঠিল, তখন যুধিষ্ঠির রাজার কিয়ৎকাল পূর্বে শ্রীব্যাসদেব একাকার বেদকে বিষয়-বিচার-পূর্বক চতুর্ভাগে বিভক্ত করত গ্রন্থাকারে সঙ্কলন করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ ঐ কার্য্য ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ ব্যাস-শিষ্য ঋষিগণ ক্রমশঃ বেদ-সকলের শাখা এমত বিভাগ করিলেন যে, অল্লায়াসে লোকে বেদ অধ্যয়ন করিতে পারিল।”—‘উপক্রমণিকা, কৃঃ সং

৩। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের আদিম ইতিহাস কি ?

“যে সময়ে ভারতবর্ষে নিরীশ্বর কর্ম্মবাদ-জনিত জড়ানন্দ মত অত্যন্ত প্রবল ছিল, যখন অপ্রাকৃত-তত্ত্বপরিপূর্ণ বেদশাস্ত্রকে কেবল ধর্ম্মপ্রতিপাদক শাস্ত্র বলিয়া নিরীশ্বর কর্ম্মবাদকে বৈদিক-মত বলিয়া জড়বাদী বিপ্রগণ সামান্ত যজ্ঞাদির দ্বারা ঐহিক ইন্দ্রিয়সুখ ও মরণান্তে ইন্দ্রপুরীর অম্বর্য্য ও অমৃত-সন্তোষ-সুখ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তখন জড়ানন্দে অসন্তুষ্ট

হইয়া ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব শাক্যসিংহ একদা শারীর দুঃখের অপরিহার্যতা পর্যালোচনা-পূর্বক নির্বাণ-সুখ-সাধক বৌদ্ধ-বাদকে স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপূর্বেও যে কেহ কেহ ঐ প্রকার নির্বাণবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। * * * * * কেবল শাক্যসিংহ নহে, তৎকালে বা তাহার কিছু পূর্ব হইতে বৈশ্যকুলোদ্ভব জিন-নামক কোন পণ্ডিত বৌদ্ধ-মতের সদৃশ আর একটি মত প্রচার করেন। ঐ মতের নাম জৈন-মত। জৈন-মত ভারতেই আবদ্ধ আছে। বৌদ্ধ-মত পর্বত, নদী ও সমুদ্র অতিক্রম করিয়া চীন, তাতার, শাম, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, প্রভৃতি নানাদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল।” —তঃ বিঃ

৪। পৃথিবীর সর্ব সভ্যজাতি কোন্ সময় ভারতবাসীকে রাজা, দণ্ডদাতা ও গুরু বলিয়া পূজা করিত ?

“যে সময় এইরূপ প্রকৃত সংস্কার প্রচলিত ছিল, সেই সময়েই ভারতের যশঃসূর্য্য মধ্যাহ্ন-রবির স্থায় অত্যন্ত প্রভাববান্ ছিল। সর্বজাতি তখন ভারতবাসীদিগকে রাজা, দণ্ডদাতা ও গুরু বলিয়া পূজা করিত। ইজিপ্ট (মিশর), চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা সে-সময় ভারতবাসীর নিকট সশঙ্কচিত্তে উপদেশ গ্রহণ করিত।” —চৈঃ শিঃ ২।৩

৫। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দেশ, প্রাচীন সভ্য জাতি, সর্বাপেক্ষা পুরাতন ও সনাতন ধর্ম কি? সেই ধর্ম কোন্ সময় সর্বাঙ্গসুন্দর ও পূর্ণ-কলেবর হয়?

“ভারতবর্ষ অপেক্ষা পুরাতন সভ্য দেশ নাই—ইহা সর্ববাদি-সম্মত। আর্য্য-জাতি অপেক্ষা পুরাতন সভ্য জাতি আর নাই,—ইহা পাশ্চাত্য গণিত পুরুষেরা স্বীকার না করিলেও সর্বকালে সত্য বলিয়া গণিত হইবে। সেই আর্য্যজাতির প্রথম বাস—ভারতে। ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি-দিগের সময়ে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে। কশ্যপ—একজন প্রজাপতি। তাঁহার দৌহিত্রের পুত্র প্রহ্লাদ; তাঁহাকে সর্বশাস্ত্রে ‘বৈষ্ণবচূড়ামণি’ বলা হইয়াছে। মনু-পুত্র ধ্রুবকেও বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ব্রহ্মার প্রথম সন্তানদের মধ্যে চতুঃসন ও নারদও—পরম বৈষ্ণব। অতএব বৈষ্ণবধর্ম অপেক্ষা পুরাতন ধর্ম আর জগতে নাই। সেই বৈষ্ণবধর্ম ক্রমশঃ স্মৃতি লাভ করিতে করিতে মহাপ্রভু-চৈতন্যদেবের সময় সর্বাঙ্গ-সুন্দর ও পূর্ণ-কলেবর হইয়াছিল।” —‘পদরত্নাবলী’ সঃ তোঃ ২।৯

৬। মৃতদেহ-সংরক্ষণ-ব্যবস্থার প্রণালী কে শিক্ষা দেন? কেন এই ব্যবস্থা প্রচলিত হইল?

“ছান্দোগ্যে প্রজাপতির নিকট ইন্দ্র ও বিরোচনের তত্ত্বশিক্ষা-লাভের যে আখ্যায়িকা আছে, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, বিরোচন স্লেচ্ছবুদ্ধির স্থলতাক্রমে এই জড়দেহকে আত্মা বলিয়া স্থির করত মৃত্যুর পর জড়দেহের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা তদীয় ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাহার ইজিপ্টদেশীয় শিষ্যগণ সেই শিক্ষাক্রমে ‘মামি’ অর্থাৎ মৃতদেহ-সংরক্ষণ-প্রথা স্বদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। সেই প্রথা একটু পরিবর্তন করিয়া অস্ত্রান্ত স্লেচ্ছখণ্ডে কবর দিবার বিধি হইয়াছে।” —‘দর্শন-শাস্ত্র’ সং: তো: ৭।১

৭। কোন্ সময় দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বুদ্ধির প্রাবল্য ও তীক্ষ্ণতা দৃষ্ট হয়?

“সপ্তম শতাব্দী হইতে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে যেরূপ বুদ্ধির প্রাবল্য ও তীক্ষ্ণতা দেখা যায়, অস্ত্রান্ত সেরূপ নহে। শঙ্কর, শঠকোপ, যামুনাচার্য্য, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী ও মধ্বাচার্য্য—এই সকল এবং আর আর অনেক মহা মহা-পণ্ডিত ঐ সময় হইতে ভারতের দক্ষিণ বিভাগের নক্ষত্র-স্বরূপ উদ্ভিত হন।” —‘উপক্রমণিকা,’ কৃ: সং

৮। কোন্ সময় হইতে সাত্তত আচার্য্যগণ প্রত্যেকে বেদান্তাদি চারিটি গ্রন্থের ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করেন?

“শঙ্করাচার্য্যের জন্ম সকলেই একটি একটি গীতা ভাষ্য, বেদান্ত ভাষ্য, সহস্রনাম-ভাষ্য ও উপনিষদ্-ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ একটি মত তখন জনগণের হৃদয়ে জাগরুক হইল যে, কোন একটি সম্প্রদায় স্থির করিতে হইলে উপরোক্ত চারিটি গ্রন্থের ভাষ্য থাকা আবশ্যক। উক্ত চারিজন বৈষ্ণব হইতে ‘শ্রীবৈষ্ণব’ প্রভৃতি চারিটি সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে।

—‘উপক্রমণিকা,’ কৃ: সং

(ক্রমশ:)

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

মুকং বরোতি বাচালং * * *

গোরা নবদ্বীপ-শলী

নীলাচল-পুরে পশি'

সর্বজীবে দেন কৃষ্ণ নাম,

সে' নাম শুনিয়া সবে

প্রেমোন্মাদে হাসে কাঁদে,

'কৃষ্ণ' কহি' নাচে অবিরাম।

গোলোকবিহারী হরি

গোরা-রূপে অবতরি'

নাম-প্রেমে জগৎ মাতায়,

অগতির গতি নাথ

করে নীলাচলে বাস

শুনি' সবে আসে তাঁ'র ঠাই।

কুলীনগ্রামী ভক্তগণে

যেতে নীলাচল-ধামে

মিলে আসি' শিবানন্দ-সনে,

শিবানন্দ তাঁ সবারে

সাদরে পালন করে,

লয়ে চলে প্রভুজীর স্থানে।

নীলাচল-পথ বাহি'

সদা সঙ্কীৰ্ত্তন গাহি'

ভক্তবৃন্দ চলে সারে সারে,

যেন পদ্মগন্ধে মাতি'

গুঞ্জরিয়া মধুলেহী

পদ্ম লাগি' ধায় সরোবরে।

সারা গ্রাম শূন্য প্রায়,

সবে নীলাচল ধায়,

হাটে মাঠে কেহ নাহি ফিরে,

সারমেয় এক রঙ্গে

চলে যাত্রীগণ-সঙ্গে

শিবানন্দ ভক্ষ্য দেন তা'রে।

পথে এক নদীতটে,

উড়িয়া নাবিক ঘাটে,

পারাপারে সেথা খেয়া বায়,

শিবানন্দের কুকুরে

লহে না সে তরী 'পরে,

শিবানন্দ তাহে দুঃখ পায়।

বহু অছুনয় করি'

দিয়া দশপণ কড়ি

সারমেয়ে করাইলা পার,

বুঝিলেন শিবানন্দ,— কুকুর নিশ্চয় ভক্ত,
 নহে এ সামান্য জীব-ছার ।
 শত শত ভক্তসনে কুকুরের আগমনে,
 শিবানন্দ হন বড় প্রীত,
 কুকুরে জোগান নিত্য উত্তম পাচিত খাত্ত,
 সযতনে পালি' তা'রে কত ।
 একদিন রাত্রে আসি' ভোজনের কালে বসি'
 দেখিতে না পাইয়া কুকুরে,
 সেবকে ডাকিয়া পুছে,— “কোথা সে কুকুর গেছে,
 অন্ন খেতে দিয়েছ কি তা'রে ?”
 সেবক কহিল, “হায়, অন্ন দিতে মনে নাই”,—
 শুনি' শিবানন্দ পান ব্যথা,
 সারমেয়ের সন্ধানে, পাঠাইলা দশ জনে,
 কেহ নাহি পেল তা'র দেখা ।
 কুকুরের অদর্শনে নিতান্ত দুঃখিত মনে
 শিবানন্দ রহে উপবাসী,
 বিনিদ্র-রজনী যাপি' পরদিন প্রাতে উঠি'
 পুনঃ তা'র করিলা তল্লাসী ।
 বহু দূর ঘুরি' ফিরি' খোঁজে তন্ন তন্ন করি'
 তবু তা'র দেখা নাহি পায়,
 না দেখিলে শিশুপুত্র মাতা যথা পায় দুঃখ
 শিবানন্দ তেন দুঃখ পায় ।
 ক্রমে যত যাত্রী সবে নীলাচল-ধামে পৌঁছে,—
 নিরখিল গৌরাজ-চরণ,
 প্রণমি' গৌরাজ-পদে, তাঁ'রে চিত্ত দিল সঁপে,
 ‘কৃষ্ণ’ কহি' নাচে অনুক্ষণ ।

পাইয়া আরাধ্যনিধি গাহে সবে নিরবধি,
 প্রেমে মত্ত যত ভক্তগণ,
 সব। সাথে গৌরহরি জগন্নাথ দর্শন করি'
 ভক্তবর্গে করা'লা ভোজন।

আর দিন ভক্তসবে হেরিল বিস্মিত চোখে,—
 প্রভু-স্থানে রহে সে কুকুর,
 প্রভুজী আপন হস্তে প্রসাদ নারিকেল-শাশ্ত্রে,
 দিতেছেন তাহাকে প্রচুর।

হাসি' বলে গৌরহরি, “কহ কৃষ্ণ, রাম, হরি”
 ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ কহে সারমেয়
 হেরি' এ অদ্ভুত দৃশ্য,— কুকুরে কহিছে ‘কৃষ্ণ’,
 সর্বলোকের হৈলা বিস্ময়।

দেখি' কুকুরের প্রেম নাচে শিবানন্দ সেন,
 দণ্ডবৎ করিলা তাহারে,
 কহে তা'রে দৈন্য করি' “অপরাধ ক্ষমা করি'
 নিজগুণে তার' এ পামরে।”

আরদিন সে কুকুরে কোন লোক নাহি হেরে,
 অন্তর্দ্বান হ'লা সে কুকুর,
 প্রভুজীর অনুগ্রহে, সিদ্ধদেহ পেয়ে সে যে,
 চলি গেলা শ্রীবৈকুণ্ঠপুর।

শিবানন্দের কুকুরে প্রভু গৌরা উদ্ধারে
 কহাইলা তা'রে কৃষ্ণনাম,
 লভিয়া গৌরাজ-কৃপা মুকেও কহিল কথা,
 পশু হ'ল ভকত প্রধান।

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

রাজর্ষি রুক্মঙ্গদ (১)

প্রাচীনকালে রুক্মঙ্গদ নামে এক সার্বভৌম রাজা ছিলেন। তিনি ভগবানের আরাধনা করিতেন, বিশেষতঃ তিনি একাদশী-ব্রত পালনে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। একাদশীর দিন তিনি হাতীর উপর চড়িয়া ঢকাবাণ্ডে সমস্ত রাজ্যে ঘোষণা করিতেন,—‘আজ একাদশী তিথি। অতএব ৮ বৎসরের উর্দ্ধ এবং ৮০ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত যে ব্যক্তি আমার রাজ্যে অন্নভোজন করিবে তাহাকে যথেষ্ট দণ্ড দেওয়া হইবে। সে আমার রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইবে। অতএব কি কথা, আমার নিজ আত্মীয়-মধ্যেও এই আজ্ঞা জারী থাকিবে। পিতা, মাতা, পত্নী, পুত্র, মিত্র সকলকেই একাদশী-ব্রত পালন করিতে হইবে, অত্থায় কঠোর দণ্ড। আজ গঙ্গাস্নান ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে।’

রাজার এই আজ্ঞায় রাজ্যবাসী সকলেই একাদশী-ব্রত পালন করিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে লাগিল। রাজ্যে যাহারই মৃত্যু হয়, সেই বৈকুণ্ঠে চলিয়া যায়; ধর্ম্মরাজ যম ইহাতে এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে পড়িলেন। লোকের যাহা কিছু সঞ্চিত পাপ ছিল, একাদশী-ব্রত পালনের ফলে সে সমস্ত নাশ হইয়া যাওয়ায় যমপুরীতে আর কাহাকেও যাইতে হয় না; চিত্রগুপ্তের লেখাপড়ার কার্য্য হইতে একেবারে অবসর হইয়া গেল।

একদিন দেবর্ষি নারদ যমপুরীতে গিয়া বলিলেন,—‘হে ধর্ম্মরাজ! আপনার এখানে কাহারও কোনরূপ ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাই না কেন? চিত্রগুপ্ত ধ্যানাবস্থিত মুনির মত নীরব কেন? অধুনা কি আপনার এখানে আর পাপী লোকের আগমন হয় না?’ নারদের বাক্য শুনিয়া যমরাজ বলিলেন, ‘দেবর্ষি! অধুনা রাজর্ষি রুক্মঙ্গদ ঢাক বাজাইয়া একাদশী-ব্রত পালনের জন্ত রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়াছে যে, তাঁহার আজ্ঞা যে পালন না করিবে তাহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করা হইবে। এই ভয়ে সকলেই একাদশী-ব্রত পালন করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতেছে। আমাকে এখন এই লোকপালের পদ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এ জন্ত আমি ব্রহ্মধামে গিয়া ব্রহ্মার নিকট সমস্ত নিবেদন করিব।’ এই বলিয়া যমরাজ ও চিত্রগুপ্ত নারদের সহিত সত্যলোকে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখিতে পাইলেন

অনেক জীব ব্রহ্মার সাক্ষাতে বসিয়া আছেন। ইতিহাস, পুরাণ, বেদাদি মূর্তরূপে ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছে। বহু লোকপালও ব্রহ্মার স্তব করিতেছেন। যমরাজ নববধূর হ্রায় লজ্জিতভাবে তথায় প্রবেশ করিলেন। উপস্থিত সকলেই চিত্রগুপ্তের সহিত যমরাজকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। সকলেই চিন্তা করিলেন,— যমরাজ কি ব্রহ্মার দর্শনার্থ আসিয়াছেন? বর্তমানে কি তাহার কোন কার্য্য নাই? ইহার ক্ষণমাত্রও অবসর থাকে না, তবে কি প্রকারে আজ এখানে আগমন করিলেন। সন্মাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লেখক চিত্রগুপ্তও সঙ্গে আসিয়াছেন।

সভাসদৃগণ এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে ধর্ম্মরাজ ব্রহ্মার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন—“দেবেশ্বর! আমার বড়ই কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পটে পাপীদের পাপের তালিকা-সম্পর্কীয় যাহা কিছু লিখা হইয়াছিল সে সবই মিটিয়া গিয়াছে। আপনার হ্রায় প্রভু থাকিতে আমার নিজেকে নিতান্ত অনাথ মনে হইতেছে কেন? এই বলিয়া তিনি নিরাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। তখন পবনদেব ধর্ম্মরাজকে উঠাইয়া চিত্রগুপ্ত-সহ উভয়কে আসনে উপবেশন করাইলেন। যমরাজ পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

“দেব! কাহারও প্রভাবের হানি হইলে তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও দুঃখদায়ক হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রভুর কোন সেবা করিতে না পারে পরন্তু প্রভুর বেতন ভোগ করে মাত্র, কাষ্ঠের কীট হইয়া তাহার জন্ম হয়। যে লোভবশে রাজা বা প্রজার ধন খায়, সেই কর্ম্মচারী তিন শত কল্প পর্য্যন্ত নরকে দুঃখ ভোগ করে। যে রাজ-কর্ম্মচারী রাজার সেবককে নিজের গৃহকার্য্যে নিযুক্ত করে তাহার বিড়াল-জন্ম হয়। আমি আপনার আজ্ঞায় ধর্ম্মের সহিত প্রজাশাসন করিতাম; ধর্ম্মশাস্ত্রাদি দ্বারা উত্তমরূপে বিচার করিয়া পুণ্যকর্ম্মী ও পাপকর্ম্মীর উপযুক্ত ফল প্রদান করিতাম; কল্পের আদি হইতে অতাবধি আপনার আদেশ যথাযথ পালন করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু আজ রাজা রুক্মাঙ্গদ আমাকে বিশেষ তিরস্কার করিয়াছেন। রাজার ভয়ে আসমুদ্র হিমাচল সমস্ত প্রজা পাপনাশক একাদশী-ব্রত পালন করিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের পিতা, পিতামহাদিও বিষ্ণুধামে চলিয়া যাইতেছেন। তাহাদের মাতাপত্নী, মাতামহাদিও বৈকুণ্ঠবাসী হইয়া পড়িতেছেন। এই নিয়ম ছিল যে, যে-ব্যক্তি যে-কার্য্য করিবে তাহার ফল সেইমাত্র ভোগ করিবে। কর্ত্তা ভিন্ন তাহার পিতামাতাকে,

যাঁহাদের জন্ম জন্মলাভ হয়, উপযুক্ত পিণ্ডপ্রদান করিলে তাঁহাদেরও উদ্ধার হইয়া যায়; কিন্তু পতি বা জামাতার পুণ্যপ্রভাবে তাহাদের পত্নী বা স্বশুরপক্ষীয় লোক কিরূপে বিষ্ণুধামে গমন করে—ইহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। একাদশী-ব্রত পালনকারী ব্যক্তি নিজের সহিত মাতা, পিতা, পত্নীসকলকে লইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিতেছে। একাদশীর দিন নিজ শরীরে আমলকী লেপন করিয়া ভোজন-ত্যাগে যে গতিপ্রাপ্তি হয়, একরূপ গতি আর কাহারও হয় না; এজন্ম আমি নিরাশ হইয়া আপনার চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছি। আপনার শ্রীচরণে আমার দুঃখ নিবেদন করিয়া আমি অভয়-প্রাপ্তির প্রার্থনা করি। আপনি এখন সমযোচিত কার্য্য করুন। বর্তমানে পৃথিবীতে এমন কোন পাপী নাই, যাঁহারা আমার দূতগণের বন্ধনে পতিত হয়। সূর্য্যতাপে তপ্ত যমলোক এখন বিষ্ণুভক্তগণের দ্বারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমস্ত পাপী কুন্তীপাক নরক হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইতেছে।”

“হে দেব! আমার মনে হয়, বৈকুণ্ঠলোক পরিমাণের অন্তর্গত নহে; এতলোক বৈকুণ্ঠে যাইতেছে, তথাপি তাহা পূর্ণ হয় না। রাজা রুক্মাঙ্গদ সহস্র বর্ষব্যাপী রাজ্য শাসন করিতেছেন এবং এই সময়ের মধ্যেই বহু প্রজাকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিয়াছেন। লক্ষ্মীপতির প্রিয় ভক্ত রাজা রুক্মাঙ্গদ যদি পৃথিবীতে থাকিয়া যান তবে সমস্ত লোকই অসময়ে বৈকুণ্ঠধামে চলিয়া যাইবে। আপনি আপনার প্রদত্ত দণ্ড ও পট গ্রহণ করুন। রাজা রুক্মাঙ্গদ আমার লোকপাল-পদ ভূমিসাং করিয়া দিয়াছে। উহার মাতা ধনু যিনি এইরূপ সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। কুপুত্রের জন্মদাত্রী মাতা বৃথা গর্ভধারণ-ক্লেশ ভোগ করে। এই সংসারে একটীমাত্র নারী এইরূপ বীর-পুত্রের জন্ম দিয়াছেন যিনি আমার লিপির অঙ্কন করিতে পারেন। পৃথিবীতে আর কোন রাজা এইরূপ কার্য্য করিতে পারেন নাই। সুতরাং রুক্মাঙ্গদ বর্তমান থাকিতে আমার কোন কার্য্যের আবশ্যকতা নাই।”

ব্রহ্মা বলিলেন,—“ধর্ম্মরাজ, তুমি এত ক্ষুণ্ণ হইতেছ কেন? কাহারও উত্তম গুণ দেখিয়া মনে সন্তাপ হইলে তাহা মৃত্যুতুল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যাঁহার নাম উচ্চারণমাত্রে পরমপদে গমন করিতে পারা যায় তাঁহার প্রীতির জন্ম উপবাস করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করা এমন কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে একবার প্রণাম করিলে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের

তুল্য ফল হয়। অশ্বমেধ-যজ্ঞকারীর পুনরায় জন্ম হয় কিন্তু কৃষ্ণভক্তের আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যাঁহার রসনাতে “হরি” এই দুই অক্ষর বিরাজিত, তাঁহার কাশী-কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থে গমনের কোন প্রয়োজন হয় না। যদি কেহ খেলার সময়ও একবার ভগবন্মাম গ্রহণ করে, তাহার গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়। ত্রিভুবন-নাথ পুরুষোত্তম আমার জন্মদাতা। তাঁহার বাসরে (একাদশী) ব্রত করিলে সেখানে কিরূপে শাসনদণ্ড চলিতে পারে? যে রাজ-কর্মচারী রাজার প্রিয় ভক্তকে না জানিয়া তাঁহার উপর দণ্ড প্রয়োগ করিতে যায়, সে বিপরীত ফল প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সে রাজ-কর্তৃক দণ্ডনীয় হইয়া থাকে। অতএব তাহার কর্তব্য এই যে, রাজার প্রিয় পাত্রের উপর শাসনদণ্ড প্রয়োগ না করা; কারণ সে স্বামীর প্রসাদে কৃতার্থ হইয়াছে। এই প্রকার যে-পাপী ভগবচ্চরণে আশ্রয় পাইয়াছে, তাহার উপর তোমার শাসন চলিবে কি প্রকারে? হে ধর্মরাজ! যদি শিব, সূর্য অথবা আমার ভক্তসহ তোমার বিবাদ হয় তবে আমি তোমার সহায়তা কোনরূপে করিতে পারি; কিন্তু বিষ্ণুভক্তের উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা আমার নাই। কেহ যদি কোনক্রমে উভয় পক্ষীয় (শুক্ল ও কৃষ্ণ) একাদশী-ব্রত পালন করে, তাহাতে তুমি অপমান বোধ করিলেও তোমাকে কোনরূপ সহায়তা করার সাধ্য আমার নাই।”

যমরাজ বলিলেন--“বেদ যাঁহার শ্রীচরণ-স্বরূপ, তাঁহাকে নমস্কার করিলে সকলেরই হিত হয়, একথা খুব যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যত দিন রুক্মাঙ্গদ পৃথিবী শাসন করিবে তত দিন আমার কোন শাস্তি নাই। যদি রুক্মাঙ্গদকে একাদশী হইতে বিচলিত করিতে পারেন তাহা হইলেই আমি আপনার কিঙ্কর থাকিতে পারিব। যাঁহারা একাদশী পালন করেন আমি তাহাদিগকে কোনরূপ দণ্ড দিতে পারি না। যে-ব্যক্তি কোন ছলে হরিনাম উচ্চারণ করে, সে আমার দণ্ডনীয় নহে। তাহার পুনরায় মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।”

ব্রহ্মা যমরাজের সম্মান-রক্ষার্থ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন, তৎপরে এক পরমা সুন্দরী নারীমূর্তি সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবীতে এত সৌন্দর্য্য কোন নারীতে থাকিতে পারে না। সর্ব্বাঙ্গে অক্ষর, বস্ত্রাদিতে বিভূষিতা হইয়া ব্রহ্মার সম্মুখে সেই নারীমূর্তি দণ্ডায়মান হইল। ব্রহ্মা তাহাকে দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, কিন্তু অত্যাশ্চর্য্য সকলেই কামমোহিত হইয়া সেই

সুন্দরীর প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। তখন ব্রহ্মা সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—“যে ব্যক্তি মাতা, পুত্রী, পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ, গুরুপত্নী বা রাজ-পত্নীকে আসক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে দর্শন করে, তাহাকে নরকে গমন করিতে হয়। এই সুন্দরীকে দেখিয়া যে কামবশ হইবে, তাহার সমস্ত জীবনের কৃত পুণ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে এবং সে পাহাড়ের ইন্দুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। অতএব ইহার প্রতি কেহ কুদৃষ্টিপাত করিবেন না।”

“হে ধর্মরাজ! যে পুত্রবধূ নিজ শ্বশুরকে নগ্ন অঙ্গ প্রদর্শন করায়, তাহার হাত-পা গলিয়া যায় এবং সে কুমিভক্ষ্য নরকে পতিত হয়; যে পাপী নিজ পুত্রবধুর দ্বারা পদধৌত কার্যা বা তৈলমর্দন করায় তাহারও এই গতি হয়; সে কল্পকাল পর্য্যন্ত স্ববীমুখ নামক কীটদ্বারা ভক্ষিত হয়। অতএব কামনাপূর্ণা দৃষ্টিতে কোন নারীর প্রতি, বিশেষতঃ পুত্রী বা পুত্রবধুর প্রতি লক্ষ্য করিবে না। এই যে সুন্দর মুখ দেখা যাইতেছে উহা কেবল অস্থি-চর্মে আবৃত। স্ত্রীলোকের চক্ষুতে যে সৌন্দর্য্য তাহা মেদ ভিন্ন কিছু নহে। অস্থি আর মাংস দ্বারা পূর্ণ শরীরের সৌন্দর্য্য কি আছে? মাংস, মেদ আর চর্মে যাহার সার-সর্ব্বস্ব তাহাতে আবার সার বস্তুই বা কি আছে যাহাতে সকলে মুগ্ধ হয়। বিষ্ঠা, মল, মূত্রপূর্ণ শরীরে কোন্ বুদ্ধিমান লোক আসক্ত হয়?” ব্রহ্মা এই প্রকার জ্ঞানদৃষ্টিতে বিচার করিয়া সেই নারীকে বলিলেন, “সুন্দরি, আমি যেমন তোমাকে শ্রেষ্ঠ বর্ণযুক্তরূপে সৃষ্টি করিয়াছি তুমি তদনুরূপ সকলের মনকে উন্মত্ত করিবার উপযুক্ত হইয়াছ।”

তখন সেই নারী ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া কহিল,—“নাথ, চরাচর জগৎ আমার রূপে মুগ্ধ। কল্যাণকামী ব্যক্তি আত্মপ্রশংসা করে না, কিন্তু কার্য্যগতিক আমাকে তাহাই করিতে হইতেছে। আপনি কাহার চিন্তে ক্ষোভ জন্মাইবার জন্ত আমাকে সৃষ্টি করিলেন, তাহার পরিচয় প্রদান করুন; আমি নিঃসন্দেহে তাহাকে মুগ্ধ করিব। পৃথিবীর মধ্যে আমাকে দেখিয়া বৃক্ষ পর্ব্বতাদিও মুগ্ধ হইবে, শ্বাসগ্রহণকারী মনুষ্যের ত কথাই নাই। এইজন্ত পুরাণে নারীর প্রতি দৃষ্টি বা তাহার রূপবর্ণন মনুষ্যের উন্মাদকারী বলিয়া বর্ণিত আছে। মনুষ্য যতদিন না নারীর কুহকে পতিত হয় ততদিন তাহার সৎপথে চলার যোগ্যতা থাকে। যতদিন নারীর নেত্রবাণ পুরুষের হৃদয়ে গভীর আঘাত না করে, ততদিন তাহার সেই ধৈর্য্য থাকে। মন্থপানে যে মত্ততা আসে নারীর দৃষ্টি বা স্মরণই সেই মত্ততা আনয়ন করে।”

ব্রহ্মা বলিলেন, “দেবি, তুমি ঠিকই বলিয়াছ। ত্রিভুবনে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। আমি যে উদ্দেশ্যে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য কর।

“কৈশিক নগরে রুক্মাঙ্গদ নামে এক রাজা আছেন। তাঁহার পত্নীর নাম সন্ধ্যাবতী। তিনি রূপে তোমারই সমান। তাঁহার গর্ভে ধর্ম্মাঙ্গদ নামে এক পুত্র হইয়াছে। সে পিতা অপেক্ষা প্রতাপশালী। তাহার শরীরে লক্ষ হস্তীর শক্তি আছে। সে ক্ষমাপ্রাণে পৃথিবী এবং গান্ধার্য্য সমুদ্রের সমান। রাজকুমার রাজনীতিতে বৃহস্পতি এবং শুক্রাচার্য্যকেও পরাস্ত করিতে পারে। তাহার পিতা কেবল জম্বুদ্বীপের অধিকারী, কিন্তু সে সমস্ত দীপেই অধিকার বিস্তার করিয়াছে। সে পিতামাতার সঙ্কোচবশে অত্যাধি স্ত্রী-মুখ দর্শন করে নাই। সহস্র সহস্র রাজকুমারী তাহার পত্নী হইতে আসিয়া বার্থমনোরথ হইয়াছে। সে পিতৃ-আজ্ঞা পালনে পরাজুখ হয় না। তাহার তিন শত মাতা আছে, তাহারা সকলেই স্বর্ণময় গৃহে বাস করে। রাজকুমার তাঁহাদের সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিপাত করে। রুক্মাঙ্গদের জীবনে ধর্ম্মই প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। তুমি মন্দার পর্ব্বতে ঐ রাজা রুক্মাঙ্গদের নিকট গিয়া তাঁহাকে মোহিত কর। তুমি সমস্ত জগৎকে মুক্ত করিতে যোগ্যতাসম্পন্ন বলিয়া তোমার নাম ‘মোহিনী’ রাখা হইল।”

মোহিনী ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া মন্দার পর্ব্বতের দিকে যাত্রা করিয়া তিন মুহূর্ত্তে পর্ব্বতশিখরে পৌঁছাইল। যে পর্ব্বতকে পূর্ব্বকালে কূর্ম্মদেব পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়া সমুদ্র-মহুনের সহায়তা করিয়াছিলেন সেই মন্দার বিচিত্র ঋতুতে পরিপূর্ণ; সেখানে দেবতাগণ বিহার করেন। মোহিনীর অঙ্গকাণ্ডি স্বর্ণময়ী। তাহার কাণ্ডিতে পর্ব্বত আরও জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। সে পর্ব্বত-শিখরে এক শিলাপৃষ্ঠে বসিয়া মনোহর সঙ্গীত আরম্ভ করিল। তথায় একটি বজ্রময় শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। মোহিনী তাঁহার সম্মুখে বসিয়া মূর্চ্ছনা ও তালযোগে গান্ধার্য্য রাগ গাহিতে লাগিল। সঙ্গীত আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেব-দৈত্য এবং অন্তঃস্থ সকল প্রাণীই উক্ত মোহজনক গীতে আকৃষ্ট হইয়া একে একে তথায় উপস্থিত হইতে লাগিল।

—ত্রিদিগ্গিস্বামী শ্রীমন্ত্ত্রিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

সমাজের বোঝা

(পূর্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ২৬৫ পৃষ্ঠার পর)

[সন্ন্যাসী (হৃদর্শন) ও যুবক মনোতোষের মধ্যে তর্ক চলিতেছিল। সন্ন্যাসীরা সমাজের কোন উপকার সাধন করেন না, তাঁহারা সমাজের ভার-স্বরূপ—মনোতোষ এইরূপ নির্বুদ্ধিতামূলক কথা বলিলে সন্ন্যাসী তেজস্বিতার সহিত বলেন, “আমরা জগতের মধ্যে নহি, ভিক্ষার দ্বারাও জীবিকা-নির্বাহ করি না ; বরং সমাজের ভারই আমরা অপহরণ করি” ।]

সন্ন্যাসী—কেবল কতকগুলি বুজ্জুরিকির দ্বারা জগৎ পরিচালনা করাই গৃহকেন্দ্রিক সমাজের রীতি। যেমন, আমরা পিতামাতার সেবার জন্ত গৃহত্যাগ করি না, আমরা পত্নীকে স্নেহ দান করিবার জন্ত সংসার ত্যাগ করি না, সমাজের লোক বেকার হইবার ভয়ে আমরা কস্মি গ্রহণ করি, সমাজের উন্নতির জন্ত সংসার আঁকড়াইয়া থাকি, জগদ্বৃদ্ধির জন্ত বিবাহ করি,………ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সকল চিন্তা কি প্রকার কপট স্বার্থসিদ্ধির জন্ত বলা হইয়া থাকে, তাহা আমরা ভাল রকমই বুঝি। অপরের সুখবিধান করার চিন্তা ইহাতে নাই, কেবল আত্মসুখাস্থেষণই এই সকলের উদ্দেশ্য।

সংযতবাক্ সন্ন্যাসীর প্রত্যুত্তরগুলি এষাবৎ শুনিয়া যুবকটী স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। কি যে বলিবে তাহার কোন ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছে না। সন্ন্যাসীর ভাষণের প্রতিটী অক্ষরের গুরুত্ব কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিয়া যুবকটী চিন্তা করিল, “সন্ন্যাসীর বাক্যের ভাষা ত কুত্ৰাপি দৃষ্ট হয় না। পূর্বে অনেক প্রকার সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বরের সেবাই সর্বাপেক্ষা কল্যাণজনক—তেজস্বিতা অথচ গাম্ভীর্য ও বলিষ্ঠভাবপূর্ণ এইরূপ শব্দ কখনও কাণে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।”

নিকটেই একটী বিশাল বটবৃক্ষ দণ্ডায়মান। উহার শাখা-প্রশাখা হইতে বহু স্থূলকায় ঝুরি ভূমিতে পতিত হইয়া বৃক্ষটীর প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিতেছিল। এমত সময়ে উক্ত বৃক্ষের শাখাদির মধ্যে হইতে পক্ষিসকলের কিচির্ মিচির্ কল-কুজন ধ্বনিত হইল। রবিদেবও অদৃশ্য হইয়াছেন, সমস্ত পশ্চিম গগন সিন্দূরবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। গগনে ইতস্তত সজ্জবদ্ধভাবে একটি একটি সজাতীয়া খেচরশ্রেণী নিঃশব্দে আপন আপন নীড়ে গমন

করিতেছে। দুই একটা সান্ধ্য কীটাদির ডাকও শোনা যাইতে লাগিল। চতুর্দিকে শূন্য স্থানের কোন কোন অংশ বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণাধূত শিশির-কণায় ধূস্রবৎ শোভিত হইল। মেঠো পথচারীরাও সমস্ত দিনের কস্ম-ক্লান্তিতে ওষ্ঠ মুদ্রিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনে উদ্যত। ঘাসের ও বৃক্ষাদির পাতায় হিমকণা পতিত হইতে থাকিল। একটা একটা করিয়া সন্ধ্যাতারা আকাশের বক্ষে পরিদৃষ্ট হইল। এই সকল নৈসর্গিক পরিবেশে একটা মন্থর দৃশ্য স্মৃতি হইল। ঈশ্বর-চিন্তায় অলসপণায়ণ জড়-সৌন্দর্য উপভোগকারীর হৃদয়ে প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যাদি উদাস ভাবের উদয় করায়। যুবকটীও উক্ত প্রকার ভাবের শিকার না হইয়া পারিল না। তাহা ছাড়া, সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ-আলোচনায় চিত্তে আবার একটা অতঃকালেরও আলোড়ন হইতেছিল। এই সকল ভারসাম্য বজায় রাখিতে না পারিয়া যুবকটী আর অধিকক্ষণ কথা কহিতে পারিল না, সেই রাত্রে উক্ত নৌকাতেই রাত্রি-যাপন মানসে তদভিমুখে গমন করিল। সন্ন্যাসী ঠাকুরকেও যুবকটী সেই নৌকায় রাত্রিযাপন করিতে সকাহর নিবেদন জানাইল।

দুঃসঙ্গ সর্বপ্রকারে বর্জন করিতে না পারিলে হৃদয় দৃঢ় হয় না। যুবকটীর চাল-চলনে যে কোন পবিত্র ভাব ছিল না, পূর্বেই প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে যুবকটীর কিঞ্চিৎ অন্য প্রকার ভাব লক্ষ্য করিয়া সন্ন্যাসী ঐ আবেদনে রাজী হইলেন, ভাবিলেন,—“আমরা সন্ন্যাসী, জগতের একটা প্রাণীকেও ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত করিতে পারিলে চারিলক্ষ মানুষ উদ্ধার পাইবে; কারণ ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে চারিলক্ষ মানুষ-জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। যদি কোনক্রমে স্মৃতি-প্রভাবে মুক্তিলাভ হয়, তবে আর মানুষ-জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। ঋষিবর্গের এই মহান্ চিন্তা হৃদয়ে স্মরণ করিয়া তেজোদৃষ্ট সন্ন্যাসী নৌকায় গমন করিলেন। স্থির করিলেন, দেখি আমাদের গুরুবর্গ ২০০ শত গ্যালন রক্ত প্রতিজীবের মঙ্গলের জন্য খরচ করিতে বলিয়াছেন। আমার সামান্য রক্ত দিয়া যদি কিছুটা মঙ্গলও ভগতের হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই জীবন সার্থক হইবে। প্রাণের রক্তদ্বারাই যে-হরিসেবা তাহাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

নৌকায় উঠিয়াই সন্ন্যাসী এক অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। সুগী গৃহকোণে পালিত ভেতো বাঙ্গালীরা মৎস্য ব্যতীত দিনব্যয় একটি

অভিশপ্ত জীবনের স্রায় মনে করিয়া থাকে। যুবক ইঞ্জিনিয়ারের তাদৃশ অভিশপ্ত হইবার কোন দুর্ভাগ্য ছিল না। নৌকাতে ঐ সকল অমেধ্য খাদ্য দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, “অনার্যাজনের ভক্ষ্য এইমূল দ্রব্যাদি দেখিতেছি কেন? যাহা পশুকুলের এং কেবল-মহুগ্যাকার-বিনিষ্ট প্রাণি-সকল গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাতে তোমাদের আনন্দ কেন?”

যুবকটী বহুক্ষণ স্থির ছিল। এতক্ষণে আবার কুতর্ক আহ্বান করিয়া প্রত্যুত্তর দিল, “শাক-পাত-খেকে বাবাজীদের দ্বারা কিছু হইবে না। এখন চাই রজোগুণ যাহার দ্বারা বিশ্ব জয় করিতে সমর্থ হইব। বিনা অণ্ডে কি গণ্ডারের মত চেহারা হয়?”

সন্ন্যাসী সহসা গম্ভীর হইলেন, চিন্তা বরিলেন, ইহারা পাশ্চাত্য রীতি-নীতিতে এতদূর বেকুব হইয়াছে যে, সর্বত্রই পাশ্চাত্য-ধরণে পটুত্বের অভিলাষী। এখনই এই সকল আপদ দূরীকরণ করিতে না পারিলে দেশের দারুণ বিপদের সম্ভাবনা। হায়! হায়! ভারতবর্ষের একি দশা হইল, একি দশা হইল!! যাহা হইক, যুবকটীকে তিনি বলিলেন,—

শক্তির কথাই যদি ধরিলে তবে গবাদি পশু নিরামিষ ভোজন করিয়াও এত বলশালী কিমে? স্থল ও জল, এই দুই-এর সর্বাপেক্ষা বৃং প্রাণিদ্বয় হস্তী ও জলহস্তী। নিরামিষ আহাৰ্য্যই উদারা গ্রহণ করে। গণ্ডারও নিরামিষাণী। তোমার সহিত যাহারা রহিয়াছেন, কাহারও স্বাস্থ্য তো তেমন ছষ্টপুষ্ট দেখিতেছি না, তালপাতার সেপাই-এর সহিত এদের যথেষ্ট সামঞ্জস্যই দেখা যাইতেছে।

যুবক—মৎস্য-মাংস খাইলেও যদি অন্য কোন রোগ শরীরে থাকে, তাহা হইলে আর পুষ্ট হইবে কিভাবে? আমার সঙ্গিগণের হয়ত কোন রোগ থাকিতে পারে। কিন্তু বিশ্বের যে সব ব্যক্তি মৎস্য-মাংসাদি খাইয়া থাকে তাহারা বিশেষ ছষ্টপুষ্ট, পাশ্চাত্যদেশবাসীর কথাই ধরা যাইতে পারে।

সন্ন্যাসী—বাপু, তুমি কয়বার বিলাত গিয়াছ? ঐ দেশেরই এক বিশিষ্ট মনীষী বলিয়াছিলেন, মুচি সকল কথাতেই চামড়ার ও ঐ জাতীয় উদাহরণ দিয়া থাকে। তোমার দশা দেখিতেছি সেইরূপই হইয়াছে। সকল কথাকেই পাশ্চাত্যের উদাহরণ দাও কেন? ভারতে কি কিছুই নাই? পাশ্চাত্যের নিকট দালালির দরুণ কিছু ভাতা পাও নাকি?

মনোতোষ—সত্যই তো ভারতের কিছুই নাই, ছিলও না; পাশ্চাত্যের

লোকেরা আসিয়া আমাদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়া মানুষ ও সভ্য করিয়াছে। আমরা শিক্ষিত বলিয়া যদি অভিমান করি, তাহা হইলে সত্যের প্রতি আদর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সত্য ঘোষণা করিতেছে,—ইংরেজরা স্বসভ্য, ভারতকে সভ্য করিয়াছে। সুতরাং তাহার অন্তথা করা সত্যের অপলাপ ও মূর্থতা বলিয়া আমাদের ধারণা। শুগবৎসেবিগণ চিরকালই দৈবের সর্ব-শক্তিমান বলিয়া থাকেন, কিন্তু কাজের বেলায় “আল্লা আল্লা খোদা খোদা”—ই তাঁদের দৌড়।

সন্ন্যাসী—ছিঃ, ছিঃ, তুমি কতদূর অধঃপাতে গিয়াছ তাহা জান কি? যদি নৈতিক-মান নির্ণয় করিবার কোন যন্ত্র থাকিত, তাহা হইলে আমি আপিয়া দেখাইয়া দিতাম তুমি সেই মানদণ্ডের কত নিম্নে অবস্থান করিতেছ। কেবল তুমি আমার এককালে বন্ধু ছিলে বলিয়া তোমার মঙ্গলের আশায় বসিয়া আছি। লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছ বলিয়া মনে হয় না। যতটুকুই বা শিখিয়াছ তদ্বারা কেবল গবাদি-ভক্ষণে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ হয়, এই অসৎ চিন্তা আয়ত্ত করিয়াছ। গবাদি-ভক্ষণাপেক্ষা উন্নততর চিন্তা কিছু মগজে যায় নাই। দেখিতেছি, মেকলে সাহেব যাহা স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক আজ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। আমি বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রবাদ, সামাজিকতা সন্নিবিষ্ট দিয়াই দেখাইয়া দিব যে তোমার আহাৰ্য্যগুলি সর্ব-প্রকারে ক্ষতিকর। কোন এক অতিমর্ত্য মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন, অমেধ্য বস্ত্র-আদি গ্রহণ করিয়া ভারতীয়রা তাহাদের বলবীৰ্য্য হারাইতেছে। যখন তিনি ঐরূপ বাণী লিখিয়াছিলেন তখন ততটা শারীরিক দৌৰ্বল্য জাতির মধ্যে লক্ষিত হয় নাই। এখন সেই বাণীর সার্থকতা উপলব্ধ হইতেছে।

মনোতোষ—“ঐষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি”—এটা ত আপনাদের শাস্ত্রেরই কথা। জাগতিক-প্রতিনিধিত্বায় ব্যর্থ হইলেই লোকে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে। সুতরাং জগতের উন্নতির চিন্তা আপনাদের থাকিতে পারে না, থাকিলেও তাহা কার্যকরী নয়।

সন্ন্যাসী—ভোগী লোক কখনও বস্তুর আদর জানে না; কেবল ভোগ হইলেই তাহার হইল, বস্তুটির প্রতি কোন যত্ন দিবার নীতি তাহাদের নাই। চলন্ত যানের মধ্যে স্থিত ব্যক্তি যেমন গাড়ীটী স্থির কি চলন্ত তাহা বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ জাগতিক চিন্তায় পুষ্ট জনগণ কখনও জগতের সম্পূর্ণ খবর রাখে না। আমরা সংসারের বাহিরে অবস্থান করি বলিয়া জগতের পূর্ণ

স্বরূপ জানি। এইজন্ত পুরাকালে রাজগণ সন্ন্যাসীদের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন। বাঁহারা ভোগ ও ত্যাগ উভয়েরই নিরপেক্ষ তাঁহারা ই সন্ধিচার করিতে যোগ্যতাবান। ধার্মিক ব্যক্তির। এইজন্ত সর্বজনমাত্ত। পৃথু রাজা, বাঁহার নামানুসারে জগৎ পৃথিবী' নামে খ্যাত, সর্বত্র এইরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন—

“সর্বত্র স্থলিতাদেশ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডক।

ন তথা ব্রাহ্মণকুলাদনুত্ৰাচুতগোত্রতঃ ॥”

কেবল পাশ্চাত্য, পাশ্চাত্য চীৎকার করিতেছে, কিন্তু সেই দেশের সমাজ-ব্যবস্থা কিরূপ তাহা চিন্তা করিয়াছ কি? প্রাক্ ভারতবর্ষে যে প্রকার শৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল, তাহারই লালসায় উহারা প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া দিনের পর দিন দ্রুতগতিতে উন্নতি করিতেছে, আর ভারতবর্ষ তাহার স্বদেশের মর্যাদা ভুলিয়া পরদেশী ফেন-এর জন্ত হাঁ করিয়া আছে।

মনোতোষ—আপনি কোন্ ব্যবস্থার কথা বলিতেছেন, বুঝিলাম না। আমরা ভারতকে উন্নত করিবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি—ইহা আপনি কি প্রকারে অস্বীকার করিলেন তাহা সোজা ভাষায় বলুন।

সন্ন্যাসী—বরু কিছুই বলিতেছি না, তবে তোমার মাথাটা বাঁকিয়া পশ্চাতে গিয়াছে কিনা। ঐ দেশে প্রাচীন ভারতের আদর্শ রাষ্ট্রের প্রধান ধর্মগুরু রাজাকে বরণ করেন, এই রীতি তোমরা পালন কর না কেন? পিতা হাজার মূর্থ হইলেও পণ্ডিত পুত্র তাঁহাকে সম্মান না করিলে কুলাঙ্গার হয়। ভারতবর্ষের রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন তোমরা কেন করিতেছ? পাশ্চাত্য দেশ তোমাদিগের শিক্ষার মধ্যে কি গাঁজা দিয়াছে, তাহা ছুর্কৌধ্য লাগিতেছে। তোমাদের এই সকল কর্মের দ্বারা কি ভারত-বিরোধিতা প্রকাশ পাইতেছে না? মুখে ‘ভারত মাতা, ভারত মাতা’ বলিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া ভারত-মাতার মন্দির তৈয়ারী করিতেছ, আবার এদিকে এই প্রকার নাস্তিক্যবাদের আবাহন! (ক্রমশঃ)

—পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিজ্ঞানিধি B. A.

তুফান *

বাত-বরিষণ, বন্যা ভীষণ, কাহারেও সে না মানে ;
ছুটিয়া চলেছে তুফান যে ঐ, সবে দেখে দূর পানে ।
অতি কৃষ্ণবর্ণ, বিরাট আকার, মস্তকে জ্বলে ধুনি,
তুফানের বুকে দিকে দিকে ঐ শতধারে সুরধুনীঃ ।
দেবের উপরে বৃথা আস্তা করি কাটিছে কাল কেবল ;
মায়াগঞ্জে শুধু ফিরিতেছি আমি পাকাইয়া হট্টগোল ।
তাই মায়া মোরে গলে দিতে ফাঁস সরাঁচি আসিল দ্বারে,
বলিল, দেবের প্রসাদ গ্রহিলে পূরিব পাগলাগারে ।
গুরু-গৌর-রূপ গিরিশঙ্কোপরি দৃঢ়ভক্তি আছে যার ।
প্রবল তুফান কখন পারে কি টলাইতে ভিত্তি তার ?
তাই সাবধানে বলি “তুফান, তুফান !
তব বক্ষে রহে এক এমন মহান্ ।

হেরি' য়াঁর রাজ্যাপদ— ‘অবনী'র সুসম্পদ’

লক্ষ লক্ষ যাত্রী ফিরে ধাই বৃন্দাবন ।

হায়রে ছুঁভাগ্য মোর, গৃহস্থে হ’য়ে ‘ভোর

ছাড়িব কি ও চরণ, একি অঘটন ?

তুফান, তুফান ! তুমি সব কার্য্য পার ।

মোর তরে অল্প কিছু করিতে কি নার ?

কাব্য, বাক্য দিয়ে গড়া নহে যেই দেশ,

আমারে জানাতে পার তাহার বিশেষ ?”

কি বলে তুফান তাহা বুঝিতে নারিহু,

মনে মনে তার পিছু আমি পাড়ি দিহু ।

‘বন্দ এল’ Band-el ডাক শোনা যায়,

এ পাতক আর দূর ধাইতে না পায় ।

দ্বাপর যুগেতে তুফানের বুকে কৃষ্ণ করি’ আরোহণ

স্বাধিকারানন্দে সারা ব্রজধাম করেছিল পর্যটন ।

* গত ১০ই আশ্বিন ‘তুফান’-এক্সপ্রেসযোগে শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির
পরমারাধ্যতম আচার্য্যপাদপদ্ম মথুরাধামে শুভবিজয় করিলে তাঁহার দর্শন-

কৃষ্ণকৃপা-বলে আজো ভাগ্যবানে চড়ি' তুফানের বুকে
হেরে ব্রজধাম, নিকুঞ্জকানন, তৃণাবর্তে দিল রুখে ।

তাহার সে' হাঁস-ফাঁস আসে "কর্ণপুর" † পাশ,
বুঝি,—এই নহে বৃন্দাবন,

"লক্ now (নাউ)" † পথ মোর, বৃন্দাবন অনিবার
খোলা শুধু তরে মহাজন ।

হরিপ্রিয় জন সনে আদি কেশবের স্থানে
শত তারে উঠে হরি-ধ্বনি—

আমি যে কাঙ্গাল তাই গৃহকোণে পড়ে রই.
তা'ও ছিল একতারাখানি ।

—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণ-ভীর্থ

জন্মাষ্টমী

দুর্ঘোষ-রাত ঘনায়ে এসেছে চারিদিক আঁধিয়ার,
ঝড়ো হাওয়া আজ মাতাল হয়েছে, ছাড়ে তাই লুঙ্কার ।

কংসের গণ ধরণীর বুক করিয়াছে অধিকার,
দানবী-পীড়নে মানবের বুকে উঠিয়াছে হাহাকার ।

আণবিক তেজে ধরার আকাশ বাতাস হয়েছে ভারী,
মানবের মনে সুখ নেই, আর লেগে আছে মহামারী ।

ধর্মের গ্লানি গ্রাসিছে ধরণী, কোথা তুমি নারায়ণ !
ধ্বংস করহ সুদর্শন-দ্বারে অশুরের এই রণ ।

বসুদেব ন্যায় কতজন আজো কংসচর-কারাগারে
কাঁদিয়া ফিরিছে, যাদের অশ্রু এ বাদল রাতে ঝরে ।

জন্মাষ্টমী আসিতেছে ওই তাঁদের জীবন পরে,
অশুরের কুলে বজ্র হানিতে নিজ নির্দয় করে ।

—শ্রীবিজন বিহারী জানা

B. A. (Hons.), P. G. B. T.

সুব্দী বেসিক স্কুল (মেদিনীপুর)

বিরহে কবিতাটি রচিত । তুফান ঝঞ্ঝা, তৃণাবর্ত অশুরকেও বুঝাইতেছে ।

‡ জলবাহক নল, † কানপুর, † লক্কো, লক্ (Lock) = বন্ধ now = এখন ।

শ্রীগোপালজী গোড়ীয়-প্রচারকেন্দ্রে নবনির্মিত মঠে শ্রীশ্রীগোপালজীর ঝুলনোৎসব

গোড়ীয়ের পাঠকবর্গ অবগত থাকিবেন যে, কয়েক বৎসর পূর্বে উড়িষ্যায় ভদ্রক মহকুমার কোর্টে সমিতির একটি শাখা-মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত প্রচারকেন্দ্রের জন্ম কয়েক মাস হইল একটি নূতন মঠ নির্মিত হইয়াছে। গত ২৬শে হইতে ৩০শে শ্রীধর পর্য্যন্ত ঝুলনযাত্রা-উপলক্ষে উক্ত মঠে মনোরম, চিত্তাকর্ষক এবং বিভিন্ন রং-বেরঙ্গের লতাপুষ্পমণ্ডিত সুসজ্জিত নূতন দোলনায় শ্রীশ্রীগোপালজীকে আরোহণ করান হয়। ঝুলন-সিংহাসনের চারিপার্শ্বে লতাপুষ্পাদির দ্বারা কুঞ্জগৃহ নির্মাণ করিয়া শ্রীশ্রীগোপালজীর আনন্দ বর্দ্ধন করা হয়। শ্রীশ্রীগোপালজীর ঝুলনোৎসব উক্ত অঞ্চলের একটি অভিনব বস্তু হওয়ায় পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও শহর অঞ্চলসমূহ হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা বহু লোক পঞ্চ দিবসই শ্রীমঠে এই অপূর্ব ঝুলন দর্শন করিতে আসিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। শ্রীশ্রীগোপালজীর দোলনায় আরোহণ হইতে অবতরণ পর্য্যন্ত প্রত্যহই শ্রীমঠে পাঠ, কীর্তনাদি ও প্রসাদবিতরণ-দ্বারা শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রচার্য্য বিষয় আগন্তুকগণকে মঠসেবকগণ বিশেষভাবে অবগত করান। এতদুৎসবের দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে শ্রীগোপালদেবের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষ্য করা গিয়াছে, আর প্রচারকবৃন্দের হৃদয়ে শ্রীমাত্বেন্দ্রপুরীপাদের সেবিত গোপালের গুণাবলীর স্মৃতি হইয়াছিল। পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ত্রিবেদান্ত হরিজন মহারাজের প্রভূত মেবায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উৎসবের সাফল্য ও মঠ-শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হওয়ায় সকলের হৃদয়কেই তিনি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার সহকারীগণের সেবাও প্রশংসনীয়।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

ঝুলনযাত্রায় শ্রীগে লোকগঞ্জ গোড়ীয় মঠে চারি দিবসব্যাপী বিরাট ধর্মসভার বিবরণ

পাঠকবর্গের অবগতির জন্ম ঝুলনযাত্রায় গোলোকগঞ্জ-মঠের ধর্মসভা সমূহের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রতিদিবসই এই সভায় সভাপতিত্ব করেন পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ত্রিবেদান্ত উর্দ্ধমহী মহারাজ।

১ম দিবস ১০ই ভাদ্র, ইং ১৭৮।৬৬ ; বিষয়—সনাতনধর্ম

প্রথম দিন স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত কামিনীকুমার রায় B. A., B. L. মহাশয় এই সভায় প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার প্রচার-সম্পাদক পরম পূজ্যপাদ ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী ও বিজাপুর (ধুবড়ী) উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী B. A. মহোদয়গণও বক্তৃতা করেন।

সভাপতি মহারাজ তাঁহার ভাষণে সনাতন ধর্ম কি এবং কিভাবে ত্রিগুণায়িক মায়া অতিক্রম করিয়া ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত হইতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় রহস্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিপুল আনন্দ প্রদান করেন।

প্রধান অতিথি মহাশয় অসমীয়া ভাষায় এক বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণে বলেন,—শ্রীমদ্ভগবদগীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাত্য বস্তুই সনাতন ধর্মের মূল। এতদনুকূল শাস্ত্রই সনাতন শাস্ত্র, অথ সকল নহে। তিনি আরও বলেন,—“যত মত তত পথ” মতটী অশাস্ত্রীয় ব্যক্তিরই মত। সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণারাধনাই শ্রেষ্ঠ ভজন। অত্যাগ শাস্ত্র হইতেও তিনি ইহার প্রমাণ উদ্ধার করেন। তাঁহার এই বক্তৃতার চমৎকারিতা ও দার্শনিক ভাব সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

অত্যাগ বক্তৃমহোদয়গণ, সনাতন ধর্ম যে একান্ত পালনীয় এবং উহা কোন নির্দিষ্ট দেশের বা জাতির ধর্ম নহে পরস্তু জীবমাত্রেরই ধর্ম, তাহা প্রভূত শাস্ত্রীয় যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলের বোধগম্য করেন।

২য় দিবস, ১১ই ভাদ্র ; বিষয়—সনাতন ধর্ম

ও শ্রীচৈতন্যদেব

অদ্য পূজ্যপাদ সভাপতি-মহারাজ বেদ, উপনিষদাদি হইতে শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুই যে স্বয়ং ভগবান তাহা প্রমাণ করেন এবং শ্রীমন্ন্যমহাপ্রভুর শিক্ষাই যে সনাতন ধর্মোক্ত তাহাও বিশদভাবে আলোচনা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের নিকট এক নূতন চিন্তার দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে আসাম বিধান-সভার ভূতপূর্ব সদস্য (M.L.A) ও বর্তমান গোলোকগঞ্জ অঞ্চল-পঞ্চায়েতের প্রধান তাঁহার ভাষণে বলেন যে, ধর্মজীবন যাপনই মানুষের একমাত্র কর্তব্য। ইহাই সকল সুখের

আধার। মানুষ ভগবানকে বিশ্বত হইয়াছে বলিয়াই এই পৃথিবীতে কষ্টভোগ করিতেছে। যিনি জাগতিক খ্যাতিতে বা ধনাদ্যতায় যত বড়ই হউন না কেন, মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কয়েদগ্রস্ত প্রধান কয়েদীর স্থায় তিনি কারাগারের একটি জীববিশেষই। শ্রীগীতায় “দৈবী হ্রেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যা। মামেব যে প্রপত্তন্তে মায়ামেতাম্ তরন্তি তে”—বাণীটি চিন্তে সংযত না করিলে সেই জীবন বৃথা। স্বয়ং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই বিশ্বে যেরূপভাবে এই সনাতন ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, পূর্বে কেহ সেরূপ করেন নাই। এইজন্য সমগ্র জগৎ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেই নিস্তার লাভ করিবে, নতুবা তাঁহার দুঃখহৃদিশা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতেই থাকিবে। “হরে কৃষ্ণ” এই মহামন্ত্রই কলিকালের যুগধর্ম। শ্রীহরি-নাম ও নামী শ্রীহরি অভিন্ন বস্তু। প্রধান অতিথি মহাশয়ের এই বক্তৃতা সুবিচারে পরিপূর্ণ থাকায় উপস্থিত জনগণকে প্রচুর আনন্দ দিয়াছে।

পূজাপাদ পর্যটক মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সঙ্ঘক্কাভিধেয়-তত্ত্ব, শ্রীপাদ বিশ্বরূপ প্রভু সাকার-নিরাকার এবং শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন প্রভু ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব-লীলা সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীপাদ হরিহর ব্রহ্মচারী প্রভু সংস্কৃত-ভাষায় ‘শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান’ সম্পর্কে ভাষণ দান করিয়া এক মধুরভাবের সমাবেশ করেন।

৩য় দিবস, ১২ ই ভাদ্র ; বিষয়—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা

পূজাপাদ সম্ভাপতি-মহারাজ অণু কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিয়া ভক্তি ব্যতীত অত্যাণ্ড পন্থার ফলপ্রদানে অক্ষমতা শাস্ত্রযুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। নানাপ্রকার যুক্তি অবলম্বনে তিনি ভক্তি-ধর্মের প্রতি সমাগত জনসাধারণের বিশেষ কোতূহল বর্দ্ধন করিয়া ভাষণের সমাপ্তি করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে পণ্ডিত শ্রীযুত বিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী প্রভু বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্মই কৈতবতালেশশূন্য। তাঁহার প্রবর্তিত মত-বিরোধী অত্যাণ্ড পন্থাগুলি বাহ্যতঃ ধর্মের স্থায় দেখাইলেও তাহা ছলধর্ম মাত্র, ভগবত্তত্ত্ব সর্বিশেষ, নির্বিশেষ মাকাল ফল নহে।

পূজাপাদ পর্যটক মহারাজ তাঁহার পূর্বদিনের আরম্ভ ‘সঙ্ঘক-অভিধেয়’ তত্ত্বের পুনরালোচনায় শ্রীল সমাতন গোস্বামী প্রভুকে প্রদত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই সম্পর্কীয় উপদেশাবলী কীর্তন করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার দার্শনিক-তত্ত্বপূর্ণ ভাষণে অদ্বৈতবাদ সর্বতোভাবে খণ্ডনপূর্বক দ্বৈতবাদ

তথা গৌড়ীয়ের ‘অচিন্ত্য-ভেদাভেদ’ স্থাপন করিয়া জনগণের বিশ্বাস উৎপন্ন করেন।

শ্রীপাদ গজেন্দ্রমোচন ব্রহ্মচারী প্রভু ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান – পরমেশ্বরের এই ত্রিবিধ প্রকাশ লইয়া এক ভাষণ প্রদান করেন।

শ্রীপাদ হরিহর ব্রহ্মচারী প্রভু তাঁহার অগ্গকার ভাষণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্যতার স্বরূপ বর্ণনায় বলেন, তিনি যে কেবল মনুষ্যকুলেরই উদ্ধারকর্তা, তাহা নহে। পশুপক্ষি-কীট সকলেরই তিনি উদ্ধারকর্তা। একদিকে যেমন তিনি জগাই, মাধাই-এর নায় পাষণ্ডীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, অপবদিকে তেমনি ঝারিখণ্ডপথে সিংহ-বান্দ্রাদি হিংস্র স্থাপদসংকুলেরও হিংস্রতা বিদূরিত করিয়া কলসঙ্কীর্ণনে উহাদিগকেও মাতোয়ারা করিয়াছিলেন।

৪র্থ দিবস, ১৩ই ভাদ্র ; বিষয়—শ্রীবলদেব ও

প্রয়োজন তত্ত্ব

সভাপতির ভাষণে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ উর্দ্ধমস্থী মহারাজ বলেন যে, জীবের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় থাকিতে পারে; কিন্তু যে-বস্তু নিত্য শাস্ত, ও সনাতন সেই বস্তু লাভ করিতে হইলে শ্রীশ্রীবলদেব প্রভুর আশ্রয়ই প্রয়োজন।

প্রধান-অতিথির ভাষণে শ্রীপাদ বিশ্বরূপ প্রভু বলেন যে হাত-যাঁতার কলাই পেষণ করিতে গেলে দেখা যায়, যে-কলাইগুলি যাঁতার মধ্যস্থলের খিলটীর মধ্যে অবস্থান করে সেইগুলি পিষ্ট হয় না। ভগবদাশ্রয়ও তদ্রূপ। শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমাদের আর মায়াপিষ্ট হইতে হইবে না।

“অব্রহ্ম-ভুবনাল্লোকাং পুনরাবর্তিনোহর্জুন।

মামুপেত্য তু কোন্তেষ পুনর্জন্ম ন বিগতে ॥”

সর্বশেষে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পর্যটক মহারাজ ‘প্রয়োজন-তত্ত্ব’-সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ দার্শনিক-বক্তৃতা করেন। অতঃপর তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-সমিতির পক্ষ হইতে সভাস্থ জনগণকে বলেন,—“আমাদের এই চারিদিবসব্যাপী ধর্মসভায় প্রত্যহ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া আপনারা ইহাকে সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করায় সমিতির আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আপনাদিগকে যে কি বলিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করিব তাহার ভাষা আমাদের নাই। এ অধম একজন ত্রিদণ্ডি-

সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে গৃহী ব্যক্তি তদভিলষিত কোনও বস্তুর অন্ততঃ কিছু দান করিয়া থাকেন। আমিও একটি ভিক্ষা আপনাদের নিকট করিব, তাই বলিয়া মনে করিবেন না যে, সন্ন্যাসী বুঝি আপনাদের বিষয়-সম্পদ ভিক্ষা চাহিতেছে। 'রাধাকৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল' এই মাত্র ভিক্ষা, অথ কোন ভিক্ষা আমি চাই না। 'রাধাকৃষ্ণ' বলা ও সঙ্গে আসা—এই দুইটি কার্য্য এক্ষণে করিতে না পারিলেও, রাধাকৃষ্ণ বলিবেন—এই প্রতিশ্রুতি-দানরূপ ভিক্ষামাত্র আমি প্রার্থনা করি। এই ধর্ম্মসভা যে আজ সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে তাহার একমাত্র কারণ—আমাদের অলৌকিক গুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের আচার্য্য-কেশব ও ষিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমন্তুক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের অহৈতুকী, অশেষ করুণা। ইহা ব্যতীত অথ কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না।”

—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব

বিগত ২২ই জ্যৈষ্ঠ, ২২শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-সমিতির অধীনস্থ সকল মঠেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী-ব্রত নিরন্তর উপবাস সহযোগে পালিত হইয়াছেন। এই ব্রতোপলক্ষে সর্ব্বত্রই প্রত্যুষে মঙ্গলারতির পর হইতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী, শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের জন্মলীলা পারায়ণ করা হইয়াছে। দিবারাত্র কৃষ্ণকথার শ্রবণ-কীৰ্ত্তনই এই জন্মাষ্টমী-ব্রত উদ্‌যাপনের প্রধান কৃত্য হইয়া বেদান্ত সমিতির শাস্ত্রানুগত্য প্রকাশ করিয়াছে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি বলিয়া এই ব্রতে নিরন্তর উপবাস একান্ত কর্তব্য।

মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এতদুপলক্ষে একশঙ্কব্যাপী এক প্রদর্শনীর উন্মোচন হয়। এইস্থানে শ্রীরামপুর-নিবাসী (হুগলী জেলার অন্তর্গত) স্বনামখ্যাত শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী, ভক্তবান্ধব মহাশয়ের দানকৃত অর্থে নবনির্ম্মিত ভোগরন্ধনশালা শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম স্বয়ং স্বহস্তে নন্দোৎসব-দিবসে উন্মোচন করেন। শত শত লোক এই উৎসবে আকর্ষণ মহাপ্রসাদ লাভ করেন। সমিতির অগ্রাঙ্ক মঠসমূহেও নন্দোৎসবে আগন্তুক-মাত্রকেই মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যত্যয় হয় নাই। —শ্রীহরিপ্রিয় ব্রহ্মচারী

শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-প্রদর্শনী

ও শ্রীশ্রীনন্দোৎসব

পলে পলে ছিন্ন বিছিন্নকর্ত্রীমায়ার রাজত্বে তাৎকালিকী সংখ্যার উর্দ্ধতম পর্য্যায়ের বিপর্য্যয়ে ভগবান শ্রীকেশবের বিচিত্র জগতে কালসাপেক্ষ-সাধনায় ব্যস্তসমস্ত জীবনিচয়ের মৃত্যুমুখী হওয়ার অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্যসমূহের মধ্যে অবস্থানহেতু অজ ভগবানের জন্মলীলার-মাধুর্য্যোজ্জ্বল রূপ দর্শনে বিমূঢ় হইয়া কং সঃ কিং করিয়াতি—এতাদৃশী অসমযোচিতা ও অপক চিন্তারত, দম্ভপরায়ণ, বাহ্যতঃ নির্ভীকস্বস্তুর দিগ্ভ্রমণ্ডল পরিব্যাপ্তকারী আশ্ফালনের সমুচিত দণ্ডপ্রদানে এবং যাহার অপরূপ গর্ভসিক্কিতে ক্ষণমাত্র অধিষ্ঠানও জগৎ-পিতা ব্রহ্মার চরণে মহদপরাধিবৃন্দকেও বিগতকল্মষ করিয়া থাকে, বিশ্বে সেই কংস-পীড়িতা, সুরলোকবন্দ্যা দেবগর্ভার অতুলনীয় সহিষ্ণুতার কীর্ত্তি-সৌরভ বিতরণসহ তদীয়া স্বয়ং নিত্য বাৎসল্যরসের নিরন্তর পুষ্টিবিধানে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের ক্ষণে ক্ষণে, স্থানে স্থানে প্রপঞ্চলীলা-পরিগ্রহণের চলনা অদ্ভুতভাবে কালে কালে যোগমায়া-প্রভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অষ্টাবিংশতিতম চতুর্যুগে স্বাপরাণ্ডে উক্ত লীলার পুনরভিনয়ে বঞ্চনাচতুর জম্বুকবেশধ্বক্-যোগমায়াপুরঃসরঃ, বৈকুণ্ঠ-যাজ্ঞকর, বসুধরেন্য যজ্ঞকুলপতি-রক্ষকের সম্মুখ হইতে শিশুহত্যা, ক্রণহত্যা, নারী-লাঞ্ছনাদি বীভৎস পাপের অগ্রদূত-স্বরূপে সপ্তদ্বীপে দৈত্যনিধিবৃন্দ কর্ত্তক পূজালিপ্সার পর্ব্বতসদৃশ দৃঢ় কারাগারও কৃষ্ণেচ্ছায় আপনি মুক্ত হইলে সেই “সন্তো বভূব প্রাকৃত শিশুঃ”-র প্রাণরক্ষাকল্পে দিব্যাবরণোন্মেঘে গোলোকে এক আনন্দরোল উঠিয়াছিল। আনন্দোচ্ছল যমুনার উত্তাল তরঙ্গও ‘স্থানে স্থিত’ হইয়া গোকুলে নন্দালয়ে গমনের পথ বসুদেবের নিকট সুগম করিয়া দিয়াছিল। চতুর্দিক ভীষণ দুর্ঘ্যোগে সমাচ্ছন্ন হইলেও ‘জ্যোতিরভ্যন্তরে’ শ্যামসুন্দরের অতুল রূপচ্ছটা বিরলে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী প্রতীসরণ হেতু দিব্যধামে গমনকারীর পথ আলোয় উদ্ভাসিত করিয়াছিল। যাহা জগতের নিকট অন্ধকারসদৃশ তাহাই শ্রীহরিসেবায় আলোকের আধার—ভক্তবৃন্দ এই লীলার পূর্ণ স্বরূপ জানিতে পারিলেন। বসুধাধর অনন্তনাগের ফটাটোপে ভীত হইয়া জাগতিক কোন বাধাও শিশুকৃষ্ণের মস্তকে কোনও আঘাত হানিতে সক্ষম হয় নাই।

উভয়কুল-রক্ষানিপুণ ভগবান অপূর্ব্ব কৌশলদ্বারা স্বয়ংরূপ-মৌলিকত্বে

নন্দালয়ে আবিভূত হইলেও তথায় পুত্রহন্তে বসুদেব মহারাজের আগমনে যোগমায়া-প্রভাবে লঙ্কাচেতনা মাতা যশোদার ক্রোড় হইতে তিনি অন্তরালে অবস্থান করতঃ বসুদেবের বাৎসল্যভাবের বিন্দুমাত্র হানি করিলেন না—এই সকলের নিগূঢ় তাৎপর্য্য ভক্তবৃন্দকে অতাপি চিন্ময়ানন্দ দান করিতেছে।

বসুদেবের প্রাণবসু কৃষ্ণ গোকুলে আনন্দ দান করিলে তাহা সর্বত্র প্রসারলাভ করিল। বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ ৪৮০ গৌরাদ, ২২শে ভাদ্র ১৩৭৩, শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে এই সকল পরমশুভ মুহূর্ত্তেরই আনন্দ-বত্মা বহিয়া গিয়াছে। কংসকুলাগ্রগণ্য আত্মরিক জগতের এই সকল আনন্দ-উপভোগের কোন্ ক্ষমতা ?

সম্প্রতিকালে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে এই সকল লীলার যে পুনর্দর্শন সকলের দৃশ্যপথে আবিভূত হইয়াছিল, সেই স্থলে উক্ত সময়ে অস্মদীয় পরমারাধ্যাতমদেবের নিখিল জগন্মঙ্গলকর সূচিস্তনীয়া বার্তাবিঘোষণার তডিং মুহূর্ত্তে সর্বাঙ্গক কৃষ্ণের অপ্ৰাকৃত চৌষক্কে আকৃষ্ট হইয়া সারিবদ্ধ অলিকুলের ত্রায় দলে দলে সমাগত জনগণ ‘জয় শ্রীকেশব’ ধ্বনি করিতে করিতে হরি-আনন্দে প্রমত্ত থাকিয়া অপ্ৰাকৃত-কুলসম্রাটের আবির্ভাবে সঙ্কীৰ্ত্তন-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

ঐকান্ত্যের অবতার তুৰ্য্যোধনের শ্রীকৃষ্ণের শীর্ষদেশের দিকে অবস্থানের ত্রায় স্মার্ত্তকুলপতিগণ উক্ত তিথির প্রথমার্দ্ধে বিদ্বাবস্থাতেই জন্মাষ্টমী-ব্রত পালন করিলেও তাহার অশাস্ত্রীয়ত্ব স্থাপনে পরদিবস বিগত যোগে মুহমূহ মেঘ-গর্জ্জন, বিছাতের শিহরণ ও দেবরাজ ইন্দ্র-প্রেরিত বলাহকের বর্ষণদানে মায়ামোহিত বিশ্বের বিমর্ষরূপ-ধারণ সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। অন্তিমের ফলাবস্থিতি। “সব ভাল যার শেষ ভাল”।

এইবার আনন্দ বিতরণের পর্বা। ধনই আনন্দ বিতরণের প্রকৃষ্ট মাধ্যম। ধন শব্দে বসু, যাহার দেবতা ইতোমধ্যেই আনন্দালয়ে প্রবেশ করিয়া-ছেন। সর্বত্রই হরিমোষণা-বৃত্তির উন্নততম শৃঙ্গে বিহরণ-লিপ্সুর জাগতিক প্রতিষ্ঠার অতুল কীৰ্ত্তি-নির্ম্মিত প্রাসাদে অতি সংগোপনে হান্তীর মধ্যে যাবতীয় অপ্ৰাকৃত প্রসাদ রক্ষিত হয়। স্বয়ং শ্রীশ্রীল পরমারাধ্যাতমদেবই উক্ত পাত্রের উন্মোচন করিয়াছিলেন। জাগতিক ভাণ্ডারের ধারণ-ক্ষমতার বহিভূত বস্তুসমূহের পরিপূর্ণ গুণাবলীর ভোগরসাস্বাদনে কে কাহাকে ঠেকাইবে? শ্রীউৎসবের বিজয় ছন্দুভির সেই গুরু-গন্তীর নিঃশ্বন

উক্ত সুরক্ষিত পাত্রমধ্যে উন্নততম প্রকারে বাদিত হইয়া সুদূরব্যাপী প্রসারিত হইয়াছিল ; সেই ধ্বনিশ্রুতিতে আগত অগণিত লোক আকর্ষণ মহাপ্রসাদ সেবনে অলৌকিক আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। আর এই সকল দিব্য প্রদর্শনী মূল নায়িকা শ্রীমতী রাধারানীর আবির্ভাব-দিবসে পরিপূর্ণরূপে আলোকিত হইয়া নিক্সাগোমুখ বিশ্ব হইতে সহসা অন্তর্হিত হইলে জগতের সৌভাগ্য পুনরায় অন্ধকার-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়—

“শরতের মেঘ যেন কারো ভাগ্যে বর্ষে।

সর্বত্র না করে বৃষ্টি, কোথাহ বরিষে।”

— শ্রীরসিকরঞ্জন ব্রহ্মচারী, B. A.

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

বিগত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ৪৮০ গোরাব্দ, ৫ই আশ্বিন ১৮৭৩, মূল-কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ ও তদধীনস্থ শাখা-মঠসমূহে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-ব্রত বিপুল হর্ষের মধ্যে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। পরমা সত্যী-সাক্ষী রমণীগণ তাঁহাদের পতিব্রতা-ব্রতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে এই তিথির বিশেষ সমাদর করেন। কেহ কেহ এই তিথিতে উপবাস করিয়া থাকেন, কিন্তু সাত্বত-স্মৃতি গ্রন্থাদিতে কেবল শক্তিমানের আবির্ভাবে উপবাসের বিধি দিয়াছেন। আবার কৃষ্ণচন্দ্র ও এই তিথিতে আলোকিত হইয়াছেন। তজ্জন্তু সমিতির সর্বত্র এই তিথিবরা “রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা”, “কুসুমাক্ত...”, “রাধাচিন্তা-নিবেশন যন্ত কান্তিবিলাপিতা”দি রাধামহিমাজ্ঞাপক বিবিধ কীর্তন ও শ্রীপুরাধাকান্তি শ্রীশ্রীবিনোদবিহারীর চতুর্বিধ রসসংযুক্ত মহাপ্রসাদ প্রচুরভাবে আশ্বাদনের মধ্যে অতিক্রান্ত হইয়াছে। শ্রীবলদেব বিজ্ঞাভূষণ প্রভু-কৃত “বেদান্ত-সুমন্তকঃ” গ্রন্থের এই দিন পারায়ণ হয়।

— শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী

ভ্রম-সংশোধন

বর্তমান ১৮শ বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গত ৬ষ্ঠ সংখ্যার ২৪০ পৃষ্ঠায় “প্রচার-প্রসঙ্গ” শিরোনামার দ্বাদশ ছত্রে ‘হরিসভা-ভবনে’র স্থলে ‘কালী-বাড়ী-ভবনে’ হইবে।

— প্রকাশক

বেষাশ্রয়

গত ৯ই ফব্রুয়ারী শ্রী শ্রীজন্মাষ্টমী-দিবসে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মের নিকট হইতে জগদগুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীনাম ও দীক্ষাশ্রিত শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রজচারী এবং সমিতির আশ্রিত শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রজবাসী ও শ্রীপাদ বলরামদাস ব্রজবাসী—এই তিনজন পরাজ্জনিষ্ঠামাত্র বাবাজী-বেষাশ্রয় গ্রহণ করেন। বেষান্তে তাঁহারা যথাক্রমে শ্রীমদ্ নবীনকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীমদ্ পুরুষোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমদ্ বংশী-বদনানন্দদাস বাবাজী মহারাজ নামে পরিচিত হন।

শ্রীমদ্ নবীনকৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজের পূর্বাশ্রম মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমায়। শ্রীল প্রভুপাদের অন্ত্যলীলার শেষভাগে প্রায় ৭৮ বৎসর তিনি মঠে যোগদানান্তর তদবধি ত্যাগীর আশ্রম যাপন করিতেছেন। অস্বদীয় শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি চিরকাল তিনি শ্রদ্ধালু ছিলেন এবং তাঁহারই আশ্রয়ে সমগ্র ভারতের তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করেন। সমিতির উড়িষ্যা প্রদেশস্থ ভদ্রক-মহকুমার কোরটাস্তর্গত-আশ্রমে কিছুদিন সেব-কার্য্যাদি সম্পাদন করেন। অনন্তর কায়মনোবাক্য শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা-মানসে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের নিকট বাবাজী-বেষ প্রার্থনা করিলে তদনুসারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামিকৃত সাত্ত্বত-স্মৃতি 'সংস্কার-দীপিকা'নুসারে তাঁহাকে বৈদিক পরাজ্জনিষ্ঠামাত্র বাবাজীর বেষ প্রদানান্তর শ্রীমদ্ নবীনকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ নামে পরিচিত করেন।

শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রজবাসী সমিতির একজন একনিষ্ঠ সেবক। শ্রী ১৭১৪ বৎসর পূর্বে তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-সমিতিতে যোগদানপূর্ব্বক শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীনরেন্দ্রীয়া গৌড়ীয় মঠ, শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও মাথাভাঙ্গা গৌড়ীয় সেবাশ্রমে বহু দিন সেবাকার্য্যাদি পরিচালনা করেন। কাষ্ঠ-শিল্পে ইঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। ইনি সেবাদ্বারা শ্রীল গুরুপাদপদ্মের প্রিয় হন এবং তাঁহার নিকট বাবাজীর বেষ প্রার্থনা করেন। তদনুসারে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম তাঁহাকে বৈদিক সাত্ত্বত-স্মৃতি শ্রীসংস্কার-দীপিকানুসারে বাবাজী বেষ প্রদানান্তর শ্রীমদ্ পুরুষোত্তমদাস বাবাজী মহারাজ নামে পরিচিত করেন। ইঁহার বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর, শ্রীজন্মাষ্টমীর পাদম্পর্শে তীর্থীভূত 'পিছলদা' পূর্ব্বনিবাস।

শ্রীপাদ বলরাম ব্রজবাসী সমিতির শ্রীনাম ও দীক্ষাশ্রিত এবং 'ভক্তি-মধুকর' নামে সর্বত্র পরিচিত। গৌড়ীয়েব মাধুকর-ভৈক্ষ্য-সংগ্রহে ইঁহার

বিশেষ যত্ন ছিল। প্রায় ত্রয়োদশ বৎসরকাল তিনি সমিতিতে ত্যক্তসংসার হইয়া যোগদানাত্তর সেবাকার্য্যে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়া মঠসেবকবৃন্দের প্রিয়পাত্র হন। ইনি কিছুকাল ‘শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ’ ও ‘শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির’ (বোসপাড়া লেন, কলিকাতা) সেবা সম্পাদন করিয়াছিলেন। একান্তভাবে মাধবতোষনী বৃত্তি-অনুষ্ঠানে অভিলাষী হইয়া তিনি পরাঅনিষ্ঠা-মাত্র বেষ গ্রহণের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে শ্রীসংস্কার দীপিকানুসারে বাবাজী-বেষ প্রদানাত্তর শ্রীমদ্ বংশীবদনানন্দদাস বাবাজী মহারাজ নামে পরিচিত করেন। ইঁহার বয়ঃক্রম কষ্টি বর্ষের সন্নিহিত। পূর্বজীবনে শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন, পূর্বনিবাস বাঁকুড়া জিলায়। বর্তমানে ইনি “সর্বতাজি” জীবের কর্তব্য কাঁহা বাস-এর উদ্দিষ্ট স্থান, জীবের চরমগতি বৃন্দাবনে ভজন করিতে সমুৎসুক হইয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

— নিজস্ব

বিরহ-বার্তা

বিগত ৩০ শ্রাবণ ১৩৭৩, ইং ১৫ই আগষ্ট সোমবার জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীগং ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদাষুজাশ্রিত শিলিগুড়ির শ্রীপাদ হরিপদ দাসাধিকারী মহাশয় (প্রফেসর শ্রীহরিপদ মণ্ডল) শ্রীনাগ স্মরণমুখে পরধাম গমন করিয়াছেন। এই বিরহসংবাদ নবদ্বীপে শ্রীমঠে পৌঁছাইলে সমিতির সেবকবৃন্দ তাঁহার দৈন্ত, সরলতা, ভক্তিসিদ্ধান্তে নিষ্ঠা, এবং তাহাতে পারদর্শী হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য-পাদপদ্মে প্রগাঢ় আস্থা প্রভৃতি বিবিধ সদগুণরাজির স্মরণ করিয়া অতীব কাতর হইয়া পড়েন। তিনি সমগ্র উত্তরবঙ্গে সমিতির শিক্ষার বিপুল প্রচারের একজন স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। দেহরক্ষাকালে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্তের পরমোপাস্ত্র শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ এবং নিরন্তর বিস্তৃত বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীমুখে শ্রীহরি নাম শ্রবণ তাঁহার প্রতুল সৌভাগ্যের পরিচয়। শিলিগুড়ি স্তম্ভপল্লীতে স্থায় বাসভবনে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র তাঁহার পার-লৌকিক-ক্রিয়া সাহিত্য-বিধানে সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইয়াছিল। ইং ১৯৩১ সালে তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন।

ময়মনসিংহে আনন্দমোহন কলেজে তিনি ডিমলট্রেটর-পদে আসীন ছিলেন। উক্ত মহাবিদ্যালয়ের অবকাশ-কালে তিনি প্রায়ই মঠে আসিয়া

ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন-প্রকাশন-বিভাগে সেবাদি করিতেন। ভারত-বিচ্ছেদের পর তিনি শিলিগুড়ি কলেজের Demonstrator নিযুক্ত হন। এক পত্রমধ্যে তিনি জানাইয়াছিলেন, “আমি ভক্তিসিদ্ধান্ত আহরণে একমাত্র শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-সমিতিকেই নির্ভরশীল মনে করি।” বপু অপেক্ষা বাণীর প্রতি আদর তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। গত বৎসর জুলাই মাসে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-সমিতির আচার্য্যদেব যখন শিলিগুড়িতে গুভবিজয় করেন, তাঁহার সহিত ‘শক্তি-শক্তিমান,’ ‘দৈবাসুর,’ ‘সবিশেষ-নির্বিশেষ’-বিচারাদি শ্রবণ করিয়া বলিয়া-ছিলেন—এরূপ সুন্দর বিচার পূর্বে কোনও আচার্য্য জগতে বিতরণ করেন নাই। সর্বপ্রকারে বাণী-সেবাই যে তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল এই সকল উক্তিই তাহার প্রমাণ।

শিলিগুড়িতে সমিতির গৃহস্থ ভক্তবৃন্দকে প্রীতিপূর্বক হরিভজনে উপদেশ-দানাদি দ্বারা তিনি তাঁহাদের বিত্তীয় অভিভাবক-স্বরূপ ছিলেন। দেহরক্ষার অল্পদিন পূর্বে তিনি শ্রীরাধারানীর একটি পিতুলময়ী শ্রীমূর্তি প্রদান করিতে অস্বদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মে আর্তি নিবেদন করেন। তাঁহার উক্ত বাসনা পূরণের পূর্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার জন্মস্থান পাবনা জিলা। তাঁহার গায় একজন উদার ও আদর্শ ভক্তের বিরহে কেবল এই চিন্তাই অহরহ হৃদয়ে জাগিতেছে, “আর কি তাঁকে পা'ব না?”

প্রচার-প্রসঙ্গ

রণক্ষেত্র হইতে ভক্তিশেষী চণ্ডালের পশ্চাদপসরণ

পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবাদান্ত বামন মহারাজ দুমকা-জিলার বিভিন্ন স্থানে বিপুলভাবে শ্রীহরিকথা কীর্তন করিতেছেন। তাঁহার নিকট অপূর্ব শাস্ত্র-তাৎপর্য্য শ্রবণে বহু লোক সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। বহু স্থান হইতে উচ্চশিক্ষিত জনসমাজ ও রাজগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা ও আহ্বান জানাইতেছেন।

বর্তমানে ‘রণবহাল’ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি শ্রীযুত সুরেন্দ্র নাথ মণ্ডল নামক জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির আহ্বানে দুমকা হইতে ৫০ মাইল উত্তরে চণ্ডালমারা নামক স্থানে গুভগমন করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে সপ্তাহ-ব্যাপী তাঁহাদের অবস্থান হয়। প্রতি দিবসই তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বিবিধ

উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে ভাগবত-বাণীর গ্রাহক হইলেই মানুষ অতিমৃত্যু, জরা হইতে মুক্তিলাভ করিবে জানাইয়া দেন। এইস্থানে অবস্থানকালে সর্বদাই বহু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি তাঁহার নিকট শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে আসিতেন। শ্রীমদ্ভাগবত-বাণীর প্রচারের জন্ত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের উদার হৃদয় সসজ্জ সম্পাদক-স্বামীজী মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। সমিতি সুরেন্দ্র বাবুকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

চণ্ডালমারা হইতে ৬ মাইল দূরে মহেশপুর এক উন্নত জনপদ। প্রপূজ্যচরণ স্বামীজী মহারাজের যশোগাথা লোকমুখে চতুর্দিশে একরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল যে, মহেশপুরের রাজা শ্রীযুক্ত মহেশ্বরনারায়ণ সিং বাহাদুর মহাশয় স্বয়ং নিজ পেট্রোল-যানে চণ্ডালমারা গ্রামে স্বামীজী-সকাশে উপস্থিত হন এবং স্বহস্তে উক্ত যান চালাইয়া সসজ্জ স্বামীজী মহারাজকে ধীরে আলয়--মহেশপুর-রাজবাটিতে আনয়ন করেন। রাজবাটিতে প্রত্যহ ভাগবত-কীর্তন-সভায় প্রচুর জনসমাগম হইত। এক দিবস স্থানীয় রাজ ইংরাজী বিদ্যালয়ের স্ববৃহৎ ক্রীড়া-প্রাঙ্গণে স্বয়ং রাজাবাহাদুরের উপস্থিতিতে স্থানীয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং শিক্ষিত জনসমাকীর্ণ এক বিরাট ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বামীজী মহারাজ “বর্তমান শিক্ষা, জড়-বিজ্ঞান ও সনাতন ধর্ম” সম্বন্ধে এক দার্শনিক-তত্ত্বমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার বলেন, ধর্ম-সম্বন্ধে এইপ্রকার দার্শনিক বক্তৃতা কখনও শুনি নাই। রাজা ও বাণী অতীব ধর্মপরায়ণ। সমাজের এইরূপ আদর্শ হইলে দেশের মঙ্গল হইবে। এক সপ্তাহব্যাপী এই গ্রামে স্বামীজী মহারাজ অবস্থান করেন।

এই স্থান হইতে স্বামীজী মহারাজ দুমকায় সজ্জনবৃন্দের আহ্বানে পুনরায় তথায় তৃতীয়বার পদার্পণপূর্বক উচ্চশিক্ষিত জনগণকে গৌড়ীয়-বাণী শ্রবণ করাইতেছেন। স্থানীয় উকীল শ্রীযুত নির্মলকান্ত ঘোষ মহাশয় প্রচারকমণ্ডলীকে সাহায্য করিতেছেন। বৃন্দাবনের শ্রামল-বনানীকে ভাস্মে পরিণত করিতে অসুরগণের যে দুষ্ঠাকাজ্ঞা তাহার বিরুদ্ধে স্বামীজী মহারাজের রণ-ঘোষণায় দাঁড়কাকের হ্রায় বহুতর ভক্তিবিরোধী লোকের রণক্ষেত্রেই পরাজয় ও নতি স্বীকার পূর্ববৎ বহালই থাকিতেছে।

—প্রচার সম্পাদক

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।

ধর্ম: স্বহস্তিত: পুংসাং বিষকুসেন-কথাত্ য:



নোংপাদিরেদযদি যতিং শ্রমএব হি কেবলম্ ॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াহ্মা স্প্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আশ্র-পরসন্ন ।
অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিদ্যুত ॥

অথ ধর্ম সূচরূপে পালে যেই জন ।
হরি-কথার বতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥

১৮শ বর্ষ } অনিরুদ্ধ, ১৮ দামোদর, ৪৮০ গৌরাক্ষ } ৯ম সংখ্যা
বুধবার, ৩০ কা্তিক, ১৩৭৩; ইং ১৬।১।১৯৬৬

সান্ন্যাসাদং

শ্রী ব্রহ্মা-কথিতং শ্রী শ্রী ভগবদ্ভিত্তি-বর্ণনম্

(শ্রী শ্রী বেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ষষ্ঠে অধ্যায়ে)

বাচাং বহুমুখং ক্ষেত্রং ছন্দসাং সপ্ত ধাতবঃ ।

হব্য-কব্যামৃতান্নানং জিহ্বা সর্ববরসমু চ ॥ ১ ॥

শ্রী ব্রহ্মা (নারদকে) কহিলেন—সেই বিরাট পুরুষের মুখ বাগিন্দ্রিয়-সমূহর, তদধিষ্ঠাতৃ দেবতার এবং অগ্নির উৎপত্তিস্থান; তাঁহার স্বগাদি সপ্তধাতু গায়ত্র্যাदि সপ্ত ছন্দের ক্ষেত্র। তাঁহার জিহ্বা হব্য (দেবতাদের অন্ন), কব্য (পিতৃগণের অন্ন), অমৃত (উক্ত উভয়ের শেষ মনুষ্যগণের অন্ন) এং মধুরাদি ষড়্-বিধ রসের, এবং আমাদিগের রসনেন্দ্রিয়ের ও তদধিষ্ঠাতৃ-দেবতা বরুণের উৎপত্তিস্থান ॥ ১ ॥

সর্বাস্থনাঞ্চ বায়োশ্চ তন্মাসে পরমায়ণে ।

অশ্বিনোরোষধীনাঞ্চ শ্রাণো মোদ-প্রমোদযোঃ ॥ ২ ॥

তাহার নাসারদ্ধয় সর্বজীবের প্রাণের ও বায়ুর উত্তম ক্ষেত্রদ্বয়।
তাহার ষ্রাণেন্দ্রিয় অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, ওষধিগণের এবং সামান্য ও বিশেষ
গন্ধের পরম স্থান ॥ ২ ॥

রূপাণাং তেজসাং চক্ষুর্দিবঃ সূর্যস্য চাক্ষিণী ।

কণো' দিশাঞ্চ তীর্থানাং শ্রোত্রমাকাশ-শব্দযোঃ ॥ ৩ ॥

তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয় রূপসমূহের এবং রূপ-প্রকাশক বস্তুসমূহের
ক্ষেত্র। তদীয় নেত্র-গোলকদ্বয় স্বর্গ ও সূর্য্যের উৎপত্তি স্থান। তাহার
শ্রোত্রাধিষ্ঠানে দিক্ ও তীর্থসমূহ বিরাজিত এবং তাহার শ্রোত্রেন্দ্রিয়
আকাশ ও শব্দের ক্ষেত্র ॥ ৩ ॥

তদগাত্রং বস্তুসারাণাং সৌভগস্য চ ভাজনম্ ।

ভৃগস্য স্পর্শবায়োশ্চ সর্বমেধস্য চৈব হি ॥ ৪ ॥

তাহার শরীর বস্তু-শক্তি সমূহের এবং সৌভাগ্যের স্থান। তদীয় ভৃক্
স্পর্শ, বায়ু এবং যজ্ঞের স্থান ॥ ৪ ॥

রোমাণ্যুদ্ভিজ্জজাতীনাং যৈকবা যজ্ঞস্তু সন্তুতঃ ।

কেশ-শ্মশ্রু-নথান্যস্য শিলা-লোহান্ন-বিদ্যাতাম্ ॥ ৫ ॥

তাহার রোমসমূহ যাবতীয় বৃক্ষের অথবা যে সকল বৃক্ষ দ্বারা যজ্ঞ
সম্যাক্রূপে সাধিত হয়, সেই সকল বৃক্ষের উৎপত্তি-স্থান। তাহার
কেশদাম ও শ্মশ্রুসমূহ মেঘসমূহের ক্ষেত্র; মহাকাঙ্ক্ষিময় নথসমূহ বিদ্যাতের
শিলা ও ধাতুর উৎপত্তি-স্থান ॥ ৫ ॥

বাহবো লোকপালানাং প্রায়শঃ ক্ষেমকর্ম্মণাম্ ॥ ৬ ॥

তদীয় বাহুসমূহ পালনকর্ত্তা লোকপালগণের উৎপত্তি-স্থান ॥ ৬ ॥

বিক্রমো ভূভুবঃ স্বশ্চ ক্ষেমস্য শরণস্য চ ।

সর্বকাম-বরস্ত্যপি হরেশ্চরণ আশ্পদম্ ॥ ৭ ॥

সেই পুরুষের পদত্বাস ভূলোক, ভুবলোক ও স্বলোকের আশ্রয়।
সেই হরির চরণ কল্যাণ অর্থাৎ লব্ধবস্তুর রক্ষণ, এবং শরণ অর্থাৎ ভয়
হইতে রক্ষণ, এবং সর্ববিধ কাম ও সকল প্রকার বরণের আশ্রয়-
স্থল ॥ ৭ ॥

অপাং বীৰ্য্যস্য সর্গস্য পর্জন্মস্য প্রজাপতেঃ ।

পুংসঃ শিশু উপস্থস্ত প্রজাত্যানন্দনিবৃত্তেঃ ॥ ৮ ॥

সেই পুরুষের শিশ্নে জল, শুক্র, স্রষ্টি, বৃষ্টিমান্ জলের এবং প্রজাপতির অধিষ্ঠান। অপর তাঁহার উপস্থিত্রিয় সন্তানার্থ সন্তোগদ্বারা তাপহানির স্থান ॥ ৮ ॥

পায়ূর্যমশ্চ মিত্রশ্চ পরিমোক্ষশ্চ নারদ ।

হিংসায়া নিব্বর্ত্তে মৃত্যোর্নিরয়শ্চ ইদং স্মৃতম্ ॥৯॥

হে নারদ ! সেই পুরুষের গুহরন্ধ্র যম, মিত্রদেব ও মলত্যাগের ক্ষেত্রের উৎপত্তি স্থান। তাঁহার পায়ুগোলক হিংসা, অলক্ষী মৃত্যু এবং নরকের আশ্রয় বালয়া খ্যাত ॥ ৯ ॥

পরাত্ত্বেরধর্ম্মশ্চ তমসশ্চাপি পশ্চিমঃ ।

নাড্যো নদ-নদীনাঞ্চ গোত্রাণামস্থিসংহতিঃ ॥১০॥

সেই পুরুষের পৃষ্ঠভাগ পরাত্ত্ববস্বরূপ অধর্ম্ম ও অজ্ঞানের স্থান তাঁহার নাড়ীসমূহ নদনদী সকলের এবং তাঁহার অস্থিরাজি পর্ব্বতসমূহের অধিষ্ঠান ॥ ১০ ॥

অব্যক্তরসসিদ্ধূনাং ভূতানাং নিধনশ্চ চ ।

উদরং বিদিতং পুংসো হৃদয়ং মনসঃ পদম্ ॥১১॥

সেই বিরাট পুরুষের উদর অন্নাদিজাত অব্যক্ত রস ও সমুদ্রের উৎপত্তি এবং প্রাণিগণের লয়ের স্থান। তাঁহার হৃদয় জীৱসমূহের লিঙ্গশরীরের আশ্রয় ॥ ১১ ॥

ধর্ম্মশ্চ মম তুভ্যঞ্চ কুমাৰাণাং ভবশ্চ চ ।

বিজ্ঞানশ্চ চ সত্ত্বশ্চ পরশ্চাত্মা পরায়ণম্ ॥১২॥

সেই পুরুষের অস্থঃকরণ ধর্ম্মের, আমার, তোমার (নারদের), সনৎ-কুমারাদির, রুদ্রের (ভব) এবং বুদ্ধি ও সত্ত্বের পরম আশ্রয় ॥ ১২ ॥

অহং ভবান্ ভবশ্চৈব ত ইমে মুনয়োহগ্রজাঃ ।

সুরাসুর-নরা নাগাঃ খগা মৃগ-সরীসৃপাঃ ॥১৩॥

গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা রক্ষোভূতগণোরগাঃ ।

পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিত্যাশ্রাশ্চারণা দ্রুমাঃ ॥১৪॥

অন্যে চ বিবিধা জীবা জল-স্থল-নভৌকসঃ ।

গ্রহক্ষ'কেতবস্তারাস্তুড়িতস্তনয়িত্ত্ববঃ ॥১৫॥

যজ্ঞপাত্র, ধান্যাদি শস্য, ঘৃতাদি মেহ, মধুরাদি রস, সুবর্ণাদি ধাতু, মৃত্তিকা, জল, ঋক, যজুঃ, সাম, হোত্রাদি কৰ্ম্ম ॥ ২৫ ॥

নামধেয়ানি মন্ত্ৰাশ্চ দক্ষিণাশ্চ ব্রতানি চ ।

দেবতানুক্ৰমঃ কল্পঃ সংকল্পস্তত্ত্বমেব চ ॥ ২৬ ॥

যাগাদির জ্যোতিষোমাদি নাম, স্বাহা কারাদি মন্ত্ৰ, দক্ষিণা, ব্রত, দেবতাদের উদ্দেশ, বোধায়নাদি কৰ্ম্মপদ্ধতিগ্রন্থ, আমি এষ্ট প্রকারে যজ্ঞ করিব'— এইরূপ সংকল্প, মন্ত্ৰ অর্থাৎ অনুষ্ঠানপ্রকার ॥ ২৬ ॥

গতয়ো মতয়শ্চৈব প্রায়শ্চিত্তং সমর্পণম্ ।

পুরুষাবয়বৈরেতে সন্তারাঃ সন্তৃতাময়া ॥ ২৭ ॥

বিষ্ণুক্রমাদিগতি, দেবতাদ্যানাди মতি, প্রায়শ্চিত্ত, কৰ্ম্মমূহের ভগবানে সমর্পণ, এই সকল নিত্য-সিদ্ধ যজ্ঞসন্তার সেই পুরুষের দেহ হইতে আমা-কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

ইতি সন্তৃতসন্তারঃ পুরুষাবয়বৈরহম্ ।

তমেব পুরুষং যজ্ঞং তেনৈবায়জমীশ্বরম্ ॥ ২৮ ॥

এইরূপে সেই পুরুষের অবয়ব দ্বারা যজ্ঞসন্তার সম্পাদন করিয়া তাহা দ্বারাই আমি যজ্ঞেশ্বর পুরুষের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়াছি ॥ ২৮ ॥

ততস্তে ভ্রাতর ঈমে প্রজানাং পতয়ো নব ।

অযজন্ ব্যাক্তমব্যাক্তং পুরুষং সুসমাহিতাঃ ॥ ২৯ ॥

হে নারদ, তদনন্তর প্রজাসমূহের পতি মরীচি প্রভৃতি তোমার নয়জন ভ্রাতা সুসমাহিত হইয়া ইন্দ্রাদিরূপে ব্যাক্ত এবং স্বতঃ অব্যাক্ত পুরুষের যজ্ঞ করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

ততশ্চ মনবঃ কালে ঈজিরে ঋষয়োহপরে ।

পিতরো বিবুধা দৈত্যা মনুষ্যাঃ ক্রতুভির্বিভূম্ ॥ ৩০ ॥

তারপর মানবগণ স্ব স্ব অবসরে এবং অপর ঋষিবৃন্দ, পিতৃগণ, দেববৃন্দ, দৈত্যসকল, মনুষ্যসমূহ সেই পরমেশ্বরকে যজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করেন ॥ ৩০ ॥

সেবাপর নাম

বস্তুর সংজ্ঞাকে ‘নাম’ কহে। যিনি বস্তুর সংজ্ঞা প্রদান করেন, তিনি ‘নাম-প্রদাতা’। যেখানে জড়ের অহঙ্কার প্রবল, সেইখানেই সেবার পরিবর্তে ভোক্তৃত্ব বর্তমান। সাধারণতঃ নাস্তিক গৃহস্থ-সমাজে নামকরণ-কালে প্রাকৃতভাবে প্রমত্ত হইয়া ভোক্তা পিতা পুত্রের নামকরণ করেন। সেজন্ত, পারমাণ্বিক সমাজে নিরীশ্বর-পিতৃদত্ত নামব্যতীত কৃষ্ণদাস্তমূলক নাম দিবার ব্যবস্থা আছে। যাহারা ভগবৎসেবাপর নহেন, তাহারা ভগবৎসেবাপর নামে তাঁহাদিগের বশ্য-দিগের নামকরণ করেন না; সেজন্তই নাস্তিক সমাজের নাম পরিহারপূর্বক পারমাণ্বিক সমাজে হরিদাস্তপর ‘নাম’ প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে। যেখানে গুরুদেবের নিকট অথবা বৈষ্ণবকুলে অবৈষ্ণব-পরিচয়াকাজক্ষী উপস্থিত হন, সেই সময়ই শ্রীগুরুদেব অথবা ভাগবতগণ জীবের স্বরূপ-নির্দ্ধারক স্থায়ী চিহ্ন-নাম প্রদান করেন। ইহাই কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবাধিকার। যাহারা কনিষ্ঠাধিকার লাভ করেন, তাঁহাদিগেরই চতুর্থ সংস্কার ‘মন্ত্র’ প্রদত্ত হয়। মন্ত্রের প্রয়োগকেই পঞ্চম সংস্কার ‘যোগ’ বা ‘যোগ’ বলে। দীক্ষিত হইবার প্রথম স্তরে কনিষ্ঠাধিকারে আদি সংস্কার ‘তাপ’ বলিয়া অভিহিত হয়।

বিষ্ণুর চতুর্বিধ অস্ত্র—শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মদ্বারা বৈষ্ণবের শরীরে ‘তাপ’ প্রদত্ত হয়। এই চতুর্বিধ অস্ত্রে সুসজ্জিত হইলেই জীব আপনার বাহ্য শরীরকে অবৈষ্ণবতা-নির্মূলনের অস্ত্রসমূহে সুসজ্জিত করেন। তখন তাঁহার বৈষ্ণব-শরীরেই দ্বাদশটী হরিমন্দির অঙ্কনের যোগ্যতা হয়। ইহাই জীবের দ্বিতীয় সংস্কার অর্থাৎ কনিষ্ঠাধিকারে মধ্যম সংস্কার। কনিষ্ঠাধিকারের উন্নত সংস্কারে আমরা পাই যে, বাহ্য শরীরে বিষ্ণুদাসাভিমান ব্যতীত জীবের বস্তু-সংজ্ঞায় ভগবদাস্ত-বোধের আবশ্যকতা আছে। ইহাই তৃতীয় সংস্কার। এই তিনটী সংস্কারে সংস্কৃত হইলে জীবের বাহ্য পরিচয়ে বিষ্ণুদাস জানিতে ও জানাইতে আর কোন বাধা থাকে না।

বাহ্যজগৎ ব্যতীত অন্তর্জগৎ মন নানা বহির্মুখী প্রবৃত্তি লইয়া বাহ্যচিহ্ন-ধারণের সময় সময় অপব্যবহারও করিতে পারে। কেবল বাহিরে শঙ্খ-চক্রাদি তপ্তমুদ্রা-ধারণ, উর্দ্ধপৃষ্ঠ হরিমন্দিরাদি চিহ্ন-ধারণ অথবা আত্মবোধক শব্দাত্ম হরিদাস্তপর নাম—এই তিন প্রকার সংস্কার লাভ করিয়াও বাহ্য-

জগতের ভোগবুদ্ধিতে কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব মানসিক চাঞ্চল্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান না। মনশ্চাঞ্চল্য হইতে মুক্ত হইতে হইলে বিষ্ণুর দাস্ত্র মনকে নিযুক্ত করিতে হয়।

শ্রীভগবানের সেবায় মনকে নিযুক্ত করিতে হইলে সৰ্ব্বাঙ্গে আত্মসমর্পণের আবশ্যক অর্থাৎ শরণাগতির অভাব হইলেই জীব জড়জগতের ভোক্তা হইয়া পড়ে ; এজহু চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্কারে দেহ ও মন ভগবৎসেবাপর হইবার যোগ্যতা লাভ করে। তখন তাপাদি পঞ্চসংস্কারী হইয়া নবেজ্যা কষ্যে দেহ ও মনকে নিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ-জীবনের সার্থকতারূপ পঞ্চার্থ-তত্ত্ববিজ্ঞায় উত্তমাধিকারী পারদ্রুত হন। সেইকালেই তিনি বহির্মুখ জীবকে কনিষ্ঠাধিকার ও মধ্যমাধিকারে প্রবেশাধিকার দিতে সমর্থ। যদিও ভগবদ্ভজন-মার্গ বা ভাব-মার্গ হইতে এই ত্রিবিধ অধিকারের অর্চন-মার্গের পার্থক্য আছে, তাহা হইলেও বহিঃপ্রজ্ঞা-বিশিষ্ট জীবের অধিরোহ-পথে ইহাই গুরুর দাস্ত্র। যেখানে গুরুদাস্ত্র প্রবল, তথায় অধিরোহ-বাদের প্রবলতা নাই। সেখানে বিষ্ণুর অবতার ও বৈষ্ণবাবতার শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ চতুর্দশ ভুবনে ভ্রমণ-পরায়ণ পথিকের পূজনীয় ও সেব্য বস্তুরূপে প্রতিভাত হন। ভগবদ্ভজন-মার্গে যে ত্রিবিধ অধিকারের কথা শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, তাহা এই বৈধ বা অর্চন-মার্গের বিরোধী না হইলেও তাহার ইহা হইতে ন্যূনাধিক স্ততন্ত্রতা আছে। শাস্ত্রীয় বিধিমাৰ্গ অনধিকারীকে অধিকার প্রদান করে। অধিকারীর উচ্চাবচ-নির্ণয় ভাব-মার্গের ত্রিবিধকার। যাহারা “ভক্তিসন্দর্ভ” স্বর্নুভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই এই প্রকৃষ্ট সত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ।

ভগবদ্ভক্তিরাজ্যে প্রবেশার্থীর প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে, সৰ্ব্বাঙ্গে তাঁহার তিনটি সংস্কারের আবশ্যকতা আছে। সৰ্ব্বাঙ্গে বাহিরের পরিচয়, পরে অন্তরের পরিচয়। বাহিরের পরিচয়কেই অর্চন-মার্গে কনিষ্ঠাধিকার কহে। আর অর্চন-মার্গে ভিতরের পরিচয়ে মধ্যমাধিকার, কনিষ্ঠাধিকারের অতিরিক্ত ‘মন্ত্র ও ‘যোগ’-সমৃদ্ধ। আজ-কাল ‘না-পড়িয়া’ পণ্ডিত-সম্প্রদায়ে ‘পরমার্থ’ শব্দটিকে গৌড়ীয় অনর্থের অত্মতম জ্ঞানে যেক্রপ অর্কাচীনের স্থায় কটাক্ষ করিতে দেখা যায়, তাহা তাঁহাদের নিতান্ত অজ্ঞতা-বিজ্ঞাপক চেষ্টা মাত্র। গোড়দেশে পারমার্থিক-সমাজের মধ্যে দিন দিন অনভিজ্ঞতার একরূপ আদর বাড়িয়াছে যে, দীক্ষার চতুর্থ সংস্কারের পূর্বে আর তিনটি সংস্কারের প্রতি কোন দৃষ্টিই নাই।

গৌড়ীয় ‘আচার্য্য’ নামধারিগণের অনেকেরই কেবল কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার প্রতি স্মৃতির দৃষ্টি আছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সমাজ-হিতৈষণার পরিবর্তে নিজের অর্থগুরুতা, প্রতিষ্ঠাশাপ্রিয়তা ও ইন্দ্রিয়-তর্পণকেই কৃষ্ণপ্রেমার আয় অত্যাচ্ছ স্থান প্রদান করিয়াছেন। আমরা এই শ্রেণীর অনভিজ্ঞগণকে দূর হইতে সম্মান করিতেছি এবং তারস্বরে দন্তে তৃণ ধারণপূর্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে অমুরাগবিশিষ্ট হইবার জন্ত তাঁহাদের পদযুগল ধারণ করিতেছি। তাঁহারা দয়া করিয়া একবার শ্রীজীবগোস্বামি-লিখিত “ভক্তি সন্দর্ভ” আলোচনা করুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, তাঁহারা যে পথ চলিতেছেন তাহাকে গৌড়ীয়গণ অস্তিত্বের পথ বা লৌকিক স্মার্তাচার বলেন। এইরূপ অনভিজ্ঞসম্প্রদায় যে গৌড়দেশবাসীর শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা কথায় কথায় বলিয়া ফেলেন যে, পারমাথিক গুরুগণ কেন শিষ্যগণকে তৃতীয় সংস্কার সেবাপর ‘নাম’ প্রদান করেন— উহাতে যে ‘তৃণাদপি’ শ্লোক মারা পড়িয়া যায়? দুর্ভাগ্য বর্ত্তমান আচার্য্য-নামধারিগণ! তোমরা না বুঝিয়া বলিতে পার, এমন কুভাষা অভিধানে আজ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই! সুতরাং তোমাদের নিকট শাস্ত্রীয় কথা হার মানিয়াছে! এখানে একটি গল্প না বলিয়া থাকিতে পারা গেল না।

কোন নিম্নবর্ণের সমাজের কতিপয় সামাজিক, পুরোহিতবর্গ ভাল করিয়া লেখাপড়া করেন না জানিয়া তাহাদের পুরোহিত সম্প্রদায়ের কোন ব্রাহ্মণ-বটুকে ভট্টপল্লীতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্ত প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মণ-ছাত্রটির যাবতীয় ব্যয়ভার সামাজিকগণ বহন করিতে থাকেন। ছাত্রটি প্রচুর পরিমাণে সাহায্য লাভ করিয়া পাঠাদিতে নিতান্ত উদাসীন হইয়া কলিকাতায় গিয়া নানা আমোদ-প্রমোদে সাহায্য-প্রাপ্ত অর্থ অবাধে ব্যয় করিতে থাকে। বহুদিন এইরূপে অতিবাহিত করিয়া সাহায্য-দাতৃগণের নিকট অবশেষে প্রত্যাগমন করিয়া ছাত্রটি স্বীয় বিদ্যাবস্তার পরিচয় দিতে থাকে। নিতান্ত নিম্নকুলের সামাজিকগণও তাঁহাদের কৃপাপ্রাপ্ত অর্থে স্নানিগ্নিত ছাত্রটিকে পাইয়া তাহাকে বিশেষ গৌরবের ও স্নানার বস্তু বলিয়া জাহির করিতে থাকিলেন। তাঁহাদের ভিতর একটি সংস্কৃত-শাস্ত্রকুশল পণ্ডিত ছাত্রটিকে পরীক্ষা করিবার জন্ত তাহার নিকট উপস্থিত হন এবং বহুলোকের সমক্ষে তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সংস্কৃত ভাষায়ই উত্তর আশা করেন। ‘কথং’ প্রশ্ন

শ্রবণ করিয়া সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রটী সাহায্যদাতৃমণ্ডলীর সমক্ষে নিজ প্রতিভা জ্ঞাপন করিবার জন্য ‘স্বং, গং, হং’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘শং, যং, সং, হং, ক্ষং’ পর্য্যন্ত সবগুলিই উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া ফেলিল। সাহায্যদাতৃগণ শ্রুতমণ্ডিত যুবক ছাত্রটির অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া পরম পুলকিত! তখন সংস্কৃতবিৎ পাণ্ডুতটী অনন্তোপায় হইয়া ছাত্রের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহার শ্রুত-বহুল চিবুক হইতে একটি কেশ ভিক্ষা করিলেন। এতদর্শনে উপস্থিত সেই নিম্নজাতীয় সকলেই ভট্টপল্লী হইতে প্রত্যাগত ‘গহীর-পণ্ডিত ছাত্রটির’ চিবুক হইতে যাবতীয় শ্রুতরাশি উৎপাটন করিয়া লইলেন। তাহাতেই ছাত্রটী উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইল।

আজকাল অনেকেই পরমার্থ-শাস্ত্রের উপদেশক-সজ্জায় এই প্রকার অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের অনাভিজ্ঞতার জন্য উপযুক্ত শাস্তিই পাইয়া থাকেন অর্থাৎ লোক-নিন্দিত হন। পারমার্থিক শাস্ত্রের অধ্যাপক বলিলেই লোকে তাঁহাকে মহর্ষি অত্রি-নির্দিষ্ট মুখ অসমর্থ বলিয়াই জানেন—

বৈদৈর্ঘ্যহীনাস্ত পঠন্তি শাস্ত্রং

শাস্ত্রং হীনাস্ত পুরাণ-পাঠাঃ।

পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্ত

অষ্টান্ততো ভাগবতা ভবন্তি ॥

আমরা গোড়দেশবাসী পারমার্থিক আচার্য্যবৃন্দের শাস্ত্র-দর্শনের ভ্রম ও তাঁহাদের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তারের জন্য যে সকল অহুষ্ঠান আরম্ভ করিয়াছি, তাহা তাঁহাদের অবিদ্যা-পিণ্ডোপতপ্ত রসনায় মৎস্যগন্ধিকা (মিছরি) সদৃশ। উহা তাঁহারা এখন আদর করিতেছেন না বটে কিন্তু কালে তাঁহারা উহারই আদর করিতে শিখিবেন। যদি তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তৃতীয় ‘নাম’ সংস্কারের কথা শুনিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে আর বর্তমান কালে বিদ্যারত্নোপাধিবাহী একখানা সাময়িক পত্রের জনৈক মুখোপাধ্যায় সম্পাদক ‘ভক্তিসারঙ্গ’ উপাধি লইয়া অনভিজ্ঞের তায় কংসবণিকের ব্যবসায়-রহস্তে প্রমত্ত হইতেন না। ‘মকুভূমি’র তায় বেনামী চিঠি ও বেনামী পত্রে ‘ভূতক পাঠক-সম্প্রদায়’ সেবাপর-নাগকেই নিজ নিজ অনভিজ্ঞ লেখনী-শরে বিদ্ধ করিতেন না। এই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রদর্শনাত্মক তাঁহাদিগকে কেবল যে অন্ধ করিয়াছে, এরূপ নয়, তমঃপ্রবৃত্তিগলে ভক্তিরহস্তকে

কলুষিত করিয়া একজন ‘ক্রেস্কোগ্রাফে’ গাপিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। অপর জন নিজ শকার্যবোধের অভাব জানাইতে গিয়া কতকগুলি বাত্মন্থের সহিত সেবাচিহ্নের সংযোগ করাইয়াছেন। এইরূপ জ্ঞানের সংকীর্ণতা আজকাল ভূতক-বক্তার ও বঙ্গীয় পত্রের ‘সব্জান্তা’ সম্পাদকের ধূর গ্রহণ করিয়াছে। আমরা ইহাদের পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় বিস্মিত হইয়াছি।

শ্রীধরস্বামী শ্রীভাগবত-টীকায় “সারঙ্গ” শব্দের অর্থ ভক্ত এবং অভিজ্ঞ বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-সঙ্কলিত বাঙ্গালা অভিধানে ২৭ প্রকার বিভিন্ন অর্থের মধ্যে “সারঙ্গ” শব্দে বাত্মন্থকেও অঙ্গীভূত করিয়াছেন। ‘বাচস্পত্য’ ও ‘শব্দকল্পদ্রুম’ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কোষগুলিতেও অনেক প্রকার অর্থ লিখিত আছে।

কনিষ্ঠাধিকারের তৃতীয়-সংস্কার অব্যর্থ ‘নাম’, যাহা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব প্রদান করেন, তাহাও বাল-চাপল্যে পরিণত হইতেছে দেখিয়া আমরা হতস্তিত। কলির ধর্ম-বর্ণনে আয়ু, বিদ্যা ও প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির অভাব হইবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর এমনটী সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। “নাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়!” এইরূপ একটী কিস্কদন্তি যেদেশে প্রচলিত আছে সেদেশে সকলেই সঙ্কটতার আদর্শ, সুতরাং এই সকল কথা উপেক্ষা করিবার প্রচুর পরিমাণে যোগ্যতা সত্ত্বেও লোকহিতের জন্য অমুরুদ্ধ হইয়া এত কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। আজ-কালকার দিনে শাস্ত্রীয় সংস্কারসমূহ উপেক্ষা করাই কচির অনুকূল হইয়াছে। সেটী কচিবশে ভক্তির অনুষ্ঠানগুলিকে উপেক্ষা করা নব্য-বঙ্গীয় যুবকগণের নৈসর্গিক প্রবৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রমশঃ তাঁহাদের বিচারটী এরূপ কলুষিত হইয়াছে যে, প্রতিষ্ঠাশা-পরায়ণ ব্যক্তিগণ যেরূপ আপনাদিগের জড়-উপাধি লইয়া ব্যস্ত থাকেন, সেবাপর নামগুলিকেও তাঁহারা তদ্রূপ অহঙ্কার-গ্রস্ত জড়োপাধিমাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন, বস্তুতঃ জড়-উপাধি ও সেবাপর নামের মধ্যে ভাবের সম্পূর্ণ বৈপরীত্য অবস্থিত। জড়-উপাধিগুলি বলদর্পের উত্তেজক, আর ভক্তিসূচক সেবাপর নামগুলি জড়-রূপের ‘তৃণাদপি স্নীচতা’-জ্ঞাপক। পাঠক! এ বিষয় চিন্তা করুন, ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রমোত্তর

(ঐতিহ্য)

৯। শ্রীমন্নহাপ্রভুর সমসাময়িক ও পরবর্ত্তিকালে কোন্ কোন্ পার্শ্বদ-ভক্ত তদীয় মনোহরীষ্ট প্রচারণ করেন ?

“চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও অবৈতের সাহায্যে রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথদ্বয়, রামানন্দ, স্বরূপ ও সাক্ষভোগ প্রভৃতির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সম্বন্ধ-তত্ত্ব স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অভিধেয়-তত্ত্বে কীর্তনের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করত কার্য সংক্ষেপ করিয়াছেন এবং প্রয়োজন তত্ত্বে ব্রজরস আশ্বাদন করিবার অত্যন্ত সরল উপায় নির্দিষ্ট করিয়াছেন।”

—‘উপক্রমণিকা’ কৃঃ সং

১০। মনোহরসাহী, গরাণহাটি ও রেণেটি—এই তিনটি গান-পদ্ধতির ইতিহাস কি ?

“শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য কাটোয়া প্রদেশ উজ্জল করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদেশটি মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রাপ্তিত গান-পদ্ধতির নাম—‘মনোহরসাহী’ গান। শ্রীনরোত্তম দাস—রাজসাহী জেলার গরাণহাটি বা গড়েরহাট পরগণার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামের অধিবাসী। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রাপ্তিত গান-পদ্ধতির নাম—‘গরাণহাটি’-গান। শ্রীশ্যামানন্দ মেদিনীপুর জেলার লোক। তাঁহার প্রাপ্তিত গীত-পদ্ধতিকে ‘রেণেটি’ গান বলা যায়। শ্রীজীব গোস্বামী গান্যচার্য্যদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য শ্রীনিবাসাচার্য্যকে ‘প্রভু’-পদ, শ্রীনরোত্তমদাসকে ‘ঠাকুর’-পদ এবং শ্রীশ্যামানন্দকে ‘প্রভু’-পদ দিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী—পরমোদার-স্বভাব ও গুণগ্রাহী। আচার্য্য-প্রভু—ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে প্রভু-পদ দেওয়ার কোনও আপত্তি ছিল না।” —‘সিদ্ধান্তবন্ধ ও রসাতাস’, সং. তোঃ ৬২

১১। মালাধর বসু গুণরাজ খাঁনের ইতিবৃত্ত কি ?

“আদি-কবি গুণরাজ খাঁন মহাশয় তেরশত পঁচানব্বই শকাব্দায় ‘শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়’ গ্রন্থ-প্রণয়নে নিযুক্ত হন এবং চৌদ্দশত দুইশকাব্দায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন। ইহার পূর্বে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি ঠাকুর বঙ্গভাষায় কিছু কিছু রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কোন কাব্য রচনা করেন নাই। তাঁহাদের রচিত কতকগুলি অসংলগ্ন গীত-মাত্র আমরা দেখিতে পাই। চৌদ্দশত শকের পূর্বে রচিত কোন বঙ্গভাষার কাব্য আমাদের চক্ষুগোচর

হয় নাই। বিলাতী লোকেরা যেক্রপ চসারুকে মান্ত করেন, আমরা কাব্য-সম্বন্ধে ইঁহাকে (গুণরাজ খাঁকে) তদ্রূপ মান্ত করি। এই পুস্তকের অভাব থাকিলে কোন বঙ্গীয় পুস্তকালয়কে সম্পূর্ণ বলা যাইতে পারে না। আধিকন্তু এই গ্রন্থ পারমাথিক লোকদিগের পক্ষে পরম আদরণীয়। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য পূজ্যপাদ শ্রীগুণরাজ খাঁন মহাশয় সর্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের দশম-একাদশ স্কন্ধের সাধারণের আদরণীয় অনুবাদরূপে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন এই গ্রন্থের যে কি মাহাত্ম্য, তাহা এই ক্ষুদ্র উপক্রমণিকায় আমরা বলিতে পারি না। বৈষ্ণব-জগতে এই গ্রন্থখানি সর্বত্র পূজনীয়। যে-গ্রন্থ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়) পাঠ করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, সে-গ্রন্থ গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে যে কত আদর লাভ করিবে, তাহা আমাদের বলা বাহুল্য।

বঙ্গীয় সম্রাট আদিশূর বৌদ্ধধর্ম-দূষিত বঙ্গদেশে আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাদি না দেখিতে পাইয়া কাণ্ডকুজ হইতে পাঁচটি সুব্রাহ্মণ ও পাঁচটি সুকায়স্থ আনয়ন করেন। সেই পঞ্চজন কায়স্থের মধ্যে সুনভ্য ও সরলমতি দশরথ বসু মহাশয় গোড়দেশে আসিয়া ছিলেন। তাঁহারই বংশের ত্রয়োদশ পর্যায়ে শ্রীগুণরাজ খাঁন উৎপন্ন হন। ইঁহার প্রকৃত নাম—শ্রীমালাধর বসু, গোড়ীয়-সম্রাট দত্ত উপাধি—‘গুণরাজ খাঁন’। ইঁহার চৌদ্দটি পুত্র। তন্মধ্যে দ্বিতীয় লক্ষ্মীনাথ বসু, উপাধি—সতারাজ খাঁন। তস্ত-পুত্র শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পার্শদ শ্রীরামানন্দ বসু। রামানন্দ বসু—পঞ্চদশ পর্যায়। ১২৯২ সালের শীতকালে আমরা শ্রীকুলীন-গ্রাম-পাটে বিশেষ অনুসন্ধান-পূর্বক বসু মহাশয়দিগের বাটী হইতে এই কুলজী সংগ্রহ করিয়াছি। তথায় জানিতে পারলাম যে শ্রীমালাধর বসু মহাশয় অতি প্রসিদ্ধ দনশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার গড় ও দেওয়াল্যাদি দর্শন করিলে বোধ হয় যে, তাঁহার রাজশ্রী অতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী ছিলেন।— ‘উপক্রমণিকা’, শ্রীকৃষ্ণ বিঃ

১২। অতিবাড়ী-সম্প্রদায় ও বিষ্ণুকিষণের ইতিহাস কি?

উড়িষ্যায় জগন্নাথের একটা দল আছে। তাহারা অতিবাড়ী। শুনা আছে যে, জগন্নাথ প্রথমে মহাপ্রভুর আজায় হরিদাস ঠাকুরের চেলা হয়। পরে শুদ্ধভক্তি ছাড়িয়া মায়াবাদ আশ্রয় করায় মহাপ্রভু তাহাকে ‘অতিবাড়ী’ বলিয়া ত্যাগ করেন। অতিবাড়ীর দল বঙ্গদেশের বাউন-দলের ন্যায় প্রচলিত ও বিস্তৃত। ঐ দলের কতকগুলি জালপুঁথি

আছে। তাহাতে লেখা আছে যে, চৈতন্য আবার প্রকাশ হ'বেন। সেই অহিলায় কএকজন ছুটে লোক কেহ চৈতন্য, কেহ ব্রহ্মা, কেহ বলদেব, কেহ কৃষ্ণ,—একপ উদয় হইতে লাগিল। বিষকিষণ নামক একজন খণ্ডায়েৎ কিছু যোগবল লাভ করিয়া আপনাকে মহাবিষ্ণু বলিয়া প্রকাশ করিল। সর্দাইপুরের চটির এক ক্রোশ অন্তরে একটি জঙ্গলে সে আপন দলবল লইয়া মন্দির সংস্থাপন করিতে লাগিল। অতিবাড়ীদের মালিকাতে লেখা ছিল,—‘মহাবিষ্ণু বিষকিষণ গুপ্তরে আছি না হ জানে আন, ১৪ই চৈত্ররে রণ হব।’ তখন মহাবিষ্ণু চতুভুজ দেখাংবেন। এই কথার প্রচার হইলে অনেক ব্রাহ্মণ-শাসন হইতে ব্রাহ্মণীসকল তাহার সেবা করিতে আসিত। ভূঙ্গারপুরের চৌধুরীর রমণীদের কোন বিভ্রাট হওয়ায় তথাকার পুরুষগণ কমিশনার রেভেন্স সাহেবকে জানায়। ওয়ালটন সাহেব আমাকে পাঠাইলে আমি রাত্রিযোগে সেই জঙ্গলে গিয়া মহাবিষ্ণুর (?) সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তাহার ইংরাজ-রাজত্ব ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা বাহির করিলাম। * * * পুরা গিয়া মহাবিষ্ণুর (?) বিচার আদালত হইল। অনেকদিন বিচারের পর আমি তাহাকে দেড় বৎসরের কয়েদ দিলাম। তাহার জটা কাটা গেলে তাহার উপাসকগণ তাহাকে প্রতারক বলিয়া ছাড়িয়া গেল।” —ঠাকুরের আশ্রচারত

১০। শ্রীগৌর-জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর-সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদ স্বল্লাকাবে কি তথ্য প্রদান করিয়া ছ?

“শ্রীচৈঃ ৩ ভাগবত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ দৃষ্টি-পূর্বক অনুসন্ধান কার্যে আমরা প্রভুর অনেক লীলা-স্থান নির্দেশ করিয়াছি। সেই সমস্ত ব্যবরণ ভক্তবৃন্দের সুখরুদ্ধর নিমিত্ত আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করবার সংকল্প করিয়াছি। সর্বপ্রথমে আমরা মহাপ্রভুর পল্লীর স্থানটি নির্দেশ করিতেছি। * * * শ্রীকবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন যে, নবদ্বীপধাম শ্রীগঙ্গাদেবীর দ্বারা পরিবৃত। তন্ত্বেও এই কথা লেখা আছে। খাড়ায়া বলিয়া যে নদী গোয়াড়ির নিকট দিয়া স্বরূপগঞ্জের নিকট ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে, তাহার নাম বাগ্‌দেবী বা জলঙ্গী। অতি পূর্বে বাগ্‌দেবী হরিশপুরের নিকট মন্দাকিনীকে আশ্রয় করিয়া দেবপল্লীর নিকট দিয়া ভালুকা নামক নগর স্পর্শ করত গোয়ালপাড়া গ্রামের নিকট ভাগীরথীতে পড়িতেন। গঙ্গাদেবীর মন্দাকিনী-স্রোতঃ যখন শুষ্ক হইয়া গেল, তখন বাগ্‌দেবী

মায়াপুরের এক পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রাপ্ত হইলেন। বাগ্‌দেবীর ভাগীরথী প্রাপ্তিকালে শ্রীমায়াপুরের অনেক অংশ বিনষ্টপ্রায় হইয়া যায়। সেই সময় ভগ্নগৃহ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ শ্রীপ্রোঢ়ামায়া ও বুদ্ধ-শিব লইয়া কুলিয়া গ্রামের চরে নূতন গ্রাম পত্তন করেন। সেই নূতন গ্রামই বর্তমান নবদ্বীপ-নগর। নূতন গ্রামে মহাপ্রভুর লীলাস্থান কিছুই নাই। স্থানটী নবদ্বীপান্তর্গত বৃন্দাবনের পুলিন। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থে যে মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে দেখিবেন যে, একটি মধ্যবর্তী চক্র আছে। সেই চক্রস্থ সমস্ত ভূমি অন্তর্দ্বীপ, স্বল্প স্বল্প দুই খণ্ড ভূমি ভাগীরথীর অপব পারে পড়িয়াছে। * * সেই মায়াপুর-গ্রামেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সময় ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর নিবাস-ভূমি ছিল, বাগ্‌দেবীর আক্রমণে প্রায় লণ্ড-ভণ্ড হইয়া গিয়াছে। মায়াপুরের একাংশে মাত্র নর-নিবাস আছে। ঐ অংশটি বল্লালদীঘীর দক্ষিণ কোণ। * * আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া এবং কোনপ্রকার গোপ্য ইঙ্গিত-অনুসারে তৎকালিক গঙ্গাতীর স্থির করিতে পারিয়াছি। মায়াপুরের দক্ষিণাংশে যে খড়্‌গন পরিলক্ষিত হয়, তৎসমীপে ‘শিবের ডোবা’ নামক একটি দীর্ঘ জলধারা এখনও প্রবাহিত আছে। ঐ জলধারার তীরে দাঁড়াইয়া গঙ্গানগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, একটি নদী-তীর-প্রায় ভূমি মায়াপুরের একান্ত হইয়া গঙ্গানগর অভিমুখে গিয়াছে। * * বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের কৃত আদিকীর্তন-বর্ণনে যে ভূচিত্র প্রাপ্ত হই, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখি—

গঙ্গা-তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায় ।
 আগে সেই পথে নাহি যায় গৌররায় ॥
 আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি ।
 তবে মাধাইর ঘাটে, গেলা গৌরহরি ।
 বারকোণা ঘাটে নাগরিয়া ঘাটে গিয়া ।
 গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া ॥

এখন এই পর্য্যন্ত বক্তব্য যে, তীর ভূমি দিয়া চলিলে বারকোণা-ঘাট ও নাগরিয়া-ঘাটের স্থানটী অদিক দূর নয়। নাগরিয়া-ঘাটটী পূর্ব-নদীয়া-নগরের প্রধান-বাজারের নিকটে ছিল, সেই বাজার বল্লালদীঘীর একটু পশ্চিমাংশে ছিল এই সকল কথা ভাবিয়া শ্রীশ্রীমায়াপুর এবং মহাপ্রভুর জন্ম ও লীলা-স্থানগুলি অনুসন্ধান করিলে ভক্তবৃন্দ অবশ্যই তাহা পাইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কুলিয়ার চরবাসী আখড়াধারী বৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে জানিতে কিছুমাত্র যত্ন করেন না। তজ্জন্তই ভক্ত-যাত্রিগণেব এত দুর্ভাগ্য।”

—‘শ্রীনবদ্বীপধাম’, বিঃ পঃ

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

স্বাধীনতা

আশা মোর গিয়াছে ভাঙ্গিয়া !

নিশার স্বপন সম

অলীক মুখের গগ

দিনে দিনে যেতেছে সরিয়া ॥

কৌমার-ক্রীড়া-কৌতুক

পুনঃ না দেখায় মুখ,

ভাবি মনে—কোথা গেল তারা ।

কৈশোর-যতন কত

রচিত স্মৃতিবিষ্ময়,

এবে কেহ নাহি দেয় সাড়া ॥

নবীন যৌবন এল,—

পত্রসম ঝরি' গেল

বৃন্তচিহ্ন শুধু গেল রাখি ।

প্রৌঢ়-মধ্যস্থলে বাস'

সতত চিন্তায় ভাসি,

দেখি বান্ধকের রক্ত-আঁখি ॥

নাহি পারি বোধিবারে

এই সব অবস্থারে,

তবু কহি,—আমরা স্বাধীন ।

অনিচ্ছায় অনুক্ষণ

জন্মে জন্মে জীবগণ

পরাধীন, নহে ত স্বাধীন ॥

স্বাধীনতা মিথ্যাকথা,

স্বাধীনতা নাহি হেথা,

সকলে অনাদি কালধীন ।

কালধীনের বীরত্ব

মায়াবানীর কর্তৃত্ব, —

সুধী তারে বলে না স্বাধীন ॥

তারে বলি স্বাধীনতা

কালাতীত যে অবস্থা,

কোন্ ব্যক্তি হেন কালজয়ী ?

দেহ-মন-বুদ্ধি-বলে

না সম্ভবে কোন কালে

রাবণ, 'কশিপু কালশায়ী ॥

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট

কালবশে হল কাৎ

হিটলার ধরাতলে ম'ল ।

“হাতী ঘোড়া গেল তল ভেড়া বলে কত জল”

স্ত্রৈণ সবে এবে বীর হ'ল ॥

ভারতীয় বীরগণ !

করহ অবলোকন

তব পূর্বপুরুষের দিকে ।

ভীষ্ম ছিল মহাবীর

শরশয্যাতেও স্থির

মতি ছিল নিত্যবস্তুচীতে ॥

নিত্য-বস্তু-ধ্যাতাগণ

কালক্ষোভ্য কভু ন'ন,

কালাতীত শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস ।

তথা নাহি কাল-ধর্ম—

ধ্বংসাদি অনিত্য কর্ম,

স্বাধীনতা সর্বত্র প্রকাশ ॥

—শ্রীসুদর্শন ব্রহ্মচারী, ব্যাকরণতীর্থ

রাজর্ষি রুক্মাঙ্গদ (২)

রাজা রুক্মাঙ্গদ মনুষ্যলোকে পীতাম্বরধারী শ্রীহরির আরাধনাতে নিযুক্ত থাকিয়া যমলোক-মার্গ শূন্য করিয়া দিয়াছিলেন। একাদশী-ব্রতপ্রভাবে কোন প্রজাকে যমপুরীতে যাইতে হইত না। অতঃপর উপযুক্ত সময়ে পুত্র ধর্ম্মাঙ্গদকে বলিলেন, “বৎস ! তুমি এক্ষণে ধর্ম্মের উপর দৃঢ়তা রাখিয়া রাজ্য-পালনভার গ্রহণ কর। পুত্র উপযুক্ত হইলে যে-রাজা পুত্রকে রাজ্য না দেয়, তাহার ধর্ম্ম ও কীর্তির হানি হয়। নিজ শক্তিশালী পুত্রদ্বারা যদি পিতা স্মৃতি না হয়, সে-পুত্রকে ত্রিভুবনমধ্যে পাতকী জানিতে হইবে। পিতার ভার হান্ধা করিবার যোগ্যতা থাকিতে যে-পুত্র তাহা না করে, সে পিতা-মাতার মলমূত্র-তুল্য। তাহার জন্মগ্রহণ করা বৃথা মাত্র। যে-পুত্র পিতা-অপেক্ষা অনেক বেশী খ্যাতি লাভ করিতে পারে, সেই পুত্র যোগ্য। যদি পুত্রের অত্যাশ্রয় কর্ম্মজন্ম দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া পিতার দৃষ্টিস্তায় নিদ্রা না হয়, তবে পুত্রকে এক কল্পকাল নরক ভোগ করিতে হয়। যে-পুত্র পিতার প্রত্যেক আজ্ঞা পালন করে, সে দেবগণ-প্রশংসিত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। আমি

প্রজাপালনজ্ঞ নানাপ্রকার কর্মে আসক্ত ছিলাম। প্রজাপালনে নিযুক্ত থাকিয়া আমি আহার নিদ্রার জ্ঞও গ্রাহ্য করি নাই। আমি বিদ্বান্ ব্যক্তি-গণকে শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা আর মূর্খগণকে দণ্ড ভয় দেখাইয়া একাদশীতে উপবাস করাইয়াছি। কখনও কাহাকেও দুঃখ দেওয়া উচিত নহে। যে-রাজা প্রজাকে রক্ষা করে, তাহার অমর লোক প্রাপ্তি হয়। আমি সৰ্বদা প্রজাপালনে তৎপর ছিলাম। নিজ শরীরকে বিশ্রাম দিবার অবসরও থাকিত না। কখনও মদপান, জুয়াখেলা ইত্যাদিতে আমার দুর্কাসনা ছিল না। উহাতে আবদ্ধ হইলে রাজা শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। তোমার উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া আমি শিকারে গমন ইচ্ছা করি। সেই উপলক্ষে অনেক নদী বন পর্বতাদি দেখিতে পাইব”।

ধৰ্ম্মাঙ্গদ বলিলেন, “পিতঃ! আপনার রাজ্যভার আমি আজ হইতে নিজ মস্তকে গ্রহণ করিতেছি। আপনার আজ্ঞা পালন ব্যতীত আমার অন্ত কোন কৰ্ম্ম নাই। যে-পুত্র পিতৃ-আজ্ঞা পালন না করে, সে ধৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলেও নষ্ট হইবে”—এই বলিয়া ধৰ্ম্মাঙ্গদ ঘোড়হস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা তাহাতে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তখন ধৰ্ম্মাঙ্গদ প্রজাগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—“প্রজাগণ! আজ হইতে পিতৃদেব আমাকে আপনাদের পালন-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পিতৃ-আজ্ঞা পালন ব্যতীত পুত্রের অন্ত কোন ধৰ্ম্ম নাই। এখন আমি দণ্ডধারণ করিয়া রাজপদে স্থিত হইতেছি। আমার জীবন থাকিতে এখানে কখনও যমরাজের শাসন চলিবে না। ইহা বুঝিয়া আপনারা সকলে ভগবান গুরুদেবের স্মরণ এবং ভগবদর্পণ-বুদ্ধিতে সমস্ত কৰ্ম্ম করিতে থাকুন। ভোগের মমতা ত্যাগ করিয়া স্ব-স্ববর্ণবিহিত কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ভগবানের পূজা করিবেন। তদ্বারা অক্ষয়লোকপ্রাপ্তি হইবে। আমি পিতাপেক্ষা একটি অধিক মার্গ প্রদর্শন করিতেছি। একাদশীর দিন ভোজন না করার জ্ঞ পিতার আজ্ঞা ছিল, কিন্তু পরব্রহ্মে-নিষ্ঠাক্রমে বিশেষ মার্গ আমি আপনাদিগকে উপদেশ করিতেছি। ভস্তুবেত্তা ব্যক্তিকে এই মার্গ অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য”।

এই প্রকারে প্রজাগণকে অমুনয়পূর্বক আশ্বাস প্রদান করিয়া ভৎসালনে নিযুক্ত থাকিলেন। তিনি সমস্ত দিবারাত্রি কখনও শয়ন করিতেন না। নিজ বীৰ্য্যবলে পৃথিবীকে নিক্ষেপ করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র ভ্রমণ করিতেন। হস্তীপৃষ্ঠে ঢাকা প্রতাহ বাদিত করিয়া এই প্রকারে কর্তব্য পালনের

জন্ত নির্দেশ করিতেন,—“ভাই সব! একাদশীতে উপবাস করিয়া মমতারহিত হও এবং নানাপ্রকার কার্যের মধ্যে দেবেশ্বর শ্রীহরির চিন্তা কর। ভগবান্ যজ্ঞেশ্বরই যজ্ঞ এবং শ্রাদ্ধাদির ভোক্তা। তিনি সূর্য, আকাশ এবং সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ব্যাপ্ত আছেন। ধর্মার্থ কামাভিলাষী ব্যক্তিরও তাঁহারই চিন্তা করা কর্তব্য। সমস্ত কর্ম তাঁহার প্রসন্নার্থ অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে মেঘগর্জনের ত্যায় উচ্চরবে এইসকল কথা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দ্বারা ঢক্কাবাতে ঘোষণা করাইতে লাগিলেন। ধর্মাত্মদের পিতা যখন জানিতে পারিলেন যে, পুত্র তদপেক্ষা অধিক কর্তব্যপরায়ণ, তখন তিনি নিজ পত্নীকে বলিলেন, “সন্ধ্যারাগী! আমি ধন্য, তুমিও ধন্যা। এইরূপ উপযুক্ত পুত্রের জন্ত আমাদের কীর্তি চন্দ্রের ত্যায় উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। এখন আমি প্রসন্নতার সহিত শিকার করিতে বনে গমন করিব এবং সেই প্রসঙ্গে জনরক্ষার কার্য্যও করিব।”

সন্ধ্যারাগী বলিলেন, “রাজন্! আপনি পুত্রের উপর সপ্তদ্বীপের শালন-ভার দিয়া মৃগহিংসার পরিবর্তে যজ্ঞের দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা এবং দেবনদী গঙ্গার সেবা করুন। তাহাই আপনার ত্যায়োচিত কর্তব্য। কোন প্রাণীকে হিংসা করা উচিত নহে। জীবহিংসা ছয় প্রকার—যে অনুমোদন করে, যে হত্যা করে, যে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া পরে জীবকে নাশ করে, মাংসভোজন-কারী, মাংসপাক ও পরিবেশক। আমি এজন্ত আপনাকে হিংসাকার্য্যে বিরত হইতে অনুরোধ করি”। রাজা বলিলেন,—“দেবি! আমি জীবহত্যা করিব না। মৃগয়ার ছলে হাতে ধনুর্কাণ লইয়া বনে ভ্রমণ করিব এবং প্রজার কণ্টকস্বরূপ প্রাণীকে বধ করিব। জনপদে আমার পুত্র থাকিল আর আমি বনে থাকিব। হিংস্র ভল্ল ও লুণ্ঠনকারী ব্যক্তি হইতে প্রজাকে রক্ষা করাই রাজার কর্তব্য। নিজ শরীর অথবা পুত্রদ্বারা প্রজাকে রক্ষা করাই কর্তব্য। যে-রাজা প্রজাকে রক্ষা করে না, সে ধর্মাত্মা হইলেও ঘোর নরকে পতিত হয়। আমি হিংসাতাব ত্যাগ করিয়া প্রজারক্ষার্থ বনে যাইব”। অতঃপর রাজা রুক্মাঙ্গদ উত্তম বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া একশত আট যোজন ভূমি অতিক্রমপূর্বক মুনিগণের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

রাজা সেই আশ্রম মধ্যে মহর্ষি বামদেবের দর্শন করিলেন। বহুশিষ্য-বেষ্টিত ঋষিকে তিনি সাদরে নমস্কার করিলে মুনিও রাজার বিশেষ সৎকার করিলেন। রাজা কুশাসনে উপবেশন করিয়া মুনিকে বলিলেন, “আপনার

ছায় ঋষির দর্শনে আজ আমার সমস্ত পাপ নষ্ট হইল”। রাজার কথা শুনিয়া বামদেব প্রসন্নচিত্তে রাজার কুশল জিজ্ঞাসাপূর্বক বলিলেন, “রাজন, তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত। তোমার দৃষ্টিপাতে আমার আশ্রম অধিক পুণ্যময় হইল। পৃথিবীতে তোমার তুল্য কোন রাজা নাই। তুমি পাপ-নাশিনী একাদশী-ব্রত পালন করাইয়া প্রজাগণকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিতে করিতে যমরাজের মার্গ শূন্য করিয়া ফেলিয়াছ এবং সাম, দান, ভেদ, দণ্ড — এই চতুর্বিধ নীতি দ্বারা প্রজাপালন করিয়া প্রজাগণের যথেষ্ট হিতসাধন করিয়াছ। আমিও তোমার দর্শনেচ্ছা করিয়াছিলাম, ইতোমধ্যে তুমি স্বয়ং আসিয়া দর্শন দিলে। চণ্ডালও যদি বিষ্ণুভক্ত হয়, তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। আর ব্রাহ্মণ বিষ্ণুভক্তি রহিত হইলে চণ্ডাল হইতেও অধম হয়। পৃথিবীতে বিষ্ণুভক্ত রাজা দুর্লভ। তুমি ভগবানের আরাধনা করিয়া ত্রায়োচিত কর্তব্য পালন করিয়াছ এবং ধন্য হইয়াছ। আমিও তোমার দর্শনে ধন্য হইয়াছি। স্বাভাবিক নম্রতাসম্পন্ন রাজা রুক্মাঙ্গদ বামদেবের কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া বলিলেন, “দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি যেক্রপ বলিতেছেন, আমি ততটা যোগ্যতাসম্পন্ন নহি আমি আপনার চরণধূলির সমান হইতে পারি নাই। পৃথিবীতে দেবতা অপেক্ষা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণ সম্ভূষ্ট হইলে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়।

বামদেব বলিলেন, “রাজন, তুমি এখন আমার অতিথি, তোমার কি সেবা করিব বল। রাজা জোড়হস্তে বামদেবকে বলিলেন, আপনার চরণ-যুগল দর্শনেই আমার সব কিছু প্রাপ্তি হইয়াছে। আমার বহুদিন হইতে এক সংশয় আছে, সেই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমার কোন্ কর্মের ফলে ত্রিভুবনসুন্দরী পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছি? সে যেখানে যেখানে পদস্থাপন করে, তথায় পৃথিবী গুপ্তরত্ন প্রকাশ করিয়া দেয়। তাহার অঙ্গে বার্কাকোর প্রবেশ হয় না। সে অগ্নির সাহায্য ব্যতীত ষড়্রসযুক্ত ভোজন পাক করিতে পারে। আর সামান্যমাত্র রন্ধন দ্বারা কোটি মানুষকে ভোজন করাইতে পারে। সে পতিব্রতা, দানশীলা এবং সমস্ত প্রাণীর সুখদাত্রী। সে কখনও বাক্য দ্বারাও আমার অবহেলা করে না। তাহার গর্ভজাত পুত্র সর্বদা আমার আজ্ঞাপালনে তৎপর এবং গুণে পিতা অপেক্ষাও অধিক। আমি কেবল একটা দ্বীপের অধিপতি ছিলাম, সে সপ্তদ্বীপের পালক হইয়াছে। সে নিজে বিবাহ না করিয়া আমার জন্য বিদ্যুল্লেখ্য নায়ী রাজকুমারীকে

লইয়া আসিয়াছে। সে সেনাপতি হইয়া ছয় মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া শত্রু পক্ষকে বলহীন করিয়াছিল। স্ত্রী-রাজ্যে গিয়া স্ত্রীলোকগণকে পরাস্ত করিয়া আমার জন্য আটটি সুন্দরী কন্যা লইয়া আসিয়াছিল এবং সেই সকলের প্রতি মাতৃভাবে বারংবার নমস্কার করে। পৃথিবীতে যেখানে যেসব দিব্য বস্তু আভরণাদি প্রাপ্ত হয়, সে-সকল আমাকে আনিয়া দেয়। সে এক দিনের মধ্যে অনেক যোজন ভ্রমণ করিয়া রাত্রিতে আসিয়া আমার পায়ে তৈল মর্দন করে। অর্দ্ধরাত্রে কবচ ধারণ করিয়া আমার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হয়। আমার শরীরও নীরোগ। শ্রীভগবানে আমার ভক্তি আছে আর ব্রাহ্মণগণকেও দান করি। আমি মনে করি আমার বিশেষ পুণ্যকর্মের ফল-স্বরূপে এ সকল প্রাপ্ত হইয়াছি”।

বামদেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন, “রাজন্, তুমি পূর্বজন্মে শূদ্রজাতিতে উৎপন্ন হইয়াছিলে। তখন তোমার দারিদ্র্যাদশা ও ছুষ্ঠা ভার্য্যা তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে। এক সময় কোন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তুমি তীর্থযাত্রার্থ গমন করিয়া ব্রাহ্মণসেবা করিয়াছ ও মথুরাপুরীতে গিয়া বিশ্রামঘাটে এক পুরাণ-পাঠকের মুখে ‘অশূন্য শয়ন-ব্রতের মাহাত্ম্য শ্রবণান্তে তাহা পালন করিয়াছিলে। তাহা পরম অভূদয় প্রদান করে। ঐ জন্মেও তুমি একাদশীব্রত দ্বারা শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদন করিয়াছ। তাহারই ফলে তোমার এ সমস্ত বৈভবপ্রাপ্তি হইয়াছে”।

অতঃপর রাজা বামদেবের অনুমতি গ্রহণ করিয়া মন্দরাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি অনেক নদী, পর্বত, বন অতিক্রম করিয়া অল্প সময় মধ্যে শ্বেতগিরি, গন্ধমাদন ও মহামেরু পার হইয়া মন্দার পর্বতে পৌঁছিলেন। সহস্র সহস্র নদীর জলে পূর্ণ মন্দার পর্বত গঙ্গাজলে প্রক্ষালিত হইতেছিল। সেই পর্বত সুবর্ণমণ্ডিত। অনেক কন্দর দ্বারা পর্বতের বিশেষ শোভা দৃষ্ট হইতেছিল। তিনি তথায় দেখিলেন যে, সমস্ত পশু, পক্ষী-আদি এক সঙ্গীতের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া এক দিকে ছুটিতেছে। তাহাদিগকে ধাবিত দেখিয়া রাজা নিজেও শীঘ্রগতিতে গমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—এক তপ্তকাঞ্চনবর্ণা নারী পর্বতশিখরে বসিয়া আছে। রাজা অতৃপ্তনয়নে তাহার রূপ দেখিতে দেখিতে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মোহিনী রাজার নিকট গিয়া মধুর বচনে রাজাকে বলিল, “আপনি পৃথিবীর সমস্ত বৈভব ভূণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া

চলিয়া আসিয়াছেন কিন্তু আজ কেন একরূপ মোহিত হইতেছেন? যদি আমার সহিত মনের অনুকূল ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে ধর্মযুক্ত দাম্য দিয়া আপনার চরণে দাসীর ন্যায় গ্রহণ করিতে পারেন”। রাজা মোহিনীকে বলিলেন, “দেবি, তোমাকে দেখিয়া আমি এতটা মুগ্ধ হইয়াছি যে আমি তোমার রূপ সত্ত্ব করিতে না পারিয়া ভূতলশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলাম। তোমার মনে যা যা অভিলাষ হইবে আমি তোমাকে সবই প্রদান করিব। আমার রাজ্যকোষ, হাতী, ঘোড়া, মন্ত্রী, সেবকাদি সবই তোমার অধীন থাকিবে। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও”।

মোহিনী রাজার মধুর বাক্য শুনিয়া তাহাকে বলিল, “রাজন্! আমি পৃথিবীর আধিপত্য চাহি না। তবে আমি সময়মত যখন যাহা বলিব আপনি নিঃসঙ্কোচে তাহা পালন করিবেন। যদি আপনি এই সর্ত্ত পালন করিতে স্বীকৃত হন, তবে আমি নিঃসন্দেহে আপনার সেবা করিব”।

রাজা বলিলেন, “আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি যাহাতে সন্তুষ্ট হও আমি তাহাই করিব”। তখন মোহিনী বলিল,—“আপনি আমাকে আপনার দক্ষিণ হস্ত প্রদান করুন, তাহা বহু ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী। আপনি ধর্ম্মশীল, স্তূতরাং কখনও অসত্য বলিবেন না, ইহাই আমার ধারণা”। মোহিনীর কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, “সুন্দরি! আমি ক্রীড়া প্রসঙ্গেও কখনও মিথ্যা বলি নাই। আমার পুণ্যচিহ্নযুক্ত দক্ষিণ হস্ত তোমাকে প্রদান করিলাম। আমি সারা জন্ম যে-সকল পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছি, সে-সকলই তোমার হইবে যদি আমি তোমার কথা না শুনি। আমি ধর্ম্মদাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তুমি আমার পত্নী হও। আমি ইক্ষাকুদংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার নাম রুক্মাঙ্গদ”।

রাজার কথা শুনিয়া মোহিনী বলিল,—“রাজন্, আমি ব্রহ্মার কন্যা। আপনার কীর্ত্তি শুনিয়া আপনাকে পতিরূপে পাইবার জন্য আমি এই মন্দারাচলে আসিয়া সঙ্গীত দ্বারা শঙ্করের উপাসনা করিতেছিলাম। তিনি আশুতোষ, আমাকে সন্তুই ফল প্রদান করিলেন। আপনি আমাতে প্রীতিযুক্ত, আমিও আপনাকে ভালবাসি”—এই বলিয়া সে রাজার হাত ধরিয়া ফেলিল। তৎপরে বলিল, “মহারাজ! আমার জন্ম কোনরূপ শঙ্ক করিবেন না। আমি নিষ্পাপা কুমারী। আপনি গৃহস্থত্র অগ্নিসারে আমাকে বিবাহ করুন। যদি অবিবাহিতা কন্যা গর্ভধারণ করে, তবে তাহার

গর্ভজাত পুত্র চণ্ডাল হয়। সগোত্রের কথা বিবাহ করিলে তাহার পুত্রও চণ্ডাল হয়। আর শূদ্রবীর্যে ব্রাহ্মণী-গর্ভজাত পুত্রও চণ্ডাল হয়”।

অতঃপর রাজা বিধিপূর্বক মোহিনীকে বিবাহ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি আমার রাজ্যে যাইতে ইচ্ছা কর অথবা এখানে থাকিতে চাও তাহা বল”। মোহিনী বলিল, “রাজন্! আপনি যেখানে থাকিয়া সুখী হইবেন, আমারও সেইস্থানেই প্রীতি। ধনসম্পত্তি-রহিত পতির সহিত বাস করিলেও পতিব্রতার তাহাতেই সুখ। সুখদুঃখ সকল বিষয়েই আমি আপনার অনুগামিনী দাসী”। মোহিনীর কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, “আমার সমস্ত পত্নীর উপরে তোমার স্থান, তুমি আমার ঘরে আমার প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয় হইয়া বাস করিবে। চল, আমরা রাজধানীতে গমন করি”। এই বলিয়া রাজার সহিত পর্কতের শোভা দেখিতে দেখিতে মোহিনী রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিল।

— ত্রিদিবস্বামী শ্রীমন্তভৈরবদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীগৌরসুন্দরের গুণ্ডিচামার্জন-লীলা

(পূর্বপ্রকাশিত ১৮-৭ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ২৬৭ পৃষ্ঠার পর)

রঙ্গ করি কহে প্রভু হাসিয়া হাসিয়া—

দণ্ড দিতে হবে সবে প্রসাদ আনিয়া।

ভুক্তি, মুক্তি, স্পৃহা যত হৃদয়ের মল

দূর করি' কর সবে হৃদয় নিৰ্ম্মল।

সেই সেই-হৃদয়ে পাত' ভক্তি পদ্মাসন।

তবেত বসিবে তথা ব্রজেন্দ্রনন্দন।

অদ্ভুত প্রভুর নাট কে বুঝিতে পারে?

আপনি আচরি শিক্ষা দেন ভক্তদ্বারে ॥

এই মত মহাপ্রভু ভক্তে শিক্ষা দিয়া

জগৎ জীবেরে ত্রাণ করেন আসিয়া।

অপার করুণাময় গোরা নটরায়।

জগৎ ভাসাল প্রভু প্রেমের বন্যায় ॥

গোলোকের ধন হরিনাম সংকীৰ্ত্তন
 দ্বারে দ্বারে বিলাইয়া তারিলা ভুবন ॥
 ভগবন্ত কভু বোঝা নাহি যায় ।
 কৃপা করি জীবে যদি নিজে না জানায় ।
 কভু নিজে আসি, কভু ভক্তে পাঠাইয়া
 ধর্ম রক্ষা করে প্রভু জীবের লাগিয়া ।
 এবে প্রভু সপার্বদে হইয়া উদিত
 বিশ্বে সনাতন ধর্ম করিলা স্থাপিত ।
 রূপ, সনাতন, আর ভট্ট রঘুনাথ ।
 শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥
 এ ছয় গৌসাই হন তাঁর নিজ জন ।
 যাঁহাদের দ্বারা কৈলা ধর্ম সংস্থাপন ॥
 রূপ সনাতনে স্থায়ী শক্তি সঞ্চারিলা,
 লুপ্ততীর্থ বৃন্দাবন-ধাম উদ্ধারিলা ।
 সুসিদ্ধান্ত স্থাপিবারে উপদেশ দিয়া ।
 বৃন্দাবনে সবাকারে দিলা পাঠাইয়া ।
 কত ধর্মগ্রন্থ তাঁরা করিলা রচন ।
 জগতে বৈষ্ণব ধর্ম কারিতে রক্ষণ ॥
 কালের কুটিল গতি বোঝা নাহি যায় ।
 সেই সব সুসিদ্ধান্ত হ'ল অস্তপ্রায় ॥
 কালের প্রভাবে পুনঃ ধর্ম লুপ্ত হল ।
 অপসম্প্রদায় যত জগতে ভরিল ॥
 সর্বকালে এই ধর্ম যাতে রক্ষা হয় ।
 তাহারও ব্যবস্থা প্রভু করিলা নিশ্চয় ॥
 জীবের দুর্দশা হেরি প্রভু নিজজনে
 বিশ্বে পাঠাইলা ভকতিবিনোদ ধনে ।
 সপ্তম গোস্বামী বলি হইল যার খ্যাতি ।
 যিনি আনিলেন প্রভুপাদ সরস্বতী ॥

প্রভুর ইচ্ছায় সব মহাজনগণ।
 সিদ্ধান্ত-বাণীর প্রজ্ঞান করিলা বিতরণ ॥
 বাণীর প্রজ্ঞান কত ধর্মযুদ্ধ করে।
 বামনাই দল হ'তে ধর্মের রক্ষিবারে ॥
 পরাস্ত করিলা সব অপসম্প্রদায়ে।
 গোষামিগণের গ্রন্থ ধরিয়া বিচারে ॥
 সেই আনুগত্যে এবে গৌর-ভক্তগণ।
 সেইরূপে করে সবে গুণিচামার্জন ॥
 আমার প্রভুর লীলা কে বর্ণিতে পারে।
 অমন্ত অনন্ত মুখে বর্ণিবারে নারে ॥
 আমি অতি ক্ষুদ্র জীব অতি অভাজন।
 কেমনে বর্ণিব বল গৌরাজের গুণ ॥
 কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
 সেইমত গুরুদেব আমারে কহায় ॥
 শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-মুখে শুনিয়াছি যাহা।
 আপনা শোধিতে কিছু লিখিলাম তাহা ॥
 প্রভু গৌরাজের লীলা সমুদ্র-গম্ভীর।
 কে স্পর্শিতে পারে বল তাঁর সেই নীর ॥
 শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম আশা করি।
 এ অধমা আছে শুধু প্রাণ-মাত্র ধরি ॥
 সবার চরণে মোর এই নিবেদন।
 নামে রুচি দিয়া কর শুদ্ধভক্তি দান ॥
 “বাণী”র ছটায় লোক হউ উদ্ভাসিত।
 “বাণী” শুনিবারে লোক হউক সম্মত ॥
 শ্রীল গুরু-পাদপদ্মে হইয়া প্রয়াসী।
 গৌরাঙ্গ গায় কিছু এ অধমা দাসী ॥

শ্রীমতী উষালতা দেবী, ভক্তিপ্রভা

শ্রীশ্রীগুরুচরণকমলেভ্যো নমোনমঃ

“শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব-সমীক্ষা”-গুপ্তকের

প্রতিবাদ

(পূর্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ২৭২ পৃষ্ঠার পর)

“কৃষ্ণবর্ণঃ...” শ্লোকের শ্রীস্বামিকৃত টীকা ও গৌরপর

শ্রীধর স্বামীর টীকার ব্যাখ্যাও যে শ্রীগৌরপর তাহা দেখান হইতেছে।

শ্রীস্বামিপাদ বলিতেছেন,—‘কৃষ্ণতাং ব্যাবর্তয়তি ত্রিষা কাহ্য্যাকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবহুজ্জলং’ অর্থাৎ কৃষ্ণতা ব্যাবর্তনের দ্বারা গৌরলাবনা বলা হইল।

ত্রিষা,—হ্লাদিনী-শক্তিগারভূত শ্রীরাধিকা যিনি কান্তিদ্বারা অকৃষ্ণ, অর্থাৎ গৌরবর্ণ; ইন্দ্রনীলমণিবহুজ্জলং-এর তাৎপর্য,—যেমন কুসুম সংযুক্ত মরকত-মণি গৌরবর্ণ হয়, সেইপ্রকার রাধিকা-কান্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের গৌরবর্ণরূপে উজ্জলতা।

‘যদা—ত্রিষা কৃষ্ণং কৃষ্ণাবতারং অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধাত্বং দর্শয়তি।’ অর্থাৎ কান্তিদ্বারা কৃষ্ণকে অর্থাৎ কৃষ্ণের আনির্ভাব-বিশেষ গৌর বলিয়া, বলিতে কৃষ্ণাবতার গৌরের প্রাধাত্বই স্থাপিত হইল। শ্রীরাধীর উভয় ব্যাখ্যাই বিশেষ কলি সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে; অথবা তর্কতীর্থ মহাশয়ের অভিপ্রেত কর্মধারয় সমানও করা যায়। ‘কৃষ্ণঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্চাসৌ অবতারশ্চেতি। ভাম, ভীমসেন ইতিবৎ’, নামের একদেশ গ্রহণের দ্বারা পূর্ণনামগ্রহণ এই চায়ে হয়। শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভু ছন্ন হইয়া আসিলেও ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন তাঁহার চরণে ছিল। তাঁহার পিতা-মাতা বাল্যকালেই এই চিহ্নগুলি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। চৈতন্য-ভাগবতাদি প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ হইতে শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভুর বাল্যশীলা আলোচনা করিলেই ইহা জানিতে পারা যায়। তর্কতীর্থ মহাশয় অস্ত্রাণি—সুদর্শনাদানি—শ্রীস্বামীর এই টীকা দেখিয়া মনে করিয়াছেন, উহার শ্রীগৌরপর-অর্থ করা অসম্ভব। কিন্তু শ্রীভগবানে সকলই সম্ভব কি প্রকারে তাহা দেখান হইতেছে।

বেকুণ্ঠের সকলই চেতন

শ্রীভগবানের রথাদি, অস্ত্রাদি, চক্র, ধনু আদি সকলই চেতন বস্তু।

ঐ অস্ত্রাদি শ্রীভগবান্ সর্বদা হস্তে ধারণ করিয়া থাকেন না। ঐ সমস্ত বস্তু নিত্য পার্বদরূপে মহাবৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের সর্বদা সেবা করিবার জন্ত অপেক্ষামান থাকেন। শ্রীভগবান্ স্মরণ করা মাত্র তাঁহার প্রীতিবিধানের জন্ত আশীষা উপস্থিত হন। শ্রীভাঃ ১০.৫০।১১, “এবং ধ্যায়তি গোবিন্দ আকাশাং স্বর্গাং চর্চসৌ। রথাবুপস্থিতৌ সত্ত্বঃ সস্বর্তৌ সপরিচ্ছদৌ ॥ আয়ু-ধামি চ দিব্যানি পুরাণানি যদৃচ্ছয়া ॥” অর্থাৎ গোবিন্দ এই প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় আকাশ অর্থাৎ উর্দ্ধলোক তদীয় মহাবৈকুণ্ঠ হইতে সূর্য্যাতুলা তেজস্বী দুইখানি রথ সারথি, ধ্বজপতাকাতির সহিত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল এবং দিব্য পুরাণ অস্ত্র-শস্ত্রসকলে তাহা পরিদূর্ণ ছিল। দিব্য অস্ত্রাদির অর্থ—শ্রীকৃষ্ণের চক্র, শ্রীবলদেবের হল, শাঙ্গ-ধনু, কোমোদকী গদা, প্রভৃতি বুঝিতে হইবে। ‘যদৃচ্ছয়া’ শব্দের তাৎপর্য্য, শ্রীভগবানের অতিপ্রায় জানিয়াই চৈতন চক্রাদি আপনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরের শ্লোকে আরও স্পষ্ট উক্তি রহিয়াছে—‘এষ তে রথ আয়াতো দয়িতাত্মানুধানি চ’, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবকে বলিলেন,—“এই আপনার রথ এবং প্রিয় অস্ত্র সকল আসিয়া উপস্থিত হইল।” শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় অস্ত্রই ‘চক্র’ এবং বলদেবের প্রিয় ‘হল’-‘চ’ শব্দে অস্ত্রাস্ত্র অস্ত্র সকল—সূচিত হইতেছে। শ্রীগৌরলীলায় শ্রীগৌর যে স্থান বিশেষে ‘চক্র’ ‘চক্র’ আশ্বাস করিয়াছেন—এই রহস্যও ব্যক্ত আছে।

‘এবং যুগানুরূপাত্মাং’—এই শ্লোকের তর্কতীর্থের ব্যাখ্যাও সমীচীন হয় নাই। শ্রীধামীর টীকায় ‘যুগানুরূপাত্মাং’—‘নামরূপাত্মাং’; অর্থাৎ যুগানুরূপ নাম ও রূপ দ্বারা কিন্তু তর্কতীর্থ নিজকল্পিত কলিযুগের উপাস্ত্র শ্রীকৃষ্ণ-রাসের সঙ্গে অদ্বয় করিতেছেন—ইহাও স্বামিপাদ-বিরুদ্ধ, অশুদ্ধ। কারণ উপক্রম-শ্লোকে ঐকরতাজন সত্যাদি চারিযুগেরই অবতার সকলের নাম ও বর্ণাদি বলিবার অতিপ্রায় প্রকাশ করেন। ‘যুগানুরূপ নাম ও বর্ণ দ্বারা’ এই প্রকার অর্থ করাই সঙ্গত, নতুবা উপক্রম-বাক্যের সঙ্গে বিরোধ হয়। তাহা হইলে শ্লোকের অর্থ এই প্রকার হইবে—সত্যযুগে শুক্রাবতার, হংস, সুপর্ণ ইত্যাদি নামে; ত্রেতায় রক্তাবতার বিষ্ণু, যজ্ঞ ইত্যাদি নামে; দ্বাপরে কৃষ্ণাবতার বাসুদেব, সর্ষপ ইত্যাদি নামে কীর্ত্তিত হন। কলিযুগের অবতারের রহস্য গোপন রাখিবার জন্ত সেই নাম প্রকাশ করা হয় নাই। ইতিতে বুঝিয়া লইতে হইবে। ‘কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ’—

এখানে ‘নারায়ণপরায়ণাঃ’—শব্দের অর্থও গৌরভক্তপরিই হইবে। নারীণাং গোপীনাং বৃন্দং নারং—গোপীসমূহঃ তদয়নং বিহারস্থানং যন্ত সঃ নারায়ণঃ—শ্রীরাসাদিবিহারী শ্রীকৃষ্ণঃ, তন্তু আবির্ভাবশিষ্যেভ্যঃ গৌরস্তৎপরায়ণা শুভ্রপাদকাঃ—অর্থাৎ গৌরভক্তগণ।

শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম-বিষয়ক আলোচনা

শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্রের রহস্য, তর্কতীর্থ মহাশয়, একেবারেই অবগত নহেন। শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্রের কয়েকটি নামই শ্রীমন্মহাপ্রভুতেই একমাত্র প্রযোজ্য। অনেক দূরবর্তী ছুই শ্লোকের অর্দ্ধাংশ জুড়িয়া একটি শ্লোক দেখান হইয়াছে সত্য, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর নাম গুলির মধ্যে যাহা শ্রীগৌরেতেই একমাত্র প্রযোজ্য তাহাই একত্রনিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাতে সহস্রনামের শ্লোকনকল করা হইল কি প্রকারে? তর্কবাগীশ আবার পাঠ বিকৃত করা হইয়াছে বলিতেছেন। শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম সম্বন্ধে অজ্ঞতাই এইরূপ উক্তির কারণ। শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্রে সহস্র হইতেও অধিক কতকগুলি নামের উল্লেখ আছে। সমস্রনাম রক্ষা করিতে গেলে অতিরিক্ত নামগুলি একত্র সমাসবদ্ধ করিয়া গ্রথিত করতঃ সহস্র নামেতে পর্যাবসিত করিতে হইবে, নতুবা সহস্রনামের সঙ্গতি থাকে না। সহস্রনাম রক্ষা করিবার জন্ত পদগুলি সমাসবদ্ধ করিয়া দেখান হইয়াছে, অর্থের বৈশিষ্ট্য-স্থাপনের জন্য নহে। স্তোত্রে পৃথক্ পৃথক্ শব্দই উল্লেখ আছে। এখানে সন্ন্যাসকৃৎ, শমঃ, শান্তঃ ও নিষ্ঠাশান্তিপারায়ণঃ—এই চারিটি নাম দেখান হইয়াছে, কেবল বিষ্ণুর সহস্রনামের সঙ্গতি রক্ষার জন্য। পৃথক্ পৃথক্ নামের অর্থগুলিও যে শ্রীমন্মহাপ্রভুরই বোধক তাহা দেখান হইতেছে। সন্ন্যাসকৃৎ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্ত্যালীলায় সন্ন্যাসবিগ্রহের বোধক; শমঃ—শম্ ধাতু চুরাদি আলোচনা অর্থে—অতি রহস্য ব্রহ্মাদি দেবতারও ছল্লভ হরিনাম আলোচনাকারী অর্থাৎ আপামর জীবসাধারণকে অকাতরে শ্রীনাম প্রদানকারী।

শান্তঃ—কৃষ্ণেতর বিষয় হইতে নিবৃত্তি; নিষ্ঠা—হরিকীর্তন-প্রধান ভক্তি-যজ্ঞে নিশ্চল। স্থিতি; শান্তিঃ—কৃষ্ণভক্তির অন্তর্দান-নিবৃত্তকারিণী শান্তি; পরায়ণঃ—পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মহাভাব অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় হইয়াছে যাহার। পুংলিঙ্গ পাঠই বহুস্থানে দেখা যায়। আচার্য্য শঙ্করও তাঁহার ভাষ্যে পুংলিঙ্গ পাঠ ধরিয়াছেন। শ্রীবলদেবের ভাষ্য ও শ্রীচরিতামৃতে পুংলিঙ্গ

পাঠ ধরিয়াই ইহারার্থ করিয়াছেন। ক্লীবলিঙ্গ পাঠে শ্রীশঙ্কর ব্রহ্মপর অর্থ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-মতে ক্লীবলিঙ্গ পাঠে ‘সবিশেষ ব্রহ্ম’ এই প্রকার সঙ্গতি করিতে হইবে। শ্রীশঙ্করাচার্য্যও তাঁহার ভাষ্যে ‘ত্রিসাম্য’ ইত্যাদি শ্লোকের বারটি নামকে আটটি নামে পর্য্যবসিত করিয়াছেন। তাহা সহস্র-নামের সঙ্গতি রক্ষা করিবার জন্যই, কিন্তু নামগুলির পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই অর্থ করিয়াছেন। ভাষ্যকারগণের মধ্যেই নাম-যোজনার মত-পার্থক্য আছে। সুতরাং ঐ পার্থক্য কোথাও পারিভাষিক রূপে সহস্র শব্দ স্বীকারে এবং কোথাও সহস্র সংখ্যাবাচকরূপেই জানিতে হইবে, বিরোধার্থে নহে।

সর্ব্ব, রুদ্র ইত্যাদি সকলই বিষ্ণুরই নাম, অন্তের নহে

শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্রে সর্ব্ব, শর্ব্ব, শিব, স্থানু শম্বু প্রভৃতি ও স্বয়ম্ভু, ধাতা, বিধাতা, পদ্মনাভ প্রভৃতি নামগুলিও শ্রীবিষ্ণুরই নাম। ঐ সকল নামপ্রয়োগের কারণ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে বলা হইয়াছে—‘রুদ্রং দ্রাবয়তে-
যস্মাক্রুদ্রস্তস্মাজ্জনর্দনঃ। ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহন্ততঃ। পিবন্তি
যে নরানাকং মুক্তাঃ সংসার-সাগরাং। তদাধারো যতোবিষ্ণুঃ পিনাকীতি
ততঃ স্মৃতঃ। শিবং সুখান্নকৃৎসেন সর্ব্বসংরোধনাক্ষরঃ। কৃত্যান্নকমিদং
বিশ্বং যতোবন্তে প্রাঃঋত্ৱন্। কৃতিবাসাত্ততো দেবো বিরিক্ষিচ্চ বিরোচনাং।
বৃংহনাদ্ ব্রহ্মণ্যামাসাবৈশ্বর্য্যাদিন্ত্র উচ্যতে॥ এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব
ত্রিবিক্রমঃ। বেদেষু সপুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ।’ ইতি

ক্রোধকে দ্রাবিত করেন বলিয়া জনর্দনকে রুদ্র বলা হয়; নিয়মনহেতু তাঁহাকে ঈশান বলা হয়। মহত্ত্বপ্রযুক্ত বলিয়া তিনি মহাদেব। যে সকল মনুষ্য সংসারসাগর হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গভোগ করেন, তাহাদিগের নাম পিনাক। ঐ পিনাক সকলের আধার বলিয়া বিষ্ণুকে ‘পিনাকী’ বলা হয়। তিনি মঙ্গলান্নক বলিয়া শিব নামে, সকলের সংহার-হেতু ‘হর’ নামে, কার্ঘ্যান্নক বিশ্বের প্রবর্তনহেতু ‘কৃতিবাস’ নামে, বিরোচন অর্থাৎ সৃষ্টি-হেতু বিরিক্ষি নামে, বৃংহনহেতু ‘ব্রহ্ম’ নামে এবং ঐশ্বর্য্য হেতু ‘ইন্দ্র’ নামে উক্ত হইয়াছেন।

এক ত্রিবিক্রম বিষ্ণু নানা নামে বেদে ও পুরাণে গীত হইয়া থাকেন। স্বন্দ-পুরাণে বলিয়াছেন, শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ প্রভৃতি কয়েকটি ভিন্ন স্বকীয় নাম-সকল ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দকে প্রদান করিয়াছেন। যথা—“ঋতে নারায়ণা-
দীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ। প্রদাদন্যত্র ভগবান্ রাজেবর্ভে স্বকং পুরমিতি ॥”

ইহার অর্থ—রাজ যেমন নিজপুর ভিন্ন অন্য নগর সকল অমৃত্যু-ভূতাদিগকে বাসের জন্য প্রদান করেন, শ্রীবিষ্ণুও তদ্রূপ স্বকীয় বিশেষ কয়েকটি নাম ভিন্ন অপরাপর নামগুলি অত্যাচ্ছ দেবতাগণকে বাসহার্য্য প্রদান করিয়াছেন।

ব্রহ্ম-পুরাণে বলিতেছেন, “চতুর্মুখশতানন্দো ব্রাহ্মণঃ পদ্মভূরিতি । উগ্র ভাস্মধরোনগ্নঃ কপালীতি শিবস্য চ । বিশেষমামানি দদৌ স্বকীয়ান্তুপি-কেশব ॥” অর্থাৎ কেশব ব্রহ্মাকে চতুর্মুখ, শতানন্দ, পদ্মভূ এবং শিবকে রুদ্র, ভাস্মধর, নগ্ন, কপালী প্রভৃতি স্বকীয় নাম সকল প্রদান করিয়াছেন :

“সুবর্ণবর্ণো...” শ্লোকও শ্রীগৌরকেই লক্ষ্য করে

“সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গোবরাজশচন্দনাম্রদী” ও ভূতি শ্রীবিষ্ণুর নামগুলি শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই বুঝাইতেছে। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণও প্রচুর বহিয়াছে। “আসন্বর্ণা” শ্লোকে “পীত” শব্দে শ্রীবলরামকে বুঝাইবার উক্ত তর্কত্রীর্থ মহাশয় যেক্রপ অপচেষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা শাস্ত্র “যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া পূর্বে প্রমাণিত হওয়ায়, পীতশব্দে, আমাদের শ্রীগৌরানন্দদেবকেই বুঝাইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে শ্রীগৌরের একটি নাম তাহাই এখন আলোচিত হইতেছে।

(ভাগবত ১০।৫।৩৬) শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—‘জন্ম কৰ্ম্মাভিধানানি মেহঙ্গ সহস্রশঃ । ন শকাংহেহুসংখ্যাতুমনস্তত্ত্বান্ময়াপি হি ॥’ অর্থাৎ আমার জন্ম কৰ্ম্ম ও নাম সহস্র সহস্র আছে, সে সকলের হেতু আমিও সংখ্যা করিয়া বলিতে পারি না। শ্রীগৌরও পরম বিষ্ণুতত্ত্ব হওয়ায়, তাঁহার নামও অনন্ত; অতএব ‘মহাপ্রভু’ও শ্রীচৈতন্যের নাম। তর্কত্রীর্থ মহাশয়কে একটু অনুধাবন করিতে বলি। ‘সুবর্ণবর্ণ’ ইত্যাদি আটটি নাম, শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্র শ্রীবিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, কোন ভক্তদ্বীকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। ষড়ৈশ্বর্য্যের পরিপূর্ণতম বিকাশ শ্রীকৃষ্ণও শ্রীগৌরবিগ্রহ। ষড়ৈশ্বর্য্যের সামান্য প্রকাশ জীবও হইতে পারে। সোনার ছায় অঙ্গকাস্তি জীববিশেষে দেখা গেলেও সে জীবই, তাহাকে ভগবান্ বলা যাইবে না। শ্রীকৃষ্ণের রূপ লক্ষ্মী-নারায়ণেরও মোহনকারী এমনকি শ্রীকৃষ্ণরূপ নিজেরও মোহনকারী। সেই শ্রীকৃষ্ণই গৌররূপে অবতীর্ণ তাঁহার রূপের সঙ্গে বা জ্ঞানাদি গুণের সঙ্গে জীবের তুলনা অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

“মহান্ প্রভুর্বে পুরুষ সত্ত্বসৌব প্রবর্তকঃ”—এই শ্রুতির অর্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুপর কেন হইবে না? “সত্ত্ব” শব্দের অর্থ মতের ভাব সত্ত্ব। এইভাবে পরম-সত্ত্বরূপ প্রেম নিজে আশ্বাদন করিয়া জীবকে আশ্বাদন করাইলেন যিনি তিনিই শ্রীগৌর। (ক্রমশঃ)

—শ্রীঅচ্যুতানন্দ

আবাহন

পতিত-পাবন প্রেমের ঠাকুর দেখা দাও আজ বঙ্গে,
তব গৌড়ের কত অভাজন মাতিয়াছে কাম-রঙ্গে ।
পাপ-পঙ্কতে মগ্ন হইয়া ফিরে কত মুঢ়মতি,
স্বার্থের কূপে হিনাব কষিছে জীবনের লাভ-ক্ষতি ।
সেবার নামেতে চলেছে কি-রোজ দুর্নীতি ও ভণ্ডামি,
ধর্মশিক্ষা-হীন ভাবী নাগরিক শিখে শুধু গুণ্ডামি ।
ধন-বিত্ত লাগি' ছুটেছে মানব, চিত্ত কাঙ্গাল রয়,
ভোগ-মহীচিকায় লুদ্ধ পথিক যত দুর্ভোগ নয় ।
জ্বালা নিশিদিন জ্বলিতেছি তোরা কামনা-বাসনা-বিষে,
বহিমোহে অন্ধ বেকুবের দল অবোধে ভুলায় এসে ।
এস আজ তুমি হে গৌরচন্দ্র ! গোলোক হইতে ভূমে,
প্রেমসুধা লউ যতেক মানব মোদের মর্ত্যধামে ।
অন্ধ অবোধে পুনঃ দাও প্রভু ! অনর্পিত-প্রেমে দীক্ষা,
পার্থিব জ্ঞান দূর করি' দাও পরজগতের শিক্ষা ।
কণ্ঠে ধরিয়া তব নামসুধা পুণ্য হটুক অঙ্গ,
দিব্য তোমার জ্যোতির আলোকে উজলিত হোক বঙ্গ ।

—শ্রীবিজনবিহারী জানা

B. A. (Hons.), P. G. B. T.
স্বর্দী বেসিক স্কুল (মেদিনীপুর)

সগণ শ্রীচৈতন্য-চরণ-সরোজে অধমার আকিঞ্চন

দিন যায়, নিশা যায়, পুনঃ আসে দিন ।
মহাভাবে নিমজ্জিত সিন্ধুগর্ভে মীন ॥
যথায় থাকেন প্রভু ঘরে কি বাহিরে ।
নিরবধি শ্রীনরনে প্রেম-অশ্রু বারে ॥
স্বৈদ, কম্প, অশ্রু, হাসি, পুলক পুষ্পের প্রায় ।
বিকাশে সর্ববঙ্গে প্রভুর, প্রেমে গড়াগড়ি যায় ॥

প্রকাশিয়া সমাধিতে কি আনন্দ কি উচ্ছ্বাস !
 মেলেন অরুণ নেত্র করুণার কি বিকাশ !
 নগর-কীৰ্ত্তনে নবদ্বীপ উচ্ছ্বসিত ।
 ভক্তির প্লাবনে সারা বিশ্ব উদ্বেলিত ॥
 গাহিতেছে শুক-সারি, নাচিতেছে নারী-নর ।
 হাসিতেছে কাঁদিতেছে নাচিতেছে পরস্পর ॥
 ভুলি শৌত্র জাতিভেদ বর্ণ-কুল-মান ।
 সর্ব-জাতি সর্ব-ধর্ম গাহে হরি নাম ॥
 যথা রবি শশিকরে, মুক্ত সগীরণে ।
 সকলের অধিকার আছে সর্বক্ষেণে ॥
 তথা ধনী, মামী, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল আর ।
 আত্মধর্মের সকলের চিরকাল অধিকার ॥
 চণ্ডাল হইলে ভক্ত ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেয় ।
 অভক্ত ব্রাহ্মণ তথা চণ্ডাল হইতে হেয় ॥
 শাস্ত্রহীন পুরোহিতে নাহি প্রয়োজন ।
 ভক্ত-যুক্ত পত্র-পুষ্পে শ্রদ্ধায় সেবন ॥
 ভক্তকৃপা হৈলে তবে কৃষ্ণকৃপা হয় ।
 বেদ, শাস্ত্র, মুনি-ঋষি—এই কথা কয় ॥
 প্রেমাবেশে মহাপ্রভু দেন এই শিক্ষা ।
 জগতের দ্বারে দ্বারে এই তাঁর ভিক্ষা ॥
 তাই গুরু-বৈষ্ণবচরণ এবে করিয়ে আশ্রয় ।
 তাঁদের শ্রীপাদপদ্মে যেন নিত্য শ্রদ্ধা-ভক্তি রয় ॥
 সরল হইয়া মন ! ভজ প্রভু শ্রীচরণ ।
 জন্মে জন্মে আশা করে দীন সেবিকা “কামন” ॥

—কুমারী কাননবালা মণ্ডল

পূর্বশেরখাচক, মেদিনীপুর

গ্রাহক নং—৪৬৯০

খল ও সাধু

বিষ্ণুমায়া-বিরচিত বিশ্ব বিচারিলে ।
বিষ্ণুর সেবক আর মায়াদাস মিলে ॥
বিষ্ণু-প্রীতে বিষ্ণুদাস বসেন সতত ।
আত্মপ্রীতে মায়াদাস ভোগ-সুখে রত ॥
সমদর্শী দয়াময় বিষ্ণুজনগণ ।
সর্বভূতহিতে রত পরম পাবন ॥
অন্তের বিদ্রোহে রত খল ছুটে অতি ।
সুখে ছুঃখী, দুঃখে সুখী,—বিপরীত-মতি ॥
আপনার হিত নাহি জানে নীচাশয় ।
অন্তের অহিতে রত অত্যাচার-গয় ॥
সেবামোদে মত্ত দেখি' ভাগবতগণে ।
ভোগবাদে বাধা জানি' রোষে খলজনে ॥
গগনে গমন-শীল সূর্য্যকিরণ ।
দেখিলে প্রফুল্ল নয় উলূকের মন ॥
সেবার সুখমা আর সাধুর সাধুতা ।
দেখিয়া না দেখে অহো! খলের খলতা ॥
কনক ভোগের দাতা জানে খলগণ ।
সে কনকে সাধু সেবে মাধব-চরণ ॥
হেন সে মাধবসেবা-বিহীন কুজন ।
সেবা-ভোগ সমজ্ঞানে করে দর্শন ॥
কামিনী-কামের ধাম কামুকের জ্ঞান ।
সাধুই বিজ্ঞানে তাহা জানয়ে অজ্ঞান ॥
কামের দেবতা কৃষ্ণ কারণ-কারণ ।
যাঁ'র সেবা কাম নাশি' দেয় প্রেমধন ॥
প্রেমবান্ সেই সাধু পবিত্রহৃদয় ।
যাঁ'র দর্শনে খলের অমর্ষ-উদয় ॥

প্রতিষ্ঠা—শৌকরী-বিষ্ঠা খলের সম্পদ ।
 জড়ের প্রতিষ্ঠা সাধু জানেন বিপদ ॥
 অস্থির অবনী-মাঝে প্রতিষ্ঠা কোথায় ?
 স্বস্থ হ'লে আত্মা শোভে প্রতিষ্ঠা-প্রভায় ॥
 ক্রুরতা খলতা হয় খলের দূষণ ।
 অক্রোধ সরল সাধু ভূষণ-ভূষণ ॥
 ভোগবাদে খলজন ক্রোধের মুরতি ।
 সেবা-রাগে রাগানুগ ধীর শাস্ত অতি ॥
 অহঙ্কার করে খলে গরবের গিরি ।
 সেবকাভিমাণে সাধু সদা সেবে হরি ॥
 প্রবৃত্তি-তাড়নে খল কেবল চঞ্চল ।
 পরমনিবৃত্ত সাধু সদা অবিচল ॥
 পরদ্বেষে সদা রত খল ক্ষুদ্রাশয় ।
 বিদ্বেষী, বিষণ্ণ ; প্রীত সাধু মহাশয় ॥
 অণ্ণে মান দেখি' খল মানে মানহানি ।
 মান দান করে অণ্ণে বৈষ্ণব অমানী ॥
 প্রাম্যগীত-গানে খল উল্লাসে নিরত ।
 গোবিন্দ-কীর্তনে সাধু মত্ত অবিরত ॥
 খলের খলতা, আর সাধুর সাধুতা ।
 এক কপটতা, আর অন্য সরলতা ॥
 খলের নীচতা, আর সাধুর উচ্চতা ।
 দেখি' খলে ছাড়ি' কর সাধুতে মমতা ॥
 গোবিন্দ-হৃদয় সাধু গোবিন্দের প্রাণ ।
 গোবিন্দের সেবা বিনা নাহি জানে আন ॥
 হেন সাধু-সঙ্গ, মন! ধর দৃঢ় করি' ।
 বরিয়া দুঃসঙ্গ ত্যাগ, বল 'হরি হরি' ॥

— শ্রীমৎ শ্রীমৎ ভক্তিবিবেক ভায়তী মহারাজ

সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব

ভাষা ভাবের অভিব্যক্তি

‘ভাষা’ ভাবের অভিব্যক্তি। নানাপ্রকার লেখ-প্রণালীর দ্বারা ইহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। মুক ব্যক্তির নিকট ‘বৈখরী’ স্বর প্রভৃতির বিকাশ না থাকিলেও অঙ্গভঙ্গিই সে স্থলে ভাবের যানবাহন। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলে কতকগুলি ভাবের বিকাশ লেখ-প্রণালী ব্যতীত অন্য প্রকারে প্রকাশিত হওয়ার ক্ষেত্রসাম্য লক্ষ্য করা যায়। হাস্তের প্রক্রিয়া, রোদন, উল্লাস, ভীতি প্রভৃতির অভিব্যক্তি সর্বত্রই একইরূপ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে-কোন প্রক্রিয়ার দ্বারাই ভাবের অভিব্যক্তি হউক না কেন, ব্রাহ্মী ইত্যাদি লেখ-প্রণালীর দ্বারা যে অক্ষরাত্মক অভিব্যক্তি প্রকাশ পাইতেছে, তাহাই ‘ভাষা’ নামে কথিত হয়।

ভাষার পার্থক্য

দেশ, কাল, পার্বেভেদে ভাষার পার্থক্য প্রচারিত আছে। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতাদিরও ভাষা আমাদের অহুসন্ধানের বিষয়। ভাষা-তত্ত্ব-বিদগণ, পশুতত্ত্ব-আলোচকমণ্ডলী ও বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই ইহাদের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া তাহাদের স্ব-স্ব চিত্তবৃত্তিকেই কেন্দ্র করিয়া উহা বিচার করিয়াছেন। সার্বজনীন ও সার্বজীব-তত্ত্বের ভাষার জীবনীশক্তির পর্যালোচনা করিতে হইলে কি-প্রকার মানদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, এস্থলে তাহাই বিচার্য বিষয়। কীট-পতঙ্গাদি, আব্রহ্ম দেব, দানব, মনুষ্য, স্তম্ভ পর্যন্ত সকলেরই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেতনের বিকাশ-স্বরূপ ভাব-ভাষাদি বর্তমান এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পরের বাহ্যতঃ যেরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয়, তদ্রূপ ভাব ও ভাষার পার্থক্য বর্তমান।

বিভিন্নাংশ অণুচেতনের ভাব ও ভাষা

সমগ্র ভারত বা ভারতের যাবতীয় দেশ-প্রদেশেই চেতনধর্মের বৈশিষ্ট্যের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক চেতনই এক ধর্ম্মে অবস্থিত হইলেও তাহার বিভিন্নাংশ। এক অণুচেতন অন্য অণুচেতনের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিয়া থাকে। এই আদান-প্রদানের প্রাণালীই ‘ভাষা’ বলিয়া কথিত হয়। কীটাকীটের অন্তর্নিহিত অণুচেতন, বৃক্ষলতা ও পশু-পক্ষী প্রভৃতির অন্তর্নিহিত অণুচেতন পরস্পরের সহিত ভাব বিনিময় করিয়া থাকে। কিন্তু একে অন্য

জাতির ভাব বিনিময়ের প্রণালীর সহিত ভেদ স্থাপন করিয়াছে। এই ভেদ প্রত্যেক জীবের অন্তর্নিহিত অণুচেতনের নহে। কারণ ইহা পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বদাদি-সম্মত যে, চেতনতায় কাহারও কোন পার্থক্য নাই; অর্থাৎ জীবাত্মা স্বরূপতঃ বিভিন্নাংশরূপে একই—ইহাই যাবতীয় আন্তিকগণের বিচার। বিভিন্নাংশ অণুচেতন জীবাত্মা অণুতে ও পক্ষ্মে এক হইলে তাহার ভাব ও ভাষা পৃথক হইবার কোন যুক্তিসম্মত কারণ নাই। আমরা সমাজগত বা দেশগত সসীম সমষ্টির মধ্যে ভাষাগত সাম্য লক্ষ্য করিয়া থাকি। সুতরাং ভাষার পার্থক্য, বিভিন্নাংশ অণুচেতন জীবের স্বভাবগত নহে। ভগবানের মায়াশক্তি বিরচিত দেশ-কাল-পাত্রাদি আবরণ হইতে উদ্ধৃত ভাষারই পার্থক্য বর্তমান।

বিভিন্নাংশ জীবের ভাষা-বৈশিষ্ট্য

এক জাতীয় বিভিন্ন আত্মার ভাব-বৈভিন্না অস্বীকৃত নহে; অথচ ভাষার বৈভিন্না না থাকিলেও বৈশিষ্ট্য আছে। একই ভাষার গুরুত্ব-লঘুত্ব, লালিত্য-কাঠিন্য প্রভৃতি ভেদে পার্থক্য লক্ষিত হইলেও ভাষাগত ভেদ নাই। তথাপি তাহাকে ‘বৈশিষ্ট্য’ বলিতে কোনপ্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না; পরন্তু বৈশিষ্ট্যই ভেদের কারণ। অণুচেতনের ভাষার বৈশিষ্ট্য থাকিলেও তদ্বারা ইহা বুঝাইবে না যে, প্রত্যেক জীবাত্মার স্বরূপ-গঠনের আত্মগত বৈশিষ্ট্য ব্যতীত অত্র কোন প্রকার ভেদ আছে। যাহারা জীবাত্মার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিতে চেষ্টা করেন, তাহাদের ভাব ও ভাষা সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে। আমরা ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া ঐক্যপূর্ণ ‘ব্যবহারিকতা’ ও ‘মিথ্যার’ প্রশ্ন দিতে প্রস্তুত নহি।

দিব্য বা দৈব-ভাষা

আত্মা দিব্য বস্তু, প্রকৃতির কোন বস্তু নহেন। সুতরাং আত্মার ভাব ও ভাষা দিব্য বস্তু অর্থাৎ দৈবভাব-সম্পন্ন। তজ্জগুই আত্মার ভাষা দিব্য ও দৈব। আত্মতত্ত্ব অহুশীলনে যাহারা যত উন্নত, তাহাদের ভাব ও ভাষাও তত উন্নত। যে দেশ যত নিম্নগতিতে চলিতে থাকে, সেই দেশের ভাব ও ভাষা তত নিম্নগামী হইয়া থাকে। চিন্তাপ্রোতের অসম্পূর্ণতাই ভাষার অসম্পূর্ণতা আনয়ন করে। দিব্য বস্তু বা ভাব যাহার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তাহাও দিব্য এবং সম্পূর্ণ। তাহা যতই বিস্তৃত হউক বা ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হইতে সংক্ষিপ্ততর বা সংক্ষিপ্ততম হউক না কেন,

উহা দিব্য এবং পূর্ণ। আমরা বেদচতুষ্টয়কে অতি বিস্তৃত দেখিলেও উপনিষদাদি তাহা অপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত। উপনিষদ, পুরাণ, ইতিহাসাদি বিরাটভাবে দৃষ্ট হইলেও সূত্রাকারে ‘ব্রহ্মসূত্রে’ আরও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহাও মন্ত্রে এবং ক্রমশঃ বীজে আরও সংক্ষিপ্ত আকারে লক্ষিত হয়। বীজ’ অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে সমগ্রতা ও বিরাটের সত্তা লক্ষিত হওয়ায় ইহা সম্পূর্ণ। বটের বীজ অতিশয় ক্ষুদ্র হইলেও তাহাতে বিরাট মণীকৃষ্ণের সত্তা থাকায় উহা পূর্ণ। নৃসিংহ-তাপনী বলেন—“বাখা ওঙ্কারো-বাগেবেদং সৰ্ব্বং ন হৃশদমিবেহাস্তি” (নৃঃ তাঃ ৮২)।

উক্ত উপনিষদের শঙ্করভাষ্য-রহস্যার্থ-দীপিকায় লিখিত হইয়াছে—“বাঙ্-মাত্রত্বাচ্চোঙ্কারস্রোতত্ত্বং সিদ্ধমিত্যাহ বাখা ইতি। সৰ্ব্ব-বৰ্ণন-কবলন-রূপত্বাদ্ বৈখর্যাদিরূপত্বাচ্চ বাঙ্-মাত্রমবগম্যাম্।”

অর্থাৎ ওঙ্কারের বাঙ্-মাত্রতা হেতু তাহার ওতত্ত্ব অর্থাৎ সৰ্বব্যাপকত্ব সিদ্ধ আছে। ওঙ্কারদ্বারা সকল পদার্থই ওঙ্কারের কবলীকৃত বা অন্তর্গত এবং বৈখরী প্রভৃতি স্বরও ওঙ্কারের স্বরূপ মাত্র। এই নিমিত্ত ওঙ্কারকে বাঙ্-মাত্র বলিয়া জানিবে।

এস্থলে অপৌরুষেয় বৈদিক বাণী হইতে জানিতে পারি, বীজ-স্বরূপ ওঙ্কারে (ওঁ) যাবতীয় বর্ণ শব্দ, বাক্য ও ভাষা কবলীকৃত হইয়াছে। বেদ-পুরাণ-ইতিহাসাদি এই ওঙ্কারেরই বিস্তার এবং আরও কথিত হইয়াছে যে, শব্দরূপ ওঙ্কার হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি হইয়া থাকে। সুতরাং ‘ওঁ’ এই দিব্য শব্দটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও ইহা পূর্ণ এবং ইহাতেই বস্তু ও তত্ত্ব নিহিত আছে—ইহা বৈজ্ঞানিকরূপে সিদ্ধ।

‘সংস্কৃত’ ভাষার বৈশিষ্ট্য

ইংলণ্ড, গ্রীস, জার্মান, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশের ভাষার সহিত আমাদের ভারতীয় ভাষার তুলনা করিলে ইহার পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে অনুভব করিতে পারি। এই পার্থক্যের মূল কারণ প্রকৃতি এবং প্রকৃতি-জাত দেশ, কাল ও পাত্র। ভারতবর্ষ এই প্রকৃতিজাত দেশ-কাল-পাত্র হইতে বহির্ভূত না হইলেও, সে এই প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইতে প্রকৃতির অতীত রাজ্যের অনুশীলন করিয়াছে। পার্থিব পরমাণুর সংযোগে যে চেতনতার আভাস লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইতেও ভারতীয় মনীষিগণ আপনাদের বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিয়াছেন।

অপ্রাকৃত চেতন প্রাকৃত চেতন (?) হইতে প্রচুর পৃথক্ । স্বতরাং অপ্রাকৃত অণুচেতনের ভাব ও ভাষা প্রাকৃত চেতন হইতে সর্বতোভাবে বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে । এই বৈশিষ্ট্যময় ভাষার নামই ‘সংস্কৃত ভাষা’ ।

ভাষার সংস্কৃত আখ্যা দিবার উদ্দেশ্য

‘সংস্কৃত’ শব্দের দ্বারা ইহাই বুঝায়, যে-ভাষা সর্বপ্রকার সংস্কার লাভ করিয়াছে । দশসংস্কারে মানব যে প্রকার শুদ্ধি লাভ করে, সেই প্রকার ‘সংস্কৃত ভাষা’টিও সর্বতোভাবে শুদ্ধতা লাভ করিয়াছে । দিব্য সদ্বৈষ্ণবের দ্বারা জারিত হইলে উহা প্রাণনাশক না হইয়া প্রাণরক্ষক হইয়া থাকে । সেই প্রকার ভাষাগত প্রাকৃত মল দেব-ঋষিগণের দ্বারা জারিত হইয়াছে বলিয়া দেবভাষার নাম—‘সংস্কৃত ভাষা’ । এই ভাষা অক্ষর ব্রহ্ম-বস্তুর নির্দেশকারিণী ।

‘অক্ষর’-পরিচয়

দেবভাষা কিছু ক্ষর-বস্তু নহে । ইহা অক্ষরাত্মক নিত্য সনাতন বস্তু । এই অক্ষরাত্মক বস্তুর অনুসন্ধান না করিলেই আমরা ‘কুপণ’ হইয়া পড়ি । তজ্জগৎ বৃহদারণ্যক (৩৯।১০) বলিয়াছেন—“এতদ্ ‘অক্ষরং’ গার্গি অবিদিত্বা যোহস্মাৎ লোকাং গৈতি স এব ‘কুপণঃ’ ।”

ভারত যদি অক্ষর ও ব্রহ্ম-বস্তুর অনুশীলন না করিয়া কুপণতার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভারত অজ্ঞাত দেশের স্থায় দুর্ভাগ্য বরণ করিবে । ভারতীয় লেখ-প্রণালী যাহাই হউক না কেন, দিব্য ভাষা বা দৈবভাষাই অনুচৈতন্য জীবমাত্রের ভাবজ্ঞাপক যানবাহন । বালাজীবনে পঞ্চম বর্ষীয় শিশুকে অক্ষর পরিচয় করাইয়া দিবার পদ্ধতি আজও রহিয়াছে । তজ্জগৎ তাহাকে শিক্ষা-গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় । আমরা অক্ষর-পরিচয়ের পদ্ধতির সারাংশ পরিত্যাগ করিয়া গতানুগতিক ধারা অনুসারে শিক্ষা আরম্ভের সময় যে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া অবলম্বন করি, তাহাতে ক্ষরবস্তু ব্যতীত অক্ষর বস্তুর পরিচয় হইতেছে না । আমরা আমাদের ত্রিকালজ্ঞ হিতকামী ঋষিবর্গের শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি, অক্ষর-পরিচয়ের নামে ক্ষর-পরিচয় লইয়াই আমরা বর্তমানে ব্যস্ত হইয়াছি । ভারতীয় বিবিধ লেখ-প্রণালী যাহাই হউক না কেন, অক্ষর বস্তুর সহিত সঘনক না থাকিলে তাহা সর্বতোভাবে আমাদিগকে অমঙ্গলের পথে চালিত করিবে ।

শব্দ বা ধ্বনির উৎপত্তি

লেখ-প্রণালীর সহিত স্বর বা ধ্বনির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ না থাকিলে উহা নিষ্ফল হইয়া পড়ে। ধ্বনি মূলতঃ বায়ু-বিলোড়নে উৎপন্ন হয়। স্ফোটবাদী বৈয়াকরণিকগণ ভাষাগত ধ্বনির উৎপত্তি-স্থান অনেক প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—প্রধানতঃ কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ইত্যাদি। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাউতে পারে, ‘স’ তিন প্রকারে তিন স্থান হইতে উচ্চারিত হয়। তালু হইতে উচ্চারিত হইলে তালব্য স = ‘শ’, মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত বলিয়া মূর্দ্ধব্য স = ‘ষ’ এবং দন্ত হইতে যে স-এর উচ্চারণ হয়, তাহা দন্ত্য স = ‘স’। এইপ্রকার উচ্চারণ-ভেদে ‘ন’ও দুই প্রকার। যথা—দন্ত হইতে উচ্চারিত বলিয়া ন-এর নাম—দন্ত্য ‘ন’ এবং মূর্দ্ধা হইতে উচ্চারিত হয় বলিয়া উহার নাম মূর্দ্ধব্য ‘ণ’। সুতরাং বৈয়াকরণিকের শব্দ বা ধ্বনি বায়ু-বিলোড়িত শব্দের দ্বারা প্রাকৃতই বুঝিতে হইবে। ইহাকে আমরা ‘অক্ষর’ শব্দের উদ্দিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারি না। অথচ অক্ষর-পরিচয় করিতে গিয়া শিশুগণকে ঐ প্রকার বর্ণ-পরিচয়ই করাইয়া দেওয়া হয়।

বর্ণ ও অক্ষরের সাদৃশ্য

লেখ-প্রণালীর বর্ণমালার সহিত অক্ষর বস্তুর কোনরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে উহার দ্বারা আমাদের পারমাথিক মঙ্গলের কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শাস্ত্রকারগণ বলেন—বর্ণমালাকে সর্বতোভাবে ‘সংস্কৃত’ করিয়া অর্থাৎ তাহার যাবতীয় মূল বিদূরিত করিয়া অথবা সদবৈচিত্র্য দ্বারা জারিত করিয়া গ্রহণ করিলে আমরা অপ্রাকৃত অক্ষর বস্তুর সম্ভান পাইব। ‘বর্ণ’ এবং ‘অক্ষর’ এক বস্তু নহে, অথচ সাদৃশ্যযুক্ত। সদৃশ বস্তুর উপমানের সহিত ভেদ থাকিলেও উপমান জ্ঞানে প্রচুর সাহায্য করা থাকে।

অপ্রাকৃত পণ্ডিতকুলবর্ণে জগদগুরু শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার স্বরচিত ‘শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের’ প্রথমে লিখিয়াছেন—“নারায়ণাৎ উদ্ভূতোহয়ং বর্ণক্রমঃ”—অর্থাৎ নারায়ণ হইতেই বর্ণসমূহের উদ্ভব হইয়াছে। শ্রীনারায়ণই অক্ষর ব্রহ্মবস্তু। যে-বর্ণ অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপ নারায়ণ হইতে উদ্ভূত, তাহা প্রাকৃত জিহ্বায় বা কণ্ঠ, তালু প্রভৃতিতে উচ্চারিত হয় না। তথাপি যে বর্ণসমূহ অক্ষরের উদ্দীপক, তাহাই আমাদের একমাত্র গ্রহণীয়। অর্থবোধক বর্ণসমূহের সমষ্টিতে শব্দ, এবং এক বা একাধিক শব্দসমূহের অর্থ-প্রকাশক সমাবেশে বাক্য এবং বাক্য-সমষ্টিতে ভাষার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমরা নারায়ণ হইতে উদ্ভূত যে বর্ণসমূহ, শব্দ, বাক্য ও ভাষা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকেই ‘সংস্কৃত ভাষা’ বলিয়া জানি। (ক্রমঃঃ)

বাণী-সংরক্ষণ যন্ত্র

বাণীর নানাবিধ প্রতিষ্ঠার জন্ম মহাজনগণের “বাণী”র সংরক্ষণ উপলব্ধ হইয়া থাকে। জড়-পদার্থ-শাস্ত্রে যাহারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, সেই সকল বৈজ্ঞানিকগণ প্রথমে গ্রামোফোন যন্ত্রে, পরে টেপ্ রেকর্ডার (Tape Recorder) যন্ত্রে বাণীকে অদিকল বিধৃত করিবার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন।

বৈয়াকরণিকগণ বাণীকে লেখ-প্রণালীর মাধ্যমে রূপদান করিয়া উহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারতবর্ষেই সর্বপ্রথম এই বিজ্ঞান প্রচলিত হয়। ইহার অস্বীকারকারীর নিকটে যুক্তি এই যে, ভারতের যাহা প্রাচীনতম ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা, তাহাই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম—ইহা বিদ্বজ্জন-স্বীকৃত। এই বিজ্ঞান ক্রমশঃ অগ্রাগ্রহ দেশ অনুসরণ করিয়াছে। তবে এই প্রণালীতে বাক্যের ‘ধ্বনি’ গুপ্ত থাকে। ‘ধ্বনি’ বক্তার হৃদয়গত ভাব। বর্তমানে রেকর্ড-যন্ত্রে বাণী সংরক্ষণে এই অসম্পূর্ণতা নাই।

পাশ্চাত্যের মনীষী যদিও এই শেষোক্ত বিজ্ঞানের উদ্গাতা বলিয়া জগতে বর্তমানে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, সে কৃতিত্ব তাহাদের একক নহে, প্রাথমিকও নহে। দৈববাণীর কথা কে না জানে? ভারতবর্ষেই এই বিজ্ঞান সমুদ্ভূত হইয়াছিল। পরম্পরের কথাবার্ত্তায় তাহাদের মানসিক শক্তি-উদ্ভূত তাড়িত-প্রভাবে এমন এক আবহাওয়ার স্বজন হইত যথার প্রকৃতি-বহির্ভূত দেববৃন্দের বাণীও শ্রুত হইত।

যাহা হউক, বৈজ্ঞানিকদের এই চেষ্টাকে মহাজনগণ বাণীর সেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। মহাজনগণের বাণীর ধারক হইলেই বিজ্ঞানের সার্থকতা। শুধু তাহাই কেন, পৃথিবীর যাবতীয় চেষ্টা বাণীর সেবাতে পর্যাবসান লাভ করিলেই তবেই তাহার সফলতা। অনেকে আবার বাণীর উগ্রতা সহ্য করিতে না পারিয়া সেবাবিচ্যুত হইয়া থাকেন। সুতরাং গোড়ায়-প্রজ্ঞান বিগ্রহের অশীতল বাণী কর্ণগোচর হইলে তাঁহাদেরও মঙ্গল হইবে। মেদিনীপুর জিলার কল্যাণপুর গ্রামের শ্রীমতী উষালতা দেবী, ভক্তিপ্রভা পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের সেবায় Tape-এর সাহায্যে বাণী-সংরক্ষণের ঐক্লপ একটি অভিনব যন্ত্র ত্রয় করিয়া দিয়াছেন। বাণীপ্রীতি তাঁহাকে বহু পূর্বেই “ভক্তিপ্রভা” আখ্যায় বিভূষিত করিয়াছিল। এখন তাঁহার এই সেবায় শত শত জিজ্ঞাসুদের কর্ণে বাণী বর্ষিত হইবেন। বাণীসেবায় তাঁহার এই আগ্রহ ও আসক্তি কত উন্নত, তাহা বাণীর সেবকমাত্রেরই উপলব্ধি করিয়াছেন। সেবা-গ্রহী, সেবাগ্রহী ও সেবাচ্যুত—এই তিন শ্রেণীর জীবকুলকেই তাঁহার প্রদত্ত সেবা নিরন্তর আনন্দ প্রদান করিতেছে।

স্বদেশী পত্রিকা



১৯৩৩ } অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩ { ১ম সংখ্যা



স্বদেশী পত্রিকা প্রকাশক: স্বদেশী পত্রিকা প্রকাশন, কলিকতা

প্রকাশিত: ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে, অগ্রহায়ণ মাসে, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে।
 প্রথম সংখ্যা: ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে, অগ্রহায়ণ মাসে, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তির্নবোদ্ধজে ।



০ গোষ্ঠীয়-পত্রিকা




অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াক্ষাঃ সুপ্রসীদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসম ।

অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরহুত ॥

অন্ত ধর্ম সুইরূপে পালে বেই জন ।

হরি-কথার বক্তি নৈলে পণ্ড মেই জন ॥

১৮শ বর্ষ } গভোদশায়ী, ১৮ কেশব, ৪৮০ গৌরাক্ষ } ১০ম সংখ্যা
 } শুক্রবার, ৩০ অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩; ইং ১৬/১২/১৯৬৬ }

ଆବୁବାଦ୍

শ্রীদেবগণকৃতঃ “শ্রীশ্রীপরমেশ্বর-স্তোত্রনবকম”

(শ্রীশ্রীবେদব্যাংসকূতে শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ-স্কন্ধে
নবমেছধ্যায়—২০-২৬, ৩০-৩২)

শ্রীদেবা উচু:—

বায়ু স্বরাগ্নাপ্ক্ষিতয়প্রিলোক ।

ব্রহ্মাদয়ো। যে বয়মুদ্ভিজন্তুঃ ।

হরাম যষ্টৈ বনিমন্তুকোহসৌ

বিভেতি যস্মাদরণং ততোহস্ত নঃ ॥ ১ ॥

শ্রীদেবগণ বলিতে লাগিলেন—বায়ু, আকাশ, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এই
পঞ্চাভ্যুত হইতে ত্রিলোক সৃষ্ট হইয়াছে, এই ত্রিলোকের অধিপতি ব্রহ্মাদি
দেবগণ এবং তাহাদিগের অপেক্ষা অর্ধাচীন আমরা সকলেই যে কাল-
করে তীত হইয়া তাঁহার পূজা করি, সেই পরমেশ্বরই আমাদের রক্ষা
করুন ॥ ১ ॥

অবিস্মিতং তং পবিত্রপূর্ণকামং

স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম ।

বিনাপসর্পতাপরং হি বালিশঃ

শূলাজ্বলেনাতিতিত্তি সিন্ধুগ ॥ ২ ॥

যিনি নিরঙ্কর অথবা বাহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই, স্ব-স্বরূপভূত পরমানন্দেই যিনি পূর্ণকাম যিনি উপাসি বা পরিচ্ছেদশূন্য এবং প্রশান্ত অর্থাৎ রাগাদিশূন্য তাঁহাকে পবিত্রাঙ্গ করিয়া যে বাক্তি অস্ত্রের শরণাগত হয়, সেই মহামূর্খ নিশ্চয়ই কুকুর পক্ষুণ গাশ্রয় করিয়া সিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করে। কুকুরটি যখন সিন্ধু অতিক্রম করতে পারে না তখন তাঁহার লাজুলগ্রামী বাক্তি আর কিরূপে সিন্ধু অতিক্রম করিবে? এই বাক্তি যেমন সমুদ্রে মগ্ন হয়, তেমনি পরমেশ্বকে ত্যাগ করিয়া যে অশ্রু উপায় অবলম্বন করে (সে ৬ ভংখসাগরে মগ্ন হয়) ॥ ২ ॥

যস্যোরশ্যঙ্গে ভগবতীং স্নানং

মনুষ্যথাবধা তত্কার তুর্গম ।

স এব নস্বাষ্টভয়াদ্ভ্যতং

ত্রাতাশ্রিতান্ বারিচবোহপ নুনম্ ॥ ৩ ॥

সত্যব্রত মনু যে মৎস্যমূর্তি ভগবানের মৎস্যরূপ পৃথ্বীমপা স্বকায় তবণি নিবদ্ধ রাখিয়া প্রলয়কালে মহাসঙ্কট হইবে তখন পাইয়াছিলেন, সেই মৎস্য-মূর্তি ভগবান শরণাগত আমাদিগকে দুঃখ দুঃভয় হইতে বদ্ধা করিবেন ॥ ৩ ॥

পুনা সন্তু পি সাযনান্ত-

স্বাদীর্ণবাতৈ ম্মি তৈঃ ন বাগে-

একে'তবদিন্দাং পতিনস্তত্কার

তস্মাদ্ভ্যাদ্ যা স নাতস্ত পাতঃ ॥ ৪ ॥

সৃষ্টির আদিতে ভগবৎ প্রলয়কালে মহাসঙ্কট হইবে তখন পাইয়াছিলেন, সেই ভগবান আমাদিগকে দুঃখ দুঃভয় হইতে বদ্ধা করিবেন ॥ ৪ ॥

য এক ঈশো নিজমায়য়া ৷ঃ

ससर्ज्जं येन नु ज्जाम विश्वम् ।

वयं न यस्यापि पुरः समीहतः

पश्याम लिङ्गं पथशीतमा'ननः ॥५॥ ।

যে ঈশ্বরই একমাত্র নিজ-মায়-বলে আমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছেন
 এবং স্বাক্ষার অনুগ্রহে আমরা বিশ্বত্বকন কান্তোছি, আমাদের অগ্রেই
 আত্মীয়মিকপে বিরাজমান সেই সৃষ্টিকর্তা ভগবানের রূপও আমরা দর্শন
 করি না, কারণ আমরা সকলেই পথক পথক ঈশ্বরানুভিমাত্রী ॥ ৫ ॥

যে নঃ সঃ ত্রৈলোক্যমুদয়ম্

দেবসিদ্ধিযুক্ত নৃষু নিত্য এব

কৃষ্ণাভ্যাস্তুত্বঃ স্বগায়ত্রী

কৃত্ত অসীং পাতি যুগে যুগে চ ॥৬॥

ତାମେବ ଦେବଃ ବୟମାତ୍ମନୋଦୈବତଃ

পত্রঃ প্রধানে পৃষ্ঠাঃ বিশদমন্তব্য ।

ବ୍ରହ୍ମାୟ ନମଃ ଅରଣ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ

ਸ੍ਵ'ਨਾਃ ਸ ਨੋ ਧਾਸ੍ਯਤਿ ਸਃ ਮਹਾਤ੍ਮਾ ॥੧॥

যে সচ্চিদানন্দ ভগবান স্বকীয় অচিন্ত্য শক্তিবলে বামন, পরশুরাম, নৃসিংহ, মৎস্য, কূষ, বরাহাদি নানা তনু ধারণপূর্বক দেবত, ঋষি, তির্যক ও মনুষ্য দির ভিতর অবতীর্ণ হইয়া শত্রুগণ কর্তৃক অশেষরূপে নিপীড়িত আমাদিগকে আত্মদাং করিয়া যুগে যুগে রক্ষা করিতেছেন, যিনি জীবের উপাস্ত, পরম কারণ, যিনি প্রকৃতি ও পুরুষ--এই উভয়াত্মক এবং বিশ্বব্রহ্ম হইয়াও বিশ্ব হইতে নির অর্গাৎ প্রত্যেকের তায় বিকারযুক্ত নহেন, আমরা লকলে সেই শরণ্য ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি। সেই মহাত্মত্ব ভগবানই আমাদের কল্যাণ বিধান করিবেন ॥ ৬৭ ॥

नमस्तु यज्ज्वर्याय दयसे उत ते नमः ।

নমঃ স্তু হস্তঃ ক্রায় নমঃ স্তু পুরুষ ভয়ে ॥৮॥

দেবগণ বলিয়াছিলেন—যিনি যজ্ঞবীৰ্য্য তথাৎ যজ্ঞাদি-জন্ত স্বর্গাদিফল
প্রদানে সমর্থ অথচ যিনি যজ্ঞজনি ও স্বর্গাদি ফলের বিনাশকারী কালস্বরূপ

এবং যিনি যজ্ঞ-বিনাশক দৈত্যগণের বিনাশার্থ চক্রেবিক্ষেপকারী ও এই কারণেই যিনি সুললিত বহুনামধারী, হে ভগবন্ ! আমরা সেই তোমাকে নমস্কার করিতেছি ॥৮॥

যন্তে গতীনাং তিস্মণামীশিতুঃ পরমঃ পদম্ ।

নার্বাচীনো বিসর্গস্য ধাতর্বেদিতুমহঁতি ॥৯॥

হে ধাতঃ ! আপনি স্বর্গ, অপবর্গ ও নরক এই ত্রিবিধ গতির একমাত্র নিয়ন্তা, আপনার পবনধাম বৈকুণ্ঠ, আপনার বিসর্গ অর্থাৎ নানাবিধ সৃষ্টির পরবর্তীকালে সৃষ্ট অকাচীন অস্বাদূশ বাক্তি তোমার ঐ পরমপদ অবগত হইতে পারে না, অতএব তোমাকে কেবলমাত্র নমস্কার করিতেছি ॥

ওঁ নমস্তেহ ভগবন্নারায়ণ বাণ্‌দেবাদিপুরুষ মহাপুরুষ মহানুভব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ পরমকারুণিক কেবলজগদাধার লোকৈকনাথ সর্বৈশ্বর লক্ষ্মীনাথ পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্মযোগসমাধিনা পরিভাবিতপারিস্কুটপারমহংসাধর্ম্যেণোদঘাটিতভ্রমঃকষাটদ্বারে চিত্তেহপা-
-বৃত আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধানি জসুখানুভবো ভবান্ ॥১০॥

হে ভগবন্ ! হে নারায়ণ ! হে বাণ্‌দেব ! হে আদিপুরুষ ! হে মহা-
পুরুষ ! হে মহানুভব ! হে পরমমঙ্গল ! (স্বয়ং মঙ্গলরূপ) হে পরম কল্যাণ !
(মঙ্গল-কারিন) ! হে পরম কারুণিক ! (স্বার্থ-নিরপেক্ষ পরদুঃখাসহিষ্ণু) !
হে নিরীকার ! হে জগদাধার ! হে লোকৈকনাথ ! হে সার্বৈশ্বর ! হে
লক্ষ্মীনাথ ! পরমহংস পরিব্রাজকগণ ! অষ্টাঙ্গযোগ সাধনা দ্বারা সমাধিযোগে
চিহ্নৈকগ্রতা ভাল করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে যে ভগবদ্ভক্তনরূপ পারমহংসাধর্ম্য পরি-
স্কুট হয় তদ্বারা চিত্তেব তমোরূপ কষাট উন্মুক্ত হইলে আত্মলোক অর্থাৎ
প্রতাক্ষরূপ প্রকাশিত হয়, তখন যে নিজ-সুখস্বরূপের উপলব্ধি বা অনুভূতি
হয়, আপনিই সেই সুখ-স্বরূপ ! আপনাকে কেহই জানিতে পারে না, অতএব
আপনাকে নমস্কার ॥১০॥

শ্রীমধব-জন্মতিথি

বিবর্তিত বার্ষিক পূর্ণপঞ্জ জন্মতিথিতে পূর্ববঙ্গে ঢাকা নগরীতে শ্রীমধব-প্রসাদে ২২শ দিনে শ্রীমধবগৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। * * *

শ্রীমদ্বাদশ টি ১০৪০ শকাব্দে বিলম্বী বাইস্পতা বর্ষে দক্ষিণ ক্যানেরা জেলায় বজ্রকলীপব গ্রামে আবির্ভূত হন। তিনি শিবালী ব্রাহ্মণকুলে সম্মানিত ভাটব ঔপদে বেদবল্লীর গার্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বাদশবর্ষ পরিমিত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উড়ুপী নামের শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষা তীর্থের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

অচ্যুতপ্রেক্ষার গুরু-পরম্পরা যাত্রা উড়ুপীতে মধব-মঠে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা এই—

১। কংস নামক পরমাত্মা। ২। চতুর্মুখ বক্ষা। ৩। সনকাদি। ৪। তর্কসার। ৫। জ্ঞাননিধি। ৬। গুরুড-বাহন। ৭। কৈবল্য তীর্থ। ৮। জ্ঞানেশ তীর্থ। ৯। পরমতীর্থ। ১০। সত্যপঙ্কজ তীর্থ। ১১। প্রাজ্ঞ তীর্থ। এই প্রাজ্ঞতীর্থের নিম্নেই অচ্যুতপ্রেক্ষা তীর্থ। অচ্যুতপ্রেক্ষা তীর্থের নিম্নেই পূর্ণপঙ্কজ আনন্দতীর্থ এবং মধবগনি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কোন কোন কালবিদগণের মতে তাঁহার ১১৬০ খৃষ্টাব্দে উদয়কাল। কিন্তু ১০৪০ শকাব্দে হইলে ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দে হয়।

এই শ্রীমধবগনি হঠাৎ বৈষ্ণবের চারি সম্প্রদায়ের অগ্রতম ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। পদ্মপুরাণ বলেন—

বামানকঃ শ্রীমদ্বাক্ষরঃ সপ্তাচার্য্যঃ চতুর্মুখঃ।

শ্রীবিষ্ণুশ্যামনঃ কল্লো নিম্বাদিত্যঃ চতুঃসনঃ।

পরাবাক্যে লক্ষ্মী, বক্ষা, কদম্ব ও সনৎকুমারাদি চতুঃসন চারি সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধি ছিলেন। কল্লো বামানক, মধব, বিষ্ণুশ্যামী ও নিম্বাদিত্য চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে বর্তমান ছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য যে গুরু-পরম্পরা শ্রীমধব করিয়াছেন, গৌড়ীয় সম্প্রদায় কিত্তানি আকর গ্রন্থমূলে তাহাই স্বীকার হইয়াছে। “শ্রীমধব-ব্রহ্মদেব-মি-বাদ-প্রাথমিক-সংস্করণ”। শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা ব্রহ্ম হইতে নারদ এবং নারদ হইতে বাসদেব। শ্রীবাসদেব শ্রীমধব-গায়েত্রী গুরুদেব।

শ্রীমধ্বপাদ হইতে ষোড়শ অধ্যয়ন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। পুরীপাদের শিষ্য শ্রীঈশ্বর পুরী, শ্রীনিতানন্দ, শ্রীমদ্বৈত। কোন মতে শ্রীলক্ষ্মীপাতব শিষ্য শ্রীনিতানন্দ-স্বরূপ। সুতরাং গৌড়দেশীয় বৈষ্ণব সকল শ্রীমধ্ব-গৌড়ীয় নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আশ্রিত ভক্তগণ সকলেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ—তাহাদের অনেকেই গৌড়দেশবাসী। গৌড়দেশ নালন্দা পূর্বকালে পঞ্চগৌড় বুঝাইত। সম্প্রতি পূর্বগৌড়কেই অর্থাৎ বঙ্গদেশের রাজধানী মালদহ এবং শ্রীনবদ্বীপকেই গৌড়ের রাজধানীদ্বয় বলা হইতেছে। শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীগৌরহরি গৌড়ের রাজধানী শ্রীমায়াপুর নদ্বীপে উদ্ভূত হইয়াছেন। আর তাঁহার নিজজন শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন শীলোদি রামকেলি গৌড়ে শ্রীগৌরানন্দের প্রচারিত ধর্ম জগতে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমধ্বমুনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষা ও নূনাধিক চত্বারিংশৎ ভক্তিশ্রু-চনা করিয়াছেন। উড়ুপী গ্রামে পয়ঃমূল উত্তরাটী মঠ ও আটটা শিষ্যের দ্বারা ঐ গ্রামে আটটি মঠ স্থাপন করেন। অতঃপরে সেই নবটি মঠ শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের কীর্ত্তি সংরক্ষণ করিতেছে। এতদ্ভাষীত বাসরাঘ মঠ ও বিজয়ধ্বজ মঠ প্রভৃতি অনেকগুলি শাখা-মঠ ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে পাঁচশত বৎসর পূর্বে স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয়দিগের গুরু-পরম্পরা ও উড়ুপীর তত্ত্ববাদীদিগের গুরুপরম্পরা শ্রীমধ্ব হইতে জয়তীর্থ পর্য্যন্ত একই আছে। শ্রীগৌড়ীয়-পরম্পরায় জয়-তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিদ্ধ এবং তা'শিষ্য দয়ানিধি প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু উত্তরাটী মঠের তত্ত্ববাদী শাখার পরম্পরা জয়তীর্থ হইতে বিদ্যাদ্বারাজ তীর্থ প্রভৃতির নাম উল্লেখ আছে। শ্রীগৌরানন্দের যে সময় উড়ুপীতে গিয়াছিলেন, সেইকালে তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের বহুবর্ষা তীর্থ পীঠাধিপ ছিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষা রচনা করেন, তাহা বেদান্তের শুদ্ধদ্বৈত পর ভাষা। তৎসহ শ্রীগৌরানন্দের প্রচারিত অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-পর বেদান্ত-ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ তত্ত্ব-সন্দর্ভের চীকায় চারিটি ভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন—

ভক্তানাং বিপ্রাণামেব মোক্ষঃ দেবা ভক্তেষু মুখ্যাঃ।

বিরিক্তস্তেব সায়ুজ্যং লক্ষ্ম্যা ভীবকোটিভূম্।

শ্রীরামানন্দের মতে বিশিষ্টাদ্বৈত, নিম্বার্কের মতে দ্বৈতাদ্বৈত এবং শ্রীম-
মায়ীর মতে শুদ্ধাদ্বৈত বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শ্রীমধ্বমুনির জীবন-চরিত্র তাঁহার নিজ শিষ্য ত্রিবিক্রম আচার্য্যের পুত্র নারায়ণ পণ্ডিত 'মধ্ববিজয়' নামক একটী মহাকাব্যে রচনা করেন। তাঁহার রচিত 'অষ্টোত্তরসহস্র শ্লোক-সম্বিত্তি' ষোড়শ সর্গবিশিষ্ট মধ্ববিজয় গ্রন্থই মধ্বাচার্য্যের সামান্যিক জীবন-চরিত্রের মূল আকর।

শ্রীমাদ্ভায়গণের এই বর্তমান হৃদশায তাঁহাদের আচার্য্যের বিষয় যে অনভিজ্ঞতা চালিতেছে, তাহা আলোচনা-প্রভাবে কথঞ্চিৎ অপনোদিত হওয়া আবশ্যিক।

— জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর —

প্রশ্নোত্তর

(শ্রুতি ও ন্যায় প্রস্থান)

১। শাস্ত্রের মধ্যে প্রধান শাস্ত্র কি ?

“উপনিষৎ,—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং শ্বেতাশ্বতথ—এই একাদশ বেদাশিরোমণি উপনিষৎ। সূত্র,—ব্রহ্মসূত্র, চারি অধ্যায় ষোল পাদ। এই দুইটি শাস্ত্র-মধ্যে প্রধান।”

— অঃ প্রঃ ভাঃ, আ ৭।১০৮

২। শ্রুতি-প্রস্থানের প্রতিপাদ্য কি ব্রহ্ম-লাভ নহে ?

“উপনিষৎসমূহ, ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদগীতা—সর্বতোভাবে শুদ্ধভক্তি-শাস্ত্র। স্থলবিশেষে আবশ্যিকতামতে এই সকল শাস্ত্রে ‘কর্ত্তা’, ‘জ্ঞান’, ‘মুক্তি’, ‘ব্রহ্ম-লাভ’ ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু চরম গীমাংসাস্ত্রে শুদ্ধভক্তি বাণীত আর কিছুই উদ্দিষ্ট হয় নাই।”

— অবতরণিকা, রঃ রঃ ভাঃ

৩। অথর্ববেদ ও বৃহদারণ্যকোপনিষৎ কি আধুনিক ? ভৈমিনীর সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য কি ?

“ঋক্, সাম ও যজুঃ—এই তিন বেদ সর্বত্র মাজ ও অধিকস্থলে উক্ত আছে। ইহাতে বোধ হয় যে, অতি পুরাতন মন্ত-সকল এই তিন বেদরূপে সংগৃহীত হয়। কিন্তু অথর্ব-বেদকে নিতান্ত আধুনিক বলিয়া

অবহেলা করা যায় না। যেহেতু, বৃহদারণ্যকে — ‘অশ্ব মহতো ভূতস্ত
 নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্ধেদো যজুর্কেদঃ সামবেদোহথর্ক্যঙ্গিঃ ইতিহাসঃ
 পুরাণং বিজ্ঞা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ স্মৃত্ত্রাণানুযাথানাহুত্বৈতানি সর্বাণি
 নিঃশ্বসিতানি’;—একুপ দৃষ্ট হয়। বৃহদারণ্যকে কদাচ আধুনিক বলা
 যায় না; যেহেতু ব্যাসকৃত সংগ্রহ-সময়ের পূর্বে উহা রচিত হইয়াছে,
 * * *। উদ্ধৃত মন্ত্রে যে পুরাণ-ইতিহাসের উল্লেখ পাওয়া যায়,
 তাহা বৈদিক পুরাতন কথা—যাহা বেদে বর্ণিত আছে, * বিষয়ক বলিয়া
 জানিতে হইবে। মীমাংসক জৈমিনি বেদকে নিত্য বলিয়া স্থাপন
 করিবার জন্য যে-সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে-সমস্ত কোমলশ্রদ্ধা
 ব্যক্তিগণের উপকারার্থ কথিত হইয়াছে। সারগ্রাহী মহাপুরুষেরা
 সারগ্রাহী জৈমিনির সার-তাৎপর্য গ্রহণ করিবেন। জৈমিনির সিদ্ধান্তের
 তাৎপর্য এই যে, যত সত্য বিষয় অবিকৃত হয়, সে-সকলই পরমেশ্বর-
 মূলক, অতএব নিত্য। কিকট, নৈচসক, প্রমদ—এই সকল অনিত্য
 বর্ণন দেখাইয়া যাহারা বেদের মূল-সত্যসকলকে অনিত্য বলিয়া বর্ণন
 করেন, তাঁহারা সত্যকাম নহেন, ইহাই জৈমিনির সিদ্ধান্ত।”

—উপক্রমণিকা, কঃ সং

৪। কি কি বেদ-গ্রন্থ সম্প্রদায়াচার্যগণ স্বীকার করিয়াছেন?

ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য তৈত্তিরীয় ঐতরেয়, ছান্দোগ্য,
 বৃহদারণ্যক ও খেতাশ্বতর—এই একাদশ তাত্ত্বিক উপনিষদ এবং গোপাল-
 তাপনী ও নৃসিংহ-তাপনী প্রভৃতি কয়েকখনি উপাসনা-সহায়রূপ তাপনী
 এবং ব্রাহ্মণ, মণ্ডল, প্রভৃতি ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্বাস্তর্গত কাণ্ড-
 বিস্তারক বেদ-গ্রন্থসমূহ আচার্যগণ স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্যপরম্পরা
 ক্রমে এই সকল বেদ গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে সংপ্রাপ্ত
 প্রমাণ আপ্তবাক্য বলা যায়।”

—জৈঃ সং ১৩শ অঃ

৫। ভ্রাম-প্রস্থানের বৈশিষ্ট্য কি?

“ভারতবর্ষে যে সকল মহা-মহোপাধায় পণ্ডিত নক্ষত্রের ভ্রাম উদ্ভিত
 হইয়া জগৎকে আলোকিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে
 ব্রহ্মসূত্রের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীমচ্ছরারচার্য্য, শ্রীমদ্রামানুজা-
 চার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানী ও তত্ত্ব-সম্প্রদায়ের আচার্যগণ এই ব্রহ্মসূত্রে
 অবলম্বন করিয়া নিজ-নিজ মত সংস্থাপন করিয়াছেন। এমত কি বে-

সম্প্রদায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষা রচনা করেন নাই, সে-সম্প্রদায় ভারতের কিছুনাত্র আচার্য্যত্ব সম্মান লাভ করেন নাই। ব্রহ্মসূত্রের পরিচয় এই যে, বেদান্ত সকল উপনিষৎ-আকারে নিত্য বর্তমান। উপনিষৎসকল সর্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়াও দুর্বোধ। এক বাক্যের অর্থের সহিত অত্র বাক্যের কি সম্বন্ধ, তাহা সহজে বুঝা যায় না। সুতরাং বিদ্বার্থী ব্যক্তির পক্ষে উপনিষৎ-পাঠে বিশেষ ফল হওয়া কঠিন। সদগুরুর উপদেশ ব্যতীত উপনিষদর্থ কখনই জ্ঞেয়্যম্ হয় না। উপনিষদই বেদের শিরোভাগ। জ্ঞানজ্ঞান ও জীবের কর্তব্য কেবল উপনিষদেই আছে। উপনিষদের অর্থ না জানিলে মানব-জন্ম সফল করা যায় না। ভগবান্ বাদরায়ণ এই বিষয় আলোচনা করিয়া সমস্ত উপনিষৎবাক্যের বিষয়বিভাগ-পূর্বক যে সূত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই নাম ব্রহ্মসূত্র। সাংখ্য, পাতঞ্জল জ্যায়, বৈশেষিক ও পূর্বমীমাংসার জ্যায় ব্রহ্মসূত্র কেবল বিচারমাত্র নয়, কিন্তু বেদ-শিরোভাগের যথার্থ তৎপরা-নির্ণায়ক আর্ষ্য-গ্রন্থ বলিয়া ইহাকে সকলেই পূজা করিয়া থাকেন। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান-সংগ্রহের জন্ত ষাঠাদের স্পৃহা আছে, তাঁহারা অত্র কোন শাস্ত্রে অধিক পরিশ্রম না করিয়া ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করুন। ব্রহ্মসূত্রার্থ সংগ্রহ করা জীবের পক্ষে সহজ নয়। সূত্র পাঠ করিলেই যে অর্থ বোধ হয়, একরূপ নহে, সূত্রের ভাষা ব্যতীত সূত্রার্থ বোধগম্য হয় না। অতএব কোন সদগুরুর নিকট সূত্রার্থ শিক্ষা করিতে পারিলে তত্ত্বজ্ঞান হয়। এতলে একটি কঠিন প্রশ্ন এই,—সূত্রের যথার্থ ভাষা কোথায় পাওয়া যায়, অথবা সূত্রার্থ নির্ণায়ক সদগুরুই বা কোথায় পাওয়া যায়? বোধায়ন ঋষি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষা কবিয়াছিলেন, তাহা প্রায় অপ্রাপ্য হইয়াছিল। সারদাপীঠ হইতে বহু বহুসহকারে শ্রীরামানুজস্বামী সেই ভাষা সংগ্রহ করিয়া নিজের শ্রীভাষা রচনা করেন। সংস্কৃত ‘প্রপন্যমৃত’ গ্রন্থে একরূপ দেখা যায়। সারদাপীঠ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের স্থান-বিশেষ। শঙ্করস্বামী অনেক যত্নে ঐ বোধায়ন-ভাষা রচনা নিজ মঠে রাখিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ কি? শঙ্করস্বামী দাক্ষাৎ রূদ্ৰাবতার, তিনি কার্য্যোদ্ধারের জন্ত স্বীয় শারীরক-ভাষা রচনা করেন। সেই ভাষার প্রচলন বৃদ্ধি করিবার জন্ত বোধায়ন-ভাষাকে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন,—একরূপ জনশ্রুতি আছে।”

—‘সমালোচনা’ (বেদান্তদর্শন), সঃ তোঃ ৮১

৬। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষা কোন্টী? শঙ্করাচার্য্য কতৃক বৌদ্ধায়ন ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভাগবতকে গোপন করিবার মূল কারণ কি?

“বেদব্যাসই ব্রহ্মসূত্রের কর্ত্তা। সূত্রসকল রচনা করিয়া তিনি বিচার করিলেন, যে-যে-কারণে উপনিষদর্থ সংগ্রহ-পূৰ্ব্বক সূত্র রচনা করিলাম, তাহা সফল হইল না। আমি স্বয়ং কোন ভাষা না করিলে সূত্র কিরূপে প্রচলিত হইবে? অতএব যে সময়ে সূত্রার্থ প্রকাশ করিবার যত্ন হইতছিল, শ্রীনারদের উপদেশে তিনি তখন শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন। সুতরাং ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতকেই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে প্রণয়ন করিলেন, ইহা নানা পুরাণে কথিত আছে।

মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ অকৃত্রিম ভাষ্য হইলেও বৌদ্ধায়ন ঋষি তদীয় গুরুব আজ্ঞায় একটী রীতিমত ভাষ্য প্রণয়ন করিলেন। জগতে ব্রহ্মসূত্রের দুইটি ভাষ্য বিরাজমান হইল। শঙ্করস্বামী ভগবদজ্ঞ-পালনরূপ কার্য্যোদ্ধারের জন্ত মায়াবাদ-ভাষ্য রচনা করত পুরুষাঙ্ক উভয় ভাষ্যের যাহাতে গোপন হয়, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।”

—‘সমালোচনা’ (বেদান্তদর্শন), সং. তোঃ ৮।১

৭। ব্রহ্মসূত্রের কয়টি বিভাগ ও তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় কি?

“ব্রহ্মসূত্র—চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ে চারিটি করিয়া পাদ আছে। * * * ব্রহ্মসূত্রের প্রথমোধ্যায়ে সমস্ত বেদের ব্রহ্মে সমন্বয় : দ্বিতীয়ে—সকল শাস্ত্রের সাহিত বিরোধ পরিহার; তৃতীয়ে—ব্রহ্ম প্রাপ্তির সাধন এবং চতুর্থে—ব্রহ্ম-প্রাপ্তিই পুরুষার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মমবস্থা, নির্মলচিত্ত, সংপ্রসঙ্গশূন্য, শুদ্ধালু, শম-দমাদিসম্পন্ন জীব এই শাস্ত্রে আধিকারী, এই শাস্ত্র স্বয়ং বাচক এবং ব্রহ্ম ইহার বাচ্য; সুতরাং পরস্পর বাচ্য বাচক-সম্বন্ধ। শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয়—নিরদ্বন্দ্ব বস্তুকানন্ত গুণগণ অচিন্ত্যানন্ত-শক্তি সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। অশেষ দোষ-বিনাশ-পুরুষের তৎসংস্কার-কারক ইহার প্রয়োজন। এই শাস্ত্রে বিদ্য, সংশয়, পুরুষপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি—এই পাঁচটি ভাষ্যাবয়ব। অধিকরণ অর্থাৎ অধ্যায়ের অংশ বিশেষের নাম—‘ভাষ্য’; বিচার-যোগ্য বস্তুকে নাম—‘বিষয়’; এক-বাক্য-স্বতন্ত্র পরস্পর-বিরোধী নানা-অর্থের বিচারের নাম—‘সংশয়’; প্রতিকূল অর্থের নাম—‘পুরুষপক্ষ’ এবং প্রামাণিকরূপে অভ্যুপগত অর্থের নাম—‘সিদ্ধান্ত’।”

—‘সমালোচনা’ (বেদান্তদর্শন), সং. তোঃ ৮।১

৮। বেদান্তসূত্রাবলম্বনে আচার্য্যগণ কি কি দার্শনিক মত প্রচার করিয়াছেন?

“উপনিষদ্-বাক্যাগুলিকে ‘বেদান্ত’ বলা যায়। সেই বেদান্তকে সুন্দর-রূপে অর্থ করিবার জন্য বিষয়বিভাগক্রমে অধ্যায়-চতুষ্টয় সংযুক্ত ‘ব্রহ্মসূত্র’ নামে শ্রীবেদব্যাস যে-সকল সূত্র রচনা করিয়াছেন, তাহাকেই ‘বেদান্তসূত্র’ বলা যায়। বিদ্বজ্জগতে বেদান্তসূত্রগুলি বিশেষ সম্মানের সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, এইসকল বেদান্ত-সূত্রে যাহা উপদিষ্ট আছে, তাহাই যথার্থ বেদার্থ। মত্যাচার্য্যগণ বেদান্ত-সূত্র হইতে স্বীয় মতপোষক সিদ্ধান্ত বাহির করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য সেই সকল সূত্র হইতে ‘বিবর্তবাদ’ উপদেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ব্রহ্মের পরিণতি করিলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকে না; অতএব পরিণামবাদ ভাল নয়, বিবর্তবাদই ভাল। বিবর্তবাদের অন্য নাম ‘মায়াবাদ’। তিনি বেদমন্ত্রসকল আবশ্যকমত সংগ্রহ করত বিবর্তবাদের পোষকতা করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, পরিণামবাদ পূর্বকাল হইতে প্রচলিত। শ্রীশঙ্কর বিবর্তবাদ স্থাপন করিয়া পরিণামবাদকে ফুটিত করিয়াছিলেন। বিবর্তবাদ একটী মতবাদ; তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ‘দ্বৈতবাদ’ সৃষ্টি করেন। দ্বৈতবাদ-স্থাপক বেদমন্ত্রসকল সজ্জিত হইয়া তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছে। এইরূপে শ্রীমদ্-রামানুজাচার্য্য কতকগুলি বেদ-মন্ত্র অবলম্বন-পূর্বক ‘বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ’ স্থাপন করিয়াছেন। আবার, শ্রীনিহাদিত্যাচার্য্য অনেকগুলি শ্রুতি-বচন অবলম্বন-পূর্বক ‘দ্বৈতাদ্বৈতবাদ’ স্থাপন করিয়াছেন। পুনরায় শ্রীবিষ্ণুস্বামী কতক-গুলি শ্রুতি-বচন অবলম্বন-পূর্বক সেই বেদান্তসূত্র হইতে ‘শুদ্ধদ্বৈতবাদ’ প্রচার করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতে যে মায়াবাদ প্রচলিত হইয়াছে, তাহা ভক্তিতত্ত্ব-বিরুদ্ধ। বৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয় পৃথক পৃথক মত প্রচার করিয়াও তাঁহাদের সিদ্ধান্তকে ভক্তিমূলক করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত শ্রুতি-বচনের সম্মান-পূর্বক যেমন সারসিদ্ধান্ত হয়, তাহাই শিক্ষা দিয়াছেন; তাহার নাম—‘অচিন্ত্যভেদাভেদ’-তত্ত্ব। তিনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াও তাঁহার মতের সার-মাত্র স্বীকার করিয়াছেন।

—জৈঃ ধঃ ১৮শ অঃ

৯। বেদান্ত কি নির্বিশেষ-জ্ঞানশাস্ত্র?

“বেদান্ত-শাস্ত্রটী সৰ্ব্বতোভাবে ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক দর্শন-শাস্ত্র।”

—তঃ বিঃ

১০। বেদান্তভাষ্যের ক্রমবিকাশ বা মধুর-রসাস্থিত তত্ত্ব আবিষ্কারের ইতিহাস কি ?

“সঙ্কর্ষণাবতার শ্রীরামানুজ বোধায়ন-ভাষ্য সংগ্রহ করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন-পূর্বক দ্বীয় শ্রীভাষ্য জগতে প্রচার করিয়া স্বতন্ত্র যথার্থ অর্থ জগৎকে দিষ্টাছিলেন। সেই শ্রীভাষ্যে যে মধুর রসাস্থিত তত্ত্ব অনাবিস্কৃত ছিল, তাহা সাধু জিজ্ঞাসুদিগকে দিবার জন্য শ্রীমদগোবিন্দদেব শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকে আজ্ঞা করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রিত সর্ববেদাধ্যয়নশীল বলদেব জয়পুর প্রদেশে এই গোবিন্দভাষ্যের আবিষ্কার করেন।”

—‘সমালোচনা’ (বেদান্তদর্শন), সঃ তোঃ ৮।১

১১। বৈষ্ণবের পক্ষে গোবিন্দভাষ্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি ?

“অনেকেই মনে করেন,—‘আমি বৈষ্ণব’ : কিন্তু কী কী বিষয় জানিলে ও কী কী করিলে জীব বৈষ্ণব-পদব্যাচ্য হন, তাহা অবগত হইতে গেলে শ্রীগোবিন্দভাষ্য পাঠ করা আবশ্যিক। এই গোবিন্দভাষ্য বেদান্তই বৈষ্ণবের পক্ষে অমূল্য নিধি।”

—‘সমালোচনা’ (বেদান্তদর্শন), সমালোচনী সঃ তোঃ ৮।১

—জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

কর্তব্য

কোন মন্ত্রে চলে বিশ্ব নাথ চারি ধারে ?

মন্ত্রটীরে জানিবারে সবে চেষ্টা করে ॥

ধার্মিক তাহারে কহে ধরম বলিয়া ।

সত্তারে ধরিছে ক্ষম—কারণ দেখিয়া ॥

আশুরিক দস্তভরে ধর্ম্যে ঘৃণা করি’

কর্তব্য বলিয়া কহে বীরত্ব বিধারি—

পিতা, মাতা, দেশ, দশ, মনুষ্যোত্তর শ্রাণী ।

কর্তব্য বলিতে কার্য্য ইহা প্রতি জানি ॥

“পিতা স্বৰ্গঃ”, সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ বলে শিত্তভক্ত ।
 “জননী জন্মভূমিষ্চ” বলে মাতৃভক্ত ॥
 “সবার হইতে মানুষ শ্ৰেষ্ঠ” নৃভক্ত-বাক্য ।
 শক্তি, শিব, সূৰ্য্য শ্ৰেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ-লক্ষ্য ॥
 নিজ ইষ্টদেবে সবে বালিলেও শ্ৰেষ্ঠ ।
 শাস্ত্র বিচাৰণে লাভ হয় সত্য ইষ্ট ॥
 শাস্ত্র কহে,—কৃষ্ণ হন সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ পিতা ।
 মাতা, পতি, ভ্রাতা, সখা, গুরু ও দেবতা ॥
 অন্ন-জল যাহা খাই সকলই তাঁহার ।
 তাঁহার ভূমিতে বাস, শ্বাস-বায়ু তাঁর ॥
 তাঁহার তপন-তাপে শৈত্য দূর করি ।
 তাঁহার অনল বলে অন্ন পাক করি ॥
 তাঁহার কৰুণা বলে ঙ্ঠর মাঝারে ।
 রক্ষা পাই’ ছন্ম লভি’ এই ধরা ’পরে ॥
 তাঁর কৃপাকণা ভিন্ন কা’র শক্তি নাই ।
 আশ্চর্য্যক বৃষ্টি ছাড়ি’ তাবি দেখ ভাই ॥
 পিতামাতা-সেবকও নরকভাগী হয় ।
 বিষ্ণুভক্ত নিরয়গামী কদাচিৎ নয় ॥
 পিতা, মাতা, নর, দেব কেহ কভু নাহি
 রক্ষিবারে, যদি কৃষ্ণ রক্ষা নাহি করে ॥
 শৈব কাশীৰাজ আর শাক্ত দশাননে ।
 নিজ ইষ্ট নারিলেক রক্ষিবারে রণে ॥
 আর দেখ যদি কৃষ্ণ চাহে রক্ষিবারে ।
 কারও শক্তি নাহি তা’র কেশস্পর্শ করে ॥
 প্রহ্লাদ দৃষ্টান্ত তাহে দেখহ বিচারি’ ।
 হিরণ্যকশিপু মৈল বিষ্ণুভক্তবৈরী ॥

আরও দেখ পিত্রাদি সম্বন্ধ অনিত্য ।
 জন্মান্তরে অণুপিতা হয় মায়াবন্ধ ॥
 নিত্যপিতা নিত্যপতি কৃষ্ণ সর্বকাল ।
 কৃষ্ণভক্তে ময়াণেহ নাহিক বিশাল ॥
 মুখ্য ত্যজি' গৌণপ্রতি কর্তব্য-বিচার ।
 অজ্ঞান বলিয়া তাহা সর্বত্র প্রচার ॥
 সকল কর্তব্য ত্যজি' কৃষ্ণ ভজিবারে ।
 সর্বশাস্ত্র উপদেশ দেয় সবাকারে ॥
 “সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য” চরমে আদেশ ।
 গীতা-শাস্ত্র সেইহেতু স্থাপিত বিশেষ ॥
 “দেবষিভূতাপ্ত” শ্লোকে ভাগ্যতবর্য্য ।
 অশ্বগী—শ্রীকৃষ্ণভক্ত স্থাপে অনিবার্য্য” ॥
 অশ্বগী অণু সেবক কভু নাহি হয় ।
 কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা অণু পথে যায় ॥
 অতএব হরিসেবা কর্তব্যের শ্রেষ্ঠ ।
 মাধুরী বুঝে না সেই যে জন নিকৃষ্ট ॥

— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

সন্দর্ভ-সার

(ভক্তিসন্দর্ভ-২০)

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—হে উদ্ধব ! বেদনাস্ত্রী ভগবদ্বাণীভে
 সত্য সনাতন ধর্ম বর্তমান । কালক্রমে উহা প্রলয়ে লুপ্ত হইলে আমি উহা
 ব্রহ্মার নিকট কীর্তন করিয়াছিলাম । চতুর্বিধ প্রলয়েও ভক্তি বর্তমান থাকে ।
 সকল যুগেই ভক্তি বর্তমান । সত্যযুগে ধ্যানদ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা
 ও দ্বাপরে অর্চনকার্য্যে যাহা পাওয়া যায়, কলিতে কেবল নাম-সংকীর্তন দ্বারা
 সে সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

সা হানিস্তুমহচ্ছিদ্রং স গোহঃ স চ বিভ্রমঃ ।

যন্মুহূর্তং ক্ষণং বাপি বাস্তুদেবো ন চিন্তাতে ॥

যে মুহূর্তে বা যেক্ষণে ভগবান বাস্তুদেবের চিন্তা না হয়, তাহা জীবের পক্ষে মহাক্রান্তি, মহাদোষ, মোহ ও বিভ্রমজনক ।

সকল অবস্থাতেই ভক্তির অবস্থান । গর্ভে অবস্থানকালে শ্রীপ্রহ্লাদকে শ্রীনারদ ভক্তির কথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন ; বাল্যকালে দ্রুব, যৌবনে অশ্বরীষাদি, বার্ককো ধৃতরাষ্ট্রাদি, মৃত্যুকালে অজামিলাদি এবং স্বর্গবাসকালেও চিত্রকেতু প্রভৃতিতে ভক্তির অবস্থান দেখা যায় ।

শ্রীনৃসিংহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

যথা যথা হরেনাম কীর্ত্তয়ন্তি স নারকাঃ ।

তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্তো দিবং যযুঃ ॥

নারকিগণও যে যে ভাবে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিল, তাহারাই সেই সেই ভাবেই শ্রীহরিভক্তি বরণ করিতে করিতে স্বর্গে গমন করিয়াছিল ।

এইজন্যই শ্রীভগবানকে দুর্ব্বাসা বলিয়াছিলেন—

যুচ্যেত যন্মায়ুদিতে নারকাস্বপি । (ভাঃ ৯।৪ ৬২)

আপনার নাম উদিত হইলে নারকীও মুক্ত হয় ।

শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি,—

এতর্কিষিদ্ধমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্ ।

যোগনাং নৃপ নির্ণীতং হরেনামাহুকীর্ত্তনম্ ॥

(ভাঃ ২।১।১১)

হে রাজন্, বিষয়-ভোগ হইতে নির্বেদভাবযুক্ত অভয়াভিলাষী যোগি-গণের পক্ষেও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে । অতএব সাধক ও সিদ্ধাবস্থাদি সকল সময়েই ভক্তির অনুষ্ঠান বিহিত ।

ব্যতিরেক দৃষ্টান্তও দেখা যায়—

কিং বেদৈঃ কিমু শাস্ত্রৈর্বা কিংবা তীর্থনিষেবণৈঃ ।

বিষ্ণুভক্তি-বিগীনানাং কিং তপোভিঃ কিমধ্বরৈঃ ॥

কিং তস্য বহুভিঃ শাস্ত্রৈঃ কিং বা তপোভিরধ্বরৈঃ ।

বাজপেয়-সহস্রৈর্বা ভক্তির্যস্য জনাৰ্দ্দনে ॥

(বৃহন্নারদীয় ও পাদ্ম)

বিষ্ণুভক্তিবিহীন জনগণের চারিদেও ও শাস্ত্রাদির অনুশীলনে, তীর্থসেবায়, তপস্যায় বা যজ্ঞানুষ্ঠানাদিতে লাভ কি? আবার কনাদিনে ষাঁহার ভক্তি আছে, তাঁহার বহুশাস্ত্র অনুশীলন, তপসাচরণ, যজ্ঞানুষ্ঠান বা সহস্র বাজপেয় অনুষ্ঠানেই বা কি প্রয়োজন?

রাজর্ষি পরীক্ষিতের প্রাণি শীলুকদেবোক্তি—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো

মন্তস্বিনো মন্তবিন্দঃ স্তম্ভজনাঃ ।

ক্ষেমং ন সিন্ধতি বিনা যদর্পণং

তস্মৈ স্তুতদ্রশবসে নামো নমঃ (ভাঃ ২।৪ : ৭)

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাস্থাপনা

ন সাধাবা ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ ।

ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ

স্বরেশলোকোহপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ।

(ভাঃ ৫।১৯২৩)

যযাচ আনয়া কিরীটকোটিভিঃ

পাদৌ স্পৃশন্নচুতমগসাধনম্ ।

সিদ্ধার্থ এতেন বিগৃহ্যতে মহান্

অহো সুরাণাম তমো ধিগাঢ্যতাম্ ।

(ভাঃ ১০।৫২।৪১)

কি তপস্বী, কি দানশীল, কি যশস্বী, কি মন্তবিন্দ, কি সনাতন পুরুষগণ — কেহই ষাঁহাকে স্ব-দ-অনুষ্ঠানাদি সমর্পণ না করিয়া কোন মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না, সেই মঙ্গলকীৰ্ত্তি শ্রীহ'রকে নমস্কার ।

যেখানে বৈকুণ্ঠ-কথা-স্থাপসরিৎ প্রবাহিত হয় না, যেখানে তদ্ব্যপ্রিত্ত নাধু ভাগবতগণ বাস করেন না, যেখানে নাগ-সংকীৰ্ত্তনাদিরূপ বিষ্ণুবক্ত নৃত্য-গীত-বাদ্য তত্ত্বপুঙ্জনরূপ মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয় না, তাহা ব্রহ্মলোক হইলেও আশ্রয়যোগ্য নহে ।

যে দেবেন্দ্র শিরঃপ্রিত মুকুটোপভাগ দ্বারা বহুবার সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক ঐ অচ্যুতের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে কবিত্তে ভৌমবধাদি অতীষ্ট সিদ্ধি প্রার্থনা করিয়াছিলেন; সেই ইন্দ্রই সফলকাম হইয়া এখন আবার সেই ইতিগবানের সহিত যুদ্ধ করিলেন । অহো, সত্ত্বপ্রধান দেবগণেরও কিরূপ তমোভাব ! ঐহাদের ঐশ্বর্য্যমদে ধিক্ !

মাতা দেবহুতির প্রতি ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের উক্তি—

সালোক্য-সষ্টি-সামীপ্য-সাক্ষ্যৈঃ স্বমপ্যুত ।

দীয়মানং ন গৃহন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ (ভাঃ ৩২৯।১৩)

আমার নিষ্কামভক্তগণকে সালোক্য, সষ্টি, সামীপ্য, সাক্ষ্য বা সাক্ষ্য মুক্তি দিতে চাহিলেও তাহারা আমার অহৈতুকী সেবা পরিত্যাগ করিয়া ঐগুলি গ্রহণ করে না ।

অশুর বালকদের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদোক্তি—

ন দানং ন তপো নৈজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ ।

প্ৰীযতেহমলয়া ভক্ত্যা হরিরহুদ্বিভুখনম্ ॥ (শ্রীভাঃ ৭।৭।৫২)

নির্মলা ভক্তির দ্বারা শ্রীহরি যেক্রপ প্ৰীত হন, দান, তপস্যা, পূজা, শৌচ ও ব্রতাদি দ্বারা তিনি তদ্রূপ প্ৰীত হন না । কেননা শ্রীহরিভক্তি ব্যতীত অত্ৰ সবই বিড়ম্বনা মাত্র ।

শ্রীবাস-প্রতি শ্রীনারদোক্তি—

নৈষ্কর্য়ামপ্যচ্যুতভাববর্জিতং

ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্ ।

কুঃ পুনঃ শব্দভদ্রমীশ্বরে

ন চাপিতং কৰ্ম যদপ্যকারণম্ ॥ (ভাঃ ১।৫।১২)

নৈষ্কর্য়া ও যদি অচ্যুতভাববর্জিত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ নিরূপাধি জ্ঞান কখনই অধিক শোভা পায় না ; তখন সাধন ও ফলকালে দুঃখরূপ কৰ্ম নিষ্কাম বা সর্কোত্তম হইলেও ভগবান্ শ্রীহরিতে অপিত না হইলে উহার শোভা কিরূপে হইবে ?

বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণের প্রতি চতুঃসনের উক্তি—

নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং

কিঞ্চিদপি তভয়ং ক্রব উন্নয়ৈস্তে ।

যেহং ত্বদজিঃশরণা ভবতঃ কথায়াঃ

কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ (ভাঃ ৩।১৫।৪৮)

হে ভগবন্, আপনার অপ্ৰাকৃত যশঃই একমাত্র কীর্ত্তনীয় ও পরম পবিত্র । যে সকল বুদ্ধিমান্ পুরুষ আপনার কথামৃত-রসজ্ঞ ও আপনার

পাদপদ্মে শরণাগত, তাঁহারা মোক্ষ নামক আপনার চরম প্রসাদকেও যখন আদর করেন না, তখন আপনার আকুটি-প্রভাবে ভয়প্রাপ্ত ইন্দ্রাদি দেবতার পদ সম্বন্ধে ত কথাই নাই অর্থাৎ উহাকে ভক্তগণ নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করেন। এই সকল ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত দ্বারাও ভক্তিরই মাহাত্ম্য জানা যায়।

শ্রীশুকদেবের বাক্য —

তস্মাৎ সৰ্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সৰ্বত্র সৰ্বদা ।

শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিভব্যশ্চ স্তবো ভগবান্নৃণাম্ ॥

(ভাঃ ২।২.৩৬)

অতএব হে রাজন্ ! সকল জীবের পক্ষে সৰ্বাত্ত্বকরণে সৰ্বদেশে সকল সময়ে ভগবান্ শ্রীহরিই শ্রবণীয়, কীর্ত্তনীয় ও স্তবণীয়।

শ্রুতি-স্তবে “ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং । ভবত উপাসতে-
হজ্জিদ্মভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ।” (ভাঃ ১০।৮৭।২০)। অর্থাৎ তত্ত্ববিদগণ
ভগবচ্চরণসেবাকেই জীবগণের একমাত্র গতি বলিয়া বিচারপূর্বক নিগমোক্ত
সৰ্বকর্মফলার্পণ-ক্ষেত্রে এবং সংসার-নিবর্তক আপনার পাদপদ্মযুগলকে দৃঢ়
বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার সহিত সেবা করেন। এহলে ইহা বলা হইতেছে যে, কর্মীর যে
কর্ম তাহা সম্যাস পর্য্যন্ত ; কর্মীর ভোগ শরীরপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত । যোগীর যোগ
তাহার সিদ্ধি পর্য্যন্ত ; জ্ঞানীর সাংখ্য তাহার আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত ; ব্রহ্মবাদী
মুমুকুর জ্ঞান মোক্ষ পর্য্যন্ত । ঐ সব সাধন সেই সেই ফলবিশেষ লাভের
যোগ্যতাসাধক । এইপ্রকারকর্মযোগ জ্ঞানাদিতে শাস্ত্রাদির ব্যভিচার (অন্ত-
আচরণও) আছে জানিতে হইতে অর্থাৎ উপায় ও উপেষের মধ্যে পাথক্য-
নিবন্ধন কর্ম-যোগ ও জ্ঞানাদির অহুষ্ঠান শাস্ত্রাদির তাৎপর্য্য নহে । বিস্তৃত
অব্যয় ও ব্যতিরেকভাবে পূর্বকথিত সেই সেই প্রসিদ্ধ মাহাত্ম্য সকল সৰ্বদা
ও সৰ্বত্র প্রতিপন্ন হওয়ায় তাহা পরম নিগূঢ় রহস্য বস্তুর অংশবিশেষ হওয়াই
হরিভক্তির পক্ষে যুক্তযুক্ত । অতএব অভিধেয় ভগবদ্ভক্তি—রহস্য অর্থাৎ
প্রয়োজন-স্বরূপ প্রেমভক্তির অংশ এবং উহা সম্বন্ধ-জ্ঞানরূপ বস্তুত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন
হওয়াতেই একরূপ কথিত হইয়াছে ।

পরবর্ত্তিকালে শ্রীব্রহ্মাও এইরূপে ভাগবত উপদেশ দিতে গিয়া তচ্ছিষ্য
শ্রীনারদকে ঐপ্রকার সঙ্কল্প করাইয়াছিলেন । যথা—

যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি ।

সর্কাত্মত্বখিলাধার ইতি সঙ্কল্য বর্ণয় ॥ (ভাঃ ২।৭।৫২)

যাহাতে অর্থাৎ যেক্রপভাবে বর্ণন করিলে সেই সর্কাত্মা সর্কাত্ম শ্রীহরির প্রতি মানবমাত্রেরই ভক্তির উদয় হয়, তুমি মনে মনে সেইরূপ সঙ্কল্য করিয়া এই ভাগবত বর্ণন কর ।

শ্রীনারদও ভগবান্ বেদব্যাসকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন—

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্

ভুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ ।

উরুক্রমস্তাখিলবন্ধমুক্তয়ে

সমাধিনা হু স্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ (ভাঃ ১।৫।১৩)

অতএব হে মহাভাগ আপনি অব্যর্থদৃষ্টি-সম্পন্ন, নিশ্চলকীর্তি, সত্যনিষ্ঠ ও সেবাব্রতধারী । আপনি জীবের সকল বন্ধন মোচন নিমিত্ত সমাধি অবলম্বনপূর্বক ভগবান্ উরুক্রমের লীলা অনুস্মরণ করুন অর্থাৎ স্মরণ করিয়া বর্ণন করুন ।

ত্বমপ্যদভ্রশ্রুত বিশ্রুতং বিভোঃ

সমাপাতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্ ।

প্রখ্যাহি দুঃখৈর্মুহূরদিতান্ননাং

সংক্লেশনির্কানমুশস্তি নাতুথা ॥ ভাঃ ১।৫।৪০)

হে বিশালকীর্তী (বেদব্যাস) ! যাহা দ্বারা পণ্ডিতগণের জ্ঞানেচ্ছা সঙ্গাপ্ত হয়, তুমি সেই বিভূ শ্রীহরির যশঃই কীর্তন কর ; কেননা তত্ত্ববিদগণ মনে করেন—নানাবিধ দুঃখে মুহূর্মুহূ পীড়িত জীবগণের সমস্ত সম্ভাপ তদ্বারাই উপশম লাভ করে, অতঃ কোন উপায়ে করে না । শ্রীব্যাসদেবও সেই মহাপুরাণ প্রচার-প্রারম্ভে পরম কল্যাণপ্রদা বলিয়া তত্ত্বিকেই সমাধিতে অনুভব করিয়াছিলেন, ইহা তত্ত্বসন্দর্ভে “ভক্তিযোগেন মনসি” প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

করোঁয়ার পানি *

বেদ অপৌরুষেয়। ব্রহ্মা এবং বেদব্যাস এই অপৌরুষেয় বেদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুগত্যে ষাঁহারা বেদ পাঠ করেন, তাঁহাই বেদের মূলপুরুষকে জানিতে পারেন। একলক্ষ শ্লোকে বেদের পরিসমাপ্তি। বেদপাঠাভিমানী পণ্ডিতগণ বেদের কেবল আদি অংশ গ্রহণ করিয়া জগতে বেদাচার প্রচার করিয়া আসিতেছেন। বেদের এই আদি অংশ-আচরণে সাধারণ জীবের লৌকিক মঙ্গল যদিও হয়, চরমে পরাশাস্তি লাভ হয় না। ব্রহ্মা এবং বেদব্যাস এইজন্ত তাঁহাদের বিভিন্ন গ্রন্থে বেদের মূল তাৎপর্য প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহার ব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন—

“ধর্মানত্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্” অর্থাৎ অত্ম সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাসপূর্বক আমার ভজন কর। এখানে অত্ম ধর্মের মধ্যে বেদের পূর্ব অংশকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ ইহাতে ঐহিক, লৌকিক ও পারত্রিক ক্রিয়া-কলাপের সমর্থন-লাভ হয়, কিন্তু ভক্তিপথ-লাভ হয় না। ভক্তির ফললাভে কর্ম-পথ, জ্ঞান-পথ, ও অত্যাভিলাষের পথ অন্তর্হিত হয়। বেদব্যাস তাঁহার অমল গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিপথের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় বলিলেন—

“ন সাধয়তি মাং যোগো ন সংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।

ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মগোজ্জিতা।”

শ্রীমদ্ভাগবতের লীলাকালে বেদপাঠাভিমানী স্মার্ত পণ্ডিতগণের বহু-ভ্রমপূর্ণ বিচারের মধ্যে একটি ঘটনা এখানে আলোচনা করিতেছি। এই ঘটনার নায়ক সুবুদ্ধি রায়কে অপরাধীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করান হইয়াছে। বিচারক-মণ্ডলী--কাশীর বড় বড় স্মার্ত পণ্ডিত। সুবুদ্ধি রায়ের উকিল—তাঁহার নিজ বিবেক। ঘটনার অন্তরালে গোঁড়ের বাদশাহ হোসেন শাহ, জাতিভ্রষ্ট সুবুদ্ধিরায়ের বিচারে রায় কি হইবে তথা সনাতন-ধর্মের মূল শিক্ষা কি, তাহা শ্রবণে উদ্গ্রীব। নিরপেক্ষ দর্শক ও বিচারক—কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোষামী প্রভু সুবুদ্ধি রায় ও হোসেনশাহের পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

* যে পাত্রে মুসলমানদিগের জল থাকে, তাহাকে করোঁয়া বলে।

পূর্বে যবে সুবুদ্ধি-রায় ছিল গোঁড়ে ‘অধিকারী’।

হুসেন-খাঁ ‘সৈয়দ’ করে তাহার চাকরী ॥

দীঘা খোদাইতে তারে ‘মুনসীফ’ কৈলা।

ছিদ্দ পাঞা রায় তারে চাকর মারিলা ॥

পাছে যবে হুসেন-খাঁ গোঁড়ে ‘রাজা’ হইল।

সুবুদ্ধি-রায়ের তিহো বহু বাড়াইল ॥

(মধ্য ২৫।১৮০-১৮২)

হুসেন শাহ গোঁড়ের বাদশাহ হইয়া পূর্বপোষ্টা সুবুদ্ধি-রায়কে পিতৃবৎ শ্রদ্ধা করিয়া নিবিঘ্নে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাদ সাধিল তাঁহার বেগম। বেগম সাহেবা হঠাৎ একদিন হোসেন শাহের সঙ্গে চাকুরের আঘাত দর্শন করিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাদশাহ তাহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। ইহা শ্রবণে বেগম প্রতিহিংসার বশবর্ত্তিণী হইয়া প্রথমে সুবুদ্ধি-রায়ের প্রাণনাশের কথা বলিলেন। পরে কহিলেন—

“* * জাতি লহ’ যদি প্রাণে না মারিবে।”

রাজা কহে,—জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে ॥

হুসেন শাহ পূর্বে সুবুদ্ধি রায়ের আনুগত্যে চাকুরী করিয়া মালিকের নিকট হইতে ‘সুবুদ্ধি’ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ‘সংসর্গজা দোষগুণা ভবান্ত’—এই শাস্ত্রবাক্যের সার্থক রূপের প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইল না। দুষ্টা প্রেয়সীর সংস্পর্শে আসিয়া বাদশাহ নিজ স্ত্রীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া স্বাতন্ত্র্যভাব বিসর্জন দিলেন। বেগমের মনঃক্ষার জন্ত তাঁহার ‘সুবুদ্ধি’ লোপ পাইয়া ‘কুবুদ্ধি’র উদয় হইল—“করোঁয়ার পানি তাঁর (সুবুদ্ধি রায়ের) মুখে দেওয়াইল।”

এই করোঁয়ার পানি সুবুদ্ধি রায়ের মুখে দেওয়াতে বিধর্মীর দ্বারা জাতিভ্রষ্ট হইয়া তিনি ভীষণ বিপদে পড়িলেন এবং তৎকালীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের শাসনের কথা চিন্তা করিয়া ভয়ে ভীত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার মানসে গৃহত্যাগ করিয়া কক্ষী ও জ্ঞানকাণ্ডের স্থান কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, “হায়! হায়! কলিকালে আমার মানব-জন্ম বৃথাই গেল। কলিকালে আমার বুঝি হরিভক্তন হইল না। ‘কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার’। এই নাম-নামী অভেদাত্মক কৃষ্ণের কীর্তন বুঝি আমার দ্বারা

হইল না। এইভাবে বহুমনা তিনি দেশাচারের কবলে পতিত হইয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট প্রায়শ্চিত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—

“প্রায়শ্চিত্ত পুছিলা তিহৌ পণ্ডিতের গণে।

তারা কহে—‘তপ্ত ঘৃত খাওয়া ছাড়’ প্রাণে ॥”

কাশীর স্মার্ত পণ্ডিতগণ বেদাদিশাস্ত্রে পাঠের মূল তাৎপর্য—পরহঙ্গে অবগাহনে অসমর্থ হইয়া ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্ভুজের আশ্রয়ে বিমোহিত হইয়া তপ্ত ঘৃত ভোজনে সুবুদ্ধি-রায়কে জীবন ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা দিয়া বিচারের রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সুচতুর সুবুদ্ধিরায় নিজ সদ্বিবেকে আস্থাবান হইয়া কাশীর পণ্ডিত-মণ্ডলীর রায়ে সংশয়াপন্ন হইলেন এবং সর্বোচ্চ বিচারের আশ্রয়—নিরপেক্ষ বিচারক ও দর্শক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে “মিলি * আপন রত্নান্ত কহিলা”।

শ্রীমদমহাপ্রভু তখন ‘জ্ঞান’-ক্ষেত্র বারাণসীতে অবস্থান করিয়া মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণকে তথা তাঁহাদের দলপতি প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়-সিদ্ধ অপূর্ব ভক্তিসিদ্ধান্ত এবং বেদান্ত যে একমাত্র ভক্তিরই গায়ক—সেই সকল বিচার শিক্ষা দিতেছিলেন।

“সর্ব শাস্ত্র খণ্ডি’ প্রভু ‘ভক্তি’ করে দার।

সযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায়ে সবার ॥

উপদেশ লঞা করে কৃষ্ণ-সংকীর্তন।

সর্বলোক হাসে, গায়, করয়ে নর্ত্তন ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।২০-২১)

এইভাবে মহাপ্রেম-রসপ্রদাতা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাশীবাসীদিগকে বৈষ্ণব করিয়া বিভিন্ন লীলা প্রকাশ করিতেছিলেন।

শরণাগত সুবুদ্ধি রায়ের এবিধ ঘটনা শ্রবণ করিয়া মহাবদান্ত শ্রীগৌরসুন্দর কন্ঠজড় স্মার্ত পণ্ডিতগণের পার্থিব বিচারধারাকে হীনজ্ঞান করিয়া পারমার্থিক বিচারের সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা বা রায় দিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রীলকবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় তাহা নিম্নরূপ—

প্রভু কহে—ইহাঁ হৈতে যাহ বৃন্দাবন।

নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন ॥

এক ‘নামাভাসে’ তোমার পাপ-দোষ যাবে।

আর ‘নাম’ লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥

আর কৃষ্ণনাম লৈতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি ।

মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥ (২: ২৫ ১৯১-১৯৩)

সংকীৰ্ত্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বাণী শ্রবণে সুবুদ্ধি রায় সৰ্বসংশয় ছেদন করত তাঁহার আদেশে নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা প্রভৃতি তীর্থস্থান পরিক্রমা করিয়া অবশেষে গথুরা-বন্দাবনে পৌঁছাইলেন এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের কপালাভে “সৰ্বযজ্ঞ হইতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার”—এই প্রায়শ্চিত্ত-যজ্ঞ হৃদয়ে উপাধ্ব হওয়ায় বেদপাঠাভিমাত্রী স্মার্ত পণ্ডিতগণের মুখে ভয় নিক্ষেপ করতঃ আনন্দে হরিভজন করিতে লাগিলেন ।

— পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

বালুরঘাট, রাজেশ্বরী বেতার-ঘাট

শ্রীশ্রী একাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ড, অষ্টাবিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব-প্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬০ পৃষ্ঠার পর)

বিজয়া একাদশী

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে বাহুদেব ! ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী-মাহাত্ম্যাদ অনুগ্রহপূর্বক আমার নিকট বর্ণন করুন ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে যুধিষ্ঠির এই বিজয়া একাদশী সম্বন্ধে একসময় নারদ কমলাসন ব্রহ্মাকে শুশ্রূ করিলে ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই তোমার নিকট বলিতেছি । এই পবিত্র ব্রত পাপনাশকারী এবং রাজগণের নিশ্চয়ই জয় দান করেন বলিয়া বিজয়া নামে বিখ্যাত ।

পূৰ্বকালে শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দশ বৎসরের জন্ম বনে গমন করিয়াছিলেন । সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তিনি পঞ্চবটী বনে অবস্থান করিতেছিলেন । সেই সময় লঙ্কাপতি রাবণ লোভবশতঃ রামভার্য্যা সীতাদেবীকে হরণ করে । স্বীয় অঙ্ক-লক্ষ্মীর জন্ম ছুঃখিত রামচন্দ্র চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে মৃতপ্রায় জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহার নিকট রাবণের সীতা-হরণ-বৃত্তান্ত অবগত হইলেন । তৎপর অরণ্য মধ্যে নিহত কবন্ধকেও দেখিতে পাইলেন । সুগ্রীবের সহিত রামচন্দ্রের মিত্রতা-স্থাপন হইলে সুগ্রীব ও অত্যাচারী বানরসৈন্য সীতার উদ্ধারার্থ রামের সহিত মিলিত হইলেন ।

তৎপর হনুমান্ লঙ্কাস্থ উত্থানমধ্যে সীতাদেবীকে দেখিতে পাইয়া শ্রীরাম-চন্দ্রের পরিচয়-জ্ঞাপক তজুরী তাঁহাকে প্রদানাত্তর ততাত্ত মহৎ কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়া পুনরায় শ্রীরাম-সমীপে আগমন পূৰ্ব্বক সমস্ত কথা বর্ণন করিল। হনুমানের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের অভিমতে সমুদ্রতীরে গমন করিলেন। সেই দুস্তর সমুদ্র দর্শনে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন, “হে লক্ষ্মণ! কি পুণ্যে এই বরুণালয় অগাধ সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া যায়? উহা নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর জলজন্তু দ্বারা পরিপূর্ণ। কিভাবে ইহা উত্তীর্ণ হইবে, তাহার কোনও উপায় আমি দেখিতেছি না।”

লক্ষ্মণ বলিলেন—“সর্ববেত্তা আদিদেব আপনি, আপনাকে আমি কি উপদেশ দিব? তবে বকদাল্ভ্য নামক মুনি এই দ্বীপ-মধ্যে অবস্থান করেন। এই স্থান হইতে অৰ্দ্ধ যোজন দূরে তাঁহার আশ্রম। হে রাঘব, অত্র ব্রাহ্মণগণও সে স্থানে বাস করেন। আপনি তথায় গমনপূৰ্ব্বক সেই প্রাচীন ঋষিশ্রেষ্ঠকে ইহার উপায় জিজ্ঞাসা করুন।”

লক্ষ্মণের অতিমনোরম এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই বকদাল্ভ্য মহামুনিকে দর্শন করিবার জন্ত ভগবান্ রামচন্দ্র তথায় গমন করিলেন। দেবগণ যেমন মস্তক অবনত করিয়া বিষ্ণুকে প্রণাম করেন, সেইরূপ ভগবান্ রামচন্দ্রও ভক্তরাজ্য মুনিকে প্রণাম করিলেন। মুনিবর শ্রীরাম-চন্দ্রকে পুরাণ-পুরুষ ভগবান্ বলিয়া অবগত হইলেন। তখন ঋষিবর আনন্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“হে রামচন্দ্র কিজন্তু আপনার আগমন হইয়াছে বলুন?”

রামচন্দ্র কহিলেন,—“মুনিবর! আপনার অনুগ্রহে সসৈন্ত আমি এই সমুদ্রতীরে আগত হইয়াছি। রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কাজয় আমার উদ্দেশ্য। আপনার অনুগ্রহে এই দুস্তর সমুদ্র যাহাতে উত্তীর্ণ হইতে পারি সম্প্রতি তাহার উপায় অনুগ্রহপূৰ্ব্বক আমাকে বলুন। এই উদ্দেশ্যে আমি আজ আপনার নিকট আসিয়াছি।”

ইহা শ্রবণ করিয়া সেই বকদাল্ভ্য মুনি সুপ্রসন্নচিত্ত হইয়া পদলোচন ভগবান্ রামচন্দ্রকে বলিলেন, “হে রাম! আপনার অভিলষিত কার্য্যজন্ত সম্প্রতি ব্রতগণের মধ্যে যে উত্তম ব্রত তাহাই করণীয় জানিবেন। যে ব্রতচরণে অনায়াসে আপনার বিজয় হইবে, এবং রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কাজয় করিয়া নিঃশূল কীৰ্ত্তি লাভ করিবেন, একাগ্রচৈতন্য হইয়া সেই ব্রত সম্যক আচরণ করুন। সেই ব্রতটি গোণ-চান্দ ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়া বিজয়া নামক একাদশী-ব্রত। এই ব্রতচরণে আপনি বিজয় লাভ

করিবেন এবং নিশ্চয়ই বানরগণের সহিত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। এই ব্রতের ফলপ্রদ বিধি শ্রবণ করুন”।

দশমী দিবসে সুবর্ণ, রজত, তাম্র অথবা একটি মৃন্ময় কুন্ত সংগ্রহ করিয়া তাহাতে জল ও পল্লব প্রদানপূর্বক উহা চন্দনাদি দ্বারা শোভিত করিয়া তদুপরি সুবর্ণনির্মিত নারায়ণ-মূর্তি স্থাপন করিবেন। একাদশী দিন প্রাপ্ত হইয়া যথাবিধি প্রাতঃস্নান করতঃ নিশ্চলভাবে উক্ত কলসের কণ্ঠে মালা ও অঙ্কলেপনাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া উত্তম স্থানে স্থাপন করিবেন এবং গুবাক্ ও নারিকেল ফল প্রদান সহ বিশেষভাবে পূজা করিবেন। সমস্ত ধাতু ও সমস্ত যব সেই ঘটোপরি বিতাস করিবেন। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য প্রভৃতি যোগে পূজা-পূর্বক সেই কুন্তের নিকট সংকথা দি দ্বারা সমস্ত দিন যাপন করিবেন। রাত্রিতেও সেই কুন্তায়ে জাগরণ করিবেন এবং ব্রতের অখণ্ড (অচ্ছিন্ন) বিধান জন্ত ঘৃতদীপ প্রজ্জ্বালিত রাখিবেন।

দ্বাদশী দিনে সূর্যোদয় হইলে পর সেই কুন্তকে বিসর্জন জন্ত নদী, প্রস্রবণ অথবা তড়াগ সমীপে স্থাপনপূর্বক যথাবিধি পূজা করিয়া দেবতা (নারায়ণ মূর্তি) সহ সেই কুন্ত বেদপারগ ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। হে মহারাজ! কুন্ত সহ অত্যাশ্চর্য মহাদানও যথাশক্তি প্রদান করিতে হয়। এই বিধি অনুসারে আপনি যুগপতিগণের সহিত এই ব্রতটি যত্ন সহকারে সম্পাদন করুন। ব্রতপ্রভাবে নিশ্চয়ই আপনার বিজয় হইবে।”

ব্রহ্মা কহিলেন—“হে নারদ, ঋষির বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুসারে রামচন্দ্র সেই বিজয়া একাদশীব্রত পালন করিলে ব্রতফলে তিনি বিজয়ী হইয়াছিলেন অথাৎ সীতাপ্রাপ্তি, লঙ্কাজয় ও যুদ্ধে রাবণ নিহত হইলে অতুল কীৰ্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং এই বিধি অনুসারে যে সকল মানব এই ব্রত পালন করিবে, তাহাদের এজগতে জয়লাভ ও পরলোকে অক্ষয় সুখপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত জানিবে।”

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন “হে বৃষিষ্ঠির! এই কারণে উক্ত বিজয়া ব্রত অবশ্য কর্তব্য। ইহার কথা পাঠ এবং শ্রবণ করিলেও বজাপের যজ্ঞের ফল লাভ হয়।”

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে ফাল্গুন-কৃষ্ণপক্ষীয়

বিজয়া-একাদশী-মাহাত্ম্য-বর্ণনের অনুবাদ সমাপ্ত

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ন্যাকরণতীর্থ

শ্রীশ্রীগুরুচরণকমলেভ্যো নমোনমঃ

“শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব-সমীক্ষা”-পুস্তকের

প্রতিবাদ

(পূর্ব-প্রকাশিত ১৮শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা. ৩৫০ পৃষ্ঠার পর)

ভগবানের ‘ত্রিযুগ’ নামের সঙ্গতি ও অর্থ

“ইখং নৃতির্যগৃষি” শ্লোকটী হইতে জানা যায়—‘ধর্ম্যং মহাপুরুষ পাসি’—
অর্থাৎ যুগধর্ম্য ভগবান্ পরিরক্ষা করেন। তাহা হইলে কলিকালে প্রচলিত
ধর্ম্যও ভগবান্ রক্ষা করিয়া থাকেন, এই অর্থ করাই সঙ্গত। ‘ত্রিযুগ’ শব্দের
অর্থ—শ্রীভগবান্ প্রত্যক্ষভাবে কলিতে আসেন না, ছন্ন হইয়া আসেন ;
ছন্ন হইয়া আসিলেও যেহেতু ধর্ম্য সংস্থাপন করা যুগাবতারের কার্য্য, তজ্জন্ত
তিনি অবশ্যই তাহা করিবেন। শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু যে যুগাবতার, ইহা পূর্বে
প্রদর্শিত হইয়াছে। ‘ত্রিযুগ’ কথার অর্থে শ্রীভগবান্ কলিতে আবির্ভূত হন
না—এইরূপ ধরিলে শাস্ত্রবিরোধ যে অবশ্যস্তাবী ক্রমশঃ তাহা দেখান হইবে।

শ্রীস্বামীর টীকায় আছে, “বিভাবয়সি—পালয়সি, হংসি—ঘাতয়সি, কলৌ
তু তন্ন করোষি”। এখানে ‘বিভাবয়সি’ ও ‘হংসি’—এই দুইটি পদের সহিত
তৎ-শব্দের অর্থ সঙ্গত হইবে। কুতর্কতীর্থ মহাশয় কিন্তু এই পদদ্বয়কে
অবতার-এর সঙ্গে অর্থ করিতেছেন। ‘অবতার’ শব্দ ‘তৎ’ পদের পূর্বে
উল্লিখিত আছে কি? নাই বলিয়াই এই অর্থ অসঙ্গত। তিন যৎ তৎ
পদের পূর্বে পরামর্শরূপ সঙ্গতিই জানেন না। ‘অত্যাশ্রয় অবতারের হায় পালন
ও প্রতিকূল ব্যক্তির দিবাশ করিয়া ধর্ম্য রক্ষা করেন না, যেহেতু ভগবান্
ছন্ন হইয়া আসেন’—এই অর্থই স্বামীর অভিপ্রেত। ‘ছন্ন’ শব্দের কোনও
অর্থ স্বামী করেন নাই। অতএব ‘ছন্ন’ শব্দের প্রচলিত অর্থই শ্রীস্বামীর
অভিপ্রেরিত বুঝতে হইবে। ‘ছন্ন’ কথার তাৎপর্য্য—‘প্রেমসীত্বিবাবৃত্তং’
—প্রেমসীর কাণ্ডি দ্বারা আবৃত বুদ্ধিতে হইবে। ছন্ন হইয়া আসিলেও
যুগানুরূপ ধর্ম্য কিন্তু ভগবান্ রক্ষা করেন। ‘ছন্ন’ ‘ছদ্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন।
ছদ্ ধাতুর সংবৃত্ত অর্থে প্রয়োগ। তর্কতীর্থ নিজের সুবিধার জন্ত ধাতুর
প্রকৃত অর্থ ছাড়িয়া এক অদ্ভুত হাশুকর অর্থ করিয়াছেন—ইহা সুধীজনের
গ্রহণীয় কি? তিনি ‘ছন্ন’ শব্দে ‘তিরোভূত’ অর্থ করিয়াছেন। এই
উদ্ভট চিন্তা কি করিয়া হইল? বস্তুর অস্তিত্বই অস্বীকার করিলে ছন্নত্ব

অসম্ভব। তর্কতীর্থের অর্থ গ্রহণ করিলেও অর্থাৎ কলিতে কোন অবতারই আসেন না বলিয়া তিনি ‘ত্রিযুগ’, তাহা হইলে নিম্ন শ্লোকাদির সহিত বিরোধ অবশ্যস্তাবী।

১। “সম্ভবামি যুগে যুগে” (গী: ৪।৮ শ্লোকের) ‘যুগে যুগে’ শব্দ-
দ্বয়ের অর্থ প্রতিযুগেই।—ইহা সকল আচার্য্য বলিয়াছেন।

২। ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।

বুদ্ধোন্মাদাহঞ্জনমৃতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ (ভা: ১।৩।২৪)

৩। অথানৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।

জনিতা বিষ্ণুযণসো নাস্ত্য কল্কিজর্গংপতিঃ ॥ (ভা: ১।৩।২৫)

—এই শ্লোকদ্বয়েও কলিযুগ সম্যাকরূপে প্রবৃত্ত হইলে ও যুগসন্ধিক্ষেপে ভগবানের আবির্ভাব হইবে, স্পষ্ট উল্লিখিত।

৪। অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।

ভগবদ্ভক্তরূপেন লোকান্ রক্ষামি সর্বদা ॥ (বৃ: নারদীয় পুরাণ)

৫। কলৌ প্রথমসন্ধ্যায়াং হরিণাম প্রদায়কঃ।

ভবিষ্যতি নবদ্বীপে শচীগর্ভে জনার্দনঃ ॥ (ব্রহ্মযামল)

এই সকল শাস্ত্রবচন এবং আরও বহু শাস্ত্রবাক্য থাকা সত্ত্বেও কলিতে শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হন না—এই প্রকার সিদ্ধান্ত ভণ্ডামি নহে, ইহা কোন পণ্ডিত ব্যক্তি বলিতে পারেন না। কলিযুগে শ্রীভগবানের অবতার আছে এবং থাকিবেও; তথাপি তিনি ‘ত্রিযুগ’ কি করিয়া? ছন্ন হইয়া আসেন বলিয়া ‘ত্রিযুগ’ নামের সার্থকতা। ‘ত্রিযুগ’ নাম কেন হইল এ সম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণু-ধর্মোত্তরীয় বচন,—

প্রত্যক্ষরূপধ্বংসং দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।

কৃতাধিষ্টেব তেনাসৌ ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে ॥

অর্থাৎ সত্য প্রভৃতি তিন যুগে ভগবান্ হরি যদ্রূপ প্রত্যক্ষ রূপ ধারণ করিয়া লোক সকলের দৃশ্য হন, কলিতে সেই প্রকার প্রত্যক্ষরূপে আসেন না—এইজন্য ভগবানের ‘ত্রিযুগ’ নাম শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। উপরের এই শ্লোকই ছন্নহের প্রমাণ।

ভগবান্ প্রতিযুগেরই ধর্মরক্ষক

ধর্মরক্ষা সম্বন্ধে ‘সুতরাং ভগবান্ স্বয়ং ধর্মরক্ষায় যে আশ্বাস দিয়াছেন, উহা কলিভিন্ন যুগের পক্ষেই বুঝিতে হইবে’—তর্কতীর্থ

মহাশয়ের এই উক্তির অসারতাই প্রমাণিত হইল। ‘ভগবান্ অবতীর্ণ হইলে যেহেতু কলির বিনাশই সংঘটিত হইবে, সেইহেতু কলিযুগ মধ্যে ভগবানের অবতার সম্ভব নয়’—তর্কতীর্থের এই উক্তিও অযৌক্তিক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এখন প্রশ্ন এই উক্তি কেবল কলিযুগ সম্বন্ধে কেন? ত্রেতায় একপাদ অধর্ম অর্থাৎ কলি থাকে এবং দ্বাপরে দুই পাদ অধর্ম থাকে। সুতরাং তর্কতীর্থের বিচারে একমাত্র সত্যযুগ ভিন্ন অষ্টযুগে শ্রীভগবানের আবির্ভাবের সম্ভাবনা নাই! কারণ সত্যযুগে অধর্ম না থাকায় সেই যুগে ভগবানের পৃথিবীতে আগমন হইলেও ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে তাঁহার আবির্ভাব হইবে না। কিন্তু শাস্ত্রে দেখা যায়, ভগবদ-বতার আসিয়া প্রতি যুগেরই অধর্ম বিনাশ করেন এবং ‘অধর্ম বিনাশে যুগ নাশপ্রাপ্ত হয় না’—কুতর্কতীর্থ মহাশয়ও ইহা স্থাপন করিয়াছেন এবং কৃষ্ণের আবির্ভাবে দ্বাপর যুগ বিনাশপ্রাপ্ত হয় নাই।

তর্কতীর্থের কথার দাম নাই

তর্কতীর্থের দুইটি উক্তি,—‘এমনকি পরীক্ষিতের রাজত্বকালেও কলি তাঁহার আসর জমাইতে পারে নাই’ ও ‘তাহা হইলে কলির আদি হইতে অন্ত্য পর্য্যন্ত একপাদের অধিক ধর্ম অবস্থান করিতে পারে না এবং তিন পাদ অধর্ম সর্বদাই অবস্থান করিবে। সুতরাং ধর্মের গ্লানি বিদূরিত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই’। কুতর্কতীর্থের এই দুইটি উক্তির কি সম্মতি? কলি-কালেই ত পরীক্ষিত মহারাজের রাজত্ব এবং তাঁহার রাজত্বকালেই কলি যে আসর জমাইতে পারে নাই, ইহা কুতর্কতীর্থের নিজেরই স্বীকারোক্তি। তর্কতীর্থের কথার দাম যে কিছুই নাই, জানা গেল। এই উক্তিদ্বয় যদি মানিয়াই লওয়া হয়, তাহা হইলে—শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইলে তাঁহার অবস্থিতিকালে, এমনকি তাঁহার প্রিয় পার্শ্বদগণের অবস্থিতিকাল পর্য্যন্তও অধর্ম বিস্তার লাভ করিতে পারে না, যেমন নাকি পরীক্ষিতের রাজত্বকাল পর্য্যন্তও কলি বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই; সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রিয় পার্শ্বদগণের অবস্থিতি পর্য্যন্ত কাল সত্যযুগ। অতএব তর্কতীর্থের যুক্তিতেও কলিকালেও ভগবানের অবতার হইতে কোন বাধা নাই।

সাধারণ লোককে ধোকা দিতে বা জ্বালিয়াতি শিখাইতে ‘চোরের মার বড় বলা’—এই গ্রাযানুসারে আলোচ্য তর্কতীর্থ কাব্য-পুরাণতীর্থ মহাশয়ের

উদ্ধৃত শ্রীমদ্বাহুপ্রভুর অবতারত্বের বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণ শ্লোকগুলিকে শোকা বা জাল দলিল বলিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণই অলীক উক্তি। অনন্ত সংহিতা—শ্রীচৈতন্য-জন্মখণ্ড ৫৭ অধ্যায়ে ঐ শ্লোক সকল বিদ্যমান আছে। শব্দকল্পদ্রুমে ‘চৈতন্য’ শব্দপর্যায়েরও এইগুলি ধৃত আছে। এত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও শ্লোকগুলি শাস্ত্রে নাই, তর্কতীর্থ মশায় কিরূপে এই ডাहा মিথ্যা বলিতেছেন সেই ধোকাবাজির বিচার সুধীগণ করিবেন।

বেদাদি শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্বের প্রমাণ

এখানে শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারত্বের দুই একটি প্রমাণ দেখাইতেছি।

১। শ্রুতিপ্রমাণ—

বয়সাম প্রব্রবামা ঘৃতশ্রাস্মিন্ যজ্ঞে ধারয়ামা নমোভিঃ।

উপ ব্রহ্ম শৃণু বচ্ছস্মানং চতুঃশৃঙ্গোহবমীদ্ গৌর এতৎ।

(ঋগাদিবেদচতুষ্টয়ান্তর্গতঃ মন্ত্রঃ)

‘চতুঃশৃঙ্গ’—চারিটি অঙ্গাদি লক্ষণ যার সেই অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র ও পার্শ্বদ্রুপ অর্থাৎ শ্রীগৌর যেমন ‘এতৎ ব্রহ্ম’—নাম-রূপ-গুণ-লীলাময় শ্রীকৃষ্ণকে বা শ্রীনামকে ‘অবমীৎ’—প্রকাশ করিয়াছেন, সেইপ্রকার ‘বয়ং’—আমরা ‘নমোভিঃ’—নমস্কারযুক্ত হইয়া ‘অস্মিন্’—এই কলিতে ‘যজ্ঞে’—সংকীর্তন যজ্ঞে ‘ঘৃতশ্র’—হবিষরূপ পরব্রহ্মের ‘তৎনাম ধারয়ামা’—সেই নামটিকে ধারণ করিব; ‘প্রব্রবামা’—সর্বদা উচ্চারণ করিব। শাস্ত্রমাণং—কীৰ্ত্তিত হইলে—‘উপ শৃঙ্গবৎ’—অধিক ভাবে শ্রবণ করিব।

২। যদা পশুঃ পশুতে রুক্মবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যাপাণে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমশাস্তিমূপৈতি ॥

—মণ্ডুকে

যখন দর্শনকর্তা (শ্লোক) রুক্মবর্ণ সর্বকর্তা ব্রহ্মযোনি পুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি বিদ্বান্ হয়েন; তাঁহার পাপপুণ্য বিধৌত হইয়া যায়, তিনি মায়ায় সম্বন্ধরহিত হইয়া পরমা শাস্তি লাভ করেন। এখানে ‘রুক্মবর্ণ’ শব্দের তাৎপর্য গৌর ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মেরও আশ্রয়। এই শ্রুতিটি আচার্য্য শ্রীশঙ্কর শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রে “সুবর্ণ-বর্ণো হেমাজ” এই নামের প্রমাণরূপেই উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ উপরের শ্রুতি ও ‘সুবর্ণবর্ণো...’ ইত্যাদি শ্লোকের অর্থ একই।

৩। মহান্ প্রভুবৈ পুরুষঃ সত্ত্বমৌষঃ প্রবর্তকঃ।—(শ্বেতাশ্বতর)

তিনি মহান্, অনুগ্রহ-নিগ্রহে সমর্থ পুরুষ; পরমসত্ত্বরূপ প্রেম নিজে আশ্বাদন করিয়া আশ্বাদন করাইলেন।

৪। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্কো বরাঙ্গশ্চন্দনাজলী।

সন্নাসকুং শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ (বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্র)

৫। শ্রীবৃন্দারদীয় পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ সংখ্যক শ্লোকে মার্কণ্ডের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি—

অহমেব কলৌ বিপ্র নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।

ভগবদ্ভক্তরূপেন লোকান্ রক্ষামি সর্বদা ॥

হে, বিজ্ঞ! আমিই নিত্য নিজের বিগ্রহ গোপন করিয়া ভগবদ্ভক্তরূপে কলিতে লোক সকলকে সর্বদা রক্ষা করি।

উক্ত শ্লোকও শ্রীমন্মহাপ্রভুর চন্দ্রস্বের কথা ব্যক্ত করিতেছে।

৬। ব্রহ্মযামল চৈতন্যকল্প ১অঃ ৩৪ শ্লোক—

কলৌ প্রথমসঙ্ক্যায়াং হরিনামপ্রদায়কঃ।

ভবিষ্যতি নবদ্বীপে শচীগর্ভে জনার্দনঃ ॥

জীবনিস্তারণার্থায় নামনিস্তারণায় চ।

যো হি কৃষ্ণঃ স চৈতন্যো মনসি ভ্রাতী সর্বদা ॥

শ্রীশঙ্কর পার্বতীকে কহিলেন—কলির প্রথম সঙ্ক্যায় হরিনাম-প্রদায়ক জনার্দন জীবনিস্তার ও হরিনাম প্রচার নিমিত্ত নবদ্বীপে, শচীগর্ভে প্রকট হইবেন। সেই কৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে আমার মনে সর্বদা প্রকাশিত হইতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে পয়ং ভগবান্—অবতারী পুরুষ, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে আরও বহু প্রমাণ আছে। তবে দুষ্প্রবৃত্তির বশে তর্কতর্কের ভাহাতেও জ্ঞানোদয় হইতেছে না, ইহাই সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়।

এখন দেখা যাইতেছে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন উক্তি এবং স্পষ্টোক্তি—উভয়ই শাস্ত্রে আছে। ইহার কারণ অল্প কিছু নহে; উভয় প্রকার উক্তি দেখিয়া স্মার্তগণ সংশয়ান্বিত হইয়া যাহাতে শ্রীগৌরভক্তনে প্রবৃত্ত না হয়, সেইজন্ত শাস্ত্রের ইহা কৌশলবিশেষ বুদ্ধিতে হইবে। শ্রীভগবান্ সকলের কাছে প্রকাশিত হইতে চান না, গোপন থাকিতে চান।

প্রমাণ—“নাহং প্রকাশঃ সর্বশ্চ যোগমায়া-সমাবৃতঃ” (গীতা)। সেমতেও উহাদের নিকট ভগবানের ছন্নত্ব সিদ্ধ হয়।

ভাগবত বিরোধী মত মাত্রই অপ্রামাণিক

এখন শ্রীভাগবতের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অর্থাৎ উহা “বেদবাস রচিত কিনা এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেন—তাহার কারণ শ্রীভাগবতের ভাষা অত্যন্ত কঠিন” ইত্যাদি। তর্কতীর্থে এই উক্ত কত অসার তাহা পণ্ডিতমাত্রই বুঝিবেন। শ্রীভাগবতের প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত (?) সন্দেহ পোষণ করে বলিয়াই যদি ইহা অপ্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে বেদাদিতে বিধর্মীর চিরশঙ্কা আছে বলিয়া বেদাদিকেও অপ্রমাণ বলা যায় কি? যেমন “ত্রয়োবেদস্ত কর্তারো ভগু ধূর্ত নিশাচরাঃ” (চার্বাক) ; অর্থাৎ “যাহারা তপু, ধূর্ত ও নিশাচর, তাহারা ই নিজেদের জীবিকার্জনের জন্ত বেদসৃষ্টি করিয়াছে”। জৈমিনী, কাঠকাদি সংজ্ঞা দর্শনে ঐ প্রকার শঙ্কা অপনোদিত হয়।

‘আচারমাধবে’ও স্মৃতি সকলের অপ্রামাণ্য শঙ্কা রহিয়াছে। সাংখ্যকারগণ বেদের জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ হিংসাদেবহেতু অনুষ্ঠানের অনুপযোগী বলিয়াছে। এই সকল কুমত থাকিলেও বিচারে অপ্রামাণ্য শঙ্কা দূরীকৃত হওয়ায় ‘স্বর্ণানিখাতন্যাবে’ সিদ্ধান্ত যেমন দৃঢ়ীভূত হইয়াছে, সেইপ্রকার শ্রীভাগবত সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

শ্রীভাগবতের ভাষা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া যদি উহা বেদবাস-রচিত নয় বলা হয়, তাহা হইলে ছান্দোগ্যাদির ভাষাও অত্যন্ত কঠিন; শ্রীবিষ্ণু-পুরাণের ভাষাও কঠিন; সুন্দরকাণ্ডেও কাঠিন্য আছে; শ্রীমহাভারতে ব্যাসকূট আছে, শ্রীগীতার কাঠিন্য মারল্য উভয়ই দৃষ্ট হয়। তজ্জন্তু কি এই সকল শাস্ত্র অপ্রামাণ্য? অতএব ছান্দোগ্যাদির ভাষা শ্রীমদ্ভাগবতেরও স্বতঃসিদ্ধ দৃঢ়বাক্যাদি বুঝিতে হইবে। কনৈকভক্তি-প্রতিপাদক অলুপ্ত-নিরসক শ্রীমদ্ভাগবতে মৎসরপরায়ণগণের চিরবিদেবহেতু শঙ্কা থাকিবেই। শঙ্কামাত্রই অপ্রামাণ্যের কারণ—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে বেদকল্পতরুমূলেই কুঠারাঘাত হইবে। (ক্রমশঃ)

— শ্রীঅচ্যুতানন্দ

গোপীনাথ পাটনায়ক-কথা

রাজস্বহারী রাজদণ্ডী

ভগবান্ গৌরহরি, নীলাচলে বাস করি'

নিত্য নব লীলা করে কত ;

নিরন্তর ভক্তসঙ্গে রহে কৃষ্ণপ্রেম-রঙ্গে

কে বুঝে সে অদ্ভুত চরিত ।

তথা দেব জগন্নাথ, আর প্রভু গোরাচাঁদ

হুঁহে হম এক অবয়ব ;

সেবিতে গৌরাজ-পদ আসে দেব, নর যত,

সকলের পূরে মনোরথ ।

ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু, চৌদ ভুবনের গুরু--

শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ;

অভয় চরণে তাঁর, সমর্পিত প্রাণ যার

নরলোকে সেই মহাধন্য ।

ভবানন্দ গোষ্ঠীবর্গ, গৌরাজ-কুপার পাত্র,

গৌর-পদে আশ্রিত যে তাঁরা ;

গৌরাজের তাঁরা নিত্য- পাল্য, ভক্ত সুবিশ্বস্ত

কেবা ত্রাতা আছে গোরা ছাড়া !

মালজ্যাঠা দণ্ডপাঠে রাজত্ব করেন সুখে

ভবানন্দ-পুত্র গোপীনাথ ;

আপন বিলাস-কার্য্যে করি' বায় রাজ-অর্থ

ঋণী হয় সম্রাটের পাশ ।

উড়িয়া-সম্রাট-দ্বারে ক্রমে তার বাকী পড়ে

হু' লক্ষ কাহন কোড়ি শুক ;

মাগিল তা' রাজা যবে, কহে গোপীনাথ হুঃখে,—

“কোড়ি নাহি, শোধিব যে সম্ভ ।

হয়েছি বড়ই দীন, অবশ্য শোধিব ঋণ,
 ভাবনা না করিহ রাজন্ ;
 ক্রমে ক্রমে দিব অর্থ, এবে লহ' দশ অশ্ব,
 আশ্রয় মূল্য করি' নিরুপণ । ”
 রাজা রাজি হ'লে ইথে, গোপীনাথ অশ্ব-সাথে
 রাজদ্বারে হইল হাজির ;
 এল রাজ-জ্যেষ্ঠপুত্র সঙ্গে করি' পাত্র-মিত্র,
 অশ্ব-মূল্য করিবারে স্থিরী ।
 সে' রাজপুত্রের সনে ভক্ত গোপীনাথ-মনে
 বনিবনা কভু নাহি রয় ;
 অশ্ব হেরি' রাজপুত্র কম করি' কষে মূল্য
 ইথে গোপীনাথ ক্রুদ্ধ হয় ।
 নিন্দিল রাজার পুত্রে নানারূপ অঙ্গভঙ্গে,
 বড় জানা লজ্জা পেল তায় ;
 হেনমতে রাজপুত্র হয়ে অপমানে ক্ষুব্ধ,
 গেল ত্বরান্বিত মহারাজ-ঠাই ।
 কহে গিয়া মহারাজে,— “ওর বহু টাকা আছে,
 তবু ঋণ ফাঁকি দিতে চায়,
 আজি আজ্ঞা দেহ মোরে, চাঙ্গে চড়াইয়া ওরে
 প্রাপ্য অর্থ করিব আদায় ।”
 কহে মহারাজ ধীরে, “অর্থাৎ আদায় তরে
 যা' উপায় হয় তাই কর ;
 তখনি সে রাজপুত্র চাঙ্গ-তলে পাতি' খড়্গ
 গোপীনাথে তোলে চাঙ্গ'পর ।
 গোপীনাথ-ভৃত্য এক আসি' ত্বরান্বিত প্রভু-পাশ
 জানাইল সব বিবরণ ;
 শুনিয়া কহেন প্রভু, “রাজা দোষী নহে কভু,
 রাজা তা'র মাগে রাজধন ।
 দণ্ডাই সে' গোপীনাথ, করেছে অশ্রয় কাজ,
 রাজ-অর্থ করিয়া হরণ” ;
 হেনমতে গোরাচাঁদ প্রকাশি' বিরক্তি-ভাব
 গোপীনাথে করিল নিন্দন । (ক্রমশঃ)
 —ঐচিৎতরঙ্গন মণ্ডল

ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিব্যবসায়ী ভিক্ষু মহারাজের মহাপ্রয়াণ

অতিশয় বিরহের সহিত শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার পাঠক-পাঠিকাগণকে এক বিরহ-সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। গত ৭ই কা্তিক ১৩৭৩, একাদশী-তিথি সোমবার শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির সুযোগ্য প্রচারক এবং হিন্দী শ্রীভাগবত-পত্রিকার সহকারী প্রচার-সম্পাদক ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত ভিক্ষু মহারাজ আমাদিগকে চিরকালের জন্য বিরহসাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বধামে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি ৫ই কা্তিক, ২২শে অক্টোবর শ্রীভাগবত-পত্রিকা এবং যন্ত্রস্থ হিন্দী-সংস্করণ-জৈবধর্মের কাগজের ব্যবস্থার জন্য দিল্লী গিয়াছিলেন এবং তথাকার কার্য সমাধা করিয়া ইং ২৫।১০।৬৬ তাং-এ সেখান হইতে ফিরিবার সময় প্রাতঃ ৪-৩০ মিনিটে মথুরা জংশনে ট্রেন হইতে নাগিয়া যাত্রী বিশ্রামাগারে পৌঁছানমাত্রই অকস্মাৎ রক্তচাপে হৃদগতি বন্ধ হওয়ায় নিত্যধামে প্রবেশ করিয়াছেন।

তঁাহার পূর্বাশ্রম মথুরাতে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে ছিল। পিতার নাম শ্রীগণেশ শীল। তঁাহার বাল্যকালের নাম ছিল শ্রীহরিচন্দ্র। বাল্যকাল হইতেই কোন স্থানে হরিকীর্তন অথবা ধর্ম্যালোচনা হইলে সেখানে তিনি উপস্থিত হইতেন। একটু বড় হইলে পর পিতাঠাকুর অল্প শিক্ষা দিয়াই ঘরের নিজ ব্যবসায় দেখাশুনা করিবার জন্য নিজের সঙ্গে রাখিতেন। অল্পশিক্ষা হইলেও তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অধ্যবসায়ী ছিলেন। কিছুদিন পর যুবাবস্থায় মাতা-পিতা তঁাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিবাহ দিয়াছিলেন। তবুও তঁাহার হৃদয়ে সংসার ত্যাগ করিয়া সংসঙ্গে হরিভজন করিবার পিপাসা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে। তগবৎ-কৃপাতেই কয়েকবৎসর পরই তঁাহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। এখন মাতা-পিতা, ঘরদুয়ার সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সংসঙ্গের খোঁজে ভারতে বিভিন্ন তীর্থে তিনি পর্যটন করিতে থাকেন।

এই সময়েই অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির সংস্থাপকবর আচার্য্যবর্য্য ঔ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ অনেক সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী ও ৪০০ যাত্রীর সহিত উজ্জ্বলব্রতোপলক্ষে ১৩৬১ সনের কা্তিকে শ্রীব্রজ-মণ্ডল-পরিক্রমার পশ্চাতে ইং ১৩।১২।১৯৫৪ তাং-এ মথুরায় সিভিল হাসপাতালের সম্মুখে শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করিয়া স্বদলবলে সেইস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। ঐ সময় একদিন কোথায়ও

সংবাদ পাইয়া হরিচন্দ্রজীও তথায় উপস্থিত হন এবং শ্রীশ্রীল আচার্যাদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত বীৰ্য্যবতী হারিকথা শ্রবণ করিয়া এত মুগ্ধ হন যে, সেইদিনই শ্রীশ্রীল গুরুদেবের অভয় চরণে নিজেকে সমর্পণ করেন। তিনি ঐ দিন হইতেই মঠে বাস করিয়া শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবগণের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

কিছুদিন পর শ্রীশ্রীল আচার্যাদেব তাঁহার নিষ্ঠা এবং ভজন-পিপাসা লক্ষ্য করিয়া শ্রীহরিনাম-দীক্ষা প্রদানান্তে তাঁহাকে শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠের বিবিধ প্রকার সেবার দায়িত্ব অর্পণ করেন। স্কুলের শিক্ষা অধিক না হইলেও প্রথরবুদ্ধি এবং কঠোর অধ্যবসায় ও সর্বোপরি একনিষ্ঠ গুরুসেবা ও ভক্তির বলে শ্রীগোড়ীয়-দর্শন এবং উপাসনার সিদ্ধান্তকে হৃদয়ঙ্গম করিতেন এবং সহজ সরল ও রসময়ী কিন্তু ওজস্বিনী ভাষায় ঐসকল সিদ্ধান্ত শ্রোতৃগণকে শ্রীণ করাইয়া মুগ্ধ করিতেন। শ্রীশ্রীল আচার্যাদেব তাঁহার সেবাকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ‘সেবা-কৌস্তভ’ উপাধি প্রদান করিয়া ইং ১৯৬১ সনের জুন মাসে শ্রীভাগবত-পত্রিকার সহকারী প্রচার-সম্পাদক নিযুক্ত করেন এবং ৪৭৮ গোরাফ (ইং ১৭ই মার্চ ১৯৬৫) শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব-বাসরে তাঁহাকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করেন। তিনি খড়ি হিন্দী (দেশের প্রচলিত ভাষা), মধুবাতি, মধুর ব্রজভাষার অতিরিক্ত গুরুমুখী, বাংলা প্রভৃতি বহু ভাষা জানিতেন। তাঁহার গুণের কথা আর কত বর্ণনা করিব। তাঁহার স্বধাম-গমনে শ্রীগোড়ীয়-বেদান্ত-সমিতি এক দেদীপ্যমান কৌস্তভ হারাইয়াছেন। তাঁহার নিজের গুরুনিষ্ঠা, সেবা-পরায়ণতা এবং শ্রীগুরু-গোরাঙ্গবানী প্রচার—এই সকল আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আমা-দিগকেও জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবগণের সেবায় তৎপর রাখিয়া ভজনে বল প্রদান করুন এবং এই বিরহাঙ্গুলি গ্রহণ করুন, ইহাই তাঁহার চরণে কাতর প্রার্থনা।

অতঃপর ১৭ই কার্তিক, ৩রা নভেম্বর ১৯৬৬, বৃহস্পতিবার কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যাদেবের সম্ভাপতিত্বে এক শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠে এক বিরহ-সভার আয়োজন হয়। তাহাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুশল নারসিংহ মহারাজ, এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের ভাষণের পর পরমারাধ্য-তম শ্রীশ্রীল আচার্যাদেব অশ্রুপূর্ণ নেত্রে এবং বিরহজনিত রুদ্ধ-স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে সংক্ষেপে অত্যন্ত বিরহপূর্ণ এক ভাষণ প্রদান করেন। এই ভাষণ

অবশ্যে সত্যের সমস্ত লোকই কাদিতে থাকে। এই সময়ে ঐক্যমনে মনে হয় যেন বিরহের প্রতিমূর্ত্তি স্বয়ংই উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সেই ভাবণের সারমণ্ডল নিয়ে প্রদত্ত হইল।

“নিজের সন্তানের বিচ্ছেদে পিতামাতার কিপ্রকার শোক হয় তাহার অনুভব আমার নাই, কেননা আমি ত আকুমার ব্রহ্মচারী; কিন্তু শিষ্যের জন্ত কিপ্রকার বিরহ-বেদনা হইতেছে, ইহা আমার পূর্ণরূপে অনুভূত হইতেছে। শ্রীমান্ জগবন্ধু, শ্রীমান্ অনঙ্গমোহন এবং শ্রীমান্ গোবর্দ্ধনের বিয়োগের পর এই আমার চতুর্থ শিষ্য-বিয়োগ। ভিক্ষু মহারাজের অগাধ-গুরু-নিষ্ঠা আদর্শস্থানীয় ছিল।

দেহত্যাগের শেষদিন পর্য্যন্ত ভিক্ষু মহারাজ বাণীর সেবা করিয়াছেন, সেইজন্ত তাহাকে হিন্দী শ্রীভাগবত-পত্রিকার প্রচার-সম্পাদক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উত্তর প্রদেশের বহুস্থানে তিনি মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়াছেন। বাণী যাহাতে পূর্ণভাবে প্রচারিত হয় সেইজন্ত তাহার চেষ্টাতে হিন্দীতে জৈবধর্ম্ম ছাপা হইতেছিল। মাত্র ভূমিকা বাকী, সেই ভূমিকা ছাপাইবার জন্ত দিল্লীতে কাগজ আনিতে গিয়াছিল এবং সেখান হইতে ফিরিয়া কৃষ্ণের জন্মস্থলী মধুপুরীতে প্রবেশ করিতেই শ্রীমধুসূদন হরি হরিদাসকে (ভিক্ষু-মহারাজের পূর্ব্বনাম) নিজের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া চিরদিনের জন্ত নিজের নিকট রাখিয়াছেন। বাণীর মধ্যেই ভগবান্ সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন। সেই বাণীর সেবাচিন্তা করিতে করিতে তাহার শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ হইয়াছে। গুরুদেবের প্রতি ছিল তাহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই ছিল তাহার জীবনের ব্রত। একটুকু আধটুকু ব্যবহারিক দোষ দোষের মধ্যে গণ্য নহে, তিনি ছিলেন ঐকান্তিক সেবক। পিতার সপ্তখে পুত্রের দেহত্যাগ যে কতই বিরহ-বেদনাব্যঞ্জক তাহা অপরে কিপ্রকারে জানিতে পারিবে? ভিক্ষুক মহারাজ বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। আমরা মৃত্যুর সময় রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া থাকি, কিন্তু ভিক্ষু মহারাজ সেবার মাধ্যমে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, অতএব কৃষ্ণের পাদপদ্মে তাহার স্থান হইয়াছে।”

—শ্রীমুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রী অনকুট-মহোৎসব

বিগত বৎসর সমূহের জায় এই বৎসরও শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির সকল মঠেই গত ২৭শে কার্তিক, ১৩ই নভেম্বর, রবিবার শ্রীশ্রীরাধা-বিনোদ-বিহারীর অনকুট-মহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সমিতির মূল কেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এই উৎসব বিরাটভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত মঠে এই দিবস সকাল হইতেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের বৃন্দাবনে গোপাল-প্রকটে অশ্রুতপূর্ব্ব ‘অনকুট’-মহোৎসবের বিবরণ পাঠ, গিরিরাজ শ্রী শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও কীর্তনের মধ্য দিয়া অতিক্রান্ত হইয়াছে। ৩০০ শত প্রকারের অধিক বিবিধ অপূর্ব্ব ভোগরাগ-সামগ্রী মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীরাধা বিনোদবিহারীকে নিবেদন করা হয়। ভোগ নিবেদনের পর সমাগত কয়েক সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে আকর্ষণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও এই মহামহোৎসবের আকর্ষণে ছুটিয়া আসেন।

এই বৎসর শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠেও ‘অনকুট’ মহোৎসব অত্যন্ত বৎসর অপেক্ষা অধিক সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়, কারণ পরমারাধ্যাত্ম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম স্বয়ং ঐসময় মথুরা-মঠে বিরাজমান ছিলেন। সেইস্থানে এই দিবস আয়োজিত এক ধর্ম্মসভায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অনকুট মহোৎসবের মহত্ত্ব তথা, ভক্তি-ভক্তের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত লইয়া হিন্দী ভাষায় এক গভীর দার্শনিকমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন। তদনন্তর উপস্থিত জনসমূহকে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদবিহারী-জিউ-এর বিবিধ প্রকার সুস্বাদু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। চুঁচুড়া শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও অত্যন্ত সকল মঠেও অত্যন্ত বৎসরের জায় এই মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

শ্রীলগৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-উৎসব

বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ, উখান-একাদশীতে শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-উৎসব সমিতির সর্ব্বত্র পালিত হইয়াছে। বাণী-আনা শ্রীল বাবাজী মহারাজের ভক্তিধর্ম্মপোষণে বিবিধ প্রচেষ্টা, অসংস্র-বর্জ্জন ও সর্ব্বদা হরিকীর্তন প্রভৃতি বিবিধ অপ্রাকৃত গুণাবলীর পুনঃ পুনঃ কীর্তন-

মুখে সমস্ত দিবস উদ্‌যাপিত হয়। পর দিবস দ্বাদশী তিথিতে মধ্যাহ্নে ভোগারতির পর সমাগত জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

চাতুর্মাস্য-ব্রত-সমাপ্তি

বিগত ২২শে বামন, ১৭ই আষাঢ় হইতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত-সমিতির সর্বত্র শ্রীচাতুর্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইয়াছিল। চাতুর্মাস্য-ব্রতের শেষ মাস—দামোদর মাস। এই ব্রতকালে শাস্ত্র-বিহিত ভক্তনানুকূল বিবিধ নির্দেশাদি পালন, বিশেষত দামোদর মাসে আরও কঠোরভাবে গ্রাম্য-ইতর কথায় বৈরাগ্য প্রদর্শনপূর্বক অহোরাত্র হরিকথা আলোচনায় গত ৩০শে দামোদর, ১২ই অগ্রহায়ণ এই ব্রত সমাপ্ত হইয়াছে। সমগ্র দামোদর মাস শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির সেবকগণ মাত্র একপাকে প্রস্তুত প্রসাদ সেবন করিয়াছেন। কেহ কেহ একাহারে ও ভূমিশযায় দামোদর-ব্রত পালন করিয়াছেন। মর্ত্যলোকে যে জন চাতুর্মাস্য-ব্রত পালন করে না, “জীবন্মপি মৃতো হি সঃ”—ইহাই শ্রীহরিভক্তিবিলাস তারহরে ঘোষণা করিয়াছেন। এই দিবস ভোগারতি সমাপ্ত হইলে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে সমাগত বহু ব্যক্তিকে মধ্যাহ্নে বিবিধ রসসংযুক্ত মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

দামোদর-ব্রতে ভাগবত-পাঠ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাশীনগর গ্রামনিবাসী সমিতির আশ্রিত শ্রীপাদ সনাতন দাসাধিকারী মহাশয়ের আগ্রহে তাঁহার আলয়ে সমিতির পক্ষ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত পরমাহৈতী মহারাজ ও আরও ২/৩ মূর্তি মঠবাসী ব্রহ্মচারী গত সমগ্র দামোদর মাস প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্তন করিয়াছেন। কোন কোন দিবস সন্ধ্যায় ছায়া-চিত্রযোগেও শাস্ত্রকথা কীর্তন করা হইত। এই ভাগবত-সভায় বহুলোকের সমাগম হইত। ব্রত সমাপ্তির শেষের কয়েক দিবস পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্ত্ৰিবেদান্ত বামন মহারাজ তথায় ভাগবত-পাঠ ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ব্রত-সমাপ্তির দিন বহুলোককে শ্রীপাদ সনাতন প্রভু মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। সমিতির বাণী প্রচারে তাঁহার এই চেষ্টা ভক্তগণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের মথুরাধামে শুভবিজয়

ও শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

গত ২৮শে জ্যৈষ্ঠ ৪৮০ গৌরান্দ, ১০ই আশ্বিন, মঙ্গলবার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম অর্দ্ধশতাধিক যাত্রী লইয়া ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন কৃষ্ণলীলাস্থলী পরিক্রমণে বেলা ১০ ঘটিকায় 'তুফান এক্সপ্রেস' যোগে হাওড়া হইতে সমিতির মথুরা গঠে শুভবিজয় করেন। পরদিবস বেলা ২টায় তিনি মথুরা ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে মথুরা মঠরক্ষক পূজ্যপাদ ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদাস্ত নারায়ণ মহারাজ ও পূজ্যপাদ ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদাস্ত মুনি মহারাজ মাল্যাদি লইয়া শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মকে বিপুল অভ্যর্থনা ও শোভাযাত্রা সহকারে মোটরযানে করিয়া গঠে লইয়া যান। শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম মথুরা গঠেই বিরাজ করিতেন। অনন্তর পূজ্যপাদ ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদাস্ত হরিশ্চন্দ্র মহারাজ শ্রীশ্রীল গুরুদেবের নির্দেশে যাত্রীগণ লইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান, বিশ্রামঘাট, মধুান, তালবন, গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ড, কাম্যবন, নন্দগ্রাম, বর্ষাণা, সংকেত, যাবট, খৈরা, কদম্বখণ্ডী, উদ্ধব কেয়ারী, বৃন্দাবন, শ্রীবন, মানস সরোবর, গোকুল, মহাবন, ব্রহ্মাণ্ড বাট, শ্রীমতী রাধারানীর আদির্ভাবস্থলী রাভেল প্রভৃতি দর্শনান্তে পুনরায় মথুরা গঠে প্রত্যাবর্তন করেন। এইস্থানে একদিন বিশ্রামের পর প্রয়াগ, বারানসী ও গয়া দর্শন করিয়া তাঁহারা স্তূৰ্পরূপে ১০ই কার্তিক হাওড়া প্রত্যাবর্তন করেন। প্রয়াগের পথে আগ্রাতেও একদিন অবস্থান করা হয়। স্তূৰ্পভাবে পরিক্রমা পাটির পরিচালনায় শ্রীপাদ হরিশ্চন্দ্র ব্রহ্মচারীর দেবাত্মপরতাও উল্লেখযোগ্য।

শ্রীশ্রীল পরমারাধ্যতমদেব মথুরাতেই অবস্থান করিতে থাকেন। এইস্থানে তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণে জিলা-বিদ্যালয়-নিরীক্ষক, উকীলবৃন্দ প্রভৃতি উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ আগমন করিতেন। মথুরা ধামে শ্রীগৌর-বাণীর প্লাবন বহাইয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব দামোদর-ব্রত-সমাপ্তির পর দিবস ১৩ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার সগোষ্ঠি মথুরা হইতে শুভযাত্রা করিয়া লক্ষ্মীতে সমিতির আশ্রিত শ্রীপীতাম্বর পন্থের (S.D.O.) গৃহে এক রাত্রি সারস্বত-বাণী কীর্তন করিয়া কাশীতে শুভাগমন করেন। -এই স্থানে পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিবিচার ঘাষাবর মহারাজের আশ্রমে তিন দিবস অবস্থান করিয়া

অপ্রাকৃত শব্দ-বিজ্ঞানের প্রথম পর্যায় সমগ্র বেদ, আরও কৃতিপর্য্য দুপ্রাপ্য গ্রন্থ, (সর্বমোট মূল্য ১০০/- এক হাজার টাকা) এবং নবদ্বীপস্থ শ্রীমন্দিরের জন্ত একটি স্ববৃহৎ পিতলের ঘণ্টা (২ মণ ওজন) সংগ্রহ করিয়া ১৯শে অগ্রহায়ণ সোমবার শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। বর্তমানে শ্রীশ্রীল পরমা-রাধ্যতমদেব নবদ্বীপ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে বিরাজ করিতেছেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

বহরমপুরে ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-গীতি

বিগত ১৭ই আশ্বিন, ৪ঠা অক্টোবর, মঙ্গলবার শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতির সুযোগ্য প্রচারক পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীমন্তুজ্জিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ সকল জীবের কর্ণপুরে বৈকুণ্ঠ-জগতের রমা-বাণী বহনের গুরুদায়িত্ব স্বক্কে লইয়া একটি প্রচার-সঙ্ঘ সহ বহরমপুর শহরে গমন করেন। তথায় বিখ্যাত শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রায় দেড়মাস যাবৎ তাঁহারা অবস্থান করিয়া শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন বাটীতে কীর্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলাদি বিবিধ শাস্ত্রীয় উপাখ্যান প্রদর্শন-মুখে গৌরবাণীর প্রবলভাবে প্রচার করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের পরিচালকগণের এই প্রচার-কার্যে সহায়তা প্রদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত ডাক্তার শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ রায় B.Sc., M.B., শ্রীযুত সুকুমার সিংহ, শ্রীযুত রামকানাই ধর, শ্রীযুত নারায়ণ চন্দ্র মুখার্জি, শ্রীযুত রমেন্দ্র কুমার দাস, শ্রীযুত সঞ্জয় কুমার মণ্ডল ও শ্রীযুত কালিদাস ব্যানার্জি প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দেরও সমিতির শিক্ষা-প্রচারে সহানুভূতি প্রদর্শন। তাঁহারা সকলেই নিত্যকাল এইভাবে হরিসেবায় লিপ্ত থাকুন, শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রীতবর্ণকমলে সমিতির আন্তরিক কামনা। —নিজস্ব

বিশেষ নিবেদন

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের নিকট নিবেদন এই যে, তাঁহারা শ্রীপত্রিকার দেয় ভিক্ষা কোন লোক মারফৎ জমা দিবার জন্ত যদি দেন, সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকা-অফিসে সংবাদটি পত্র দ্বারা জানাইয়া দিলে ভাল হয়।



১৮শ বর্ষ } পৌষ, ১৩৩৩ { ১১শ সংখ্যা



ম্পাদক -- ব্রহ্মদেব শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈদ্য বামন মহারাজ
কাগালয় -- শ্রীদেবানন্দ গোস্বামী, তেঘরিপাড়া, নবগীপ (নদীয়া)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোকজে ।



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা স্প্রসাদতি ॥

সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরমর । অতঃ ধর্ম সূচকপে পালে যেই জন ।
 অধোকজে অহৈতুকী ভক্তি বিরহুত । হরি-কথার বক্তি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

১৮শ বর্ষ } কীরোদশায়ী, ১৮ নারায়ণ, ৪৮০ গৌরাক
 শনিবার, ২৯ পৌষ, ১৩৭৩; ইং ১৪।১।১৯৬৭ { ১১শ সংখ্যা

সান্নিহাদং

শ্রীদেবগণকৃতং “শ্রীশ্রীপরমেশ্বর-স্তোত্রদ্বাদশকম্”

(শ্রীশ্রীবেদব্যাসকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ-স্কন্ধে

নবমেইধ্যায়ে— ৩৩-৪৪)

ছরববোধ ইব তবায়ং বিহারযোগো যদশরণোহশরীর ইদমন-
 বেক্ষিতাস্মৎসমবায় আত্মনৈবক্রিয়মাণেন সগুণমগুণঃ সৃজসি পাসি
 হরসি ॥ ১ ॥

(হে ভগবান্) আপনি আশ্রয়হীনের হ্রায় এবং প্রাকৃত শরীর-রহিত
 হইয়াও আমাদিগের কোনরূপ সহায়তার অপেক্ষা করিতেছেন না ; আপনি
 এই প্রপঞ্চের উপাদান কারণ হইয়াও নির্বিকার আত্মস্বরূপে এই মায়াগুণময়
 বিশ্বের সৃষ্টি, পালন এবং সংহার করিতেছেন । অথচ আপনি স্বয়ং
 ত্রিগুণাতীত ; আপনার এই ক্রীড়াযোগ অতীব দুর্লভ ॥ ১ ॥

অথ তত্র ভবান্ কিং দেবদত্তবদিহ গুণবিসর্গপতিতঃ পারতন্ত্র্যেণ

স্বকৃতকুশলাকুশলফলমুপাদদাতি । আহোশ্বিদাত্মারাম উপশমশীলঃ
সমঞ্জসদর্শন উদাস্ত ইতি হ বাব ন বিদামঃ ॥ ২ ॥

দেবদত্তাদি সংসারী জীবগণ যেমন সংসারে গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়া তাহাতে
স্বকৃত শুভাশুভ ফল প্রাপ্ত হয়, আপনিও কি তেমনই পরব্রহ্ম হইয়াও
এই সংসারে জীবের ত্যায় গুণ কার্য্য-ভূত-শরীরে অবস্থিত হইয়া কালকন্ধ্যাদির
অধীনে স্বকৃত কুশলাকুশল কৰ্ম্মভোগ করেন, কিম্বা আত্মারাম উপশমশীল
ও নিত্য-চিহ্নক্ৰিয়ুক্ত অবস্থায় কেবলমাত্র সাক্ষীরূপে এই সংসারে বিরাজ
করিতেছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ২ ॥

নহি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যাপরিমিত-গুণগণ ঈশ্বরেহনবগ্রাহ-
মাহাত্ম্যোহ্বৰ্ব্বাচীন-বিকল্প-বিতর্ক-বিচার-প্রমাণাভাস-কুতর্কশাস্ত্রকলিলান্তঃ-
করণাশয়-হ্রবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসর উপরতসমস্তমায়াময়ে কেবল
এবাত্মমায়ামন্তর্দ্বায় কো যথার্থো দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপ-দ্বয়াভাবাৎ ॥ ৩ ॥

আপনার মধ্যে পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মদলেরও সমাবেশ সম্ভবপর হয় ।
কারণ আপনি ভগবান্, আপনি অপরিমিত গুণগণশালী ঈশ্বর, আপনার
মাহাত্ম্য অন্তের অবোধ্য । বৈশেষিকাদি নব্যশাস্ত্রে বিকল্প (এইরূপ কিম্বা
এইরূপ ?), বিতর্ক (এস্থলে কোন্টী যুক্তিযুক্ত ?), বিচার (এইরূপই
হইবে) ও প্রমাণাভাস (দুই প্রমাণ) অবলম্বনপূর্ব্বক কুতর্কাদি বিদ্যমান ।
তদ্বারা যাহাদিগের চিত্ত বিম্রাস্ত হইয়াছে, তাহারা প্রকৃত বস্তু সংস্পর্শ করিতে
পারে না । তাহাদের দুই আগ্রহ-নিবন্ধন যে বিবাদ উপস্থিত হয়, আপনি
তাহার অগোচর, আপনি সমস্ত মায়্যা-প্রপঞ্চ হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন,
আপনি অদ্বিতীয় আপনাতে কর্তৃত্ব-অকর্তৃত্ব, সুখ-দুঃখ, প্রভৃতি কিছুই বিরুদ্ধ
নহে । অঘটন-ঘটন-পটীয়সী আত্মমায়া অর্থাৎ চিহ্নক্ৰিয় সাহায্যে আপনাতে
দুর্ঘট কি আছে ? কারণ আপনাতে স্বরূপদ্বয় অর্থাৎ বন্ধন ও মুক্তি, এই
অবস্থাদ্বয়, বর্ত্তমান নাই । (অতএব স্বকীয় মায়্যাপ্রভাবে আপনি সকলই
করিতে পারেন) ॥ ৩ ॥

সমবিষম-মতীনাং মতমন্তুসরসি যথা রজ্জুখণ্ডঃ সর্পাদিধিয়াম্ ॥ ৪ ॥

রজ্জুখণ্ডে যথার্থবুদ্ধিশালী ব্যক্তি উহাকে রজ্জু বলিয়াই জানিতে পারে
বলিয়া তাহা হইতে যেমন কখনও ভয় প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু ভ্রান্ত ব্যক্তি রজ্জুতে
সর্পবুদ্ধি করিয়া তাহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়, আপনিও তেমনি সমবুদ্ধি অর্থাৎ

জ্ঞানী ব্যক্তিকে অভয় প্রদান করেন এবং বিষয়-বুদ্ধি অর্থাৎ অজ্ঞানজনকে ভয় প্রদান করেন। বস্তুতঃ তাহারা নিজ-নিজ মতিভেদেই যথাক্রমে ভয় ও অভয় প্রাপ্ত হয়—আপনাতে সম-বিষমভাব নাই ॥ ৪ ॥

স এব হি পুনঃ সর্ববস্তুনি বস্তুস্বরূপঃ সর্বেশ্বরঃ সকলজগৎ-
কারণ-কারণভূতঃ সর্বপ্রত্যগাত্মত্বাৎ সর্বগুণাভাসোপলক্ষিত এক
এব পর্য্যবেশেষিতঃ ॥ ৫ ॥

বিচার করিলে দেখা যায় যে, যিনি নানাভাবে প্রতীত হন, তিনিই সকল প্রপঞ্চে পরমার্থভূত সং-স্বরূপ, তিনিই সর্বেশ্বর জগৎকারণ মহাদির ও কারণীভূত, তিনিই সর্বজীবের প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামী, তিনিই সকল বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-প্রভৃতির প্রকাশকরূপে উপলক্ষিত হইয়া থাকেন, তিনি ভিন্ন সকলই জড়প্রায় “নেতি নেতি” এই শ্রুতিদ্বারা পর্য্যবসিত। সেই তিনি—আপনি ভিন্ন আর কেহই নহেন ॥ ৫ ॥

অথহ বাব তব মহিমামৃত-রস-সমুদ্রবিপ্রক্షা সঙ্কল্পীঢ়য়া স্বমনসি
নিশ্চিন্দমানানবরত-সুখেন বিস্মারিতদৃষ্টি-শ্রুতি-বিষয়-সুখলেশাভাসাঃ
পরমভাগবতা একান্তিনো ভগবতি সর্বভূত-প্রিয়সুহৃদি সর্বাণ্যনি
নিরতনির্বৃত্তমনসঃ কথমূহ বা এতে মধুমথন পুনঃ স্বার্থকুশলা হ্যাত্মপ্রিয়-
সুহৃদঃ সাধবস্তুচরণাশুজান্নসেবাং বিসৃজন্তি ন যত্র পুনরয়ং সংসার-
পর্য্যাবর্ত্তঃ ॥ ৬ ॥

অতএব হে মধুসূদন, আপনার মহিমামৃত-সমুদ্রের বিন্দুমাত্রও যাহারা
একবার পান করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে এক অজস্র আনন্দ-প্রস্রবণ উথিত
হইয়া মায়িক-দৃষ্টি-শ্রুতিজাত বিষয়-সুখাভাসকে বিস্মৃত করিয়া দিয়াছে।
তাঁহারা ভোগাকাজ্জ্বল-রহিত পরম-ভাগবত। তাঁহারা সর্বভূতের প্রিয়
সুহৃদ, সর্বাণ্য ভগবান্ আপনাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া পরমসুখ লাভ করেন।
যাহারা পুরুষার্থে নিপুণ এবং আপনিই যাহাদের আত্মা ও প্রিয় সুহৃদ,
সেই ভক্তগণ, যাহাতে আর পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না—আপনার সেই
চরণাশুজ-সেবা কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে ? ৬ ॥

ত্রিভুবনাত্মভবন ত্রিবিক্রম ত্রিনয়ন ত্রিলোক-মনোহরানুভাব
তবৈব বিভূতয়ো দিতি-দনুজাদয়শ্চাপি তেষামুপক্রমসময়োহয়মিতি

স্বাত্মমায়য়া সুর-নর-মৃগ-মিশ্রিতজলচরাকৃতিভির্যথাপরাধং দণ্ডং দণ্ডধর
দধর্থ এবমেনমপি ভগবন্ জহি ষ্ঠাষ্ট্রমুত যদি মনুসে ॥ ৭ ॥

হে ত্রিভুবন-স্বরূপ, হে ত্রিভুজন-জনক, হে ত্রিবিক্রম, (বামনরূপধারি),
হে ত্রিনয়ন, (নৃসিংহ-রূপধারিন্), হে ত্রিলোক-মনোহরাশুভাবশীল, দৈত্য-
দানব এবং মনুষ্য প্রভৃতিও আপনারই বিভূতি ; হে দণ্ডধর, আপনি
সর্বদাই দৈত্যগণের অভ্যুত্থানকাল অবগত হইয়া স্বকীয় মায়্যা-শক্তিবলে
কখনও—সুরাকৃতি বামনাদি অবতার, কখনও নরাকৃতি রাম-কৃষ্ণাদি
অবতার, কখনও মৃগাকৃতি বরাহাদি অবতার, কখনও মিশ্রাকৃতি হর্যগ্রীব-
নৃসিংহাদি অবতার এবং কখনও জলচরাকৃতি মৎস্য-কুর্মাди অবতার-বিগ্রহ
ধারণপূর্বক অসুরগণের অপরাধানুযায়ী দণ্ডবিধান করিয়াছেন । হে ভগবান্,
অতঃ এই বৃত্তান্তরকেও যদি বধ্যযোগ্য মনে করেন, তাহা হইলে সেইরূপভাবে
উহাকে বিনাশ করুন ॥ ৭ ॥

অস্মাকং তাবকানাং তততত নতানাং হরে তব চরণনলিন-যুগল-
ধ্যানানুবন্ধ-হৃদয়নিগড়ানাং স্বলিঙ্গ বিবরেণাত্মসাংকৃতানামনুকম্পানু-
রঞ্জিত-বিশদ-রুচির-শিশিরস্মিতাবলোকেন বিগলিত-মধুর-মুখরসামৃত-
কলয়া চান্তস্তাপমনঘাহঁসি শময়িতুম্ ॥ ৮ ॥

হে রক্ষক, হে পিতামহ, হে অনঘ (হরে), আমরা আপনার চরণযুগলে
প্রণত, আপনার চরণারবিন্দযুগল ধ্যানে আমাদের চিত্ত শৃঙ্খলিত । আপনি
নিজমুক্তি প্রকটিত করিয়া আমাদের নিভজন বলিয়া গ্রহণ-পূর্বক
অনুকম্পানুরঞ্জিত বিশদ শীতল মুহূর্ত্তাসিক্ত অবলোকন এবং অনুকম্পাজাত
মধুরপ্রিয় বচন-সুধাধারা আমাদের “বৃত্ত”-ভয়-জনিত মনস্তাপ প্রশমিত
করুন ॥ ৮ ॥

অথ ভগবন্তবাস্মাভিরখিলজগৎপত্তি-স্থিতি-লয়-নিমিত্তায়মান-দিব্য-
মায়্যাবিনোদস্য সকলজীবনিকারানামন্তহৃদয়েষু বহিরপি চ ব্রহ্ম-
প্রত্যগাত্মস্বরূপেণ প্রধানরূপেণ চ যথাদেশ-কাল-দেহাবস্থানবিশেষঃ
তদুপাদানোপলভ্যকতয়ানুভবতঃ সর্বপ্রত্যয়সাক্ষিণ আকাশশরীরস্ত
সাক্ষাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ কিয়ানিহ বার্থবিশেষো বিজ্ঞাপনীয়ঃ
স্বাদ্বিস্থলিঙ্গাদিভিরিব হিরণ্যরেতসঃ ॥ ৯ ॥

হে ভগবন্, আপনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণীভূত অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়াদ্বারা সর্বদা বিলাস করিতেছেন। সকল জীবসমূহের হৃদয়মধ্যে ব্রহ্ম ও অন্তর্যামী পরমাত্মরূপে এবং বাহিরে প্রকৃতিরূপে আপনিই বিরাজ করিতেছেন। দেশকাল ও বাল্যপৌরুষাদি দেহাবস্থান অতিক্রম না করিয়াও অর্থাৎ স্বীকার করিয়াও এই সকলের ঐ সমস্ত উপাদানের জ্ঞাতারূপেও আপনিই প্রতীয়মান হইতেছেন। আপনি বুদ্ধ্যাদি সকল প্রত্যয়ের সাক্ষী, আপনি আকাশের ছায়া অর্থাৎ গুণাদির দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হন না, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মা। অগ্নির অংশগত ফুলিঙ্গসমূহ যেক্রপ অগ্নিকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইক্রপ ফুলিঙ্গসদৃশ চিৎকণ আমরাও সর্বজ্ঞ আপনার নিকট কার্য্যার্থ প্রকাশ করিতে অসমর্থ অর্থাৎ আপনি সমস্ত জ্ঞাত আছেন, আপনার অবিদিত কিছুই নাই ॥ ৯ ॥

অতএব স্বয়ং তত্পকল্পয়াস্মাকং ভগবতঃ পরমগুরোস্তব চরণ-
শতপলাশচ্ছায়াং বিবিধ-বৃজিন-সংসারপরিশ্রমোপশমনীমুপস্থতানাং
বয়ং যৎকামেনোপসাদিতাঃ ॥ ১০ ॥

আপনি সর্বজ্ঞ; অতএব আমরা যে কার্য্যসিদ্ধি কামনায় ভগবান্ পরম-
গুরুরূপী আপনার চরণ-কমলচ্ছায়ায় উপনীত হইয়াছি, আমাদিগের সেই
কার্য্য আপনি স্বয়ংই সম্পাদন করুন। আপনার এই চরণকমলচ্ছায়ায়
শরণাগতগণের (বহুজন্মের) বিবিধ পাপজনিত সংসার-পরিশ্রমের উপশম
হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

অথো ঈশ জহি হৃষ্টং গ্রাসন্তং ভুবনত্রয়ম্ ।

গ্রস্তানি যেন নঃ কৃষ্ণ তেজাংস্তদ্রায়ুধানি চ ॥ ১১ ॥

অতএব হে ঈশ! আপনি ত্রিভুবন-গ্রাসকর্তা হৃষ্টনন্দন বৃত্রাসুরকে
সংহার করুন। হে কৃষ্ণ! এই অসুর আমাদিগের তেজোরশি অন্ত্র
এবং আয়ুধ সকলকেও গ্রাস করিয়াছে ॥ ১১ ॥

হংসায় দহুনিলয়ায় নিরীক্ষকায়

কৃষ্ণায় মৃষ্টযশসে নিরুপক্রমায় ।

সৎসংগ্রহায় ভবপান্ননিজাশ্রমাণ্ডা-

বন্তে পরীষ্টগতয়ে হরয়ে নমস্তে ॥ ১২ ॥

আপনি অতি বিদ্বৎ, হৃদয়াকাশবাসী, চিত্তবৃত্তাদির সাক্ষী, সদানন্দ কৃষ্ণস্বরূপ, উজ্জল যশস্বী, অনাদি, সংসংগ্রাহ, অথবা সতের অমুগ্রাহক। যে সংসার-পান্থগণ আপনার শরণাগত হয়, সংসারান্তে আপনিই তাহাদের উত্তম ফলরূপে লভ্য হইয়া থাকেন। অতএব হে হরে! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥

বিচার-আদালত

বিচারপতি

১। স্বয়ম্ভু, ২। নারদ, ৩। শম্ভু, ৪। সনৎকুমার, ৫। কপিল, ৬। মনু, ৭। প্রহ্লাদ, ৮। জনক, ৯। ভীষ্ম, ১০। বলি, ১১। বৈয়াসকি, ১২। যম, (ছাদশজন)।

মানব-সাধারণ বনাম গৌড়ীয়।

নালিশের কারণ।

গৌড়ীস্বগণ মানব হইয়া অত্যাযত্বপূর্বক মানব সাধারণের কায়-মনোবাক্যের সহিত গৌড়ীয়েলের কায়মনোবাক্যের ভেদ-স্থাপন করেন। তাহার ক্ষতিপূরণ বাবৎ নালিশ।

বাদীপক্ষেঃ—

ব্যারিষ্টারের তালিকা

১। বশিষ্ঠ, ২। শক্তি, ৩। পরাশর, ৪। দত্তাত্রেয়, ৫। অষ্টাবক্র, ৬। দুর্কাসা প্রভৃতি।

উকীলের তালিকা

১। ঈশ্বরকৃষ্ণ, ২। গৌড়পাদ, ৩। গোবিন্দ, ৪। শঙ্করাচার্য্য, ৫। বিচারণা, ৬। সদানন্দ যোগীন্দ্র, ৭। আনন্দগিরি, ৮। মধুসূদন সরস্বতী, ৯। স্বপ্নেশ্বর, ১০। বিজ্ঞানভিক্ষু, ১১। শেষ নাগ, ১২। বাচস্পতি মিশ্র ইত্যাদি।

মোক্তারের তালিকা

১। কুল্লুক ভট্ট, ২। উদয়নাচার্য্য, ৩। শিহলণ মিশ্র, ৪। কুমারিল ভট্ট, ৫। রঘুনন্দন, ৬। কমলাকর, ৭। হলায়ুধ প্রভৃতি।

বিবাদীর পক্ষঃ—

ব্যারিষ্টারের তালিকা

১। ঋষভ, ২। নবযোগেন্দ্র, ৩। প্রাচীনবর্হির দশপুত্র প্রচেতাগণ,
৪। ক্রুব, ৫। পৃথু, ৬। মৈত্রেয়, ৭। উদ্ধব প্রভৃতি।

উকীলের তালিকা

১। রামানুজ, ২। মধ্বাচার্য্য, ৩। নিম্বাদিত্য, ৪। বিষ্ণুস্বামী,
৫। বেদান্তদেশিকাচার্য্য, ৬। জয়তীর্থ, ৭। শ্রীনিবাস, ৮। শ্রীধরস্বামী,
৯। বিষ্ণুমঙ্গল, ১০। জয়দেব, ১১। বল্লভাচার্য্য, ১২। শ্রীজীব, ১৩। বলদেব
প্রভৃতি।

মোক্তারের তালিকা

১। কৃষ্ণদেব, ২। গোপাল ভট্ট, ৩। ধ্যানচন্দ্র, ৪। কৃষ্ণদাস, ৫। গোপী-
নাথ দাস প্রভৃতি।

বিচারকালে সাক্ষীর তালিকা উভয়পক্ষ হইতে দাখিল করা হইবে
এবং বাদী ও বিবাদী উভয় পক্ষই ইচ্ছামত নিজ নিজ ব্যারিষ্টার, উকীল,
মোক্তারাদি নিয়োগ, বর্জন বা বর্জন করিবার অধিকার রাখিবেন।
সম্প্রতি প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে বাদিগণের নয় শত অভিযোগ দাখিল করা
আবশ্যক।

—জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

(স্মৃতি-প্রস্থান)

পুরাণ পঞ্চরাত্রাদি

১। পুরাণে যখন সকলের অধিকার, তখন ঐ শাস্ত্র বেদ হইতে নূন
নহে কি ?

“সকল নিগমবল্লীর সারতত্ত্ব-রূপ কৃষ্ণনামে যেমন সকলেরই অধিকার
আছে, তদ্রূপ বেদতুল্য পুরাণ-ইতিহাসে সকলেরই অধিকার থাকায়
তাহাদের মাহাত্ম্যের স্বীকার করা যায় না। যে ব্যাস বেদ-সকলকে
বিভাগ করিলেন, তিনিই পুরাণ ও ইতিহাসের সংগ্রহকর্ত্তা; অতএব
তাহাতে পুরাণসকলের মাহাত্ম্য ও বেদতুল্যতা উপলব্ধ হয়।”

—‘ষট্-সন্দর্ভ’, সঃ তোঃ ১১।১০

২। গীতাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য কি? গীতাতে ভক্তিবিশয়ক বিচার মধ্যস্থলে রক্ষিত হইল কেন?

“গীতা-শাস্ত্রে আঠারটি অধ্যায়; তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায়ে ‘কর্ম’, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ‘ভক্তি’ ও তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে ‘জ্ঞান’ পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি অত্যন্ত গূঢ়তত্ত্ব, অথচ জ্ঞান ও কর্মের জীবনস্বরূপ এবং অর্থসাধক বলিয়াই ভক্তিবিশয়ক বিচারকে মধ্যস্থিত ছয়-অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।”

—‘অবতরণিকা’, গী: র: র: ভা:

৩। গীতার বিচারে জীবের চরম উদ্দেশ্য কি?

“বিশুদ্ধভক্তিই গীতাশাস্ত্রে জীবের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতার চরমে “সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য” শ্লোকে ভগবৎশরণাপত্তিই যে “সর্ব-শুদ্ধতম” উপদেশ, ইহা পরিজ্ঞাত হইবে।” —‘অবতরণিকা’, গী: র: র: ভা:

৪। গীতা কি যুদ্ধাভিধায়ক গ্রন্থ নহে?

“অর্জুনের যুদ্ধাঙ্গীকার—কেবল অধিকার নির্ণায়ক উদাহরণমাত্র, গীতার চরম তাৎপর্য নয়।” —‘অবতরণিকা’, গী: র: র: ভা:

৫। গীতার গূঢ় তাৎপর্য কি?

“গীতার গূঢ় তাৎপর্য এই যে, যে-ব্যক্তি যে-স্বভাবসম্পন্ন, তদনুযায়ীই তাহার অধিকার। সেই অধিকার-নির্দিষ্ট জীবনযাত্রোপযোগি-কর্ম স্বীকার করতঃ পরতত্ত্ব অনুসন্ধান কর্তব্য; তাহাতেই শ্রেয়ঃ নিহিত।”

—‘অবতরণিকা’, গী: র: র: ভা:

৬। সাহিত্যী শ্রুতি কি?

“ভাগবতকে ‘সাহিত্যী শ্রুতি’ বলা হইয়াছে।”

—‘ষট্-সন্দর্ভ’ স: তো: ১১।১০

৭। কোন্ কোন্ গ্রন্থপাঠ করিলে আত্মমঙ্গল হয়?

“যে-সকল গ্রন্থে শুদ্ধভক্তি উপদিষ্ট ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, পঞ্চরাত্র ও মহাজনগণের মীমাংসা-গ্রন্থ পাঠ করিবেন। অল্প মতের গ্রন্থে কেবল বৃথা তর্ক শিক্ষা হয়।”

—‘তত্ত্বৎকর্মপ্রবর্তন’, স: তো: ১১।৬

৮। কোন্ গ্রন্থ সর্বশাস্ত্রের পরিপাক-গ্রন্থ?

“গীতাশাস্ত্রই সর্বশাস্ত্রের পরিপাক-গ্রন্থ। যিনি গীতাশাস্ত্রের অমৃতময়

উপদেশ প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহার পক্ষে অত্ৰ শাস্ত্রের ভার বহন করার অত্ৰ নাম —শাস্ত্র-গর্দভতা মাত্র ।” —‘সমালোচনা’, স: তোঃ, ১২।২

৯। বেদের প্রকৃত অর্থ-প্রকাশক শাস্ত্র কি ?

“পুরাণশাস্ত্রই বেদের যথার্থ অর্থ-প্রকাশক । উপনিষদাদি বেদে যে পরমতত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, পরাশর বেদব্যাসাদি প্রকৃত প্রস্তাবে স্বীয় স্বীয় পুরাণে তাহাই সবল ভাষায় ভাষ্যরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাই সৎ-সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ।” —ত: মু: ২

১০। প্রকৃত বেদতাৎপর্য কোথায় পাওয়া যায় ?

“বেদবাক্যের অর্থসমূহ অত্যন্ত নিগূঢ় । মহর্ষিগণ জগতে বেদবাক্য-তাৎপর্য বুঝাইবার জন্ত পুরাণবাক্যে বেদ-তাৎপর্য নির্ণয় করিয়াছেন ।”

—অ: প্র: ভাঃ, ম ৬।১৪৩-১৪৮

১১। ‘সংক্রিয়া-সার-দীপিকা’র সহিত কশ্মিরগণের রচিত স্মৃতিগ্রন্থের পার্থক্য কি ?

“শ্রীমদগোপাল ভট্টগোষামী ভক্তগণের সন্ধর্শ্বরক্ষার্থ এই সারদীপিকা-পদ্ধতি রচনা করিলেন । বৈদিকানুশাসনক্রমে অনিরুদ্ধ ভট্ট, ভীমভট্ট ও শ্রীমদগোবিন্দানন্দ ভট্টাদি কশ্মিরগণের জন্ত পদ্ধতিসমূহ রচনা করিয়াছেন । শ্রীনারায়ণ ভট্ট কশ্মিরগণের এবং শ্রীভবদেব ভট্ট বেদানুষ্ঠাতৃগণের জন্ত পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন । বর্ণাশ্রমাত্মগত ও অন্ত্যজ বর্ণোৎপন্ন গোবিন্দ-ভক্তগণের জন্ত বেদপুরাণ ও মন্বাদি ধর্মশাস্ত্রের সপ্রমাণ বাক্যদ্বারা সেবা ও নামাপরাধ বিচারপূর্বক পিতৃদেবার্চনপদ্ধতি ত্যাগ করিয়া এই ‘সংক্রিয়া-সারদীপিকা’-পদ্ধতি রচিত হইল ।” —স: সা: দী, (বঙ্গানুবাদ)

— জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

গোপীনাথ পটুনাথ-কথা

(পূর্বপ্রকাশিত ১৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৩ পৃষ্ঠার পর)

আন্তের নিপদ-ভঞ্জন

চাঙ্গ'পরে গোপীনাথ অরি' নিজ অপরাধ
এক মনে জপে কৃষ্ণনাম,
রহি' মরণের দ্বারে, মৃত্যুরে না ভয় করে,
গোরা-পদে সঁপি' মন প্রাণ ।
হেন গোপীনাথ-চিত কভু নহে ভয়ে ভীত,
বড় জানা হেরি' তা বিস্মিত ;
সবংশে বাণীনাথেরে বান্ধি' আনে দরবারে,
তবু গোপীনাথ নহে ভীত ।
প্রভুপাশে লোক গিয়া জানাইলা প্রণমিয়া
এ খবর তাঁহারে দ্বারায়,
কহে, “ওগো দয়াবান্ গোপীনাথে কর ত্রাণ,
তুঁহু বিনা কে আছে রক্ষায় ?”
ভক্তগণ কহে,—“প্রভু ! উদাস হয়ো না কভু,
রামানন্দ-গোষ্ঠী তব দাস” ;
ক্রোধে প্রভু ক'ন তবে, “তোমরা কি চাহ সবে
প্রার্থী হ'য়ে ধাই রাজা-পাশ ?
গিয়া আমি রাজদ্বারে, তা'র করমুক্তি তরে,
যদি মাগি ছ'লক্ষ কাহন ;
তবু রাজা কৃপাদৃষ্টে পাঁচ গণ্ডার এ বিপ্রে
অত ধন ছাড়িবে বা কেন ?”
তদা পুনঃ লোক আসি' প্রভুর চরণ স্পর্শি'
কাঁদি কহে করিয়া মিনতি,—
“পূর গোপীনাথ-আশ, বাঁচাও তাহারে আজ,
তুমি তার একমাত্র গতি ।

বড় জানা বুঝি এবে বধিবেন গোপীনাথে,
 তাই আমি এসেছি ছুটিয়া,
 জানি হে কৃপায় তব সবই হয় সম্ভব,
 দেহ' তাঁর বন্ধন মোচিয়া ।”
 যত ভক্তগণ সবে, জানালেন প্রভু-পদে,—
 “রক্ষ তা'রে করিয়া করুণা,
 তোমার অভয়-পদে দেহ-মন সঁপেছে সে
 সর্ব দোষ কর তার ক্ষমা ।”
 শুনি' হেন কাকুবাণী কহিলেন গোরামণি,—
 “ভিক্ষু আমি কি করিতে পারি ?
 তা'র প্রাণরক্ষা-তরে যাও জগন্নাথ-দ্বারে,
 জগন্নাথই মুক্তিদাতা হরি ।
 ‘কর্ত্তু মকর্ত্তু মনুথা’ করিতে সমর্থ সদা
 পরমেশ্বর জগন্নাথ প্রভু,
 তাঁর হাতে সর্ব অর্থ সর্বস্ব তাঁর আয়ত্ত্ব
 তিনি বৈ রক্ষক নাহি কভু ।”
 গৌরাজের যাহা ইচ্ছা তাহা জগন্নাথ-বাঞ্ছা
 গৌরাজই মূর্ত্ত জগন্নাথ,
 জগন্নাথ-ভৃত্য তাই প্রিয়া ত্বরা রাজ-ঠাই
 কহে,—“এ কি কাণ্ড, নহে হিত !
 রাজস্বের বিনিময়ে গোপীনাথ-প্রাণ ল'য়ে
 রাজস্ব না মিলিবে কখন ;
 তোমার সেবক সে যে, সেবকে বধিয়া শেষে
 কিবা ধর্ম্য হইবে পালন ?
 সেবকের প্রাণদণ্ড, নহে কভু রাজধর্ম্য,
 তোমা' পক্ষে ইহো না জুয়ায় ;
 লহ অশ্ব ঠিক দামে, ঋণ সে শোধিবে ক্রমে,
 যত্ন লহ তাহার রক্ষায় ।”

হরিচন্দনের পাশে শুনি' এ বারতা শেষে,
 সচকিতে কহিলা নৃপতি,—
 “গোপীনাথ-বিনাশিতে নাহি ইচ্ছা মোর চিতে
 দ্রব্য পেলে দানিব মুকতি ।
 রক্ষিতে তাহার প্রাণ কর সর্ব সমাধান
 তোমা' পরে করিহু নির্ভর” ;
 হরিচন্দন পাত্র তবে গিয়া বড় জানা কাছে
 রাজ-আজ্ঞা জানাল সত্তর ।
 তখন তাহার অশ্বে কেনা হ'ল ঠিক মূল্যে,
 কিছু ঋণ শোধ হ'ল তায় ;
 ঋণ যা' রহিল বাকী তাহার মুদ্রতি লিখি'
 গোপীনাথ পরিত্রাণ পায় ।

ভক্তের অর্ঘ্যাদা

এথা প্রভু ইচ্ছাময় জানাতে ভক্তির জয়
 জিজ্ঞাসে গোপীনাথ সেবকে,
 “বন্ধনেতে বাণীনাথ করেছিল কিবা কাজ,
 বিশেষিয়া কহ তা' আমাকে ।”
 সেবক কহিল ধীরে, “বাণীনাথ নিরন্তর
 অঙ্গুলিতে নাম-সংখ্যা রাখে,
 সহস্র নাম পূর্ণ ক'রে, কাটে রেখা অঙ্গ' পরে
 নিতি হেন হরিনাম জপে ।”
 কহে অগ্ন ভক্ত সবে, “তোমার করুণা এ যে,
 সদা নাম জপে সে বিরলে ।”
 শুনিয়া এতেক বাণী কহে হাসি' গোরামণি—
 “নামে রুচি ইহা রেই বলে ।”
 রাজগুরু কাশীমিশ্র হেনকালে এল তত্র
 দরশিতে গৌরাজ-চরণ;

প্রভু কহিলেন দুঃখে, “শান্তি হেথা না বিরাজে
দেখি’ শুনি’ ক্ষুব্ধ হয় মন ।

ভবানন্দ-গোষ্ঠী প্রতি রাজা যা’ দিতেছে শান্তি
বারংবার কহে তারা মোরে ;

আলালনাথে যেতে তাই হয় মোর অভিপ্রায়,
নাহি চাহি হেথা রহিবারে ।”

শুনি’ মিশ্র হেন বাণী, কহে,—“হে ভুবনস্বামী,
তব দুঃখ দাগা দেয় মোরে,

গোপীনাথ-বিপদেতে আসে ভৃত্য তোমা’ কাছে
তার দুঃখমোচনের তরে ।

যেও না চলিয়া কভু, রহ হেথা ওগো প্রভু—
তুমি যে গো মোদের শরণ ;

তোমা’ ছাড়ি’ বাঁচিব না, মৎস্য যেন জল বিনা
নাহি পারে ধরিতে জীবন ।”

এত কহি’ রাজগুরু গেলা ফিরে স্বমন্দির
মন্মাহত হইল হৃদয়,

মধ্যাহ্নে আসিলে নৃপ সেবিতে শ্রীগুরু-পদ,
কহিলেন সকল বিষয় ।

শুনি’ মহাপ্রভু-বাঞ্ছা দুঃখিত হইল রাজা,
কহে,—“গোরা মোর প্রাণধন,

মোর বলি’ যাহা আছে সকলি দিয়াছি সঁপে
এতে ছাড়ি’ তুলসী কাহন !

বধিবারে গোপীনাথে নাহি ইচ্ছা মোর হৃদে,
তারা সবে মোর প্রিয়জন ;

বড় জানা অর্থ পেতে চান্দ্রে চড়াইয়া ওকে
করে শুধু ভয় প্রদর্শন ।

জানাবেন প্রভু-পদে, ভবানন্দ-গোষ্ঠী সবে
ক্ষতিগ্রস্ত নাহি হবে আর,

প্রভু যেন হৃষ্ট মনে বিরাজেন এই স্থানে—
এই যাক্ষা করি পদে তাঁর ।”

এত কহি’ গজপতি, প্রাসাদে ফিরিয়া আসি,
পুত্র আর গোপীনাথে ডাকি’ ;
দৌহার মিলন করি’ কোড়ি সব দিল ছাড়ি,
ক্ষমা কৈল গোপীনাথ-ক্ৰুটি ।

রাজ্য ফিরি দিয়া তাঁরে, দ্বিগুণ বেতন হারে
রাজ-কার্য্যে করে নিয়োজন,
নিজে গোপীনাথ-শিরে, শিরোপা পরায়ে ধীরে,
ভক্তে মান দানিলা রাজন ।

মালজেঠা-অধিকারী রাজ-অর্থ চুরি করি’
লাঞ্ছনা পাইল রাজস্থানে,
গৌরাজ-চরণ স্মরে বিপদ হতে উদ্ধারে,
রাজ্য ধন পেল সসম্মানে ।

— শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল

সন্দভ-সার

(ভক্তিসন্দভ-২১)

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ ১৯৪০ শ্লোকে উদ্ধবের “লাভ কি” প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“লাভো মদভক্তিরুত্তমঃ” অর্থাৎ আমার প্রতি শুদ্ধ-ভক্তিই জীবের পরম ভাল ।

এইরূপে ভক্তির অভিধেয়ত্ব স্থাপিত হইল । তবে যে বহুস্থানে কন্ধ্যাদির সহিত মিশ্রভাবে ভক্তিধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কন্ধ্যাদি অভক্তি-মার্গনিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে ভক্তির সহিত সম্বন্ধ স্থাপন দ্বারা কৃতার্থ করিবার জন্ত এবং তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও ভক্তির আশ্বাদন করাইয়া শুদ্ধভক্তিতে প্রবর্তিত করাইবার জন্তই বুঝিতে হইবে । সর্বত্র ভক্তিরই অভিধেয়ত্ব বলিবার জন্ত ক্রমশঃ পুনরায় ব্যাখ্যাত হইতেছে—

এতাবানৈব লোকেহস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ ।

ভক্তিয়োগো ভগবতি তন্মামগ্রহণাদিভিঃ ।

(ভাঃ ৬।৩।২২)

তুচ্ছনাম-গ্রহণাদি দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যে ভক্তিয়োগ তাহাই এই মর্ত্য জগতে পরম ধর্ম বলিয়া বিদিত ।

আবার—

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ।

তীব্রেন ভক্তিয়োগেন যজ্ঞেত পুরুষঃ পরম্ ॥ (ভাঃ ২।৩।১০)

সর্বপ্রকার কামনাবিশিষ্ট হইয়া, নিষ্কামভাবে অথবা মোক্ষকামনা লইয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি তীব্র ভক্তিয়োগে পরমপুরুষ শ্রীহরির আরাধনা করিবে ।

সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং হেতুঃ পতিরহং প্রভুঃ ।

অহং যোগস্ত সাংখ্যস্ত ধর্মস্ত ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥

(ভাঃ ১।১।১৫।৩৫)

ব্রহ্মবাদিগণের সাংখ্য-ধর্মের—সর্ববিধা সিদ্ধির আমিই কারণ, আমিই পালয়িতা এবং আমিই প্রভু । এইসকল স্থলে ভক্তিরই পরমধর্মত্ব ও সর্বকাম-প্রদানত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে ।

স্কন্দপুরাণে সনৎকুমার-মার্কণ্ডেয়-সংবাদে কথিত হইয়াছে—

বিশিষ্টঃ সর্বধর্মানাং ধর্মো বিষ্ণুর্চনং নৃণাম্ ।

সর্বযজ্ঞতপোহোম-তীর্থস্নানৈশ্চ যৎফলম্ ॥

তৎফলং কোটিগুণিতং বিষ্ণুং সম্পূজ্য বাগ্নুয়াৎ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন নারায়ণমিহার্চয়েৎ ॥

সকল ধর্মের মধ্যে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অর্চনাই মানবগণের বিশেষ ধর্ম । সকল যজ্ঞ, তপস্শ্রা, হোম ও তীর্থস্নান হইতে যে ফললাভ হয়, শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিয়া তাহার কোটিগুণ ফলপ্রাপ্তি ঘটে । অতএব ইহলোকে সর্বপ্রযত্নের সহিত শ্রীনারায়ণেরই অর্চন করিবে ।

ঐ পুরাণে ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদেও—

অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ করোতি বৈ ।

ন হি তৎফলমাপ্নোতি মন্ত্ত্বৈর্ভেদব্যাপ্যতে ॥

আমার ভক্তগণ যে ফললাভ করে সহস্র সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞকারী ব্যক্তিরও তাহা পায় না ।

দ্বারকাগাহাত্ম্যে পরমেশ্বর-বাক্য—

মন্ত্ত্রিং বহতাং পুংসামিহলোকে পরেহপি বা ।

নাস্তুভং বিদ্যতে লোকে কুলকোটিং নয়েদ্বিবম্ ॥

আমরা ভক্তগণের ইহলোকে বা পরলোকে কোন অশুভই থাকে না, পরন্তু আমার প্রতি ভক্তি তাহাদের কোটি কুলকে দিব্যলোকে লইয়া যায় ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—

স্মৃতে সকলকল্যাণভাজনো যত্র জায়তে ।

পুরুষং তমজং নিত্যং ব্রজামি শরণং হরিম্ ॥

যাঁহাকে স্মরণ করিলে জীবসকল কল্যাণভাজন হয়, সেই জন্মরহিত সনাতন পুরুষ শ্রীহরির শরণাগত হই ।

ভক্তির সর্কবিঘ্ন-বিনাশকত্ব—

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্

ব্রশন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ ।

ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া

বিনায়কানীকপমূর্কসু প্রভো ॥ (ভাঃ ১০।২।৩৩)

হে মাধব, হে প্রভো, তোমাতে সৌহৃদ স্মৃত্রে আবদ্ধ ত্বদীয় ভক্তগণ ভক্তিমার্গ হইতে কোনকালে ভ্রষ্ট হন না । তোমাকর্তৃক সর্কতোভাবে রক্ষিত হইয়া তাহারা নির্ভয়ে বিঘ্নকারী দলপতিগণের মন্তুকোপরি বিচরণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ অনায়াসে বিঘ্নসকল জয় করিয়া থাকেন ।

ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে যে, যাঁহারা ভগবৎপাদপদ্ম সেবায় অনাদর করিয়া নিজদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বহুভন্মের তপস্শাবলে জীবমুক্তিদশা লাভ করিয়াও ভগবৎপাদপদ্মে অনাদরহেতু অধঃপতিত হন, কিন্তু ভক্তগণের তাহা নাই । ব্রত, গজেন্দ্র ও ভরতাদি ভক্তগণের উৎকৃষ্ট জন্ম হইতে বিচ্যুতি ঘটিলেও তাহাদের ভক্তি-বাসনার অনুসরণ পরজন্মে দেখা গিয়াছে । মুক্তগণও যদি অচিন্ত্য মহাশক্তিশালী ভগবানের নিকট অপরাধী হন, তাহা হইলে পুনরায় সংসার-বাসনা লাভ করেন ; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ কখনও ভ্রষ্ট হন না যেহেতু তাঁহারা ভগবানে বদ্ধসৌহৃদ্য । এস্থলে শ্রদ্ধামার্গে সাধকত্ব-নিবন্ধন, সৌহৃদ-শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে । ভগবানে বদ্ধসৌহৃদ-বশতঃই ভক্তগণ “ত্বয়াভিগুপ্তা”—ভগবান্

কর্তৃক সর্বতোভাবে রক্ষিত হন, ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। নিম্নের শ্লোকে তাহা বিশেষরূপে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে—

ত্বাং সেবতাং স্তুতকৃতা বহুবোহস্তুরাষাঃ ।
শোকো বিলজ্য পরমং ব্রজতাং পদং তে ।
নাত্মস্তু বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্
ধত্তে পদং স্বমবিতা যদি বিঘ্নমুদ্ভি। (ভাঃ ১১।৪।১০)

অর্থাৎ তোমার সেবনকারী ভক্তগণকে স্বর্গভূমি অতিক্রম করিয়া পরম-
পদে গমন করিতে দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ বহু বিঘ্ন উপস্থাপিত করেন।
কিন্তু যদি তুমি রক্ষাকর্ত্তা হও, তাহা হইলে তোমার সুরক্ষিত ভক্ত
অনায়াসে বিঘ্নের মস্তকে পদ ধারণ করেন অর্থাৎ বিঘ্নে অভিভূত না হইয়া
অনায়াসে তাহা অতিক্রম করেন।

আবার অত্র কথিত হইয়াছে—

ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্থলেন্ন পতেদিহ । (ভাঃ ১১।২।৩৫)

এই ভাগবতধর্ম্মে নেত্রদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক ধাবিত হইলেও স্থলিত বা
পতিত হইতে হয় না।

শ্রীভগবান্ কর্দ্দম প্রজাপতিকে বলিয়াছেন—

ন বৈ জাতু মৃষেব স্তাং প্রজাধার্ক মদর্হণম্ ।
ভবধিধেধতিতরাং ময়ি সংগৃভিতাঙ্গনাম্ । (ভাঃ ৩।২।২৪)

হে প্রজাপতে, আমার প্রতি একাগ্রচিত্ত ভক্তগণের বিশেষতঃ ভবাদৃশ
জনগণের নিকট বিহিত আমার যে অর্চন, তাহা কখনও কোনপ্রকারে
নিষ্ফল হয় না।

আবার উক্ত হইয়াছে—

বাধ্যমানোহপি মন্ত্রকো বিষয়ৈরভিতেন্দ্রিয়ঃ ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ।
(ভাঃ ১১।১৪।৩৮)

বিষয়ভোগে আকৃষ্যমান্ অজিতেন্দ্রিয় প্রাকৃত ভক্তও আমাতে প্রবল
ভক্তিপ্রভাবে বিষয় দ্বারা প্রায়ই অভিভূত হয় না। এস্থলে ‘প্রায়শঃ
বধ্যমানত্ব’ শব্দে কখনও কখনও ভগবদ্ব্যানাদি হইতে আমার ভক্তের
আকৃষ্যমানত্ব, তাহা হইলেও ‘বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেহপ্যনীশ্বরঃ’
(ভাঃ ১১।২০।২৭) অর্থাৎ কামসমূহকে দুঃখাত্মক জানিয়াও উহাদিগকে

ব্রহ্মারদীয়ে উক্ত হইয়াছে—

যত্র পূজাপরো বিকোস্তত্র বিঘ্নং ন বাধতে ।

রাজা চ তস্করশ্চাপি ব্যাধয়শ্চ ন সন্তি হি ।

প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুস্মাণ্ডা গ্রহা বালগ্রহাস্তথা ।

ডাকিত্বো রাক্ষসাস্চৈব ন বাধন্তেহচ্যুতার্চকম্ ।

যেস্থলে বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ ভক্ত বর্তমান সেস্থানে কোন বিঘ্নই পীড়ন করে না । কি রাজা, কি তস্কর, কি ব্যাধি কাহারও উপদ্রব তথায় থাকে না, বিঘ্নোৎপাদক প্রেত, পিশাচ, কুস্মাণ্ড (গণদেবতা), গ্রহ, বালকঘাতী গ্রহ, ডাকিনী ও রাক্ষস প্রভৃতি কোন অপদেবযোনি শ্রীঅচ্যুতের পূজককে পীড়ন করিতে পারে না ।

ভাগবতেও (৩।২২।৩৭) উক্ত হইয়াছে—

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ ।

ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশয়ম্ ।

হে ব্যাসনন্দন বিহুর, জরাদি শারীরিক, শোকাদি মানসিক, অনাবৃষ্ট্যাদি আধিদৈব অর্থাৎ আস্তরীক্ষ, শত্রু বা হিংস্র জীব প্রভৃতি এবং শীতোষ্ণাদি আধিভৌতিক ক্লেশসকল শ্রীহরিচরণাশ্রিত ব্যক্তিকে কিরূপে পীড়া দিতে পারে ?

গরুড়পুরাণেও উক্তি আছে—

ন চ দুর্কাসসঃ শাপো বজ্রঞ্চাপি শচীপতেঃ ।

হস্তং সমর্থং পুরুষং হৃদিস্তে মধুসূদনে ॥

যাঁহার হৃদয়ে শ্রীমধুসূদন অবস্থিত, সেই ব্যক্তিকে দুর্কাসার ভীষণ শাপ বা ইন্দ্রের বজ্রও বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না ।

পাপঘ্নতে দৃষ্টান্ত —

যথাগ্নিঃ স্তসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ ।

তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কুৎসশঃ ॥

(ভাঃ ১১।১৪। ১২)

হে উদ্ধব, প্রজালিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ আমার ভক্তিও সমগ্র পাপ নাশ করে । শ্রীধরস্বামি-টীকা—পাকাতির জন্ত প্রজালিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসমূহ ভস্মীভূত করে, সেইরূপ বাক্যদ্বারা কোন প্রকারে অহুষ্ঠিতা মদ্বিষয়িনী ভক্তিও সমস্ত পাপ বিনাশ করে । এজন্য

সাক্ষাৎ ভগবান্ ও স্বকীয় ভক্তিমহিমার প্রভাব স্বরণে বিশ্বয় হেতু উদ্ধবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “হে উদ্ধব, আশ্চর্য্যের বিষয় শ্রবণ কর।”

পদ্মপুরাণ পীতালখণ্ডে বৈশাখ-মাহাত্ম্যে—

যথাগ্নিঃ স্নানসমুদ্ভাচ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভাস্মসাৎ ।

পাপানি ভগবন্তুক্তিসুখা দহতি তৎকৃণাৎ ॥

অগ্নি প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসকলকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ ভগবন্তুক্তি পাপসকলকে তৎকৃণাৎ দহন করিয়া ফেলে ।

‘স্নানসমুদ্ভাচ্চিঃ’ এই পদদ্বারা সাধনভক্তির কৰ্ম্মজ্ঞানাদি অন্তঃসাধনসাপেক্ষতা, অসাধ্য-সাধ্যতা ও ফলোৎপাদনে বিলম্বতা নিরাকৃত হইয়াছে । অর্থাৎ ভক্তি যে সম্পূর্ণ কৰ্ম্ম-জ্ঞান-নিরপেক্ষা, ভক্তি যে সৰ্ব্ব সাধ্যেরই সাধন বা ভক্তি-প্রভাবেই যে সৰ্ব্ব বস্তুর লাভ এবং অবিলম্বে তৎফলপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা সংস্থাপিত হইল ।

কেচিং কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ ।

অথ ধূম্রস্তি কাংস্মোন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥

(ভাঃ ৬:১১৫)

সূর্য্য যেমন হিমরাশিকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে, তদ্রূপ বাসুদেব-পরায়ণ কোন কোন ঐকান্তিক ভক্ত কেবলা ভক্তিযোগে পাপকে সমূলে উৎপাটিত করেন । ‘কেচিং’ এই পদদ্বারা ঐরূপ ঐকান্তিক ভক্তিপ্রধান সাধক যে বিরল তাহাই উক্ত হইয়াছে । ‘বাসুদেবপরায়ণাঃ’ এই পদটি ‘কেবলা ভক্তি’-পথের অধিকারী ব্যক্তিগণের বিশেষণ নহে, কিন্তু অন্যান্য সাধকগণ ‘কেবলা ভক্তি’তে অপ্রবৃত্ত হওয়ায় অর্থাৎ ঐকান্তিক ভক্তগণের মধ্যেই ‘কেবলা ভক্তি’ মাত্র পর্য্যবসিত হওয়ায় প্রযুক্ত ‘বাসুদেবপরায়ণাঃ’ পদটি এস্থলে অনুবাদ উল্লিখিত মাত্র হইয়াছে । অর্থ এই, সূর্য্য যেরূপ কেবলমাত্র স্বীয় রশ্মিদ্বারা স্বভাবতই হিমকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করে, উহার বিনাশের জ্ঞাত তাহার কোন প্রযত্নের আবশ্যকতা হয় না, তদ্রূপ বাসুদেবপরায়ণ ব্যক্তিও কেবলা ভক্তি দ্বারাই স্বভাবত নিখিল পাপ নাশ করেন । তজ্জ্ঞাত তাঁহার অত্ন কোন যত্নের আবশ্যকতা নাই ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রোতী মহারাজ

শ্রীশ্রীএকাদশী-মাহাত্ম্য

[পদ্মপুরাণ-উত্তরখণ্ড, অষ্টাষিংশ অধ্যায়]

(পূর্ব-প্রকাশিত ১৮শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, ৩৮৫ পৃষ্ঠার পর)

আমলকী একাদশী

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“হে কৃষ্ণ! মহাফলজনক বিজয়া-একাদশীর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম, সম্প্রতি ফাল্গুনী গুরুপক্ষীয়া একাদশী যে নামে খ্যাত তাহা বর্ণন করুন।”

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—হে মহাভাগ যুধিষ্ঠির! মাস্কাতার প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা বশিষ্ঠ এই একাদশীর কথা বলিয়াছিলেন। ইহার নাম আমলকী একাদশী। ফাল্গুনের গুরুপক্ষের এই আমলকী একাদশীর পুণ্যজনক ব্রত বিষ্ণু-লোক প্রদানকারী বলিয়া বিশেষভাবে কথিত হয়। ঐদিন আমলকী বৃক্ষের তলে রাত্রি-জাগরণ করিলে গো-সহস্র দানের ফললাভ হয়।

মাস্কাতার কৌতূহল নিবারণে বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভাগ! যে প্রকারে এই সর্ষপাপ-বিনাশী আমলকী বৃক্ষ পৃথিবীতে উৎপন্ন হইলেন, তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি।

পূর্বকালে ব্রহ্মার দৈনন্দিন প্রলয়কাল (অর্থাৎ ব্রহ্মার রাত্ৰিকাল) উপস্থিত হইলে স্বাবর-জঙ্গম এবং দেবতাগণ, অশ্বরগণ, রাক্ষসগণ সমস্ত নষ্ট হইলে পর সেই একাধ্ব-জলে দেবাদিদেব পরমাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হইলেন। তখন সেই জগৎরূপ ব্রহ্মের স্তবনবশতঃ মুখ হইতে চন্দ্রতুলা শুভ্রবর্ণ একবিন্দু জল উথিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। সেই জলবিন্দু হইতে আপনাআপনি একটি বৃহৎ আমলকী বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। উহার বিশাল শাখা-প্রশাখা সমূহ ফলভারে নত হইয়াছিল। সেই বৃক্ষই সমস্ত বৃক্ষের আদি বৃক্ষ বলিয়া কথিত হয়। এই বৃক্ষ হইতেই ভগবান্ কর্তৃক ব্রহ্মা সৃষ্ট হন এবং সমস্ত প্রজা, দেব-মনুষ্যাদিও তাহা হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন। দেবগণ ও ঋষিগণ আশ্চর্য্যজনক এই বৃক্ষকে দেখিবার জন্ত যেখানে সেই বৃক্ষ আছে, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বৃহৎ স্নানভিনব আমলকী বৃক্ষ দেখিয়া পরম বিস্ময়প্রাপ্ত দেবতা ও ঋষিগণ সকলে পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন, কারণ একরূপ আশ্চর্য্য বৃক্ষ তাঁহারা কখনও দেখেন নাই। প্লক্ষাদি বৃক্ষ পূর্বে দেখিয়াছেন বটে, তাহাদের

নামাদিও অংগত আছেন; কিন্তু এই বৃক্ষ কোথা হইতে আসিল এবং কি নাম ইত্যাদি অজানা হেতু বিষয় সকলে চিন্তাশ্রিত আছেন। এমন সময়ে তাঁহাদের চিন্তা দূীকরণার্থ আকাশবাণী উথিত হইল।

আকাশবাণী কহিলেন—হে দেবগণ! এই বৃক্ষের নাম আমলকী, পরম বৈষ্ণব বলিয়াই বিখ্যাত। ইহার স্মরণমাত্রই গোদানের ফললাভ হয়, দর্শনে তাহার দ্বিগুণ ও ইহার ফল ভক্ষণে উহার তিনগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব সর্বপ্রকারে এই আমলকীর সর্বদা সেবা করা উচিত। এই বৈষ্ণবী আমলকী সর্বপাপ-বিনাশিনী। তাহার মূলদেশে ভগবান্ বিষ্ণু, উর্দ্ধে পিতামহ ব্রহ্মা ও স্বর্গে পরমেশ্বর রুদ্র অবস্থান করেন। ইহার শাখা-সমূহে মুনিগণ এবং প্রশাসনসমূহে দেবগণ অসন্তান করেন। পর্ণসমূহে বসু নামক দেবগণ, পুষ্পেতে বায়ু নামক দেবগণ এবং ফলসমূহ সমস্ত প্রজাপতি অবস্থান করেন। এই আমলকী সর্বদেবময়ী, স্মৃতির ঐক্য-ভক্তি-পরায়ণগণের এই ব্রত পরম পুণ্যতম বলিয়া জানিবে।

ঋষিগণ কহিলেন—হে প্রভো! এই ব্রতের বিধি জানিতে বাসনা। কি প্রকারে এই ব্রতটি সম্পূর্ণ হয়, এই ব্রতের প্রণাম-মন্ত্র এবং অত্যান্ত তথ্যসকলও বর্ণনা করুন।

প্রশ্ন শুনিয়া বিষ্ণু বলিলেন—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, এই ব্রতে অত্যান্ত একাদশীর তায় প্রাতঃস্নানাদি নিয়মাদি-গ্রহণপূর্বক পতিত, চৌর, পাষণ্ডী, দুর্বৃত্ত, মর্যাদাহীন ও গুরুদারাভিগামী মনুষ্যের সহিত আলাপ করিবে না। অপরাহ্নে পুনরায় যথাবিধি স্নান করিবে, সেই স্নানে মৃত্তিকা গ্রহণপূর্বক নদী, তড়াগ, কূপ অথবা গৃহে উথিত জলে স্নান-মন্ত্রাদি পাঠ সম্পূর্ণ করিবে। তৎপর স্তব্ধ দ্বারা পরশুরাম-মূর্ত্তি নির্মাণ করিবে। সেই স্তব্ধের পরিমাণ এক মাসা অথবা তাহার অর্দ্ধ বা শক্তি অনুসারে তদর্দ্ধও করিতে পারা যায়। স্নানান্তর গৃহে আসিয়া সেই জামদগ্ন্য-মূর্ত্তির পূজা ও হোমাদি সমাপন-পূর্বক আমলকী বৃক্ষের তলায় গমন করিবে।

পূজাসম্ভার সহ তথায় যাইয়া প্রথমতঃ বৃক্ষের চতুর্দিক পরিষ্কার করিবে, তৎপর ছিদ্রাদি দোষরহিত একটি কলসী সেই বৃক্ষের সম্মুখে মন্ত্রদ্বারা স্থাপন করত তাহাতে পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব, দিব্য গন্ধাদি, ছত্র, উপানহ (পাতুকা), বস্ত্র ও শ্বেত চন্দ্রনাদি প্রদান করিবে। তৎপরি উত্তম লাজ (খই)-প্রপূরিত একটি পাত্র স্থাপনপূর্বক উহার উপর পরমশুভদায়ক সেই জামদগ্ন্য-

মুক্তি স্থাপন করিবে। মন্ত্রদ্বারা পূজা সমাপনান্তে শ্বেতবর্ণ ফলদ্বারা ভক্তি-
ভরে দেবদেব জামদগ্ন্য-প্রভুকে অর্ঘ্য প্রদানপূর্বক রাত্রি-জাগরণ করিবে।
নৃত্য, গীত, বাত, ধর্মগ্রন্থ, বৈষ্ণবোখ্যান পাঠ ও আলোচনাদ্বারা সমস্ত রাত্রি
অতিবাহিত করিয়া বিষ্ণুনাথ ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনপূর্বক ১০৮ বার অথবা
২৮ বার সেই আমলকী বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিবে। অতঃপর রাত্রি-প্রভাত-
সময়ে জামদগ্ন্য-মূর্ত্তির মঙ্গলারাত্রিকাদি সমাপন করিয়া শ্রীনামপরায়ণ
ব্রাহ্মণকে পূজা করিবে এবং ‘জামদগ্ন্য-স্বরূপ শ্রীকেশব আমার প্রতি প্রীত
হউন’—এইরূপ চিন্তা করিয়া সূর্য, জামদগ্ন্য-মূর্ত্তি, ঘট, বস্ত্রযুগ্ম, উপানহ
প্রভৃতি সমস্ত পূজাদ্রব্য ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া উক্ত আমলকী বৃক্ষকে
স্পর্শ, প্রদক্ষিণ ও প্রণামাদি করিবে। তৎপর যথাবিধান স্নানাদি সমাপন-
পূর্বক শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া কুটুম্বগণের সহিত
নিজে ভোজন করিবে। এই একাদশী-ব্রতের পুণ্য অত্যাশ্রয় সমস্ত দান ও
সমস্ত যজ্ঞাদি হইতেও অধিক, ইহাকে কোনও সংশয় নাই।

বশিষ্ঠ বলিলেন—হে মহারাজ মাক্ষাতা! ব্রাহ্মণগণের প্রশ্নের উত্তরে
ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ ব্রতবিধান বর্ণন-পূর্বক তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলে
সেই ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুর উক্ত উপদেশ মত যথাবিধান এই ব্রত পালন
করিলেন।

মাক্ষাতার নিকট বশিষ্ঠ ঋষির এই ব্রত-বর্ণনায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে
শ্রবণ করাইয়া বলিলেন—“হে যুধিষ্ঠির এই ব্রত অতিশয় শুভফলদায়ক ও
সমস্ত পাপ বিনাশ করে”।

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে ফাল্গুন-শুরুপক্ষীয়

আমলকী একাদশী-মাহাত্ম্য বর্ণনের অনুবাদ সমাপ্ত।

—পণ্ডিত শ্রীযুত নবীনচন্দ্র স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থ

১১ শ সংখ্যা ১৯৩৩ খ্রিঃ

১১ শ সংখ্যা ১৯৩৩ খ্রিঃ

১১ শ সংখ্যা ১৯৩৩ খ্রিঃ

১১ শ সংখ্যা ১৯৩৩ খ্রিঃ

১১ শ সংখ্যা ১৯৩৩ খ্রিঃ

পূজ্যপাদ পরমহংসস্বামী
শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের শ্রীচরণে
দীনান্ন অর্ঘ্য

(জয়) গোলোকভূষণ, কৃষ্ণপ্রিয়তম,

কৃষ্ণ-প্রেম-ধন-দাতা ।

প্রতি ঘরে ঘরে, জীবের গোচরে,

কহিছ প্রেমের কথা ॥

সংসারের সার, সর্বস্ব তোমার,

তুমি হে জীবের বন্ধু ।

তব কৃপাবলে, জীব অবহেলে,

পার হয় ভবসিন্ধু ॥

সম্বন্ধ-বিজ্ঞান, তুমি কর দান,

জীবের মঙ্গল তরে ।

অজ্ঞান-তিমির, নিমেষেতে হর,

শুভ দৃষ্টি দান ক'রে ॥

(জয়) ভক্ত-শিরোমণি, মূর্ত গৌরবাণী.

আনি' সরস্বতী-ধারা ।

কত অধম পামরে, অভিষিক্ত ক'রে,

নাশিলে এ ভবকারা ॥

(তুমি) লয়ে গৌরহরি, দিগ্বিজয় করি'

ভ্রমিছ ভূমণ্ডলে ।

মো-হেন পাতকী, কভু দেখেছ কি,

সসাগরা মহীতলে ??

ভুলিয়া কেশব, প্রাণী বত শব,

মুক্তি লভিবে কেমনে ?

তুমি হে কেশব ! তাদের উদ্ধারে,

প্রতিজ্ঞা করেছ মনে ॥

তাই অভাজন, করিছে রোদন,

ধরি' তব শ্রীচরণে ।

আমারে তারিলে, তোমার মহত্ত্ব,

দেখিবে জগৎজনে ॥

জয়, জয়, জয় ! করুণা আনয়,

বৈষ্ণব-ঠাকুর তুমি ।

মো-হেন পামরে, করহ উদ্ধার,

তব পদে নমি আমি ॥

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবপদরেণু প্রার্থিনী

—শ্রীমতী প্রফুল্লকুমারী দেবী, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীশ্রীগুরুচরণকমলেভ্যো নমোনমঃ

“শ্রীচৈতন্যদেবের অবতারত্ব-সমীক্ষা”-পুস্তকের প্রতিবাদ

(পূর্ব-প্রকাশিত ১৮শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, ৩৯১ পৃষ্ঠার পর)

বোপদেব শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা নহেন

‘বোপদেবাচার্য্যই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছেন’ (পৃঃ ৩২)—তর্কতীর্থের এই উক্তি যে ভ্রমগ্রস্ত তাহা দেখান হইতেছে—

শ্রীমদ্বাচার্য্য ১১৬০ শকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার ভাষ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীরামানুজ ১৩৮ শকে জন্মগ্রহণ করেন ; তিনি বেদান্তসারে শ্রীভাগবতের ‘বেদস্তুতির’ প্রমাণ তুলিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য্য ১০০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন ; শ্রীভাগবতের তাঁহারও রচিত টীকা আছে। অভিনবগুপ্ত ১০০০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন ; তিনি তাঁহার গীতার টীকায় ভাগবতের ১১স্কন্ধের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাধব-বুত্তি-ব্যাখ্যায় শ্রীভাগবতের শ্লোকের উল্লেখ আছে। তাহার অনুবাদ চীন ভাষায় ৫৫৭—৫৬৬ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে। শ্রীশঙ্করের পরমগুরু শ্রীগৌরপাদ পঞ্চীকরণে—শ্রীমদ্ ভাগবতের “অগৃহে পৌরুষং” ইত্যাদি শ্লোকটি

উদ্ধৃত করিয়াছেন। সনৎসর-প্রদীপ নামক স্মৃতি-নিবন্ধে শ্রীভাগবতের কথা উল্লিখিত আছে। শ্রীরামপার্বদ শ্রীহনুমানের শ্রীভাগবতের ভাষ্য আছে। এই প্রকার বিদ্বৎকামধেনু, তস্তুদীপিকা, ভাবার্থদীপিকাদি প্রাচীন ও অর্কাচীন বহু বেদজ্ঞ সজ্জন এই শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্কর শ্রীভাগবতের ভাষ্য করেন নাই, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া, শ্রীভাগবতের গ্রহণ ব্যতীত নিজ জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিবে না চিন্তা করিয়া তাঁহার রচিত শ্রীগোবিন্দাষ্টকে কেবলমাত্র শ্রীভাগবতেই বর্ণিত বিশ্বরূপ-দর্শন, ব্রজেশ্বরী-বিস্ময়, ব্রজকুমারীদিগের বসন-চৌর্য্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য ও শ্রীশঙ্কর সমসাময়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীশঙ্করের সময় হইতে দুইশত বৎসর পর ১৩০০ খৃঃ বোপদেবের জন্ম। শ্রীরামপার্বদ হনুমান, চিং-সুখাচার্য্য (বিভ্রমঙ্গল ঠাকুর) প্রমুখ বহু পূর্ববর্তী কালের মহাজ্ঞগণ যে সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তখন যে বোপদেবের জন্মই হয় নাই, তাহা বুঝিতে আর কাহার অম্বিধা হইবে?

দেবীপুরাণ 'ভাগবত' নহে

'দেবী ভাগবত' যে ভাগবত নহে, উহা যে একটি জালপুঁথি, উক্ত গ্রন্থের শ্লোকদ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে।

প্রণম্য চ শিবাং দেবীং শর্কং ভাগবতং তথা ।

পুরাণং সম্প্রবক্ষ্যামি যথোক্তমুন্নিভিঃ পুরা ॥

দেবী শিবা ও ভাগবত শর্ককে প্রণাম করিয়া পুরাকালে ঋষিগণ যেমন বলিয়াছিলেন তদনুরূপ পুরাণ-কথা বলিতেছি। উক্ত শ্লোকে 'ভাগবতং' শব্দ 'শর্কং' এই শব্দের বিশেষণ, 'পুরাণং' শব্দের বিশেষণ 'ভাগবতং' নয়; যেহেতু 'তথা' এই শব্দের দ্বারা 'ভাগবতং' ও 'পুরাণং' শব্দ ব্যবধান প্রাপ্ত হইয়াছে। শর্কের ভাগবতত্ব সন্দেহে প্রশ্ন—

“ভস্মোদ্ধূলিত দেহস্ত জটামণ্ডলমণ্ডিতঃ ।

অহং ধ্যায়ামি তং বিষ্ণুং পরমাত্মানমব্যয়ং ।

বিষ্ণোরাদানার্থং মে ব্রতচর্য্যা পিতামহ ॥”

(গরুড় পুরাণ ২য় অঃ ১১-১২ শ্লোক)

শ্রীমহাদেব-বাক্য—“হে পিতামহ! আমি ভস্মমাখা দেহ ও জটামণ্ডল-

মণ্ডিত হইয়া সেই পরমাত্মা অব্যয় বিষ্ণুকে ধ্যান করি। বিষ্ণুর আরাধনার জন্তই আমার সঙ্কল্প।’ সুতরাং যিনি ভগবদ্ভক্ত তিনিই ভাগবত বলিয়া খ্যাত হন। ‘ভগবত্যাঃ ইদং ভাগবতমিতি’—এইভাবে ‘ভাগবত’ পদ সিদ্ধ হয় না, “শ্রীভ্যো চক্” ব্যাকরণের এই সূত্রই তাহার বাধক।

আবার মৎস্য ও स्कन्दপুরাণে শ্রীভাগবতের লক্ষণ বলা হইয়াছে—
উহা গায়ত্রীদারা সমারক, শ্লোকসংখ্যা অষ্টাদশসহস্র। পদ্মপুরাণে, ভাগবত ‘শ্রীগুরু-কথিত’ বলিয়া উক্ত হওয়ায় দেবীপুরাণ গ্রহণীয় নয়। মৎস্যাদিতে পুরাণের যে সকল লক্ষণ বলা হইয়াছে তাহাও দেবীপুরাণে নাই, বরং তাহার বিপরীত লক্ষণই দৃষ্ট হয়। তথাকথিত দেবীপুরাণে শ্লোকসংখ্যা লক্ষ বলা হইয়াছে। বিজয়, ত্রৈলোক্যাভ্যুদয়, শুভ-নিশুভ মথনাথ্য পাদত্রয় বিশিষ্ট লক্ষণ। উক্ত গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা যে লক্ষ—তাহা বিভাদেব-কথিত অভ্যুদয় পাদপুষ্টি অধ্যায়ের বাক্য হইতে জানা যায়; ইহাতে শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ কোথায়ও নাই; আধিক্য অধ্যায়-সমাপ্তিতে ‘দেবীপুরাণ’ এই প্রকার নামেরই উদাহৃতি দেখা যায়, কিন্তু ‘ভাগবত’ নামে নহে। এই হেতু দেবীপুরাণকে যাহারা ভাগবত বলেন—তাহারা শুক-ভাষিত যে ভাগবত তাহার প্রতি এবং তদ্বাচ্য ভগবানের প্রতি বিদ্বেষণতঃই ঐ সকল কথা বলেন মাত্র।

শ্রীমদ্ভাগবত-দানের মর্যাদারও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। শ্রীভাগবত স্বর্ণসিংহাসন বাহন করিয়া দান করিতে হয়, কিন্তু দেবীপুরাণাদি জল ও ধেনু-সম্বিত করিয়া দান করার বিধি। সুতরাং এই হেতুও শ্রীমদ্ভাগবতের বৈশিষ্ট্য। শ্রীভগবৎ-প্রোক্ত ভগবদেবতাকর্ত্ত্বকতরূপ অবয়ব শক্তিদ্বারা ও সমুদয় শক্তিরারা ও শুকভাষিত শাস্ত্রকে বোধ করাইয়া এই এই ‘ভাগবত’ শব্দ পঞ্চজাদি শব্দের ত্রায় যোগকৃত বুঝিতে হইবে।

মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত পরস্পর বিরোধী নহে

“মহাভারতের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের মারাত্মক বিরোধ রহিয়াছে... .. এইরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ বর্ণনা একজনের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়” (পৃ: ৪১)—
তর্কতীর্থের এই উক্তি কতদূর বিচারসহ তাহা দেখা যাউক।

তর্কতীর্থ মহাশয়ের জ্ঞান যে সীমিত তাহা উপরের উক্তি হইতেই বুঝা যায়। শাস্ত্র যতটুকু পড়িয়াছেন তাহারও সমাধান কি করিয়া করিতে হয় জানেন না।

সমাধান এইরূপ—সর্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাসের ভ্রম থাকিতে পারে না।

শ্রীমহাভারতে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও সত্য, শ্রীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত ও বরাহপুরাণে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও সত্য। বিভিন্ন কল্পে একই চরিত্রের বিভিন্ন অবস্থান থাকে। কোন কোন কল্পে, পরীক্ষিতের যাহা হইয়াছিল সেইপ্রকার ভাবেই মহাভারতে বর্ণনা হইয়াছে। আর বর্তমান অষ্টাবিংশ চতুষ্টয় কল্পিতে শ্রীভাগবত যেভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, শ্রীভাগবত শ্রবণ করিয়াই সেইভাবেই বর্তমান কল্পে পরীক্ষিতের দেহ-ত্যাগ হয়। পাণ্ডিত্যভিমাণে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত জানা যায় না, মহচ্চরণ আশ্রয় করিয়া শাস্ত্রাহীনীন করিলে শাস্ত্রই কৃপা করিয়া সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কাহারও অংশ নহেন, তিনিই

অংশী ও পূর্ণ

তর্কতীর্থের আর একটি উক্তি—“শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অষ্টমাংশের অবতার” (পৃঃ ৪১)—বিষয়টি আলোচিত হইতেছে।

উপরোক্ত বাক্যটি শ্রীমহাভারতের অন্তর্গত শ্রীগীতা-বাক্যেরও সম্পূর্ণ বিরোধী। নিম্নে শ্রীগীতার বিরোধী স্থানগুলি উদ্ধৃত হইল এবং সকল মায়ারাদিরও মাত্ৰ শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদের টীকা ও তাঁহার নিজরচিত শ্লোকও দেওয়া হইল যাহাদ্বারা উপরোক্ত আপত্তিকর মন্তব্য বোধগম্য হইবে।

গীঃ ৭।৭ শ্লোক—“মতঃ পরতরং নাত্মং” অর্থাৎ আমি হইতে শ্রেষ্ঠ অত্ৰ কিছুই নাই।

গীঃ ১৪।২৭—“ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাং” অর্থাৎ আমি ব্রহ্মেরও আশ্রয়।

গীঃ ১৫।১৫—“বেদৈশ্চ সর্কৈরহমেব বেদ” অর্থাৎ আমিই সর্ববেদবেদ্য।

গীঃ ১৫।১৮ “অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ” অর্থাৎ এই হেতু আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সরস্বতীপাদের টীকা—... ... প্রথিতঃ পুরুষোত্তম ইতি “সঃ উত্তমঃ পুরুষঃ ইতি বেদে উদাহৃত এব লোকে চ কবি কাব্যাদৌ হরিষ্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃত ইত্যাদি প্রসিদ্ধং। কারুণ্যতো নরবদাচরতঃ পরার্থান্ পার্থায় বোধিতবতো নিজমীশ্বরত্বং। সচ্চিৎসুখৈকবপুষঃ পুরুষোত্তমশ্চ নারায়ণশ্চ মহিমা ন হি মানমেতি।” অর্থাৎ তিনি উত্তম পুরুষ এই কথা বেদে উদাহৃতই আছে। আর লোকে অর্থাৎ কবি কাব্যাদির মধ্যেও একমাত্র হরিই পুরুষোত্তম বলিয়া “স্মৃতঃ” ইত্যাদি প্রসিদ্ধই আছে। যিনি

কারুণ্যবশতঃ মনুষ্যের ছায় আচরণ করিয়া পার্থকে পরমার্থ তত্ত্ব উপদেশ দিয়া নিজ ঈশ্বরত্বের অনুভব দিয়াছিলেন। সেই সৎ, চিং ও সুখস্বরূপ পুরুষোত্তম নারায়ণের গাচমার পরিমাণ হয় না।

গীঃ ১৫।১৯—“যো যামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্। স সৰ্ববিদুজতি”

টীকা — ...যে যামীশ্বরং এবং যথোক্তনামনির্কচনেন অসম্মূঢ়ঃ মনুষ্য এবায়ং কশ্চিং কৃষ্ণ ইতি সংমোহবর্জিতঃ জানাত্যমীশ্বর এবেতি পুরুষোত্তমং প্রাখ্যাখ্যাতং স মাং ভজতি সেকতে। সৰ্ববিং মাং সৰ্বাত্মানং বেত্তীতি স এব সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বভাবেন প্রেমলক্ষণেন ভক্তিযোগেন হে ভারত ! অতো যদুক্তং ‘মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূষায় কল্পতে।’ ইতি তদুপপন্নং। যচ্চোক্তং ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি তদুপাপন্নতরং ‘চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং ব্রহ্মস্রীণাং হারং ভব জলধিপারং কৃতধিয়াং। বিহন্তং ভূভারং বিদধদবতারং মুহুরহো বারং বারং ভজত কুণলারন্তকৃতিনঃ’।

আমাকে এই প্রকার যথোক্ত নাম নিরুক্তি দ্বারা অসম্মূঢ় হইয়া অর্থাৎ এই কৃষ্ণ একজন মনুষ্য ব্যতীত কিছুই নন—এই প্রকার যে সম্মোহ তাহা বিবর্জিত হইয়া যিনি আমাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, পূর্বে যাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেই পুরুষোত্তম, সেই ব্যক্তিই আমার সেবা করেন। আর তিনিই সৰ্ববিং, তিনি আমাকে সৰ্বাত্মারূপে জানেন বলিয়া তিনিই সৰ্বজ্ঞ। হে ভারত ! তিনিই আমাকে সৰ্বতোভাবে প্রেমলক্ষণ-ভক্তি-যোগ দ্বারা ভজন করেন। সুতরাং ‘যে ব্যক্তি অব্যভিচারী ভক্তিযোগ সহকারে আমার সেবা করেন, তিনিও গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মস্বরূপতার যোগ্য হন। এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহা সঙ্গতই হইয়াছে। আর আমিই “ব্রহ্মের পর্য্যাপ্তি স্বরূপ”—এইরূপ যাহা বলা হইয়াছে তাহাও অধিকতর যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। অতএব কুণলারন্ত কৃতিগণ, যিনি চিদানন্দ-স্বরূপ,—যিনি জলধর-রুচিসার,—যিনি শ্রুতিবাক্যের সার,—যিনি ব্রহ্ম-সুন্দরীগণের কণ্ঠভূষণ,—যিনি কৃতধী ব্যক্তিগণেরও ভবসাগরের পারস্বরূপ এবং যিনি ভূভার হরণ করিবার নিমিত্ত মুহুমূহ অবতার গ্রহণ করেন, সেই পরম স্বপ্রকাশতত্ত্বকে বারংবার ভজন করুন।

গীতা ১৫।২০—“গুহ্যতমং শাস্ত্রং” এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্যে সরস্বতী-পাদ বলিতেছেন—“রহস্যতমং সম্পূর্ণং শাস্ত্রং” এই অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

তাহা হইলে শ্রীগীতা সকল উপনিষদ্-সার বলিয়া সকল উপনিষদের তাৎপর্য পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বে পর্যাপসিত—ইহা প্রমাণিত হইল।

এক্ষণে সরস্বতীপাদ, গীতার শেষ অধ্যায়ের শেষে নিজকৃত শ্লোকে বলিতেছেন—

বংশীবিশুষিত-করান্নবনীরদাভাং

গীতাধরাদরুণবিষফলাধরোষ্ঠাং।

পূর্ণেন্দু-মুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাং

কৃষ্ণাং পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥

ঐহার বংশীবিশুষিত করকমল,—ঐহার নবনীরদকান্তি—ঐহার বসন গীতবর্ণ,—ঐহার অধরোষ্ঠ বিষফল তুল্য অরুণ,—ঐহার মুখকমল পূর্ণেন্দুর ত্রায় মনোহর,—ঐহার নয়ন অরবিন্দসদৃশ—সেই যে কৃষ্ণ, তাঁহা হইতে যে আরও কিছু পরম তত্ত্ব আছে তাহা আমি জানি না।

শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত মহিমা প্রয়াণ সহকারে নির্ণীত হইলেও ঐহার ইহা সহ করিতে পারে না, সেই সমস্ত মূঢ়গণ নিশ্চিতই নিরয়গামী হইয়া থাকে। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ বলিতেছেন—

প্রমাণতো হি নির্ণীতং কৃষ্ণমাহঙ্কামদু তং।

ন শক্লুবন্তি যে সে চুঃ তে মূঢ়া নিরয়ং গতাঃ ॥

তর্কতীর্থ মহাশয়কে অনুরোধ, তিনি যেন এই প্রকার মূঢ়তা ও পাগলামি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদের উক্ত টীকা দেখেন, তাঁ'র নিজকৃত শ্লোক দেখেন। মহাভারতে শান্তিপর্বে 'কৃষ্ণ নারায়ণের অষ্টমাংশ' থাকা সত্ত্বেও 'শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব'—ইহা শ্রীসরস্বতীপাদ নির্ণয় করিলেন কি করিয়া? ইহা চিন্তা করিলে শ্রীমদভাগবতের বাক্য "কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং"—এর তাৎপর্য বুঝিতে পারিবেন। তথাপি সামান্য একটু আলোচনা করিতেছি।

"কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং"—ইহা হইতেছে পরিভাষা বাক্য। পরিভাষা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হইয়াছে - 'অনিয়মে নিয়মকারিণী'। শাস্ত্রে একবারই পরিভাষা কথার উল্লেখ হয়; একবার উল্লিখিত হইলেও একমাত্র উহা দ্বারা কোটি কোটি বাক্য শাসিত হইয়া থাকে। শ্রীমদভাগবত পরমার্থ-নির্ণায়ক শাস্ত্র "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং"—তাহাতে আবার পরিভাষা বাক্যটি আর্থিক অর্থাৎ তাৎপর্য নির্ণয়ের একমাত্র সহায়। আবার 'কৃষ্ণস্ত-

ভগবান্ স্বয়ং’—ইহা গুণবাদ নহে ; তাহার কারণ, গুণবাদে মুখ্যার্থ বাধিত হয় এবং গৌণার্থ প্রতীত হয়। এখানে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্বাভ্যাতক বাক্য গুণবাদ নহে। যদি উহা পরিভাষা বাক্য না হইত, তবে অত্র বাক্য-বিরোধে ইহার গৌণার্থ অবলম্বন করিয়া অর্থ-সঙ্গতি করিতে হইত। এই শ্রীমদ্ভাগবত পরমার্থ নির্ণায়ক শাস্ত্র বলিয়া কেবল শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী বাক্যই নয়, অত্যান্ত পুরাণ মহাভারতাদিরও সমস্ত বিরোধী বাক্যকেই এই পরিভাষা বাক্যের অনুগত বলিয়া অর্থ করিতে হইবে।

মহাভারত প্রভৃতি যাগতীয় শাস্ত্র হইতেও

একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেরই উৎকর্ষ

তর্কতীর্থ মশাই। “একথা বলিবার উপায় নাই যে মহাভারত হইতে ভাগবতের প্রাধান্য অধিক” পৃঃ ৪৫ — এই উক্তিও যে অশাস্ত্রীয় তাহা না জানিবার কারণ কি আপনার ইচ্ছাকৃত নহে? অত্যান্ত পুরাণ হইতে এমনকি মহাভারত হইতেই শ্রীমদ্ভাগবতের উৎকর্ষ আছে, শাস্ত্র-প্রমাণ সহকারেই তাহা বর্ণনা করিতেছি।

ব্রহ্মার চারিকল্পে চারিপ্রকার পুরাণ প্রকাশিত হয়। যথা —

‘পঞ্চাঙ্গঞ্চ পুরাণং স্রাদ্ধাখ্যানমিতরং স্মৃতম্।

সাত্ত্বিকেষু চ কল্লেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ ॥

রাজসেযু চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিহুঃ।

তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেযু শিবস্ত চ।

সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগন্ততে ॥” (মৎস্য পুরাণ)

যাহা সর্গ-বিসর্গাদি পঞ্চভঙ্গিবিধিষ্ট উহাই পুরাণ নামে অভিহিত, অগ্রগুণি আখ্যায়িকাময়। সাত্ত্বিক কল্লে শ্রীহরির মাহাত্ম্য অধিক। রাজস কল্লে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য অধিক এবং তামস কল্লে দেবাদিদেব শিবের ও অগ্নির মাহাত্ম্য অধিক। সত্ত্ব-রজস্তমোময় সঙ্কীর্ণ কল্ল সকলে সরস্বতী ও পিতৃ-গণের মাহাত্ম্য অধিক কীর্ণিত হইয়াছে। পুরাণাদির উৎকর্ষ অপকর্ষ সম্বন্ধে

“মাৎস্যং কৌর্ম্মং তথা লৈঙ্গং শৈবং স্কান্দং তথৈব চ।

আগ্নেয়ঞ্চ ষড়ৈতানি তামসানি নিবোধত ॥

ব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ং তথৈব চ।

ভবিষ্যং বামনং ব্রাহ্মং রাজসানি নিবোধত ॥

বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং।

গারুড়ঞ্চ তথা পদ্মং বারাহং শুভদর্শনম্।

সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥” (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

উক্ত শ্লোকসমূহের তাৎপর্য্য বুঝা যায়,—সাত্ত্বিক পুরাণেরই উৎকর্ষ। সাত্ত্বিক পুরাণের দুইটি বিশেষণ—“ভূতঃ” এবং “ভূতদর্শনম্” শব্দদ্বয় বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। “মনীষিভিঃ” শব্দ দ্বারা সূচিত হইতেছে যে একমাত্র মনীষি-গণই সাত্ত্বিক পুরাণের তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারেন, সকলে নহে। সকল পুরাণকে এক গড্ডলিকা-প্রবাহে ফেলিয়া সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন, —তারতম্যমূলক বিচার শাস্ত্রে আছে বলিয়া শাস্ত্রার্থ রক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। আরও একটি কারণে সাত্ত্বিক পুরাণের শ্রেষ্ঠতা নির্ণীত হয়।

“সত্ত্বাৎ সংজ্ঞায়তে জ্ঞানম্” ও “সত্ত্বং যদব্রহ্মদর্শনম্”; অর্থাৎ সত্ত্ব হইতে জ্ঞানের জন্ম, ও সত্ত্বগুণই ব্রহ্মদর্শনের দ্বার—এই ভায়ে সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য লক্ষিত হইতেছে। এই হেতু পরমার্থ-বস্তুবোধের নিমিত্ত সাত্ত্বিক পুরাণ সকলের প্রাবল্য নিশ্চয় হইতেছে।

মহাভারতের মাহাত্ম্য তর্কতীর্থ মণাই দয়ংই কীর্তন করিয়াছেন। এহেন মহাভারত অপেক্ষাও শ্রীমদ্ভাগবত যে অতিশয় পূর্ণ ও সর্বশাস্ত্রের সার, এমন কি ব্রহ্মসূত্রেরও অর্থ-নির্ণায়ক, তাহা এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

“অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থে বিনির্নয়ঃ।

গায়ত্রী ভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ।

পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাৎভগবতোদিতঃ।

দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোহয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ।

গ্রন্থোহষ্টাদশ সাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।” (গরুড় পুরাণ)

ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ, ভারতার্থের নির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং বেদার্থের বিস্তারক, সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্তৃক কথিত, বেদের মধ্যে সাম-বেদের ভাষ্য, পুরাণ সকলের মধ্যে সামরূপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত শতবিচ্ছেদযুক্ত অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক গ্রন্থই শ্রীমদ্ভাগবত নামে অভিহিত।

তাৎপর্য্য—ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র সকলের অকুত্রিম ভাষ্য যাহা পূর্বে মহর্ষি বেদব্যাসের মনে সূক্ষ্মাকারে ব্রহ্মসূত্ররূপে প্রকাশিত হয়, তাহাই পরিশেষে অবিস্তৃতাকারে শ্রীমদ্ভাগবতরূপে প্রচারিত হইয়াছে। অতএব এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যভূত স্বতঃসিদ্ধ এই শ্রীমদ্ভাগবত বর্তমান থাকায়, তৎপরবর্তী অন্যান্য ভাষ্যকারগণের স্ব-স্ব কপোল-কল্পিত শ্রীমদ্ভাগবত-বিরোধী ভাষ্যসকল সম্পূর্ণ ত্যাগ্য। (ক্রমশঃ)

শ্রীধাম মায়াপুর

নবদ্বীপে অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর-ধাম ।
যথা জন্মিলেন শ্রীচৈতন্য ভগবান্ ॥
তথায় পার্শ্বদগণ সহ তাঁর লীলা ।
ব্রজ-মায়াপুর একতত্ত্ব, প্রকাশিলা ॥
সেই সব লীলা কর্ণে প্রবেশিলা যার ।
শুদ্ধভক্তি-প্রেমাবেশ হয় যে তাহার ॥
অতাপিও সেই ধামে শুদ্ধ ভক্তগণ ।
সক্ষম গৌরঙ্গ-লীলা করিতে দর্শন ॥
পুণ্যতীর্থ মায়াপুরে যে করে ভ্রমণ ।
সার্থক হ'য়েছে তার মানব জীবন ॥
যেথা নিত্য বৈষ্ণবেরা করেন গমন ।
সেই মায়াপুর-ধূলি ভবে অতুলন ॥
সেই ধূলি এক কণা যে ধ'রেছে শিরে ।
পুলক আবেশ হয় তাহার শরীরে ॥
মনোলোভা মায়াপুর-শোভা অনুক্ষণ ।
ভাষা নাহি সেই ধাম করিতে বর্ণন ॥
উত্তুরিতে ভবসিন্ধু গৌরভক্তগণ ।
প্রেমানন্দে করে নাম-গুণানুকীৰ্ত্তন ॥
গৌর-পদধূলি-পূত মায়াপুর ধাম ।
ভূমিতে লুটিয়া করি তাঁহারে প্রণাম ॥

—শ্রীবিমলচন্দ্র পোদ্দার ।

ব্রহ্ম-খণ্ডবস্ত

জাগতিক বিচারে দেখা যায়, কার্যের তারতম্যাহেতু কারণের বৈষম্য হয় এবং কারণের তারতম্যাহেতু কার্যেরও ভেদ লক্ষিত হয়। এই বিচারের সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য এই যে, বৃষ্টির তারতম্যক্রমে বস্তুর তারতম্য হইয়া থাকে। সুতরাং উপাসকের উপাসনার বৈষম্য হেতু উপাস্ত-তন্তুর বৈষম্য হইবে। জাগতিক দৃষ্টান্তস্থলে আমরা দেখিতে পাই—কেহ যদি চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করে, তাহা হইলে তাহার চক্ষের দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায় এবং সে তাহার খর্ব্বদৃষ্টিতে নিকটস্থ পুঁথির অক্ষরগুলির স্বরূপ দেখিতে পায় না। একারণ তাহার কাছে অক্ষরগুলি নিরাকার, নির্বিশেষ ও আ-ছায়া বলিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ মনে হয়। কিন্তু পূর্ণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন চক্ষুস্থান্ ব্যক্তি অক্ষরগুলিকে কখনই নিরাকার ও নির্বিশেষ দর্শন করেন না।

আমার উল্লিখিত উদাহরণ হইতে আপনারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, অক্ষর ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে গিয়া শাস্ত্রীয় বিচারযুক্তির রূপ দর্শনের স্বল্পতা হেতুই অক্ষরবস্তু নিরাকার, নির্বিশেষ ও জ্যোতিঃস্বরূপ বলিয়া কাহারও কাহারও নিকট প্রতিভাত হন। কিন্তু তাই বলিয়া চক্ষুস্থান্ ব্যক্তির পক্ষে অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ ও সুদর্শন-সেবী তাঁহাদের পক্ষেও কি কুদর্শনকারীর গ্রায়ে অক্ষর ব্রহ্মবস্তু নিরাকার, নির্বিশেষ, জ্যোতির্ময় হইবে, না বাস্তবিক পক্ষে তদ্বস্তুর পূর্ণ বৈশিষ্ট্য-যুক্ত স্বরূপ উপলব্ধ হইবে—ইহা অধী পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখিবেন। পক্ষতের উপরে উঠিয়া তাহার পাদদেশস্থ ক্ষুদ্র-বৃহৎ বক্ষলতাদি, উচ্চাবচ ভূখণ্ডসমূহ দৃষ্ট না হইলে কি উঁচু-নীচু ছোট-বড় বস্তুসকলের সম্বন্ধহীনতাই স্বীকার করিতে হইবে? বা তাহাকে সমতল নির্বিশেষ বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে? উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থ দৃশ্যবস্তুর দূরে অবস্থিতি হেতু তাহা আমাদের দর্শনেদ্রিয়ার গ্রাহ হইতেছে না। কিন্তু চর্তুদর্শক প্রতি বস্তুরই ভেদ-বৈশিষ্ট্যাदि অর্জুভাবে দর্শন করিয়া তৎসম্বন্ধে বাস্তবসত্য জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। ইহারই নাম সুদর্শন বা বেদান্ত।

যে বস্তুর যাহা স্বরূপ, তাহাকে তদ্রূপ দেখাই সত্য-দর্শন এবং যে বস্তু যাহা তাহাকে তদ্রূপ না দেখাই ভ্রম দর্শন। দর্শনের ভ্রান্তিহেতু বস্তু-বিচারেও আমাদের ভ্রান্তি উপস্থিত হয়। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই উক্ত

হইয়াছে যে, কার্য্যে বৈষম্য থাকিলে কারণেও বৈষম্য আছে প্রমাণিত হয়। এস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কারণবৈষম্য বলিলে বস্তুবৈষম্য বা বস্তুর নানাত্ব প্রমাণিত হয় না, কিন্তু বস্তুর শক্তির নানাত্ব স্বীকৃত হয়। বস্তুতে অর্থ ৭ কারণে যে শক্তি আছে সেই শক্তিরই বিবিধত্ব, নানাত্ব, বিষমত্ব প্রভৃতি স্বীকৃত হইয়া থাকে। তাহাতে বস্তুর কোন প্রকার বিকার হয় না।

এখন বিচার্য্য এই যে, আমরা ইহজগতে এই যে ভেদ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতেছি তাহার কারণ কি? যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষীভূত বৈশিষ্ট্য তাহাকে কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিলে তাহার কারণেও বৈশিষ্ট্যের অধিষ্ঠান যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কার্য্যরূপ জগতে ভেদ থাকিলে কারণেও তাহার ভেদ থাকা সম্ভব। সুতরাং বস্তু কোন প্রকারেই নির্ভেদ, নির্বিশেষ ও নিরাকার প্রতিপন্ন হইতে পারে না। যে বস্তুতে যাহার সম্ভা (Potency) নাই, তদ্বস্তু হইতে তাহার উদ্ভব হইতে পারে না। যেমন—জল হইতে ঘূতের উৎপত্তি ও বালুকা হইতে তৈলের উৎপত্তি কখনই সম্ভব হয় না। তদ্রূপ কারণস্বরূপ ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষ হন, তাহা হইলে কার্য্যরূপ জগৎ কোন প্রকারেই সর্বিশেষ হইতে পারে না। জাগতিক বস্তুতে যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মবস্তুতেও শক্তি আছে, ইহা সর্বতোভাবে মানিয়া লইতে হইবে। আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করও ‘অসংকারবাদ’ নিরাকরণকল্পে উপনিষদের মস্তাদি উদ্ধার করিয়া বেদান্তের (২।১।১৬) সূত্রের ভাষ্যে আশ্রয় উল্লিখিত যুক্তির সর্বৈব অনুমোদন করিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্তু নিম্নে তাহা উদ্ধার করিলাম—

‘সদেব সৌমোদমগ্র আসীৎ’, ‘আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ’, ইত্যাদাবিদংশকগৃহীতশ্চ কার্য্যস্য কারণেন সামানাদিকরণ্যাৎ । যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ত্ততে, ন তৎ তত উৎপদ্যতে, যথা সিকতাভ্যন্তৈলম্ ।” উক্ত ভাষ্যের (কালিবর বেদান্ত-বাগীশ মহাশয়ের) অনুবাদ যথা, “হে সৌম্য, এসকল অগ্রে সং-ই ছিল। অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এসকল এক আত্মা ছিল। ইত্যাদি শ্রুতিতে কারণের সহিত ইদম-শব্দ-বাচ্য জগতের সামানাদিকরণ্য কথিত হওয়াতেও কার্য্য-কারণ ভিন্ন নহে। যাহা যাহাতে তদ্রূপে থাকে না, তাহা হইতে তাহা জন্মেও না। যেমন বালুকা হইতে তৈল জন্মে না।”

সুতরাং শঙ্করের উক্ত যুক্তি অনুসারেও দৃঢ়ভাবে বলা যাইতে পারে, জগৎরূপ কার্যের ভেদ-বৈশিষ্ট্যাদি তাহাদের কারণ-ধরূপ ব্রহ্মেতে নিশ্চিত-রূপে বর্ত্তমান। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইহ জগতেও আকাশের নিরাকার নির্বিশেষত্ব অনুভূত হইয়া থাকে; সুতরাং কার্যধরূপ জগতে এবশ্রুকার নির্বিশেষত্বাদি অনুভূত হইলে কারণধরূপ বস্তুর নিরাকারত্ব নির্বিশেষত্ব স্বীকার করিয়া তাহার ব্রহ্মতা সিদ্ধ হইবে না কেন? এইরূপ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, আমার যুক্তিসমূহ পূর্বপক্ষকারী স্বীকার করিয়া লইলে আমি তাহার সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইতে পারি। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় এই যে, আকাশ নিরাকার হইলেও পাঞ্চভৌতিক জগতের উহা আংশিক উপাদান মাত্র। সুতরাং বস্তুর নির্বিশেষত্বাদি কল্পনা পূর্বপক্ষীর পক্ষে আংশিক জ্ঞান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। কাষ্ঠেতে অগ্নিসত্তা অপ্রকাশিত থাকে বলিয়া তাহাকে তদ্বস্ত্বহীন বলিয়া প্রকাশ করিলে কাষ্ঠের অপূর্ণতাই প্রকাশিত হইল। সুতরাং বস্তুকে নির্বিশেষ মাত্র প্রতিপন্ন করিয়া তাহাকে ব্রহ্ম বলিলে বস্তুও অখণ্ড না হইয়া খণ্ডত্বই স্থাপিত হইতেছে।

শ্রীমহা প্রসাদ

দেহসর্বস্ববাদী ব্যক্তিগণের দেহরক্ষার জন্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ, আর বৈষ্ণবের মহাপ্রসাদ গ্রহণ—এই দুইটী মনো বিশেষ পার্থক্য আছে। স্বল্পপুণ্যবান ব্যক্তি ভগবদ্-উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না, মহাপ্রসাদের তত্ত্ব-উপলব্ধি গুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় হয়। শ্রীভগবানের একান্ত ভক্তের প্রদত্ত বস্তু শ্রীভগবান্ গ্রহণ করেন। সেই ভগবদুচ্ছিষ্টই মহাপ্রসাদ, অর্থাৎ মহতী কৃপা। শ্রীভগবান্ মাদৃশ জিহ্বা-লাম্পট্যপরায়ণ বিষয়ীর মঙ্গলের জন্ত তাহার কৃপাধরূপ মহাপ্রসাদ প্রদান করেন। মহাপ্রসাদ এই জড়জগতের ভাত, ডালবিশেষ জড়পদার্থ নহেন। ইহজগতের ভক্ষ্য ও পেয় বস্তু অনিত্য, কিন্তু মহাপ্রসাদ অদ্বয়জ্ঞান বস্তু, তাহা ঐপ্রকার জড় বা অনিত্য বস্তু নয়। অনেকে বলিতে পারেন,—যাহাকে বৈষ্ণবগণ প্রসাদ বলিয়া বলেন, তাহা আমাদের দর্শনে ভাত-ডাল। প্রসাদ যদি চেতন অদ্বয়জ্ঞান বস্তু হয়, তাহা হইলে উহাতে ভাত-ডাল দর্শন কি প্রকারে

হয় ? তবে কি অচেতন বস্তুসমূহ শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে চেতন হইয়া পড়ে ? না তাহা নহে ; এই প্রকার ধারণাপূর্ণ বিচার ভ্রান্ত । তাহার কারণ, অচেতন ভূমিকায় অবস্থিত ব্যক্তি অচেতন বস্তু লইয়াই নাড়া চাড়া করে । সুতরাং তাহাদের দর্শনে চেতনবস্তুও অচেতনের ছায়াই প্রতিভাত হয় । যাহারা চেতনের ভূমিকায় অবস্থিত, তাহারাই এই তত্ত্ব বিশেষরূপে জানেন বা উপলব্ধি করিতে পারেন ।

অচেতন বা জড়বস্তু কখনও চেতন হয় না বা চেতন কখনও জড় বা অচেতন হয় না । চেতন নিত্যকাল চেতন ; জড় নিত্যকাল জড় । শ্রীভগবানের সহিত জড়ের বিন্দুমাত্রও সংস্পর্শ নাই । ভগবান্ যাহা গ্রহণ করেন তাহা চেতন, হেয়গুণ-বর্জিত । এই প্রসাদই ভবরোগের পথ্য । মহাপ্রসাদসেবনে ভবরোগগ্রস্ত জীবের দুঃখদুঃসমূহ অপসারিত হয় । আমাদের দর্শনের অযোগ্যতা থাকার দরুণ আমরা আমাদের অনন্তকালের অজ্ঞাত ভোগবুদ্ধিবৃত্ত চক্ষুদ্বারা মহাপ্রসাদকেও ভোগের উপকরণ বলিয়া দর্শন করি । যেদিন গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় প্রসাদের মহিমা জানিতে পারিব, সেদিন প্রসাদে ভাত-ডাল-বুড়ি বিদূরিত হইবে । এইজন্ত প্রসাদকে অদ্বয়-জ্ঞান-বস্তু বলা হয়, অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত যাবতীয় বস্তুই শ্রীঅদ্বয়জ্ঞান ভগবানে প্রতিষ্ঠিত । এইজন্ত শাস্ত্র বলেন—

“নৈবেদ্যং জগদীশস্ত্র্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ ।

ভক্ষ্যভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্বক্ষণে দ্বিজাঃ ॥”

হে বিপ্রগণ, শ্রীহরির নৈবেদ্য ও অন্নপানাদি সেবন করিতে কোন প্রকার ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার করিবে না । ভোগমতে প্রমত্ত ব্যক্তিগণ জিহ্বার লাম্পট্য-হেতু খাড়াখাড়া বিচার করে । যাহাতে ইন্দ্রিয়তোষণ হয় তদ্রূপ খাণ্ডকে তাহারা আদরের সহিত গ্রহণ করেন । ইহাই লোভ । ষড়্‌রিপুর মধ্যে লোভ একটী প্রধান রিপু । এই লোভের দাসত্বে যাহারা প্রমত্ত, তাহাদের কোন রিপুই বশীভূত হয় না । লোভ চরিতার্থ করিতে গিয়া কামনার উদয় হয় । কামনার যেখানে ব্যাঘাত ঘটে, সেখানে ক্রোধ আসিয়া পড়ে এবং আনুষঙ্গিকরূপে মদ, মোহ, মাৎসর্য ইত্যাদিও আসিয়া চিত্তকে একেবারে কলুষিত করিয়া ফেলে । এবিধ কলুষিতচিত্ত ব্যক্তির সম্মুখে যখন মহাপ্রসাদ আসিয়া কৃপা করিতে প্রস্তুত হন, তখন ঐ ইন্দ্রিয়পরায়ণ দুর্ভাগ্য ব্যক্তি নিজরুচি অনুযায়ী প্রসাদ না পাইলে প্রসাদকে অবজ্ঞা করে ।

তজ্জন্ত সে মহা অপরাধ-পক্ষে নিমজ্জিত হয়। মহাপ্রসাদে অবগাননকারী ব্যক্তির নিস্তার নাই।

ব্রহ্মবন্নির্জিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।

বিকারং যে প্রকুর্কন্তি ভক্ষণে তদ্বিজাতয়ঃ ॥

কুষ্ঠব্যাদিসমায়ুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্তিতাঃ।

নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা তস্মান্নাবর্ততে পুনঃ।

এইজন্ত বলি, সাধু সাবধান! যাহারা প্রকৃত মঙ্গল চান, তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র মহাপ্রসাদই গ্রহণীয়; তাঁহারা মহাপ্রসাদ ছাড়া যেন আপাতমধুর স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়কৃতিকর অল্প জিনিষ পাইবার জন্ত বাস্তব না হন। যে-দিন মহাপ্রসাদে ভোগবুদ্ধি দূর হইবে, সেদিন মহাপ্রসাদের কৃপা হইবে। শ্রীমহাপ্রসাদের কৃপা হইলে ভবঃরোগ দূরহইয়া যাইবে ও সেবারাজ্যে প্রবেশলাভ ঘটবে। মহাপ্রসাদকে অবজ্ঞাকারী ব্যক্তি বিষ্ণুচরণে অপরাধী। আমাদের ভোগকর ভাত, ডাল, যাঁতায় বস্ত্রই এই ভোগময় রাজ্যে পাওয়া যাইবে। কে। না, বর্তমানে যে রাজ্যের আমরা বাসিন্দা হইয়াছি, সেই রাজ্য ভোগময় রাজ্য; স্বপুরুষ-বিস্মৃতিহেতু যে ভোগময়ী প্রবৃত্তি, তন্নিমিত্তই এই অনিত্য ভোগভূমিকায় আগমন। কিন্তু যদি এই ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করিয়া কেহ নিজমঙ্গলেব জন্ত প্রয়াসী হন, তাহা হইলে তিনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন, এ'জগতের বস্তুসমূহকে ভীষ ভোগ করিতে পারে না। যে বস্তুকে ভোগ করিবার জন্ত ভীষ প্রমত্ত হয়, সেই বস্তুই তাহাকে ভোগ করিয়া বসে।

মদ্যপায়ী ব্যক্তি মদ্যপানদ্বারা নিজের ভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া মনে করে, আমি মদ ভোগ করিয়াছি। কিন্তু সে মদ ভোগ করে নাই, মদই বরং তাহাকে ভোগ করিয়াছে, মদের দাসত্বই তাহার অবলম্বন হইয়াছে। সুতরাং সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, এ জগতের বস্তুসমূহ ভোগ করিতে গেলে, ভোগের পরিবর্তে নিজের প্রাণবিনাশ করিতে হয়। যেমন উদাহরণ—মৎস্ত; নিজ জিহ্বালালসায় যখন সে বড়শীর টোপ গিলিয়া ফেলে, তখন তাহার দেহ আর একজনের ভোগ্য হইয়া পড়ে। অতএব যখন আমরা আমাদের ভোগবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিব, তখন ভগবানের প্রসাদরূপ ভগবানের অধরানুত আমাদের লাভ হইবে।

শ্ৰীশ্ৰীগুৰুগোবিন্দো জয়ত:

শ্ৰীশ্ৰীবৈষ্ণৱ সন্মিলন ।

শ্ৰীব্রহ্মমাধৱ গৌড়ীয় মঠ, বৰপাৰা, বঙ্গাইগাঁও

সাদৰ সন্তোষপূৰ্বক নিবেদন —

অহা ৮ই ফাগুন (ইং ২১শে ফেব্ৰুৱাৰী) মঙ্গলবাৰ কলিযুগ-পাবন-অবতাৰ জগদগুৰু শ্ৰীশ্ৰীনিত্যানন্দ প্ৰভুৰ নিখিল ভুবন মঙ্গল-ময়ী শুভ আবিৰ্ভাৱ-তিথি ও আচাৰ্য্য শ্ৰীশ্ৰীল নিমানন্দ সেৱাতীৰ্থ প্ৰভুৰ ত্ৰিৰোভাৱ তিথি (শুক্লা ত্ৰয়োদশী) উপলক্ষে শ্ৰীবৈষ্ণৱ সন্মিলনৰ উদ্যোগত অহা ৭ ফাগুন পৰা ৯ ফাগুনলৈকে তিনি দিন ধৰি পাঠ, কীৰ্ত্তন, বক্তৃতা, শ্ৰীনিগ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠা, নামঘজ্ঞ প্ৰভৃতি বিৰাট অনুষ্ঠান হব ।

ধৰ্ম্মপ্ৰাণ সজ্জন মহোদয় সকল উক্ত শুদ্ধ ভক্তানুষ্ঠানত সৰাস্বৰে যোগদান কৰিলে সন্মিলনৰ সদস্যবৃন্দ পৰমানন্দিত ও উৎসাহিত হব । এই মহদনুষ্ঠানত যোগদান কৰিবলৈ অসমৰ্থ হলে প্ৰাণ, অৰ্থ বুদ্ধি ও বাক্য দ্বাৰা সন্মিলনৰ সেৱা কাৰ্য্যত সহানুভূতি প্ৰদৰ্শন কৰিলেও ভগবৎ সেৱানুগী শ্লোকটি অৰ্জ্জিত হব । ইতি—:লা পুহ শুদ্ধ ভক্তকুপালেশ প্ৰাৰ্থী—

শ্ৰীটীক্ৰমৰ সন্মিলনৰ সভ্যবৃন্দ —

শ্ৰীসত্য গোবিন্দ দাসাধিকাৰী, সেক্ৰেটাৰী

শ্ৰীসৰ্বানন্দ দাসাধিকাৰী ।

শ্ৰীমদন মোহন দাসাধিকাৰী ।

শ্ৰীধৰ্ম্মজয় দাসাধিকাৰী ।

শ্ৰীবলাই চাঁদ দাসাধিকাৰী ।

শ্ৰীখগমোহন দাসাধিকাৰী ।

শ্ৰীগোৰকৃষ্ণ দাসাধিকাৰী ।

শ্ৰীলীলামাধৱ দাসাধিকাৰী ।

শ্ৰীৰাধামোহন দাসাধিকাৰী ।

উৎসৱ পঞ্জী :-

৭ই ফাগুন সন্ধ্যা ৬টাৰ পৰা ত্ৰয়োৎসৱৰ অধিবাস কীৰ্ত্তন, প্ৰাৰ্থনা ও শ্ৰীচৈতন্য ভাগৱত পাঠ ।

৮ই ফাগুন পুৱা ৬টাৰ পৰা ৮টালৈ নগৰ সংকীৰ্ত্তন । উক্ত প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিষ্ঠাতা-সভাপতি পৰিব্ৰাজক আচাৰ্য্য শ্ৰীশ্ৰীমদ্ ভক্তি-বেদান্ত পৰিব্ৰাজক মহাৰাজ কৰ্ত্তক বেলা ২টাৰ পৰা সন্মিলনৰ নৱ-নিম্নিত শ্ৰীমন্দিৰত শ্ৰীশ্ৰীগুৰুগোৱাঙ্গ ও শ্ৰীশ্ৰীৰাধা কৃষ্ণৰ শ্ৰীমূৰ্ত্তি প্ৰতিষ্ঠিত হব । বেলা ৩টাৰ পৰা বিভিন্ন বক্তাই নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ও গুৰু-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা কৰিব ।

৯ ফাগুন পুৱা ৬টাৰ পৰা শ্ৰীচৈতন্য-চৰিতামৃত পাঠ । বেলা ১টাৰ পৰা মহাপ্ৰসাদ বিতৰণ ।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

২২শে পৌষ, ১৩৭৩ ; ইং ৭।১।৬৭

“নারায়ণং নমস্কৃত্য নরৈশ্চৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥”

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

আগামী ১৬ই ফাল্গুন ১৩৭৩, ১লা মার্চ ১৯৬৭ বুধবার ব্যাসাভিন্ন জগদগুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিকান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব (মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমী)-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে শ্রীনবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে ও চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে, ১৪ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী সোমবার উল্লিখিত শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর পরিব্রাজকাচার্য্যাবধ্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাণের শুভ আবির্ভাব-তিথি (মাঘী কৃষ্ণা তৃতীয়া) হইতে ১৬ই ফাল্গুন ১৩৭৩, ১লা মার্চ, বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চক, ব্যাস-পঞ্চক, মধ্বাদি আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, শ্রীগুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ হরিকীর্তন, ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি-প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্ম প্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবাঙ্গুর যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ-সেবোন্মুখী স্মৃতি অজ্জিতা হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—

সত্যব্রন্দ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—সোমবার পূর্বাঙ্কে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ-পাঠ ও বক্তৃতা। মঙ্গলবার পূর্বাঙ্কে ও অপরাহ্নে গুরুস্তব সম্বন্ধে আলোচনা। বুধবার পূর্বাঙ্কে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান, অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধ-পাঠ, এবং পরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

ঐশ্বরীকপোষকো ভবত:



১৮শ বর্ষ } মাঘ, ১৩৭৩ { ১২শ সংখ্যা



ঐশ্বরীকপোষকো ভবত: (বিশ্ববিদ্যা)

— ইংল্যান্ডের লন্ডন শহরে প্রকাশিত —

— প্রকাশক: শ্রী ১৩, ব্রহ্মবিদ্যা, নবদ্বীপ (বঙ্গদেশ)

*	<p>স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্কে ।</p> <div style="text-align: center;">    </div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;"> <p>০ গোবিন্দ-পট্টিকা</p> </div>	*
*	<p>অহৈতুক্যপ্রতিহতা বন্ধাঃ সুপ্রসীদতি ॥</p>	*
*	<p>সেই ধর্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আশ্র-পরসম্ম । অত্র ধর্ম অষ্টরূপে পালে যেই জন । অধোক্কে অহৈতুকী ভক্তি বিহীন ॥ হরি-কথায় বতি নৈলে পও সেই শ্রম ॥</p>	*

১৮শ বর্ষ }	সঙ্কর্ষণ, ১৮ মাঘ, ৪৮০ গৌরাদ সোমবার, ৩০ মাঘ, ১৩৭৩; ইং ১৩২১/১৯৬৭	{ ১২শ সংখ্যা
------------	---	--------------

সান্নিহাদঃ

শ্রী প্রজাপতিকৃতং “শ্রী শ্রী হংসভগবৎ-স্তোত্রদ্বাদশকম্”

(শ্রী শ্রী বেদব্যাসকৃতে শ্রী মদ্ভাগবতে ষষ্ঠ-স্কন্ধে
 চতুর্থেহধ্যায়ে—২৩-৩৪)

নমঃ পরায়াবিতথানুভূতয়ে
 গুণত্রয়াভাস-নিমিত্ত-বন্ধবে ।
 অদৃষ্টধাম্নে গুণতত্ত্ববুদ্ধিভি
 নিবৃত্তমানায় দধে স্বয়ম্ভুবে ॥ ১ ॥

(প্রজাপতি দক্ষ অধোক্কে শ্রী হরিকে প্রসিদ্ধ ‘হংসভগবৎ’-স্তব দ্বারা এইরূপে স্তুতি করিয়াছিলেন) । যিনি মায়া ও মায়িক পদার্থ হইতে উত্তম, এবং যিনি—অব্যক্তিচারী জ্ঞানেচ্ছা-শক্তিবিশিষ্ট, যিনি—জীব ও মায়ার নিয়ন্তা এবং প্রবর্তক, মায়িক গুণত্রয়ের পরিণামভূত অনিত্য পৃথিব্যাদি বিষয়ে

অভোগ্য-জ্ঞানে সত্যবুদ্ধিবিশিষ্ট অথবা গুণাদির পরিণামভূত-তত্ত্বেই ‘ইনি—
দেবতা, ইনি—মানুষ’ ইত্যাদি বুদ্ধিযুক্ত জনসমূহ যাহার স্বরূপ দোঁখতে পায়
না, যিনি—প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অতীত অর্থাৎ স্বতঃপ্রমাণ অথবা অপরি-
চ্ছিন্ন, যিনি—কারণান্তর হইতে উৎপন্ন নহেন অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ, আমি
তঁাহাকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

ন যস্য সখ্যং পুরুষোহবৈতি সখ্যঃ

সখা বসন্ সংবসতঃ পুরেহস্মিন্ ।

গুণো যথা গুণিনো ব্যক্তদৃষ্টে-

স্তস্মৈ মহেশায় নমস্করোমি ॥ ২ ॥

(রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি) বিষয়সমূহ যেমন তৎপ্রকাশক
ইন্দ্রিয়ের প্রকাশকত্ব জ্ঞাত নহে, সেইরূপ জীব এই দেহপুরে থাকিয়াও জীব-
দেহে বিরাজমান প্রপঞ্চাধীশ যে বিভূচিৎ পরমেশ্বরের করণ-প্রবর্তকত্বাদি অর্থাৎ
হৃষীকেশত্ব জানিতে পারে না, সেই মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করি । ॥ ২ ॥

দেহোহসবোহক্ষা মনবো ভূতমাত্রা-

মাত্মানমন্তুঃ বিদুঃ পরং যৎ ।

সর্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্জ্ঞো

ন বেদ সর্বজ্ঞমনন্তুমীড়ে ॥ ৩ ॥

প্রাণসমূহ, ইন্দ্রিয়বর্গ, অন্তঃকরণসকল, পৃথিব্যাदि স্থূলভূতসমূহ ও শব্দাদি
তন্মাত্রসমূহ, এবং আপনাদের স্বরূপ ও অন্তঃস্থ ইন্দ্রিয়বর্গের স্বরূপ, আর
এই উভয়ের শ্রেষ্ঠ তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্বরূপ,--এই তিনটির একটাও
দেহাদি জানিতে পারে না ; কারণ, ঐ দেহাদি—জড়মাত্র ; কিন্তু জীব
‘চেতন’ বলিয়া দেহাদিকে এবং তন্মূলীভূত তত্ত্বাদিগুণসমূহকেও জানিতে
পারেন। তথাপি এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও জীব যে সর্বজ্ঞ অনন্ত
স্বরূপকে জানিতে পারেন না, আমি সেই সর্বজ্ঞ ঈশ্বরকে স্তুব করি ॥ ৩ ॥

যদোপরামো মনসো নামরূপ-

রূপস্য দৃষ্ট-স্মৃতি-সম্প্রমোষাৎ ।

য ঈয়তে কেবলয়া স্বসংস্থয়া

হংসায় তস্মৈ শুচিসদ্বনে নমঃ ॥ ৪ ॥

যখন চিত্তের উপরাম হয়, অর্থাৎ জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থার জায় চিত্তের বিক্ষেপ না হইয়া, এবং সুষুপ্তি-অবস্থার জায় চিত্তের লয় না হইয়া সমাধি হয়, তখন নাম ও রূপের উদ্ভাবক ঐ চিত্তের দর্শন ও স্মরণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এইরূপ সমাধিকালে যিনি জীব-চিত্তে স্বকীয় সচ্চিদানন্দরূপে প্রকাশিত হন, সেই শুদ্ধান্তঃকরণৈকগম্য ভগবান্ হংসকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

মনীষিণোহন্তুহৃদি সন্নিবেশিতং

স্বশক্তিভিন্‌বভিশ্চ দিব্যবুদ্ধিঃ ।

বহিঃ যথা দারুণি পাক্ষদশ্যং

মনীষয়া নিক্ষেপন্তি গূঢ়ং ॥ ৫ ॥

স বৈ মমশেষ-বিশেষ-মায়া-

নিষেধ-নির্ব্বাণ-সুখানুভূতিঃ ।

স সর্ব্বনামা স চ বিশ্বরূপঃ

প্রসীদতামনিকৃত্যত্মশক্তিঃ ॥ ৬ ॥

কাষ্ঠের অন্তঃপ্রদেশে গূঢ়ভাবে অবস্থিত অলৌকিক অগ্নিকে মনীষিগণ যেমন পঞ্চদশ (সামিধেনী) মন্ত্রদ্বারা বহিঃপ্রকটিত করেন, সেইরূপ বিবেকিগণও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ,—এই গুণত্রয়, এবং প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, মনঃ ও পঞ্চ তন্মাত্র,—এই নয়টী, এবং পঞ্চমহাভূত ও দশেন্দ্রিয়,—এই পঞ্চদশটী,—সর্ব্বশুদ্ধ এই সপ্তবিংশতি-তত্ত্বাত্মিকা নিজ-শক্তিদ্বারা আবৃত-হৃদয়ের অন্তর্দেশে অবস্থিত যে পরমাত্মাকে ধ্যান করেন, সেই পরমাত্মা আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্। কার্য্য-কারণাত্মক প্রপঞ্চরূপ অশেষ বৈচিত্র্যময়ী মায়ার ভোগাপগমে মোক্ষস্থখ (স্বরূপসিদ্ধিতে সেশ-স্থখ) উপস্থিত হইলেই যিনি অনভূত হন, যিনি—সকল চিত্তচিত নামেরই বাচ্য, যিনি—সর্ব্বচিৎস্বরূপ, এবং যিনি—অচিন্ত্যশক্তি, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্ ॥ ৫-৬ ॥

যদ্যগ্নিরুক্তং বচসা নিক্রপিতং-

ধিয়াক্তভির্ব্বা মনসোত যশ্চ ।

মাভূৎ স্বরূপং গুণরূপং হিতত্ত্বং

স বৈ গুণাপায়-বিসর্গ-লক্ষণঃ ॥ ৭ ॥

যাহা বাক্যদ্বারা অভিহিত হয় যাহা বুদ্ধিদ্বারা নিরূপিত হয়, যাহা ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা গ্রাহ্য হয় এবং যাহা মনে দ্বারা সংকল্পিত হয়, সে সমস্তই গুণের কার্য্য বলিয়া তাহাদের কোনটাই যাহার স্বরূপ নহে; যিনি স্বয়ং গুণাতীত, অথচ গুণসকলের প্রলয়োৎপত্তির 'কারণ' বলিয়া গুণত্রয়ের আদিতে ও অন্তে বিরাজিত তাহাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

যস্মিন্ যতো যেন চ যশ্চ যস্মৈ

যদ্ যো যথা কুরুতে কার্য্যতে চ ।

পরাবরেষাং পরমং প্রাক্ প্রসিদ্ধং

তদ্বাক্ষ্য তদ্বৈতুরনন্তদেকং ॥ ৮ ॥

যে অধিকরণে, যাহা হইতে, যদ্বারা, যাহার সম্বন্ধে, যাহাকে সম্প্রদানার্থ, যে অভীক্ষিত কর্ম্মটী যে-কর্ত্তা যে-প্রকারে করেন বা অত্মদ্বারা করাইয়া থাকেন, সেই উচ্চাচ কারণসমূহের পরমকারণই একমাত্র ব্রহ্ম । তিনি—সমস্ত বস্তুর পূর্বেই প্রসিদ্ধ : যেহেতু, তিনি ঐ সকল বস্তুরও কারণ এবং তিনি—স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত । আমি তাহাকে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ

বিবাদসম্বাদভুবো ভবন্তি ।

কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং

তস্মৈ নমোহনন্তগুণায় ভূয়ে ॥ ৯ ॥

যাহার মায়াবিজ্ঞাদিশক্তিসমূহট জড়ীয় দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ও স্বভাববাদাদির আশ্রয়ে বিবদমান পণ্ডিতগণের বিবাদের ও বিসংবাদের একমাত্র হেতু এবং যাহার শক্তিপ্রভাবেই ঐ সকল পাণ্ডিত্যমুগ্ধবাক্তিবর্গের আত্মমোহ জন্মিয়া থাকে, সেই অনন্তসচ্চিদানন্দ-গুণশালী সর্বব্যাপী শ্রীভগবানকে আমি নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তুনিষ্ঠয়ো-

রেকস্থয়োভিন্নবিরুদ্ধধর্ম্মণোঃ ।

অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসাংখ্যয়োঃ

সমং পরং হৃদকূলং বৃহত্তং ॥ ১০ ॥

পরমাত্মোপাসনাত্মক যোগ-শাস্ত্র সচ্চিং প্রতীতির আশ্রয়ে তত্ত্ববস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন; কিন্তু প্রকৃতিবাদাশ্রিত জ্ঞানশাস্ত্র সাংখ্যনির্বিশিষ্ট-ভাব-হেতু তত্ত্ববস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সেই 'অস্তি' ও 'নাস্তি'-বিচার লইয়া দ্বন্দ্বরত বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রিত শাস্ত্রদ্বয়কে এক পরব্রহ্ম-বস্তুতেই পর্য্যবসিত বলিতে হইবে; কারণ, উভয়ের মত বিভিন্ন হইলেও ভাব ও অভাবের পর যে একটি অধিষ্ঠান প্রতীত হইতেছে, তিনিই বৃহৎ পরব্রহ্ম; আমি তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১০ ॥

যোহনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল-

মনামরূপো ভগবাননন্তঃ ।

নামানি রূপাণি চ জন্মকর্ম্মভি-

ভেজে স মহাং পরমঃ প্রসীদতু ॥ ১১ ॥

অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যাসম্পন্ন যে ভগবান্ (জড়বুদ্ধিবৃত্ত জীবের নিকট) দেশ-কাল-বস্তু প্রভৃতি পরিচ্ছেদশূন্য এবং প্রাকৃত-নাম-রূপাদিরহিত; আবার, তৎপাদমূল-ভজনকারী ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্ত নিত্যকাল জন্ম-লীলা-প্রদর্শনপূর্ব্বক নাম-রূপ-যুক্ত, সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১১ ॥

যঃ প্রাকৃতৈর্জ্ঞানপথৈর্জনানাম্

যথাশয়ং দেহগতো বিভাতি ।

যথানিলঃ পার্থিবমাশ্রিতো গুণং

স ঈশ্বরো মে কুরুতাং মনোরথং ॥ ১২ ॥

বায়ু যেমন পার্থিব পক্ষজাদির গন্ধ গ্রহণ করিয়া নানাগন্ধবিশিষ্ট এবং পক্ষজেরূপ প্রভৃতির ধূসর-কৃষ্ণাদি বর্ণ ধারণ করিয়া নানারূপবান্ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ সর্বদেহগত অন্তর্ধামী ভগবান্ও দেহধারী জনসমূহের প্রাক্তন-বাসনা (কৃচির) অনুযায়ী অর্কাচীন (বিদ্ধা)-উপাসনামার্গে উপাসিত হইয়া সেই সেই ভাবে তদুপাসকগণের নিকট প্রকাশিত হন, সেই পরমেশ্বরই আমার মনোরথ পূর্ণ করুন; অত্ৰ দেবতার আশ্রয়ে কি প্রয়োজন? ১২ ॥

ঠাকুরের স্মৃতি-সমিতি

শ্রীমহাপ্রভু জীবের প্রতি করুণা করিয়া কালে কালে অলৌকিক চরিত্রসম্পন্ন বৈষ্ণবগণকে জগতে প্রেরণ করেন। তাঁহাদের অসাধারণ অনুষ্ঠান-দর্শনে বিদ্বৎসমাজ দূরে থাক, হরিসেবা-পরায়ণ শ্রদ্ধাবান্ জনগণেরও অনেক সময় ভ্রমপূর্ণ ধারণার উদয় হয়।

শ্রীগৌরাজের প্রেরণাক্রমে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বীয় প্রভুর আজ্ঞাসমূহ পালন করিয়া প্রভুর নিকট ফিরিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ভাগ্যহীন বৈষ্ণব-জগৎ তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে না পাইয়া কতই না অভাব অনুভব করিতেছেন। তবে যাহারা তাঁহার সাক্ষাৎ সান্নিধ্য লাভ করিয়া হরিভক্তনের অলৌকিক-প্রণালী পাইয়া ক্তার্থ হইয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা তৎসম্বন্ধীয় পবিত্র স্মরণ-প্রভাবে সমধিক ভজন-যোগ্যতা লাভ করিতেছেন। ঠাকুরের সুদীর্ঘ প্রকটকালের ঘটনাবলী শুদ্ধবৈষ্ণবজীবনের প্রতিপদেই আদর্শ। স্মরণে তাঁহার ভক্তিময় চরিত্র শুদ্ধভক্তের করে অঙ্কিত হইলে তদর্শনে বৈষ্ণবজগতের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

* * ভক্তিবিনোদ দেবের স্মৃতি-সমিতির যে বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া কেহ কেহ মনে করেন যে গোড়ীয় শুদ্ধভক্তিগণ যে মহাত্মার অলৌকিক চরিত্র প্রতিপদেই অনুক্ষণ অনুসরণ করিয়া স্মরণ করেন, সেই আদর্শচরিত্র অগদগুণের আবার বাহ্যিক অনুষ্ঠানময়ী স্মৃতি সংরক্ষিত হইবার আবশ্যক কি? কেহ বলেন,—নিত্য বৈষ্ণবের নিত্য চরিত্র নিত্যকাল স্থিত, স্মরণে স্মৃতিরক্ষণ-কার্য্য কন্মাস্তুর্গত হওয়ায় ঐ প্রকার স্মরণের প্রয়োজন কি? বৈষ্ণবের তাদৃশ স্মৃতিরক্ষার যত্ন বৈষ্ণবোচিত নহে।

এই সকল তর্কসমূহ যাহাদের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, তাঁহাদের জ্ঞাত কয়েকটি কথা এস্থলে উল্লেখ করিলে বোধ করি তাঁহারা আমাদের সবিনয় বাক্যকে নিজগুণে ক্ষমা করিতে পারেন। বিষয়মদাক্ত নিষিদ্ধবাদী শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত শ্রীমূর্তির পূজাকে—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীনরোত্তমবিলাস, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থকে—শঠকোপ দাস, মধুর কবি, গোদাদেবী, কুলশেখর রামানুজাদির অর্চা-বিগ্রহকে—বাহ্য-অনুষ্ঠানপূর্ণ কন্মপ্রয়াস বলিয়া গর্হণ করিতে পারেন; ভক্তের কিন্তু সে কথা হৃদয়ে স্থান পায় না। গৌরগুণগান, তুলসীমালা ধারণ, উর্দ্ধপুণ্ড্র সেবন, নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্তন

প্রভৃতি মায়াবাদীর বিচারে কৰ্ম্মান্তর্গত প্রয়াসসমূহ ; কিন্তু ভগবানের সেবনোদ্দেশে কৃতকৰ্ম্মের ফল-ভোক্তা ভগবদ্ভক্ত নহেন, ভগবান্ স্বয়ং । তজ্জন্তু ভক্তির অনুষ্ঠানসমূহ প্রাকৃতদৃষ্টিতে কৰ্ম্ম বলিয়া মৃঢ়নয়নে রূপান্তরিত হইলেও উহা হরি-সেবা, অনুষ্ঠাতার স্বার্থ বিজৃম্বিত ফলভোগ-কামনা নহে ।

শ্রীভগবানের নববিধা ভক্তিপর্য্যায়ের স্মরণকে তৃতীয়া আখ্যা দেওয়া হয় । ভগবান্ ও ভগদ্ভক্তের স্মরণ দোষাবহ নহে । যে স্থলে স্মৃতি-রক্ষানুষ্ঠান প্রাকৃত রাজস-ভাবোথ অর্থাৎ অনুষ্ঠাতৃবর্গের প্রতিষ্ঠাবর্দ্ধক সম্বলে উহা আদরণীয় নহে । যেস্থলে উহা নিগুণ কৃষ্ণভক্তনের উদ্দেশে কৃত হয় উহা শুদ্ধ হরিভক্তনের উৎসাহ বৃদ্ধির অনুষ্ঠান-বিশেষ ।

কৰ্ম্মগণ ফলকামোদ্দেশে যে-সকল শব্দ ব্যবহার করেন, ভক্তগণের তত্তৎ শব্দ দ্বারা ঠিক সেই ধারণা হয় না । কৰ্ম্মফলবাদীর স্মৃতিরক্ষা শব্দে বৈষ্ণবের ব্যথিত হইবার কারণ নাই । কৃষ্ণনাম বলিলে অত্যাভিলাষী, কৰ্ম্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি নামাপরাধিন যাহা বুঝেন তাহা কখনই বৈষ্ণবের গ্রহণীয় হয় না ; আবার কৃষ্ণনামের অপ্রাকৃতানুভূতি কখনই অভক্তের বুদ্ধিগম্য নহে । সুতরাং যাহারা “স্মৃতিরক্ষণ-সভা” শব্দ শুনিয়াই ক্ষুদ্র তাঁহাদের ধারণা উন্নত হওয়া আবশ্যক ।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণের সেবা ও গৌরভক্তগণের হিতের জন্তু কতই না করিয়াছেন । তাঁহার সমগ্র প্রয়াসসমূহকে হরিভক্তন না দেখিয়া যিনি (এঁগুলকে) কৰ্ম্মবীরের ফল চেষ্টামাত্র অনুভব করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে কৰ্ম্মবীর হইবার আদর্শ লাভ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে কিছু অধিক বলিতে চাহি না । তাঁহারা নিজ ফলভোগময় কৰ্ম্ম-বুদ্ধিগম্য হইয়া স্মৃতি-সমিতিতে যোগদান করিয়া কৰ্ম্মজীবনের শেষ প্রাপ্য শুদ্ধভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট হউন । সেখানে আসিলে তাঁহারা বুঝবেন যে, ভগবান্দির অপেক্ষা অপ্রাকৃত ভক্তের স্মৃতিমন্দির কোন প্রকারে নূন শুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠান নহে, পরন্তু কোন কোন বিষয়ে কৃষ্ণের অধিক প্রসাদ লাভের সুযোগযাত্র ।

—জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীশ্রী

(প্রকরণ-প্রস্থান—মহাজন-বাক্য-গ্রন্থাদি)

১। মহাজনকৃত ভক্তিগ্রন্থসমূহ আদরণীয় কেন ?

“শুদ্ধভক্তগণ মহাজনকৃত ভক্তিগ্রন্থগুলিকে মধুচক্রে বলিয়া জানেন। সেইসকল মধুচক্রে যতপ্রকার নূতনভাবে নিকটবর্তী হয়, ততই নূতন নূতন রসের উদয় হয়।”

—‘নিবেদন’, সঃ তোঃ ১০।৫

২। মহাজনগণ কি মনোধাম্মোখ কল্পনার সাহায্যে গ্রন্থ রচনা করেন ?

“বাক্যানাং জড়জন্তুদ্বান শক্তা মে সরস্বতী।

বর্ণনে বিমলানন্দবিলাসস্ত চিদান্ননঃ

তথাপি সারজুটবৃত্ত্যা সমাধিমবলম্ব্য বৈ।

বর্ণিতা ভগবদ্বার্তা ময়া বোধ্যা সমাধিনা ॥

চিদান্নার বিমলানন্দবিলাস বর্ণনে আমার সরস্বতী অশক্তা ; যেহেতু যে-বাক্যসকলের দ্বারা আমি তাহা বর্ণন করিব, ঐ সকল বাক্য জড় হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যদিও বাক্য দ্বারা স্পষ্ট বর্ণন করিতে অশক্ত হইয়াছি, তথাপি সারজুট বৃত্তি দ্বারা সমাধি অবলম্বন-পূর্বক ভগবদ্বার্তা যথাসাধ্য বর্ণন করিলাম। বাক্য-সকলের সামান্য অর্থ করিতে গেলে বর্ণিত বিষয় উত্তমরূপে উপলব্ধ হইবে না। এতদ্ব্যতীত প্রার্থনা করি যে, পাঠকবৃন্দ সমাধি অবলম্বন-পূর্বক এতদ্ব্যতীত উপলব্ধি করিবেন। অরুণতী-সন্দর্শন-প্রায় স্থূলবাক্য হইতে তৎসন্নিহিত সূক্ষ্মতত্ত্বের সংগ্রহ করা কর্তব্য ; যুক্তিপূর্ণ ইহাতে অক্ষম, যেহেতু অপ্রাকৃত-বিষয়ে তাহার গতি নাই। কিন্তু আত্মার সাক্ষাদর্শনরূপ আর একটি সূক্ষ্মবৃত্তি ‘সহজ সমাধি’ নামে লক্ষিত হয় ; আমি যেমত সেই বৃত্তি অবলম্বন-পূর্বক বর্ণন করিলাম, পাঠকবৃন্দও সেইরূপ তাহা অবলম্বন-পূর্বক তত্ত্বোপলব্ধি করিবেন।”

—কঃ সং ১।৩২-৩৩

৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত সর্বশাস্ত্রের সার কিরূপ ?

“ভালরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতই সর্বশাস্ত্রের সার। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদে এবং বেদান্তশাস্ত্রে

যে গভীর তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সারভাগ এই শিক্ষামূতে পাওয়া যাইবে। অষ্টাদশ পুরাণ, বিংশতি ধর্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, ষড়্‌দর্শন ও তত্ত্বশাস্ত্রে যে-সকল কল্যাণকর সত্বপদেশ আছে, সে সমস্তই তাত্ত্বিকরূপে এই শিক্ষামূতে পাওয়া যায়। বিদেশীয় ধর্মশিক্ষায় ও স্বদেশীয় প্রচলিত ধর্মসমূহে যে কিছু সৎস্ব আছে, সে সমস্তই এই গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। স্বদেশীয় বিদেশীয় কোন শাস্ত্রে যাহা পাওয়া যাইবে না, তাহাও এই উপাদেয় গ্রন্থে লভ্য হইবে।”

—‘বিবোধন’, চৈঃ শিঃ

৪। শ্রীমদ্ভক্তিবিদ্যোদ ঠাকুর কাঁহার প্রেরণায় ‘শ্রীশ্রীভাগবতাকর্মরীচিমালা’ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন?

“যৎকুপয়া স্ববুদ্ধোহহমেতন্নিহ্ন গ্রন্থসংগ্রহে।

তং গৌরপার্ষদং বন্দে দামোদরস্বরূপকম্ ॥”

—‘মঙ্গলাচরণম্’, শ্রীভাঃ মঃ

৫। ‘শ্রীভাগবতাকর্মরীচিমালা’ গ্রন্থ-প্রণয়নে শ্রীমহাপ্রভুর আদেশটি কি?

“শ্লোক বিচারিতে শ্রীস্বরূপদামোদর।

অনুভবে আসি আজ্ঞা দিলা অতঃপর ॥

মহাপ্রভু আজ্ঞামত শ্লোক সাজাইয়া।

সম্বন্ধাভিধেয়-ক্রম দেহ’ দেখাইয়া ॥

গ্রন্থ নিতাপাঠ্য হবে বৈষ্ণব-সভায়।

ভাগবত-পড়মালা প্রভুর কপায় ॥

‘জন্মান্তর’ শ্লোকের তাৎপর্য্য কহিলা।

গোড়ীয়-ব্যাখ্যার ক্রম তবে দেখাইলা ॥

সেই ত’ প্রেরণাক্রমে এ অধম দাস।

ভকতিবিদ্যোদ গ্রন্থ করিল প্রকাশ ॥

বহু শ্রোতা মহোদয়গণের চরণে।

পড়ি’ কৃপা মাগে দাস নিকপট মনে ॥”

—‘উপসংহার’, শ্রীভাঃ মঃ

৬। ‘শ্রীশ্রীভাগবতাকর্মরীচিমালা’ গ্রন্থাষাদনের ফল কি?

“শ্রীমদগৌরগদাধরপ্রেমোদ্দীপন-তৎপর।

শ্রীমদ্ভাগবতী মালা ভক্তিবিদ্যোদগুপ্তিতা ॥

নিত্যমাস্বাদয়েন্নিত্যমানন্দোৎফুল্লচেতসা ।

ভক্তেন লভ্যতে সদ্যঃ রাধামাধবয়োঃ কৃপা ॥

দিনানি তব স্বপ্নানি বহুবিস্তানি তাত্তপি ।

অতশ্চেষ্টঃ সুযত্নেন রসং ভাগবতং পিব ॥”

—‘উপসংহারঃ’, শ্রীভাঃ মাঃ, ২০শ কিঃ

“উপসংহারে সংগ্রাহক বহু মনো-পূর্বক কহিতেছেন, এই শ্রীগৌর-গদাধরের প্রেমোদ্দীপনতৎপর ভক্তিবিনোদ-গুপ্তিতা শ্রীমদ্ভাগবতী মালা উপস্থিত হইয়াছেন। যে-ভক্ত আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে নিত্য ইহার আশ্বাদন করিবেন, তিনি সদা শ্রীরাধামাধবের কৃপা লাভ করিবেন। শ্রীরাধামাধব স্বীয় ব্রজের সহিত এই গোড়ভূমিতে শ্রীনবদ্বীপধামে শীগদাধর-গৌরাঙ্গরূপে উদ্ভিত হইয়া প্রকারান্তরে নিত্যলীলা করেন, ইহাই স্মৃতিত হইল।”

—‘উপসংহার’, শ্রীভাঃ মাঃ, ১-২ অনুবাদ

৭। ‘শ্রীশ্রীভাগবতাকর্মরীচিমালা’ গ্রন্থ কিরূপে অবিভূত হইলেন ?

“শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বনির্দেশে কৃপা যশ্চ প্রয়োজনম্।

বন্দে তং জ্ঞানদং কৃষ্ণং চৈতন্যং রসবিগহম ॥

সমুদ্রশোষণং রেণোর্যথা ন ঘটতে কচিৎ।

তথা মে তত্ত্বনির্দেশো মূঢ়স্য ক্ষুদ্রচেতসঃ ॥

কিন্তু মে হৃদয়ে কোহপি পুরুষঃ শ্যামসুন্দরঃ।

ক্ষুরনু সমাদিশং কার্যামেতত্তত্ত্বনিকূপণম ॥”

—কৃঃ সং, ১ম অঃ ১-৩

৮। অচিন্তা-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-সম্মত গীতাভাষা আছে কি ?

“তৃতীয়াংশে এ পর্যন্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যে-সমস্ত টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রায় সকলগুলিই আভেদ-ব্রহ্মবাদিদিগের রচিত ; বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি সম্মত টীকা বা অনুবাদ প্রায়ই প্রকাশিত নাই। শঙ্কর-ভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকা সম্পূর্ণ আভেদ-ব্রহ্মবাদপূর্ণ। শিখরস্বামীর টীকা ব্রহ্মবাদপূর্ণ না হইলেও, তাহাতে সাম্প্রদায়িক শুদ্ধাধৈতবাদের গন্ধ আছে। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর টীকাটি যেরূপ ভক্তিপোষক বাক্যে পূর্ণ, চরম উপদেশ স্থলে সেরূপ কল্যাণপ্রদ নয়। শ্রীরাধামুখ স্বামীর ভাষ্যটি সম্পূর্ণ ভক্তিসম্মত বটে, কিন্তু অস্বদেশে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর অচিন্তাভেদাভেদ-শিক্ষাপূর্ণ গীতাভাষ্যরূপে কোন টীকা প্রকাশিত না হইলে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির

আশ্বাদকদিগের আনন্দবৃদ্ধি হয় না। এতন্নিবন্ধন আমরা যত্নসহকারে শ্রীগৌরানুগত মহামহোপাধ্যায় ভক্তচিরোমণি শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের বিরচিত টীকাটী সংগ্রহ পূর্বক তদনুযায়ী ‘রসিকরঞ্জন’ নামক বঙ্গানুবাদ সহকারে গীতাশাস্ত্র প্রকাশ করিলাম। শ্রী মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্মত শ্রীবলদেব বিদ্যাবূষণ-কৃত একটি গীতা-ভাষ্য আছে। বলদেবের টীকাটী বিচারপর, কিন্তু চক্রবর্তী মহাশয়ের টীকাটী বিচার ও প্রীতিরস—এতদুভয় বিষয়েই পরিপূর্ণ; বিশেষতঃ চক্রবর্তী মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাটী সর্বদেশে প্রচারিত ও সম্মানিত। চক্রবর্তী মহাশয়ের বিচার সরল এবং সংস্কৃত-ভাষা প্রাজ্ঞ।”

— গীঃ, রঃ রঃ ভাঃ

— জগদগুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

তীর্থযাত্রা

[১]

বুড়ীর সাথে সুযোগ-মতে চলেন বুড়ো তীর্থধাম।
 ‘সস্ত্রীক ধর্ম্য করতে হয়’—শাস্ত্রবাক্য তার প্রমাণ ॥
 শাস্ত্র হ’লো অস্ত্র ভাল কাটতে ভোগের সরল পথ।
 ‘রথ দেখা আর কলাবেচা’ হ’বে ছোটোই যুগপৎ ॥
 ‘কলা বেচায়’ ষোল আনা, টান্ ত আছেই বারমাস।
 রথের নামে এবার সেটা সতের আনা সুপ্রকাশ ॥
 কোথায় তীর্থ, তীর্থপদ সাধু-সঙ্গ সুমঙ্গল।
 ‘হা হা জগন্নাথ!’ ব’লে প্রাণঢালা সে অশ্রুজল ॥
 উণ্টো হ’লো, হায়রে কলি, সেই সকলি সঙ্গে ধায়।
 ‘খাও’, ‘নাও’, ‘এস’, ‘বস’, ‘গেল-গেল’, ‘হায়-হায়’ ॥
 গাঁঠ-ছড়াটি-বাঁধা বিয়ের বর-কনেটি যেন রে!
 পাঁচের সেবাই সর্বক্ষণ, সেব্য আবার আছেন কে??
 গাড়ীর বেঞ্চে গিন্নী বেশ আরাম ক’রে নিদ্রা যান।
 আছেন ব’সে কর্তামশায়—কোল্ পেতে যে উপাধান ॥

সুখের সকল অনুষ্ঠান, সঙ্গে কারো চমৎকার ।
 পান্, দোক্তা, তামাক্-টিকে, কল্কে-ছঁকো কতই আর ॥
 হায়রে কপাল, কইবো কা'রে, কালের গতি ভয়ঙ্কর ।
 তীর্থধামেও তের পুঁটুলী এ'নে বুড়ো বাঁধেন ঘর ॥
 ছিলেন বাঁধা যে বাঁধনে, এক চুলও সে শিথিল নয় ।
 স্বর্গে গেলেও সমানে ধান ভানেন্ টেকী মহাশয় ॥
 'টে' কুচ-কুচ' কুঁড়ো মেখে, কামিনীর সে পদাঘাত ।
 ঘুচে না ত কোথাও তা'র, হ'লেও দেহ কুঁপো কা'ত্ ॥

[১]

হা হা শিবানন্দ সেন, রাঘব পণ্ডিত-বর ।
 দময়ন্তী-বিরচিত ঝালি যাঁর শিরোপর ॥
 কোথায় তোমারা আজ যাত্রী নীলাচল-পথে ।
 সচল অচল ব্রহ্ম নিরখিতে পথে রথে ॥
 প্রাণঢালা পিপাসায় কোথায় সে আর্তশ্বর !
 'হা গৌরাজ্, হা গৌরাজ্,—গৌড়-জন-প্রাণেশ্বর !!'
 শিবাই নিতাই-প্রেমে কি আনন্দে ভরপুর ।
 সাথে পত্নী, পুত্র তিন,—চলে নীলাচল পুর ॥
 "মরুক্ শিবার পুত্র"—দেন গালি অবধূত ।
 কেঁদে মরে নারী ভয়ে—করে কত কাঁউ-মাউ ॥
 রেগে খুন্ ভাগ্‌নেটা জ্বলে যেন দাউ-দাউ ।
 শিবারে প্রহারে পদ,—রঙ্গ তাঁ'র অদভূত ॥
 অবিকার শিবানন্দ, কি আনন্দে মরি মরি !
 ঢালে প্রেম-অশ্রুধার নিতা'য়ের পদে ধরি ॥
 হরি, হরি ! হায় !! হায়, নিত্যলীলা সেই সব ।
 লুকা'ল মোহান্ধ চক্ষু, হ'লো আজি অসম্ভব ॥
 জনে জনে হেরি' দৃশ্য কি দারুণ পথ-ঘাটে ।
 বিকায় কৈতব-ফল কেবল ভবের হাটে ॥
 খাইয়া সে বিষ-ফল জ্বলে মরে জীবগণ ।
 কহে কাঁদি 'কৃষ্ণামৃত' রক্ষা কর গৌর-জন ॥

রাজা বি রুক্মাঙ্গদ (৩)

রাজা মোহিনীর সহিত পর্বতশিখর হইতে অবতরণ করিয়া নিজ অশ্বকে দেখিতে পাইলেন। তাহার পদাঘাতে পৃথিবীতে গর্ত হইয়া পড়ে। সেই গর্তে একটা টিকটিকী ছিল, ঐ আঘাতে তাহার শরীর বিদীর্ণ হইয়া যায়। রাজা তাহা দেখিতে পাইয়া অতিষত্রে সেটিকে গর্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার শরীরে ঠাণ্ডা জল সিঞ্চন করাতে তাহার চেতনতা আসিল। সে তখন তাহার পূর্বজন্মের বিবরণ রাজার নিকট বর্ণন করে—

সে পূর্বজন্মে তাহার নিজ পত্নিকে বশীভূত করার জন্য বশীকরণ ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিল। তৎফলে পত্নির ক্ষয়রোগ হইয়াছিল। সেই পাপে উহার ঐ জঘন্য টিকটিকী জন্ম হইয়াছে। সে দশ হাজার বৎসর এইরূপে অবস্থান করিতেছে। রাজা যদি তাঁহার বিজয়া দ্বাদশীর ফল উহাকে দেন তবে সে উদ্ধার পায়। রাজা তাহা শুনিয়া উহাকে নিজ দ্বাদশী-ব্রতের ফল প্রদান করিলে সে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিল।

অতঃপর তাহারা রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে অনেক বৃক্ষ, নদী, পর্বত, বন, গ্রাম, নগর সরোবরাদি অতিক্রম করিয়া বৈদিশ নগরের প্রান্তে উপস্থিত হন। রাজপুত্র ধর্ম্মাঙ্গদ গুপ্তচরমুখে পিতার প্রত্যাবর্তন-বার্তা শ্রবণ করিয়া নিজের অধীনস্থ রাজাদের সহিত পিতাকে স্বাগত অভ্যর্থনার ওন্ত গমন করিলেন। তাহারা এক ক্রোশ-পথ পদ-ব্রজে গমন করিলে পর রাজা রুক্মাঙ্গদকে দেখিতে পান। পিতাকে প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মাঙ্গদ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। রুক্মাঙ্গদ অশ্ব হইতে অবতরণপূর্বক মেহভরে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “৭৭স! তুমি সমস্ত প্রজাকে যথাযোগ্য পালন করিতেছ কি না? ত্রাযোপাঞ্জিত ধন দ্বারা কোষাগার পূর্ণ করত ব্রাহ্মণগণকে অধিক সংখ্যায় ধন দান কর ত? তোমার স্বভাব সকলের প্রীতিপ্রদ কি না? তুমি কাহাকেও কঠোর বাণী প্রয়োগ কর কি না? তোমার রাজ্যে প্রত্যেক পুত্র পিতার আজ্ঞা পালন করে কি না? গোচর ভূমিতে গোসকল চরিতে কেহ বাধা দেয় না তো? দ্রব্যাদির ওজন সম্বন্ধে নিরীক্ষণ কর কি না? কোন বড় গৃহস্থকে অধিক কর ধার্ম্মদ্বারা পীড়া দাও না ত? তোমার

রাজ্যে মদিরা পান এবং জুয়াখেলা হয় না ত? তোমার মাতৃগণকে সমান চক্ষুতে দেখ কি না? রাত্রির চতুর্থ প্রহরে তোমার নিদ্রাভঙ্গ হয় ত? রাজা নিদ্রার বশীভূত হইলে অধিক দিন রাজ্য পালন করিতে সমর্থ হয় না। নিদ্রা ব্যক্তিচারিণী জীবের মত স্বামীর ইহ-পবলোক নাশ করিয়া দেয়। রাজার কথা শুনিয়া ধর্ম্মাজদ বারম্বার প্রণাম করিয়া বলিলেন, “আপনার সমস্ত বাক্যই যথাযথ পালন করিয়া আসিতেছি এবং ভবিষ্যতেও পালন করিব।”

তৎপর ধর্ম্মাজদ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পিতঃ! আপনি আমাকে রাজ্যভার প্রদান করিয়া কোথায় গিয়াছিলেন? এষ্ট কান্তিময়ী দেবীকে কোথায় পাইলেন? ইনি সাক্ষাৎ গিরিরাজ-নন্দিনীর তুল্য। ইনি কি আমার মা? এ প্রকার মাতা প্রাপ্ত হইলে আমার মত পুণ্যাত্মা পৃথিবীতে কেহ নাই।” ধর্ম্মাজদের বাক্য শুনিয়া রুক্মাজদ বলিলেন, “এই দেবী সত্যই তোমার মাতা। এষ্ট দেবী ব্রহ্মার কন্যা। এ বাল্যাবস্থা হইতে আমাকে প্রাপ্ত হইবার জন্ত দেবগিরিতে কঠোর তপস্কা করিতেছিল। আজ হইতে ১৫ দিন পূর্বে আমি মহয়াবনে গিয়া দেখি, এই বালিকা মহাদেবকে প্রসন্ন করিবার জন্ত সঙ্গীত গাহিতেছিল। তথায়ই আমার সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ হয়, আর আমাকে পতিক্রমে বরণ করে। আমি মহাদেবের সাক্ষাৎ ইহাকে বিবাহ করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি।” তখন ধর্ম্মাজদ ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া মোহিনীকে অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করাইলেন এবং পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিলেন,—

“মা, আমি আপনার পুত্র, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।” এই বলিয়া পুনরায় পীঠে চড়াইয়া মোহিনীকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া দিলেন। আর সকলে পদব্রজে চলিতে লাগিলেন; অল্পকাল মধ্যে তাহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা ঘোড়া হইতে নামিয়া মোহিনীকে পুত্রের গৃহে যাইতে আদেশ করিলেন। তখন ধর্ম্মাজদ মোহিনীকে সঙ্গে লইয়া নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন এবং এক পালকে বসাইয়া চরণ ধৌত করিলেন। ধর্ম্মাজদ নিজ জননীর প্রতি যে ভাব, মোহিনীকেও সেইভাবে দর্শন করিলেন, তাহার চরণ ধুইয়া সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন এবং নম্র বচনে বলিলেন, “আজ আমি বিশেষ পুণ্যাত্ম হইলাম।” তারপরে অত্যাশ্চর্য

নবনারীসহ যত্নসহকারে মোহিনীর পথশান্তি দূর করিয়া তাহাকে উত্তম ভোগসকল প্রদান করিলেন। ক্ষীরসাগর মন্থনকালে যে উত্তম কুণ্ডল উৎখিত হইয়াছিল, অম্বরেরা তাহা লইয়া যায়। ধর্ম্মাঙ্গদ পাতালে গিয়া সেই অম্বরগণকে পরাজিত করিয়া ঐ কুণ্ডল আহরণ করিয়াছিলেন। তাহা নিজ হস্তে মোহিনীর কাণে পরাইয়া দিলেন, আরও বহুমূল্য বিচিত্র অলঙ্কার প্রদান করিলেন। অতঃপর নিজ মাতাকে আশ্বাসন করিয়া তাঁহার হাতে মোহিনীকে ভোজন করাইয়া নিজ জননীকে বলিলেন, —

“মা, তোমার ও আমার কর্তব্য পিতার যাহাতে সন্তোষ হয় তদ্রূপ কার্য্য পালন করা। পতিব্রতার কর্তব্য স্বামীর সুখবিধান করা। প্রাচীনকালে এক দৃষ্ট-প্রকৃতির শূদ্র ছিল। সে সর্ব্বপ্রকার সদাচারশূন্য ছিল। গৃহে পতিব্রতা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এক বেশ্যাকে আনিয়া গৃহে রাখিয়াছিল। তাহার স্ত্রী পতিব্রতা ছিল। সে পত্নীর সন্তোষ নিমিত্ত বেশ্যারও সেবা করিত। কিছুকাল পর তাহার পতি ভগবন্দর রোগে আক্রান্ত হয়। তাহার ঘরে যে সকল অর্থ ছিল সেই অর্থ দিয়া পতিব্রতা পতির সেবা করিতে থাকে। কিছুকাল পর বেশ্যাটী তাহার অর্থাভাব দেখিয়া পরিত্যাগ করে, কিন্তু পতিব্রতা নিজ পিতা ও ভ্রাতার নিকট হইতে অর্থ ভিক্ষা করিয়া পতির ঔষধাদির ব্যবস্থা করে। একদিন তাহারই পতি সদ্ভিজ্জরবশে কাঁপিতে কাঁপিতে উক্ত পতিব্রতা স্ত্রীর অঙ্গুলি কাটিয়া লয় এবং সেই দশায়ই মৃত্যু লাভ করে। তখন পতিব্রতা যত্নপূর্ব্বক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া চিতা সজ্জিত করত মৃত পতিকে তাহাতে স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নিসংযোগ করিয়া স্বয়ং পতিবক্ষে শয়ন করে। অনন্তর সেই পতিব্রতা পতিসহ দেবলোকে গমন করিয়াছিল। স্ত্রীর পুণ্যে দ্রুতগতিগরায়ণ পতির উর্দ্ধলোক প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।” ধর্ম্মাঙ্গদ এই উপাখ্যান শুনাইয়া নিজ জননীকে মোহিনীর সেবার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

রাণী সন্ধাবলী বিচিত্র ভোজনসামগ্রী লইয়া স্বহস্তে মোহিনীকে ভোজন করাইতেন। ধর্ম্মাঙ্গদ তাহার অত্যাশ্রিত মাতাকে ডাকাইয়া বলিলেন, “মাতৃগণ! আমার পিতা এই দেবীকে মন্দরাচল হইতে আনিয়াছেন। ইনি পিতার বিশেষ প্রিয়পাত্রী। অতএব আপনারা পতিপ্ৰীতি হেতু ইহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিলে আমি সুখী হইব। অত্যাশ্রিত সকলেই পুত্রের এই বাক্য সমর্থন করিলেন। তখন ধর্ম্মাঙ্গদ সকল মাতাকে বহুমূল্য বস্ত্র ও বিচিত্র অলঙ্কার প্রদান করিয়া সকলের সন্তোষ বিধান করিলেন

এবং সকলকে নমস্কার করিলেন। ধর্ম্মাঙ্গদ পিতার সেবার জন্ত বহু প্রকারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এইরূপে মোহিনীর সহিত বিলাসে রুক্মাঙ্গদের আট বৎসর গত হইয়াছিল। নবম বর্ষে পুত্র ধর্ম্মাঙ্গদ মলয় পর্বতে গিয়া পাঁচজন বিদ্বাদ্ব্যক্রে পরাস্ত করিয়া পাঁচটী মণি কাড়িয়া লন। ঐগুলি সর্ব্বপ্রকার কামনা পূরণকারী ছিল। ধর্ম্মাঙ্গদ ঐ মণিসকল আনিয়া পিতাকে প্রদান করেন। ইহার পর তিনি নাগপুরী, দানবপুরী ও বরুণলোক জয় করিয়া বহু মূল্যবান সামগ্রী ও বিদ্বাদ্ব্যর কন্যা আহরণ করেন।

রাজা রুক্মাঙ্গদ প্রীতি সহকারে সেই কন্যাগণের সঙ্গে পুত্রের বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিলেন। পুত্র পিতামাতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করতঃ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। তাঁহার রাজ্যকালে রাজ্যমধ্যে এমন কোন মল্লয্য ছিল না, যে ধর্ম্ম পালন না করিত। রাজ্যের প্রজাগণ হৃষ্টপুষ্ট ছিল, গাভীসকল প্রচুর দুগ্ধ দান করিত। রাজ্য সর্ব্ব-প্রকারে সমৃদ্ধি পূর্ণ ছিল।

রাজা রুক্মাঙ্গদ মোহিনীর সহিত নিজ সুখ বিলাসে বহু সময় অতিবাহিত করিলেও একদাশী তিথির পালনে অবহেলা কদাপি করেন নাই। এইরূপে আরও এক বৎসর গত হইল। মঙ্গলময় কাস্তিক মাস আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখিয়া রাজা রুক্মাঙ্গদ মোহিনীকে বলিলেন—
“মোহিনী, আমি তোমার সহিত বিলাসে বহুদিন অতিবাহিত করিয়াছি। তোমার সঙ্গে আসক্ত থাকায় আমার বহু কাস্তিক মাস বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে। এবার আমি কাস্তিক ব্রত পালন করিতে ইচ্ছা করি। কাস্তিক মাসে নিয়মপূর্ব্বক ব্রতাদি পালন করিলে মানবের পরমা গতি লাভ হয়। অতএব তুমি অনুমতি করিলে তোমার মোহ পরিত্যাগ করিয়া আমি ব্রত পালন করিতে সমর্থ হইব।”

রাজার বাক্য শুনিয়া মোহিনী উত্তর করিল,—“মহারাজ! রাজার তিনটী কর্ম্মই প্রধান—দান, প্রজাপালন এবং বিরোধী লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করা। আপনার এ ব্রত করা কর্তব্য নহে। আমি আপনাকে ছাড়িয়া দুই ঘণ্টাও থাকিতে পারিতে পারি না, অতএব আপনি ব্রতের পরিবর্তে ব্রাহ্মণগণকে ভোজনাদি সামগ্রী দান করুন। আর যদি উপবাস করার আবশ্যক হয়, তবে ভোঁঠা পত্নীই তাহা পালন করুন”। মোহিনীপূর্ণ কথা

বুঝিতে না পারিয়া রুক্মাঙ্গদ জ্যেষ্ঠ্যপত্নী সন্ধ্যাবলীকে আহ্বান করিলেন। তিনি আসিয়া পতিকে জোড়হস্তে বলিলেন, “নাথ, কি নিমিত্ত দাসীকে আহ্বান করিয়াছেন, আজ্ঞা পাইলে আমি তাহা পালন করিব।”

রুক্মাঙ্গদ বলিলেন, “প্রিয়ে! তুমি আমার চরিত্র ভাল করিয়া জান। আমি তোমারই আদেশে মোহিনীর সহিত দীর্ঘকাল বাস করিলাম। এই প্রকারে বিলাসমগ্ন অবস্থায় আমার অনেক কাস্তিক-ব্রত বৃথা নষ্ট হইয়াছে। এবার আমি এই কাস্তিক-ব্রত পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মোহিনী তাহা নিষেধ করিয়া তোমাকেই এই ব্রত পালন করিবার পরামর্শ দেন।” রাজার কথা শুনিয়া রাণী সন্ধ্যাবলী হর্ষসহকারে সেই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া সেই পাপনাশিনী নিয়মসেবা পালন করিতে লাগিলেন। রাজা রুক্মাঙ্গদ মোহিনীকে বলিলেন, “তোমার কথায় আমি কাস্তিক ব্রত ত্যাগ করিলাম। আমি তোমার সন্তোষের জন্ত রাজ্যপালন-কার্য্যও পরিত্যাগ করিয়াছি।” মোহিনী শুনিয়া বিশেষ প্রীতিসহকারে বলিল—দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্বাদি বহু বান্ধি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেও আমি তাহাদের প্রতি মনোযোগ না দিয়া কেবল আপনাকেই লক্ষ্য করিয়াছি। অতএব উভয়ের একাচল হওয়াই প্রয়োজন।

এইপ্রকার কথোপকথন সময়ে রাজা ধর্ম্মাঙ্গদের ঢক্কাবাদ্য রুক্মাঙ্গদের কর্ণগোচর হইল। ঢক্কাবাঁজের সহিত ঘোষণা হইতেছিল—প্রজাগণ! আগামীকাল একাদশী তিথি, আজ কেবল একবার মাত্র ভোজন ও ভূমি-শয্যাতে অবস্থানপূর্ব্বক স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে অরুণ কর। এই কাস্তিকী শুক্লা একাদশী শ্রীহরির নিদ্রাভঙ্গকাল। ইহাতে উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা দি যাবতায় পাপনাশ হয়। যে আমার আদেশ পালন না করিবে তাহাকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হইবে।

রাজা রুক্মাঙ্গদ সেই ঢক্কাধ্বনি সহ একাদশী ব্রতের আগমন শ্রবণ করিয়া মোহিনীর শয্যা ত্যাগ করত উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মোহিনীকে বলিলেন, “প্রিয়ে, অল্পই সেই অতিপুণ্যতম সর্ব্বপাপনাশিনী একাদশী। অতএব আজ আমি সংযমে থাকিব। তোমার আজ্ঞায় কাস্তিক-ব্রত পালন করিবার জন্ত জন্ত সন্ধ্যাবলীকে নিযুক্ত করিয়াছি, কিন্তু একাদশী-ব্রত আমি নিজে পালন করিব। তুমিও আমার সহিত সংযতভাবে এই ব্রত পালন কর।”

মোহিনী রাজবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল—রাজন্! একাদশী ব্রতপালন

অবশ্য কর্তব্য ; কিন্তু আপনি আমাকে মহ্যাবনে হাতে হাত রাখিয়া শপথ করিয়াছেন—আমি যাহা বলিব তাহা অবশ্য পালন করিবেন। অতএব আপনি আমাকে বর দান করুন, যদি না বেন তবে আপনার সমস্ত জীবনের অনুষ্ঠিত পুণ্যসকল নাশ পাইবে।”

রাজা বলিলেন, “তোমার চিত্তে যে ইচ্ছা জন্মিবে আমি তাহা পূর্ণ করিব।” তখন মোহিনী বলিল—তাহা হইলে আমার ইচ্ছা, আপনি একাদশী পালন না করিয়া ভোজন করুন। যদি আমার কথা রক্ষা না করেন, তবে প্রাজ্ঞাভঙ্গ-জনিত পাপে ঘোর নরকে পতিত হইবেন।

রাজা পুনরায় বলিলেন, “কল্যাণ, এই প্রকার বাক্য বলিও না। তুমি ব্রাহ্মণ কণ্ঠা হইয়া ধর্মপথে নিম্ন উৎপাদন কেন কর? আমি জন্মাবধি যে ব্রত পালন করিয়া আসিতেছি, আজ আমার কেশ পক হইয়াছে, এখন উহা কিরূপে ত্যাগ করিব? যাহার ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস হইয়াছে তাহার পক্ষে ধর্মপালনপূর্বক ভগবানের সন্তোষ বিধান করাই কর্তব্য। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ব্রতভঙ্গ করিও না। ইহার পরিবর্তে তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে, তাহাই প্রদান করিব। চতুর্দশীতে ক্ষৌরকার্য্য করিলে যে পাপের সঞ্চার হয়, আর নষ্টীর দিন তৈল খাইলে বা মাখিলে যে পাপ হয়, একাদশীতে ভোজন করিলে যে সমস্ত পাপ হইয়া থাকে, গোচরভূমি নাশ করিলে, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলে, কুমারী কণ্ঠার বিবাহে বাধা প্রদান করিলে, মৃতবৎসা গাভীর দুগ্ধ পান করিলে এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে কিছু দান করিবার কথা বলিয়া সেইদান না করিলে যে পাপ হয়, মণিকূট, তুলাকূট, কণ্ঠামৃত আর গব্যামৃতে যে পাপসঞ্চার হয়, একাদশীতে ভোজন করিলে সেই সকল পাপ হইয়া থাকে। আমি এ সকল জানিয়া শুনিয়া একাদশীতে ভোজন কিরূপে করিব?”

[মণিকূট--যে মণিবিভ্রেক্তা আসল রত্নের দাম লইয়া নকল রত্ন দেয়, তাহা মণিকূট পাপ; তুলাকূট—তুলাদণ্ডে ওজন কম করিয়া দেওয়া তুলাকূট পাপ; কণ্ঠামৃত—বিবাহের জন্ত এক কণ্ঠাকে দেখাইয়া অপর কণ্ঠা দান কণ্ঠামৃত পাপ; গব্যামৃত—কাধাকেও এক গাভী দিবার কথা বলিয়া অল্প গাভী দেওয়া গব্যামৃত পাপ।]

মোহিনী বলিল—“রাজেন্দ্র একভুক্ত ব্রত, নরক ব্রত, অযাচিত-ব্রত, অথবা উপবাস দ্বারা একাদশীব্রত সকল করিবে; তাহা লঙ্ঘন করিবে না সত্য

কিন্তু আমি মহাযাবনে থাকার সময় মহর্ষি গোতম আমাকে বলিয়াছিলেন,—গর্ভিনী স্ত্রী, ক্ষীণকায় রোগী, শিশু, যজ্ঞের আয়োজনে উত্তম ব্যক্তি, যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত যোদ্ধা এবং পতিব্রতা স্ত্রী—ইহাদের জন্ত নিরাহার-ব্রতের বিধান নাই। একাদশীতে বিনা ব্রতে থাকা উচিত নহে—এই আজ্ঞা উপরোক্ত ব্যক্তিদের জন্ত নহে। অতএব আপনি যদি একাদশীতে ভোজন না করেন তবে আপনার জায় অসত্যবাদীকে আমি স্পর্শ করিব না। সকল বর্ণ ও আশ্রমে সত্যেরই পূজা হইয়া থাকে। সত্যের জোরেই চন্দ্র-সূর্য্যের উদয় হয়, পৃথিবী সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত সত্যে বায়ু চলিতেছে, অগ্নি জলিতেছে এবং চরাচর জগতের আধার একমাত্র সত্য। সত্যে বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়া বিদ্যাচল মাথা উঁচু করে না, সত্যের প্রভাবেই যুবতী স্ত্রী সময় অতীত হইলে গর্ভধারণ করে না। সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বক্ষ লতাাদি ফুলফল প্রদান করে, দিব্যালোকের আধার একমাত্র সত্য এবং সহস্র অশ্বমেধেরও অধিক একটা সত্য বাক্য। আপনি অসত্যবাদী হইলে মদিরা-পানভুল্য পাপে লিপ্ত হইবেন।”

রাজা বলিলেন, “একাদশীর দিন ক্ষীণকায় ব্যক্তির জন্ত ফলমূল, দুধ, জলাদি গ্রহণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অন্ন ভোজনের কথা কোন শাস্ত্রে নাই। গোতমের কথা শাস্ত্রসম্মত নহে। অতএব তুমি ইহাতে আগ্রহ করিও না, ইহাতে আমার ব্রতভঙ্গ হইবে।” মোহিনী বলিল, “একাদশী ব্রতের কথা বেদে নাই।” রাজা বলিলেন—“মোহিনী বেদ অনেক রূপে বিরাজিত। যজ্ঞাদি কৰ্ম্মকাণ্ড বেদ, স্মৃতিও বেদ এবং এই দুই প্রকার বেদ পুরাণে প্রতিষ্ঠিত। বেদ অপেক্ষা পুরাণকে অধিক মানা উচিত। যাহারা শাস্ত্র কম জানে বেদ তাহাদিগকে ভয় করে। কারণ তাহারা বেদকে অন্তায় ভাবে গ্রহণ করিয়া প্রহার না করে, এইজন্ত। বেদে যাহা নাই, তাহা স্মৃতিতে আছে, বেদ ও স্মৃতিতে যাহা নাই তাহা পুরাণে পাওয়া যায়। বহুবিধ পাপ, রোগের ঔষধ প্রভৃতি পুরাণে আছে। বেদ, বেদাঙ্গ, স্মৃতি ও পুরাণে যাহা কিছু বলিয়াছে সে সকলই বেদের অন্তর্গত জানিতে হইবে। পুরাণ পুনঃ পুনঃ এই কথা কীর্ত্তন করিতেছেন—একাদশীতে ভোজন করা কর্তব্য নহে।”

মোহিনী দাসীকে ডাকিয়া বলিল—“ঘূর্ণিকে! তুমি শীঘ্র গিয়া বেদ-পারঙ্গত গোতমাদি ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আন।” দাসীর আহ্বানে ব্রাহ্মণগণ

আসিয়া উপস্থিত হইলে রাজা ও মোহিনী উভয়ে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তাঁহাদিগকে উত্তম আসনে বসাইলে পর গৌতম জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাদিগকে কি জ্ঞাত আত্মান করিয়াছেন? মোহিনী বলিল, “রাজা বলিতেছেন, একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করিবেন না। ব্রতপালন ত বিধবা ও যতিদের জ্ঞাত, রাজার ধর্ম প্রজাপালন করা আর ব্রাহ্মণদের সেবা। রাজার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইয়াছে। ইনি একাদশী ব্রত পালন কিরূপে করিবেন? আমি অনেক বুঝাইয়াছি, কিন্তু ইনি তাহাতে নারাজ।”

মুখ্য ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—“রাজন্! আপনি যে শপথ করিয়াছেন উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবেন না, তাহা শাস্ত্রদৃষ্টিতে হয় নাই, নিম্ন বুদ্ধিতে করিয়াছেন। অগ্নিহোত্রীর জ্ঞাত উভয় সন্ধ্যায়ই ভোজনের বিধি আছে। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ হোমাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে—ইহাই বিধি। বিশেষতঃ ভূপালের জ্ঞাত উপবাস বিহিত নহে; আপনি ব্রাহ্মণ-গণের সঙ্গে ভোজন করিলে ব্রতভঙ্গ হইবে না।” এই বাক্য শুনিয়া রাজা মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেও মধুর বচনে বলিলেন,—

“বিপ্রগণ! আপনারা সকল প্রাণীকে সংমার্গ প্রদর্শন করেন, এরূপ বলা অতুচিত। আপনারা যে বলিলেন রাজার জ্ঞাত উপবাসের বিধান নাই, আমি তাহার বিরুদ্ধে বলিতেছি। যদিরা যেমন পান করিতে নাই,—ব্রাহ্মণকে মারিতে, জুয়াখেলা আর একাদশীতে অন্ন ভোজনও তেমনই অকর্তব্য। অকর্তব্য কর্ম করিয়া শত বৎসর জীবন ধারণে কি লাভ? আমার শরীর ক্ষীণ নহে আর আমি রোগাও নহি। সুতরাং আপনারা কহিবা মাত্র একাদশী-ব্রত ত্যাগ করিতে পারিব না। দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, রাক্ষস, সিদ্ধ, ব্রাহ্মণ, আমার পিতা, ভগবান বিষ্ণু, শিব বা ব্রহ্মা, সূর্য্য কি অগ্নি লোক-গণ যে কেহ আসিয়া অন্ন ভোজনের উপদেশ করিলেও আমি অন্ন ভোজন করিতে পারিব না। ছুইবার করিয়া ঢকাবাতে ঘোষণা করা হইতেছে যে, আমার রাজ্যে কোন প্রাণী একাদশীতে অন্ন ভোজন করিবে না। আমি নিজেই ইহা প্রচার করিয়া স্বয়ংই তাহার বিপরীত আচরণ কিরূপে করিব? যদি ইন্দের তেজ ক্ষীণ হয়, হিমালয় পরিবর্তিত হয়, সমুদ্র শুকাইয়া যায়, অগ্নি তাহার স্বাভাবিক উষ্ণতা পরিত্যাগ করে তথাপি রাজা রুক্মাঙ্গদ একাদশী-ব্রত ভঙ্গ করিবে না। যাহারা শাস্ত্র মানে না তাহারা যমের দণ্ডনীয়।” রাজার বাক্য শুনিয়া মোহিনী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া

বলিল—“রাজন্ ! যদি তুমি আমার বাক্য স্বীকার না কর তবে ধৰ্ম্মভ্রষ্ট হইবে। আর আমাকে বাক্য দিয়া তাহা পালন না করিলে আমি চলিয়া যাইব। এখন আর তুমি আমার পতি নও, আমিও তোমার পত্নী নই। তুমি নিজ বাক্য ভঙ্গ করিয়া ধৰ্ম্মভ্রষ্ট হইলে। তোমাকে ধিক্কার !” এই কথা বলিয়া বিশেষ উদ্বেগের সহিত উঠিয়া ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। ঠিক সেই সময়ে ধৰ্ম্মাঙ্গদ পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছিলেন। তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া পিতাকে ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিলেন। পরে, মোহিনীকে বাহিরে যাইতে দেখিয়া দ্রুতগতিতে তাহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন—“মা, কে তোমার অপমান করিয়াছে? তুমিত পিতার অধিক প্রিয়া, কে তোমাকে রুষ্ট করিয়াছে? ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে তুমি কোথায় যাইতেছ? ধৰ্ম্মাঙ্গদের বাক্য শুনিয়া মোহিনী বলিল—বেটা, তোমার পিতা মিথ্যাবাদী। আমার নিকট শপথ করিয়া তাহা ভঙ্গ করিয়াছে। সেজন্ত তোমার পিতার সহিত থাকিবার আমার কোন উৎসাহ নাই।” ধৰ্ম্মাঙ্গদ বলিলেন, মা তুমি ক্রোধ করিও না, ফিরিয়া চল।” মোহিনী বলিল, “তোমার পিতা আমাকে মন্দরাচলে মনমাখা বরদান করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। দেবেশ্বর মহাদেব সাক্ষী আছেন। এখন সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছেন। আমি তাঁহার নিকট পার্থিব কোন দ্রব্য চাহি না; তাঁহারই স্বথের জন্ত—শরীরের জন্ত যে বিষয় বলিতেছি, তিনি তাহা শুনিতেন না। অসত্যভাষণ মন্দরাপানের তুল্য পাপ। এজন্ত আমি আর তাঁহার নিকট থাকিব না।” ধৰ্ম্মাঙ্গদ বলিলেন—আমার পিতা জীবন থাকিতে কখনও মিথ্যা বলিতে পারে না, কখনও তিনি মিথ্যা বলেন নাই। যাহার সত্যের উপর নির্ভর করিয়া দেবতা, দানব, মনুষ্য, সকলেই অবস্থিত, যাহার কীৰ্ত্তি দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে—যিনি যমপুরী শূন্য করিয়াছেন, তিনি অসত্যবাদী ইহা কিরূপে সম্ভব। আমি তাঁহার বাক্য শুনি নাই, পরোক্ষ তোমার বাক্য কিরূপে বিশ্বাস করিব? অতএব ফিরিয়া চল।”

ধৰ্ম্মাঙ্গদের বাক্য শুনিয়া মোহিনী ফিরিল। রুদ্ৰাঙ্গদ যে শয্যাতে শায়িত ছিলেন, ধৰ্ম্মাঙ্গদ মোহিনীকে লইয়া তথায় বসাইলেন এবং জোড়হস্তে পিতাকে বলিলেন—“পিতঃ ! মাতা মোহিনী আপনাকে আজ অসত্যবাদী বলিতেছে। আপনি কিরূপে অসত্যবাদী হইলেন। তাহা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। এ আপনার নিকট অর্থাৎ যাহা চায় আপনি নিঃসঙ্কোচে প্রদান করুন। অগতে যাহা দুর্লভ একরূপ বস্তুও মোহিনী চাহিলে

তাহাও তাহাকে প্রদান করুন। ইন্দ্রপদ চাহিলে আমি ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া মোহিনীকে তাহাও প্রদান করিব। আমার জীবন অথবা আমার জননীৰ জীবন চাহিলে তাহাও দিতে পারি। আপন তদ্বারা ইহ-পরলোকে কীৰ্ত্তিমান থাকিবেন। রাজা বলিলেন—“আমার কীৰ্ত্তি নষ্ট হউক, আমি অসত্যবাদী হইকিষা নরকে যাই, কিন্তু একাদশীতে ভোজন-ভোজন কিরূপে করিতে পারি? পুত্র! মোহিনী যদি ব্রহ্মার লোকে চলিয়া যায় তাহাও সম্ভব হইবে কিন্তু সে আমাকে অল্প একাদশীতে ভোজন করাইবার জন্তই আগ্রহ করিতেছে, তাহা কিরূপে সম্ভব? আমার দুন্দুভি ধ্বনিত লোককে একাদশী পালনের কথা জানাইতেছে। আমি স্বয়ং তাহা পালন না করিলে তাহা অসত্য হইয়া যাইবে। অগম্যাগমন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ কিম্বা মদিরা পান করিয়া শত বৎসর বাঁচিয়া কি ফল? এই চঞ্চলাকটাক্ষশালিনী মোহিনীৰ বিয়োগে আমার মৃত্যু হইলেও একাদশীতে ভোজন করিতে পারিব না। যে নরকের পঙ্ক্তিতে আমি শূন্য করিয়া দিয়াছি, আমা কর্তৃক একাদশীৰ অপালনে তাহা আবার পূর্ণ হইবে। মোহিনী মরিয়া যায় অথবা চলিয়া যায়, তথাপি আমার মন-একাদশী-ব্রত হইতে বিরত হইতে পারে না। স্ত্রীপুত্রাদি সহিত নিজশরীর ত্যাগ করিতে পারি কিন্তু ব্রতভঙ্গ করিতে পারি না।”

পিতার বাক্য শুনিয়া সন্ধ্যাঙ্গক নিজ মাতা সন্ধ্যাবলীকে আহ্বান করিয়া মোহিনীকে সান্ত্বনা দিবার জন্ত অনুরোধ করেন। সন্ধ্যাবলী মোহিনীকে বলিলেন, “ভগ্নী! তুমি রাজাকে একরূপ অস্ত্রায় কার্যের জন্ত আগ্রহ করিও না। আমি ভ্যেষ্ঠা হইলেও তোমার চরণ বন্দনা করিব। তুমি পতিকে বাক্যবিবশ করিয়া অস্বার্থ্য্য করাইতে চেষ্টা করিবে না। যে একরূপ চেষ্টা করে তাহার নরকে পতন হয়, তৎপর শূকরী যোনিতে জন্ম হয়, তৎপশ্চাৎ চণ্ডালী হয়। এই প্রকার পরিণাম জানিয়া আমি সখিভাবে তোমাকে নিষেধ করিতেছি।”

সন্ধ্যাবলীর বাক্য শুনিয়া মোহিনী বলিল—দিদি, তুমি আমার মাননীয়া, এজন্ত তোমার কথা শুনিব। রাজা যদি একাদশীতে ভোজন না করেন তবে আমার পরিবর্তে অল্প এক কাজ করুন। যাহা তোমার পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক, যাহা আমারও দুঃখজনক, পুত্রবধূগণেরও প্রাণহরণকারী বাক্য—উহাতে আমার কলঙ্ক হইবে—সে কথা মুখে আনাও সম্ভব নহে।

মোহিনীর কথা শুনিয়া রাণী সন্ধ্যাবলী বলিলেন—বল, কি কথা? আমার যতই দুঃখ হউক, তাহা শুনিব। আমার পতির সত্য রক্ষার জন্ত সবই সহ্য হইবে। সন্ধ্যাবলীর বাক্য শুনিয়া মোহিনী বলিল, “রাজা যদি একাদশীতে ভোজন না করেন, তাহা হইলে নিজ প্রিয় পুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া আমাকে প্রদান করুন।” মোহিনীর বাক্য শুনিয়া সন্ধ্যাবলী ক্ষণকালের জন্ত কম্পিত হইয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন—মোহিনী, তোমার প্রসন্নতার জন্ত পুত্রের মস্তক তোমাকে দেওয়াইব, আমার বাক্যে বিশ্বাস কর।

অতঃপর রাণী সন্ধ্যাবলী রাজাকে বলিলেন—“মহারাজ! আমি মোহিনীকে অনেক বুঝাইয়াছি, কিন্তু সে কিছুতেই শুনবে না। অতএব ধর্ম্মহানি অপেক্ষা পুত্রের প্রাণনাশ করাই শ্রেয়ঃ। পিতা অপেক্ষা মাতার স্নেহ শতগুণ অধিক। কিন্তু আজ মা হইয়াও সত্যপালনের জন্ত পুত্রের মমতায় জলাঞ্জলি দিতেছি। স্নেহত্যাগ করিয়া পুত্রকে বধ করুন।

রাজা বলিলেন, “প্রিয়ে! পুত্রহত্যায় ব্রহ্মহত্যা হইতেও অধিক পাপ। দেবি! এই মোহিনী আমার স্ত্রী নহে সাক্ষাৎ কালধ্বংসিনী ফণী। ধর্ম্মাঙ্গদের জ্বায় উপযুক্ত পুত্রকে হত্যা করিয়া আমার কি গতি হইবে? কুপুত্রকে মারিতেই পিতার কষ্ট হয়; আর ধর্ম্মাঙ্গদের জ্বায় ধর্ম্মশীল, প্রজাপালক, গুরু-জনের সেবককে মারিয়া কি ফল? মোহিনী মোহে ডুবিয়া কেবল আমাকে দুঃখ দিতেছে। উহাকে মাস্তানা দাও।” এই বলিয়া রাজা মোহিনীকে বলিলেন, “আমি পুত্রহত্যা বা একাদশীতে ভোজন কোনটাই করিতেই পারিব না। ধর্ম্মাঙ্গদকে মারিয়া বা আমাকে একাদশীতে ভোজন করাইয়া তোমার কি লাভ হইবে? এই দুঃখতাপূর্ণ আগ্রহ ছাড়িয়া দাও।” মোহিনী পুনরায় বলিল, “আপনি একাদশীতে ভোজন করিলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, পুত্র বধের প্রয়োজন নাই।

ঠিক সেই সময় রাজপুত্র সহসা ধর্ম্মাঙ্গদ আসিয়া মোহিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—“ভামিনি, তুমি আমার বধরূপ বর গ্রহণ কর।” এই বলিয়া একটি তীক্ষ্ণধার তরবারি রাজার হাতে প্রদান করিয়া বলিলেন, “পিতঃ! আপনি বিলম্ব করিবেন না, মোহিনীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা সফল করুন। আপনার হিতের জন্ত আমার মৃত্যু হইলে অক্ষয় গতি লাভ করিব। সত্যপালন করুন, একাদশীতে ভোজন করিবেন না। পুত্রের বাক্য শুনিয়া রাজা সন্ধ্যাবলীর মুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাহা কমলের

তায় প্রসন্ন। তাহা দেখিয়া রাজার চিত্ত প্রসন্ন হইল। তখন আবার মোহিনী বলিল, “একাদশীতে ভোজন কর, পুত্রবধ করিতে হইবে না, আর ভোজন না করিলে পুত্রবধ করিতে হইবে।”

ঠিক ঐসময় ভগবান্ বিষ্ণু অলক্ষিত-ভাবে আকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা হর্ষযুক্ত চিত্তে ভগবানের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া তরবারি গ্রহণ করিলেন; পুত্রও সানন্দে মস্তক ভূমিতে স্থাপন করিলেন। রাজা তরবারি উত্তোলন করিলে পর্বত সহিত সমগ্র পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল, সমুদ্রে জোয়ার আসিল, পৃথিবীতে উদ্ধাপাত হইতে লাগিল। মোহিনীর রং সাদা হইয়া গেল। তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। রাজাকে তরবারি উঠাইতে দেখিয়া মোহিনী মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। সেই সময় ভগবান্ শ্রীহরি নিজ হস্তে তরবারি ধারণ করিয়া বলিলেন—“রাজন্! আমি তোমার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি স্ত্রী-পুত্রসহ আমার বৈকুণ্ঠধামে চল। ত্রিলোকে অক্ষয় কীৰ্ত্তি স্থাপন করিয়া আমার ধামে গমন কর।”—এই বলিয়া তিনি রাজাকে স্পর্শ করিলেন, তৎক্ষণাৎ পুত্র, রাণী ও রাজা সকলের সম্মুখে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। আকাশে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, দেবতাগণ হৃন্দুভি বাজাইতে লাগিলেন।

ধর্ম্মরাজ এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যলোকে গিয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন—প্রভো! আর এইপদে আমার প্রয়োজন নাই। আমাকে অস্ত্র কার্য্যে নিযুক্ত করুন।

—ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীমন্তভূদেব শ্রোতী মহারাজ

অমল পত্র

পূজনীয় মহারাজ ! চরণে তোমার ।
পত্র দ্বারা সাষ্টাঙ্গে নমি বারংবার ॥
কৃপা করি' মোর নাম পত্রে যে প্রেরিলে ।
কি কব উত্তরে তার, ভাষা নাহি মিলে ॥
মো-সম পাতকী জনে তব এত দয়া ।
ভাবিতে তা' সদা মোর কেঁদে উঠে হিয়া ॥
তুমি যে ঠাকুর প্রভু আমি তো কুকুর ।
তবু এ অধমে স্নেহ করিছ প্রচুর ॥
মোদের কুশল-বার্তা পুছিলে পত্রেতে ।
তোমা না হেরিয়া সদা আছি বিমর্ষেতে ॥
এ গ্রামে সকল লোকে তোমা ভালবাসি ।
পুছে মোরে, “আর কবে আসিবে সে স্ত্রাসী” ॥
তব মধু ব্যবহারে প্রীত সর্বজন ।
গ্রামস্থ সজ্জন সবে গাহে তব গুণ ॥
তব আশীর্বাদে আর তব কৃপাবলে ।
এ বাটীর সবে রহে সর্বাক্ষ কুশলে ॥
তোমার কুশলে থাকি আনন্দ-মাগরে ।
তোমার কুশল দিয়া সুখী কর মোরে ॥
ইচ্ছা আছে যাব ত্বর নবদ্বীপাশ্রম ।
দিন কত রহি' সেথা লভিব বিশ্রাম ॥
কৃপায় আমারে ওগো শুদ্ধা ভক্তি দানে ।
তোমার দাসের দাস কর এ-অধমে ॥
পরম আরাধ্য-নিধি শ্রীগুরু-দর্শনে ।
নবদ্বীপ যাইবারে ইচ্ছা জাগে মনে ॥
জানায়ে শ্রীগুরুপদে সাষ্টাঙ্গ প্রণতি ।
তব শ্রীচরণে রাখি শতকোটি নতি ॥
আর যত বৈষ্ণবপদে জানায়ে প্রণতি ।
কৃপায় ক্ষমহ প্রভু মোর সর্ব ক্রটি ॥

ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য

মহারাজের স্বধাম প্রয়াণ

অত্যন্ত বিরহের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, জগদগুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোষামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত ও তাঁহার নিকট সন্ন্যাসপ্রাপ্ত পূজাপাদ শ্রীল অরণ্য মহারাজ গত ২১শে পৌষ ১৩৭৩, ইং ৬ই জানুয়ারী ১৯৬৭, শুক্রবার একাদশী তিথির আশ্রয়ে সন্ধ্যা ৬-৩০মিঃ বসিরহাটের নিকটবর্তী ধলতিখা গ্রামে তাঁহার অনুগত শ্রীযুক্ত ননীগোপাল কুণ্ডু মহাশয়ের ঠাকুরবাটীতে শ্রীশ্রীগুরু-গোরাচন্দ্রের বাণী কীর্তনমুখে সজ্ঞানে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়া গোড়ীয় সারস্বত-সমাজকে গভীর বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছেন। সমগ্র গোড়ীয় সারস্বত সমাজে স্বামীজী মহারাজের অলৌকিক বাগ্মিতা ও শ্রীল প্রভুপাদের বাণী কীর্তনে তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা একটি বিষয়ের বস্তু ছিল।

হরিবাসর ব্রতোপলক্ষে স্বামীজী মহারাজ নিজ শিষ্য ও অনুগত জনগণের নিকট কৃষ্ণকথা কীর্তন করিতেছিলেন। পাশ্ববর্তী গ্রামে তদীয় এক সতীর্থের আগমন-সংবাদ পাইয়া তাঁহাকেও আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনিও উক্ত হরিকীর্তন-সভায় উপস্থিত ছিলেন। এইরূপে হরিকীর্তনের মধ্যে হঠাৎ স্বামীজী মহারাজ একটু অস্বস্তি বোধ করেন। কিছুক্ষণ পরেই কৃষ্ণকথা কীর্তন করিতে করিতেই সজ্ঞানে নিত্যাধামে বিজয় করেন। এইরূপ অলৌকিকভাবে তাঁহার দেহরক্ষা উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করিয়াছে।

বিগত দামোদর ব্রতকালে মথুরা শ্রীকেশবজী গোড়ীয় মঠে অস্মদীয় শ্রীশ্রীল গুরুপাদশ্রদ্ধের উপস্থিতিতে ত্রিদিগ্বিশ্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবাদান্ত ভিক্ষু মহারাজের বিরহ-সভায় স্বামীজী মহারাজ বৈষ্ণবজগতে বিরহ-তত্ত্ব সম্পর্কে এক দার্শনিক বিচারপূর্ণ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। মনে হয়, প্রকাশ্য সভায় উহাই তাঁহার শেষ বক্তৃতা।

যশোহর জিলায় গঙ্গারামপুর গ্রামে তাঁহার পূর্বনিবাস ছিল। এই আশ্রমে থাকাকালীনই তিনি শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত হন। বর্তমানের পাশ্চাত্য শিক্ষা স্বামীজী মহারাজের বেশী না থাকিলেও

তাঁহাতে সহজ ভক্তিসিদ্ধান্তের অফুরন্ত ভাণ্ডার ও তাহার পরিবেশন-দক্ষতা তদীয় সতীর্থ বৈষ্ণবগণকে কেন, বহু উচ্চশিক্ষিত লোককে-ও মুগ্ধ করিত।

বিশ্বনাথী গৌরবাণী কীর্তনকারিণী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্যদেবের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত প্রীতিভাব ছিল। তিনি প্রায়শঃই বলিতেন, “শ্রীল প্রভুপাদের বাণী তেজস্বিতার সহিত ইনিই কিছু প্রচার করিতে পারেন এবং করিতেছেন।” এমনকি, সম্প্রতিকালে তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠসমূহ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিতে দান করিতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন এবং তজন্য অস্বদীয় আচার্য্যপাদপন্থকে তিনি যথেষ্ট অনুরোধ করিয়াছিলেন। অত্র সমিতির মঠসমূহে প্রায়ই তিনি আগমন করিয়া সেবককে নানাবিধ হৃৎকর্ণরসায়ণী হরিকথা শ্রবণ করাইতেন। আজ তাঁহার স্বধামপ্রয়াণে আমাদের কর্ণ তাঁহার তেজস্বিনী হরিকথা শ্রবণে বঞ্চিত হইল—ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য। তিনি প্রচুর পরিমাণে আমাদের আশীষাদ করুন, যেন তাঁহার মুক্তিমান্ আদর্শে আমরাও বাণীর সেবায় যোগ্যতা লাভ করি।

সর্বশেষে পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহার অপ্রাকৃত কলেবর পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিষামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের নির্দেশে বহু খরচ করিয়া মোটরযোগে পল্লীগ্রাম ধলতিখা হইতে কলিকাতায় কেওড়াতলা শ্মশানে আনীত হইয়া অগ্নিদাহ করা হইয়াছে। ইহা সাত্বত-স্মৃতিগ্রন্থের অনুমোদিত নহে। আমরা ইহাতে বিশেষ দুঃখিত, কারণ সন্ন্যাসিগণের দেহ সমাধিস্থ করারই বিধি আছে। বিশেষতঃ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ অরণ্য মহারাজ জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন প্রাচীন সন্ন্যাসী।

—নিজস্ব সংবাদ

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীল আচার্যদেব

বিগত ১২ই মাঘ বৃহস্পতিবার হইতে ১৮ই মাঘ পর্য্যন্ত কলিকাতা ৩৫নং শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠের নবমন্দির ও নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠা ও বার্ষিক মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত মঠের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিদিয়িত মাধব মহারাজ স্বয়ং শ্রীগোড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য-পাদপদ্মকে এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে আসিয়া অনুরোধ ও আহ্বান জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্ম কয়েকমুষ্টি ব্রহ্মচারীসহ বুধবার ১১ই মাঘ অপরাহ্নে নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। এই মহোৎসবে জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত বহু সন্ন্যাসী যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা মহানগরীর বহু বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-গণও ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ উক্ত মন্দির ও নাট্যমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তুক্তিভূদেব শ্রীমতী মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমন্তুক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ প্রতিষ্ঠা-কার্যের আনুষ্ঠানিক হোম, যজ্ঞাদি সম্পন্ন করেন।

আনন্দপাডায় শ্রী শ্রী নরহরি প্রভুর বিরহ-মহোৎসবে যোগদান করিতে শ্রীশ্রীল আচার্যদেব ১৫ই মাঘ রবিবার অপরাহ্নে তথায় যাত্রা করিয়া পুনরায় ১৭ই মাঘ মঙ্গলবার অপরাহ্নে কলিকাতায় শুভবিজয় করেন। ১২ই, ১৪ই ও ১৮ই মাঘ যথাক্রমে ‘মঠ-মন্দিরের প্রয়োজনীয়তা’, ‘গীতার শিক্ষা’ ও ‘যুগধর্ম’ এই তিনটি বিষয়ে শ্রীশ্রীল-আচার্যদেব দার্শনিক ভাবগভীর বক্তৃতা প্রদান করেন। যথাক্রমে এই তিন-দিবস কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত দীপনারায়ণ সিংহ, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ ব্যানার্জি (ভূতপূর্ব উপাচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ও কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মুখার্জি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অতঃপর ২০শে মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল আচার্যপাদপদ্ম নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ

গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রদত্ত বক্তৃত্ত্বের ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। প্রথম দিনের বক্তৃতা নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

শ্রী শ্রীল আচার্য্যদেবের ভাষণ

আজ মঠ-মন্দিরের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আলোচনার কথা। প্রথমেই আমার strike করছে সভাপতি মহোদয়ের কথা, যিনি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি (Chief Justice, Calcutta High Court)। তাঁর উপস্থিতিই মঠ-মন্দিরের আবশ্যকতা প্রমাণ করছে। সিংহ সর্কাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই নামে উপমা দেওয়া হয়। সুতরাং সিংহবিক্রমে তিনি ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করেন। *

কয়েকটি সাধারণ কথা আমি বলতে চাই। ‘মঠ’ শব্দ ‘মঠ্’ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এই ধাতুর অর্থ—‘মঠন্তি বসন্তি ছাত্রা যত্র’ অর্থাৎ যেখানে ছাত্রগণ বাস করে। তাহলে ত বোডিং হাউসকেও মঠ বলা যায়?—না তা বলা যায় না, পার্থক্য আছে। মঠ-মন্দির যে শ্রেণীর ছাত্রাবাস মেস (mess), বোডিংকে সে শ্রেণীর ছাত্রাবাস বলা যায় না। দেবস্থান, ধর্ম্মশিক্ষার স্থানকে ‘মঠ’ বলা হয়। যা শিক্ষা সাধারণ স্কুলে দেওয়া হয়, সেখানে ধর্ম্ম কোথায়, কি, এ’শিক্ষার স্থান নেই। এমন কি সাধারণ নীতিশিক্ষাও স্কুলে দেওয়া হয় না।

ছাত্র শব্দ ছদ্-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। ছদ্ ধাতুর অর্থ আচ্ছাদন করা। মঠবাসীরা আচ্ছাদন করে রাখে। কিসে থেকে তারা কি আচ্ছাদন করে রাখে? দেশে যত তাপ, উত্তাপ তারা রক্ষা করে দেশকে শীতল রাখে। Political (রাজনীতির) কিছু ঘটলে স্কুল, কলেজ আগুন হ’য়ে যায়, মঠ কিন্তু calm and quiet (শান্ত সমাহিত)।

স্মৃতি-শাস্ত্রকার বলেন, যে-গ্রামে মঠ-মন্দির নাই, সে গ্রামের মধ্য দিয়ে যাবে না। গ্রামে মন্দির থাকলে লোকের চিত্তবৃত্তির শোধন হয়। সাধারণ লৌকিক উদাহরণ দেই—হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু এরা অশুর ছিল, ঈশ্বর-বিরোধী ছিল। সেজন্য এদের রাজত্বে প্রকৃত শান্তি ছিল না। বরাহদেব নৃসিংহদেব এদের ধ্বংস করেছেন। এদের দৃষ্টি ছিল শুধু টাকা উপায় করা। কেবল টাকা উপায় কর, টাকাই সব করবে। অনেকে আবার বলে, ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলে ডাকলে কি খেতে পাওয়া যাবে? আমি বলছি, ভগবানকে ডেকেছেন কি ডেকে যদি না পেতেন তা’হলে কথা হত।

* সভাপতি মহাশয়ের উপাধি সিংহ। উহাকে লক্ষ্য করিয়া সিংহবিক্রমে বলা হইয়াছে।

আমাদের এই প্রাকৃত দৃষ্টিকে স্বীকৃত না করতে পারলে দেশে শান্তি আসবে না। ভক্ত প্রহ্লাদকে মেরে ফেলতে হবে, হিরণ্যের সেবা করতে হবে—এই principle (নীতি) নিয়ে এখন রাজনীতি চলছে। আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে, এমন কি ইংরেজ আমলেও ধর্ম কিছু ছিল, আজকাল আর তা নেই।

স্মৃতি শব্দের অর্থ Codified Rule। ঋষিগণ কতকগুলি Codified Rule তৈরী করে দিয়েছিলেন। দেশের শাসন ব্যবস্থা সেইভাবেই চলত। এখন সেইগুলো তুলে দিয়ে পাশ্চাত্য দেশের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। সুখে থাকতে ভুতে কিলোয়। আমাদের দেশে সুখ ছিল, ধর্ম ছেড়ে দিয়ে এই অবস্থা। গাঁজাখোর একটা place (স্থান) পেয়েছে রাষ্ট্রের কাছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য ধর্ম রাষ্ট্রের Constitution-এ (সংবিধানে) কোন স্থান পায় নি। গাঁজাখোরদের গাঁজার দোকান, মদ্যপায়ীদের মদের দোকান, আফিং-খোরদের আফিং-এর দোকান—এই প্রকার নেশাখোরদের provide করবার (বাঁচিয়ে রাখবার) জন্য লাইসেন্স দিয়ে বড় বড় দোকান খোলা হ'য়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ধার্মিক লোকদের জন্য কোন Provision বা বন্দোস্ত নেই, অধিকন্তু তাদের পেছনে লেগে পড়া যাতে তাদের অশান্তি ও অসুবিধা হয়। এতে দেশে শান্তি আসবে কি করে? আমাদের দেশ থেকে যদি ধর্ম উড়িয়ে দেওয়া হয়, তাহলে দেশের এই অসৎ প্রগতি রূথবে কে? মঠ-মন্দির সেই স্থান।

অল্প কয়েকদিন হ'ল অরবিন্দ মহারাজ দেহরক্ষা করেছেন। সাগানা সিটি ও লিখতে তিনি পারতেন না, কিন্তু বক্তৃতা দিলে লোকে বলত ইনি M.A., D.Litt. ইত্যাদি। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর এমনই একটা স্কুল খুলেছেন।

দেখা যায়, সাধুরা ফুঁ দিলে জ্বর সেরে যাবে। এই যে science (বিজ্ঞান)—আমি এটাকে science বলছি—এটা উঠে যাবে কেন? পরদেশের শিক্ষা নেওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয়।

মঠ মন্দিরের দরকার কি? আমি একটা political কথা বলছি। Unemployment (বেকার সমস্যা) Government (সরকার) সমাধান করতে পারছে না, totally failure (সম্পূর্ণ অকৃতকার্য)। বহু

শিক্ষিত লোক মঠে আছে এরা যদি চাকরী করত, ব্যবসা করত, তাতে আরও বহু লোক বেকার হ'য়ে যেত ।

সাধুরা যদি জমি নিয়ে লাঞ্ছল চাষ করে, তাহলে বহু চাষীর জমির অভাব হ'ত । সাধুরা যদি ব্যবসা করে, তাহলে অনেকের ব্যবসার চাটবাটা উঠে যেত । তারা যদি চাকরী করত তাদের দ্বারা অনেকের চাকরী করাও বন্ধ হ'য়ে যেত । সুতরাং সাধুরা দেশের সর্ববিষয়ে, সর্বতোভাবে উপকার করেছে । অধিকন্তু সাধুরা সাধারণ ভোগী লোকেরা যে সমস্ত ভোগ করে থাকে, সেগুলো গ্রহণ না করায় তাদের ভোগের দ্রব্য সুলভ হ'য়েছে । [আজকাল মুসলমানরা যেমন হিন্দুদের (accuse) দোষারোপ করে যে, তারা পেঁয়াজ, মূর্গী খায় বলে ওরা মূর্গী পেঁয়াজ পায় না । কারণ তারা দরিদ্র, অত অধিক মূল্যে পেঁয়াজ, মূর্গী কিনতে পারে না ; হিন্দুদের দরুণ মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে ।]

অত্যন্ত দুঃখ পেলে লোকে মঠে এসে শান্তি পায় । এমন কি ঐ যে হিরণ্যকশিপু, তার বড় ভাই-এর মৃত্যুতে তার বিধবা পত্নীকে শান্তি দিতে কোন টাকার তোড়া রাখেন, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তা'কে সান্তনা দিয়েছিল ।

আজকাল অনেক মঠ হয়েছে—মঠের শিক্ষা তাদের নেই, অথচ নাম মঠ । পাও দাও থাক—এই তাদের শিক্ষা । এগুলোকে মঠ বলে না, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' শিক্ষা মঠ দেয় না । এটা suicidal (আত্মহত্যার) নীতি । এই শিক্ষায় কেউ কাউকে মানে না । সকলে বলে, “আমি বড়, আমি ব্রহ্ম, তুমি বড় কিসের ? তোমার চেয়ে আমিই বড় ।” “তৃণাদপি সূনীচ” ভাবে সেটা নেই । বঙ্কিম চাট্টোজ্জ্যের 'আনন্দ মঠ' বই আমাদের আনন্দ দেবে না, তাতে যুদ্ধবিগ্রহ আছে । 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এর চেয়ে suicidal মত আর নেই । এই সমস্ত শিক্ষা যেখানে আছে, সেখানে মঠ শব্দের তাৎপর্য্য রক্ষিত হয় না —নিজস্ব

আনন্দপাড়ায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

গত ৪ঠা মাঘ, ১৬ই মাঘ, ইং ৩০শে জানুয়ারী, সোমবার পৌষ-কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর তিরোভাব-তিথি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সর্বত্রই বিশেষভাবে পালিত হইয়াছে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সেবকস্বত্রে জগতে আবির্ভূত হন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পূর্বাশ্রমের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল বসু প্রতিবৎসর এই বিরহ-তিথি বনগ্রামের নিকটবর্তী আনন্দপাড়া নিজবাটিতে (পাকিস্তান পরিত্যাগের পর নির্মিত) বিশেষ আড়ম্বরের সহিত উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। অস্বদীয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মও ১৫ই মাঘ রবিবার কয়েক মূর্তি ব্রহ্মচারী সহ উক্ত উৎসবে যোগদানের জন্য কলিকাতা হইতে আনন্দপাড়ায় শুভবিজয় করেন। উৎসব দিবসে মধ্যাহ্নে সহস্রাধিক জনসমাকীর্ণ মহতী ধর্মসভায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার দেড় ঘণ্টাব্যাপী (অপরাহ্ন ২-৩০টা—৪টা) ভাষণে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের সেবার সৌন্দর্য্য, গৌড়ীয় সারস্বত গগনে তাঁহার অলৌকিক অবদান ও ভক্তের প্রীতিবিধানে অব্যর্থকাল চিন্তানিরত প্রভৃতি বিবিধ অমূল্য গুণরাজি এবং তাঁহার অন্তর্দ্বানে ধর্মজগতের পরিচ্ছিন্ন রূপ বর্ণন করিতে করিতে বিরহে বিহ্বল হইয়া পড়েন।

সকাল হইতে মহাজন-বিরচিত বহু বিরহ-কীর্তন গীত হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভক্তিপ্ৰাপণ দামোদর মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করেন এবং মধ্যাহ্নে ভোগারতি ও সভার আদি-অস্তেও মহাজন পদাবলী কীর্তন হয়। সভান্তে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। তদন্তর সমাগত জনগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই মহোৎসবে ভোগরন্ধন-কার্য্যে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ব্রহ্মচারী প্রচুর সেবায় সুরোগ লাভ করেন।

পরদিন র মঙ্গলবার ১৭ই মাঘ পার্শ্ববর্তী বড়া গ্রামে পরলোকগত শ্রীপাদ নৃত্যগোপাল দাসাধিকারী (মুখার্জি) মহাশয়ের ধর্মপ্রাণা পরিজনবর্গের অনুরোধে উক্ত বাটিতে সকালে অবস্থান করিয়া অপরাহ্নে কলিকাতায় শ্রীমান্ মাধব মহারাজের মঠে বার্ষিক উৎসবে পুনরায় যোগদান করেন।

— নিভস্ব সংবাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসঙ্গ-পরিক্রমায় আস্থান

শ্রীশ্রী গুরুগোবিন্দো জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতি

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় ঠাট

ভেবরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ

(নদীয়া)

সাদর সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারা স্বয়ং-গবান শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল-ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে উপরি-উক্ত ঠিকানায় আগামী ৭ই চৈত্র ১৩৭৩, ইং ২১শে মার্চ ১৯৬৭, মঙ্গলবার হইতে ১০ই চৈত্র, ১৩৭৩ মার্চ, সেবার পর্যন্ত সপ্তাহ-ব্যাপী বিরাট মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদুষ্ঠানে প্রতাহ পাঠ, কীর্তন বক্তৃতা, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, মহাপ্রসাদ বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যা জত হইবে।

এই উপলক্ষে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামের অন্তর্গত নয়টি (৯টি) দ্বীপ দর্শন ও তত্ত্বস্থান-মহাত্মা-কীর্তন ও নগর-সংকীর্তন-মুখে ষোল ক্রোশ পরিক্রমা করা হইবে। এই বৎসরও শ্রীনৃসিংহপল্লী, মামগাছি ও শ্রীধাম মায়াপুরে মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও প্রসাদ-সেবাস্ত্রে অপরাহ্নে সহর-নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ধর্ম্যপ্রাণ সজ্জন-মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধ ভক্ত্যুষ্ঠানে সবান্নব যোগ-দান করিয়া সমিতির সদস্যবর্গকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহায়ুভূতি প্রদর্শন করিলে বিশেষ বাঞ্ছিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরানন্দ-মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং নবদ্বীপ পরিক্রমা-পঞ্জী পর-পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি— ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩; ইং ২৩/১১/৬৬

শুদ্ধভক্ত-কপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয়-বেদান্ত-সমিতি

উদ্বৃত্ত্য :—কোন বিষয় বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট উপরি-উক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতবা বা প্রেরিতব্য।

বর্তমান খাতি-পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিবেচনীয়।

পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ৭ই চৈত্র, মঙ্গলবার ; 21st Mar. (১) **শ্রীগোক্রমদ্বীপ** (কৌতুকাখ্য) —গঙ্গা-স্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহদেবপল্লী (মধ্যাহ্নে প্রসাদ-সেবা) ;

(২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য)—মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন ।

২। ৮ই চৈত্র, বুধবার ; 22nd Mar. (৩) **শ্রীকোমলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য) —গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলের-দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটী এবং

(৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চনাখ্য)—রাতুপুর ।

৩। ৯ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার ; 23rd Mar. (৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য) —জামগর (জহ্নুমুনিস্থান), বিজ্ঞানগর (শ্রীসার্কভৌম -ট্টাচার্য্যের পাট) এবং

(৬) **শ্রীমোদক্রমদ্বীপ** (দাস্তাখ্য)—মামগাছি (শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পাটে মধ্যাহ্নে প্রসাদ-সেবা), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞান-বাস) ।

৪। ১০ই চৈত্র, শুক্রবার ; 24th Mar. (৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখাখ্য) —রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, উজ্রাকপুর ও গঞ্জের ডাঙ্গা এবং

(৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—সিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেথারচর, বেলপুকুর ; অঃপরে কালদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা ।

৫। ১১ই চৈত্র, শনিবার ; 25th Mar. (৯) **শ্রীঅমৃতদ্বীপ** (আত্মানন্দনাখ্য) —শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীগৌর-জন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅষ্টৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্য মঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর-আচার্য্য-ভবন), জগদগুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি, চাঁদকাঁজির সমাধি, শ্রীধর অঙ্গন এবং শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট; তৎপরে মধ্যাহ্ন-ভোগরাগ ও প্রসাদসেবান্তে নবদ্বীপ-সহরে শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠে প্রত্যাহর্জন ।

৬। ১২ চৈত্র, রবিবার ; 26 Mar.—শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব ।

৭। ১৩ই চৈত্র, সোমবার ; 27th Mar.—সাধারণ মহোৎসব (সর্ব-সাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ) ।